বাংলা কথাসাহিত্যে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের নববীক্ষণ

পিএইচ.ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মুনমুন দাস

রেজিস্ট্রেশন: ১১ই জুলাই, ২০১৪। রেজিস্ট্রেশন নম্বর: **A00BE1100214**

তত্ত্বাবধায়ক

ড. সত্যবতী গিরি

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

এবং

ড. রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২১

Certified that the Thesis entitled

"বাংলা কথাসাহিত্যে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের নববীক্ষণ"

Submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. (retd.), **Dr. Satyabati Giri**, Bengali Dept. Jadavpur University and Prof. **Dr. Rajyeswar Sinha**, Bengali Dept. Jadavpur University.

And that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by the

Supervisor: Satyabati Giri

Dated: 05.07.2021

(Retired) Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

5/7/21

Professor
Bengali Department
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Candidate: Mumtaz Das

Dated: 5/7/2021

প্রাক্-কথন

বিগত কয়েক বছর ধরে আমি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধীনে গবেষণার কাজ করছি। আমার গবেষণার বিষয় : 'বাংলা কথাসাহিত্যে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের নববীক্ষণ'। চৈতন্যদেবকে নিয়ে আমি দীর্ঘদিন ধরেই চর্চা করে চলেছি। ইতিপূর্বে এম. ফিল স্তরে অধ্যাপিকা ড. সত্যবতী গিরির তত্ত্বাবধানে ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকটি চৈতন্যচরিতকাব্য নিয়ে একটি গবেষণা পত্র রচনা করার সুযোগ পেয়েছি। সেজন্য আমি দিদির কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে নতুন কোনো বিষয়ে গবেষণা করার ইচ্ছা আমার বরাবরই ছিল। তাঁকে কেন্দ্র করে পাঁচশো বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নানাবিধ চর্চা হয়ে চলেছে। তবে বাংলা কথাসাহিত্যে যেভাবে চৈতন্যদেবের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে, তাঁকে নিয়ে নতুন নতুন ভাবনা-চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে তা বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বভাবতই আমি এ বিষয়ে রচিত উপন্যাস ও ছোটগল্প সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে উঠি। এ বিষয়ে আমার কৌতূহলের কথা তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপিকা ড. সত্যবতী গিরিকে জানালে তিনি এ বিষয়ে আমাকে আরও উৎসাহিত করেন। সেই অনুপ্রেরণাতেই আমি গবেষণার জন্য উপরিউক্ত বিষয়টি নির্বাচন করি।

এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে ঊনবিংশ-বিংশ-একবিংশ শতকে রচিত বিবিধ উপন্যাস ও ছোটগল্প নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে চৈতন্যদেবের সুদূরপ্রসারী প্রভাব বাংলা কথাসাহিত্য জগতে কীভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে, আধুনিক কথাসাহিত্যকদের হাত ধরে কীভাবে চৈতন্যদেবের জীবনের নানা দিক নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উঠে এসেছে, চৈতন্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা কীভাবে অব্যাহত রয়েছে বাংলা কথাসাহিত্য জগতে, সম্পূর্ণ আধুনিক মানবিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কীভাবে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ ঘটে চলেছে, নববীক্ষণে চৈতন্যচর্চার অগ্রগতি কোন পথে প্রভৃতি বিবিধ বিষয় যুক্তি-তথ্যের আলোকে সম্পূর্ণ নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার-বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি।

প্রতিটি অধ্যায় যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি, তেমনি বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যগুলিকে অবিকৃত রেখে যথাযথভাবে সন্নিবেশ করেছি এবং তত্ত্বধায়কের মতানুসারে তাঁর দেখানো পথেই গবেষণার কাজটি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি। সর্বোপরি বিষয়টিকে ভালবেসে ঐকান্তিক অধ্যাবসায় ও নিরলস পরিশ্রম করে বিষয়টিকে যথাসম্ভব সুপরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছি। কতটুকু সাফল্য লাভ করতে পেরেছি জানি না।

তবে এই গবেষণা পত্রটি রচনায় আমার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা ড. সত্যবতী গিরির অবদান অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। তত্ত্বাবধায়ক রূপে তাঁকে পেয়ে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে গবেষণা কর্মের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর মূল্যবান পরামর্শ, সুচিন্তিত মতামত গবেষণা কর্মটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। তাছাড়া বই-পত্র দিয়ে, উৎসের সন্ধান দিয়ে তিনি নানাভাবে আমাকে পথ দেখিয়েছেন। সাংসারিক নানাবিধ জটিলতার মাঝখানে যখন আমার গবেষণা কাজটি প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে তখনও একমাত্র তিনিই আমাকে নিরন্তর উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর সস্নেহ তাড়না ও আশীর্বাদের ফলেই আমি আজ এই গবেষণা পত্রটি সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। তাঁকে জানাই আমার কোটি কোটি সশ্রদ্ধ প্রণাম।

সেই সঙ্গে আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জানাই আমার আর একজন তত্ত্বাবধায়ক বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক রাজ্যেশ্বর সিন্‌হা মহাশয়কে। বিভিন্ন সময়ে সদুপদেশ ও উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে তিনি আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন। গবেষণা কাজের সঙ্গে যুক্ত অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কাছ থেকে আমি সাহায্য পেয়েছি। তাঁকে জানাই আমার বিনম্র শ্রদ্ধা ও প্রণাম।

আমার গবেষণার প্রয়োজনে প্রামাণ্য গ্রন্থের জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গ্রন্থাগার এবং বাংলা বিভাগের গ্রন্থাগার থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি। এই সব গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মিবৃন্দকে আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, জাতীয় গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী এবং লিটল ম্যাগাজিনের সংগ্রহশালা থেকেও সাহায্য পেয়েছি।

পরিশেষে বলি যার একান্ত সহযোগিতা ছাড়া আমার এই কাজটি কোনোভাবেই সম্পূর্ণ হত না, তিনি হলেন আমার স্বামী রতন গোস্বামী। তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণাই আমার চলার পথের পাথেয় হয়েছে। তাঁকেও আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আর, যার স্নেহ-ভালবাসায় আমার কাজটি এগিয়ে গেছে সে হল আমার ছোট্ট সন্তান রত্নদীপ গোস্বামী। দুষ্টুমি, চঞ্চলতার মধ্যেও সে আমার পাশে থেকে নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়েছে। ওর প্রতি রইল আমার স্নেহাশীর্বাদ।

মুনমুন দাস

গবেষক

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-৬
প্রথম অধ্যায় : শ্রীচৈতন্য জীবনকথা	৭-২৬
দ্বিতীয় অধ্যায় : চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির পরিচয় ও প্রাসঙ্গিকতা	২৭-৫৬
তৃতীয় অধ্যায় : ঊনবিংশ শতকের কথাসাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব	৫৭-৭০
চতুর্থ অধ্যায় : বিংশ শতকের প্রথমার্ধে কথাসাহিত্যে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রভাবের প্রতিফলন	৭১-১২৪
প্রথম পরিচ্ছেদ : রবীন্দ্র সাহিত্যে ও জীবনদর্শনে নববীক্ষণে চৈতন্য	৭২-৯৪
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তারাশঙ্করের উপন্যাসে চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতিফলন	৯৫-১১৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ‘ত্রয়ী’ উপন্যাসে চৈতন্য প্রসঙ্গ	১১৪-১২৪
পঞ্চম অধ্যায় : বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কথাসাহিত্যে চৈতন্যচর্চার নবনিরীক্ষণ	১২৫-১৮১
ষষ্ঠ অধ্যায় : একবিংশ শতকের উপন্যাসে নববীক্ষণে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব	১৮২-২৫৬
সপ্তম অধ্যায় : বাংলা ছোটগল্পে চৈতন্য প্রসঙ্গ ও বৈষ্ণব অনুষঙ্গ	২৫৭-২৯৫
উপসংহার :	২৯৬-৩০৫
গ্রন্থসূচি :	৩০৬-৩২০

ভূমিকা

চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। ষোড়শ শতক থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত প্রায় তিনশ বছর ধরে চৈতন্যদেবের প্রভাব বাঙালি মানস পরিমণ্ডলকে বিচিত্র দিকে সম্প্রসারিত করেছে। ব্যক্তিবিশেষকে কেন্দ্র করে একটি দেশের জাতীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে, সর্বোপরি সাহিত্য ধারায় যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি হতে দেখা যায় তাকে অনেকেই চৈতন্য রেণেসাঁস বলে অভিহিত করেছেন। আর এই রেণেসাঁস বা নবজাগরণের প্রভাব কেবল ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। ঊনবিংশ-বিংশ-একবিংশ শতকেও এই চৈতন্য রেঁণেসাসের প্রভাব অব্যাহত রয়েছে বাংলা সাহিত্যে নিরন্তর চৈতন্যচর্চার মধ্যে দিয়ে।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, গল্প এমনকি উপন্যাসেও চৈতন্যদেবের গভীর প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় বাংলা কথাসাহিত্যে। বিংশ ও একবিংশ শতকে তাঁকে নিয়ে রচিত হয়ে চলেছে একের পর এক উপন্যাস, ছোটগল্প। আধুনিক কথাসাহিত্যকদের হাত ধরে বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে চৈতন্যদেবের জীবনের নানা দিক নতুন নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কীভাবে উঠে এসেছে তাই যুক্তি-তথ্যের আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ ও আলোচনার চেষ্টা করেছি এই গবেষণা পত্রে। চৈতন্যদেবের সুদূরপ্রসারী প্রভাব বাংলা কথাসাহিত্য জগতে কীভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে, কীভাবে আধুনিক কথাশিল্পীদের কলমে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের নবনির্মাণ, বিনির্মাণ ঘটে চলেছে, চৈতন্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারা কীভাবে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলেছে, নববীক্ষণে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের সেই প্রভাব অন্বেষণই এই গবেষণা পত্রের অন্বিষ্ট।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে একদিকে যেমন বাঙালি মানসে ‘ভাবের বাষ্প’ ও ‘প্রেমের রস’ জমে উঠেছিল, তেমনি সমাজ ও জীবনের বহিরঙ্গেও বৃহৎ মানবতার আদর্শ ও বিস্তার ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। তাঁর সমগ্র জীবনটাই বাঙালি জাতির আদর্শ। তাঁর আবির্ভাব থেকে তিরোধান পর্যন্ত বাল্য, কৈশোর, যৌবন, সন্ন্যাস ও সন্ন্যাস পরবর্তী জীবনের প্রতিটি ঘটনাই বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাই এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে আমরা চৈতন্যদেবের অলোকসামান্য মহাজীবনের, তাঁর আদি, মধ্য ও অন্ত্য লীলার একটি প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছি।

চৈতন্যদেবের এই মহাজীবনের কথা আমরা জানতে পারি বিবিধ চৈতন্যচরিত কাব্য থেকে। এই গ্রন্থগুলিতে একদিকে যেমন দেবতার পরিবর্তে মানবের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, অপরদিকে সমসাময়িক সামাজিক পরিবেশেরও পরিচয় বিধৃত হয়েছে যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পক্ষেই যে এক বিশেষ সম্পদ তাই নয় এর মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণও নিহিত রয়েছে। আর এই চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলি থেকে উপাদান গ্রহণ করেই আধুনিক কথাসাহিত্যিক কল্পনা ও বাস্তবের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সম্ভাবতাকে আখ্যানভাগে বিন্যস্ত করে উপন্যাস ও ছোটগল্পের সংরূপে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের বিনির্মাণ করেছেন। তাই আমাদের গবেষণায় প্রাসঙ্গিক ভাবেই চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলি আলোচনার অপেক্ষা রাখে। এই গবেষণা সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি।

চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলি অবশ্যই চৈতন্যদেবের জীবনের এবং সমসময়ের দলিল বটে। তবে প্রতিটি জীবনীকাব্যই লেখা হয়েছিল চৈতন্য মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে। ফলত চৈতন্য চরিত্রে দেবত্ব ও অলৌকিকত্ব আরোপিত হওয়ায় তাঁর মেধা, পাণ্ডিত্য, বাগ্মিতা, নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্ব, জনসংযোগ, সাংগঠনিক দক্ষতা ও সাহস, রাজনীতিক জ্ঞান, আদর্শনিষ্ঠা – এই সমস্ত অসাধারণ মনুষ্যোচিত গুণাবলী ও প্রতিভা যথাযথভাবে চিত্রিত হয় নি। এমনকি তাঁর অন্তর্ধান রহস্য এমনভাবে বর্নিত হয়েছে যে তাতে চৈতন্যচরিত্র অতিমাত্রায় অলৌকিক ও কাল্পনিক হয়ে পড়েছে। এই অলৌকিকতাকে মোচন করে যুক্তিনিষ্ঠভাবে চৈতন্যচরিত্র বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন বেশ কিছু আধুনিক কথাশিল্পী। তাঁরা নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনে ও অক্লান্ত চর্চায় মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায় চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের উপাদানকে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে অর্থাৎ উপন্যাস ও ছোটগল্পে ব্যবহার করে আজকের সমাজ ও নবপ্রজন্মকে উপহার দিতে প্রয়াসী হয়েছেন চৈতন্য ব্যক্তিত্বের নবদিগন্ত।

বাংলা কথাসাহিত্যের প্রথম যর্থাথ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরেই বাংলা উপন্যাস শিল্পের আবির্ভাব। বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতকের রেণেসাঁস যুগের শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র পজিটিভ যুক্তিধর্মী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে ‘ঊনবিংশ শতকের কথাসাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব’ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের ‘আনন্দমঠ’ উপন্যাসে কীভাবে চৈতন্যদেবের আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে, শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম থেকে ‘আনন্দমঠে’র সন্তানদের পালিত তথা বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসৃত বৈষ্ণব ধর্মের পার্থক্য কোথায় ও কেন; ‘মৃণালিনী’ ও ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসে কীভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসঙ্গ এসেছে তাই নিয়েই আলোচনা করেছি।

পরবর্তী চতুর্থ অধ্যায়ে ‘বিংশ শতকের প্রথমার্ধে কথাসাহিত্যে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রভাবের প্রতিফলন’ অন্বেষণ করতে গিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ লেখকদের উপন্যাসে কীভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে চৈতন্য প্রসঙ্গ, চৈতন্যদেবের উদার প্রেমনীতির অনুপ্রেরণায় উপন্যাসের চরিত্রগুলি কীভাবে নতুন মাত্রা পেয়েছে, গ্রাম বাংলার বাউল-বোষ্টম-বৈষ্ণবদের জীবনে চৈতন্য প্রবর্তিত নব্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাই কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি।

এই অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে ও সাহিত্যে চৈতন্যের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবের উদার প্রেমভক্তির বিরাট মানবিকতার স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন। চৈতন্যদেবের এই মানবপ্রেম ও মানবধর্ম প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী প্রতিফলন আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বউ ঠাকুরাণীর হাট’, ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসে দেখতে পাই।; আবার ‘গোরা’ উপন্যাসে গোরার রূপচিত্র ও চরিত্র গঠনে চৈতন্যদেবের প্রভাব, ‘ঘরে-বাইরে’ নিখিলেশের বিচ্ছেদ যন্ত্রনা বোঝাতে বিদ্যাপতির পদের ব্যবহার, ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে লীলানন্দ স্বামীর উপাখ্যানে বৈষ্ণব ধর্মের গুরুবাদী সাধনার স্বরূপ উন্মোচন প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে কীভাবে বার বার বিবিধ অনুষঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রভাব এসেছে তাই আমরা এই পরিচ্ছেদে আলোচনার চেষ্টা করেছি।

পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা রবীন্দ্রোত্তর পর্বের যথার্থ কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির রূপ এবং রাঢ় বাংলার আউল- বাউল-বোষ্টম ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের জীবন চিত্রের প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছি। যেমন ‘রাইকমল’ উপন্যাসে বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব সমাজের সার্থক প্রতিফল ঘটেছে, ‘রাধা’ উপন্যাসে একদিকে বৈষ্ণবধর্মের অবক্ষয়ের চিত্র ধরা পড়েছে অপরদিকে সেই অবক্ষয়ের বিপরীতে দাঁড়িয়ে চৈতন্যের প্রেমধর্ম তথা রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে বাস্তবের রাধা মোহিনী চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে, বাৎসল্য রসের ফল্গুধারা ‘স্বর্গমর্ত্য’ উপন্যাসে বোষ্টমীর জীবনকে প্রবাহিত করেছে, ‘কবি’, ‘নিশিপদ্ম’ প্রভৃতি উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ় বাংলার প্রান্তবাসিনী বারাঙ্গনা তথা দেহোপজিবীনি ডোমসম্প্রদায় প্রভৃতি সমাজের উপেক্ষিত নিম্নবিত্ত মানুষগুলির উন্নততর জীবনে উত্তরণের বাস্তব সত্য চিত্র তুলে ধরেছেন। আবার বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের উদারতার সুবাদে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তথা আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাঁর ‘রসকলি’, ‘রাইকমল’, ‘রাধা’, ‘স্বর্গমর্ত্য’ প্রভৃতি রচনায়। এই বিষয়গুলি নিয়েই এই পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

বিংশ শতকের আর এক প্রখ্যাত সাহিত্যিক সরোজকুমার রায়চৌধুরীও তাঁর উপন্যাসে রাঢ় বাংলার পটভূমিতে চৈতন্যপ্রভাবিত বৈষ্ণবজীবনের সহজ-সরল বাস্তব চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী', 'সোমলতা'- এই ত্রয়ী উপন্যাসে। এই উপন্যাসগুলিতে কীভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ, বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তন, বৈষ্ণবদের আখড়া নির্মাণ, ভিক্ষাবৃত্তি, মোচ্ছব প্রভৃতি অনুষঙ্গ; কীভাবে গ্রাম বাংলার বৈরাগী-বৈরাগিনীদের জীবনের সঙ্গে অন্বিত হয়ে গেছে চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্ম তাই আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। এভাবেই আধুনিক কথাসাহিত্যিকের হাত ধরে চৈতন্য-চর্চার ধারা অব্যাহত থাকে এবং চৈতন্যদেবের সুদূরপ্রসারী প্রভাব বাংলা কথাসাহিত্যে ফুটে ওঠে।

পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রচিত উপন্যাসে কীভাবে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের নবনির্মাণ ঘটেছে, কীভাবে আধুনিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে চৈতন্যদেবের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে, নবনিরীক্ষণে চৈতন্যচর্চার ধারা কীভাবে বাংলা উপন্যাস শিল্পে প্রতিফলিত হয়েছে তাই নিয়েই আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু ইতিহাসকে আশ্রয় করে মানবপ্রেমিক ও জনসংঘের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্ব হিসাবে চৈতন্যচরিত্রের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁর কালকূট ছদ্মনামে লেখা 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য' উপন্যাসে। আবার কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'সাগরিক' উপন্যাসে চৈতন্যজীবনের নানান দিক সাম্প্রতিক কালের প্রেক্ষাপটে কীভাবে তুলে ধরেছেন তাও আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে। গজেন্দ্রকুমার মিত্র 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদে বর্ণিত সাধ্য-সাধন তত্ত্ব অবলম্বনে সাধ্যশিরোমণি 'কান্তাপ্রেম' লাভের আশায় বিশ্বম্ভরের জীবন কীভাবে আবর্তিত হয়েছিল তাই দেখান তাঁর 'কান্তাপ্রেম' উপন্যাসে। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসে সম্পূর্ণ ভিন্ন পটভূমিতে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব আশ্রমকে কেন্দ্র করে তথাকথিত শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত একটি পরিবারের সদস্যদের জীবনাবর্তের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন।

বাংলা কথাশিল্পীরা যখন তাদের উপন্যাসে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রভাবের নবনিরীক্ষণ করে চলেছেন তখন এই অলোকসামান্য মহাপুরুষের তিরোধান রহস্য নিয়ে আলোকপাত করলেন জয়দেব মুখ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' উপন্যাসে। চৈতন্যদেবের তিরোধান নিয়ে তিনি চৈতন্যচরিতকার জয়ানন্দ, বৃন্দাবন দাস থেকে শুরু করে রোমা রোঁলা, দীনেশ চন্দ্র সেন, বিমানবিহারী মজুমদার প্রমুখদের বক্তব্যকে যেভাবে তুলে ধরে প্রায় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তা কতটা যুক্তিসঙ্গত গ্রহণযোগ্য তাও আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি।

এভাবেই কথাসাহিত্যিকের হাত ধরে চৈতন্যদেবের প্রভাব ও চৈতন্যচর্চার ধারা নব নব রূপে নবতাৎপর্যে একবিংশ শতকেও বাংলা উপন্যাস শিল্পে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। একবিংশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আজও চৈতন্যদেবের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাঁকে নিয়ে রচিত হয়ে চলেছে একের পর এক উপন্যাস। কোথাওবা নায়করূপে চৈতন্যব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ ঘটেছে, কোথাওবা তাঁর পদরেণুধন্য বিশিষ্ট স্থানগুলি নিয়ে উপন্যাস রচিত হয়েছে, কোথাও বা তাঁর সমসময়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পটভূমিতে ঔপন্যাসিকের কল্পনা আবর্তিত হয়েছে। আবার চৈতন্যদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কোনো কোনো উপন্যাস যেন হয়ে উঠেছে বর্তমানের প্রেক্ষিতে মধ্যযুগের নবনির্মাণ। আমাদের গবেষণা পত্রের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এ প্রসঙ্গে অবশ্যই ২০০১ সালে চৈতন্যদেবের পাঁচশত বৎসর পূর্তি উপলক্ষে ডঃ দীপক চন্দ্রের লেখা 'সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থটি আলোচনার অপেক্ষা রাখে, যেখানে ঔপন্যাসিক চৈতন্যদেবের প্রতিবাদী গণশক্তির জাগরুক সত্তার পরিচয় বিধৃত করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিপ্লবী নায়কের আখ্যান রূপে উপন্যাসটির অভিনবত্ব আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার, চৈতন্যদেবের গৌড় তথা রামকেলি পরিভ্রমণকে কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত অভিজিৎ সেনের 'রাজপাট ধর্মপাট' (২০০৮) উপন্যাসটিও আমাদের গবেষণায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে।

হাজার বছরের বাঙালি জাতির ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রীচৈতন্য। নবদ্বীপে তিনি গৌরাঙ্গ, গৌর, গোরা নামে পরিচিত। এই গোরা তথা চৈতন্যদেবকে নিয়েই শৈবাল মিত্র লিখলেন তাঁর সুদীর্ঘ ও সর্ববৃহৎ উপন্যাস 'গোরা' (২০১২)। এই উপন্যাসে লেখক এ যুগের গোরা, রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের গোরা আর মধ্যযুগের গোরা চৈতন্যদেব - এই তিন যুগের গোরার মধ্যে কীভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন তাও আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি।

আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছে চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে রচিত রূপক সাহার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'ক্ষমা কর হে প্রভু'(২০১৩)। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অতীতের রূপরেখা রচনা করে লেখক একই সঙ্গে যেমন ষোড়শ শতকের পটভূমিতে চৈতন্যদেবের জীবন বৃত্তান্ত রচনা করেছেন তেমনি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে চৈতন্যদেবের আদলে দলিত সম্প্রদায়ের নেতা রূপে গোরা চরিত্রকে নির্মাণ করে সমসময়কে রূপদান করেছেন। সেই সঙ্গে চৈতন্যদেবের মৃত্যু নিয়ে লেখকের গবেষণাধর্মী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে।

এভাবেই ঔপন্যাসিকের কলমে বাংলা সাহিত্যে একদিকে যেমন চৈতন্যদেবের সুদূরপ্রসারী প্রভাব অব্যাহত থাকে, অপরদিকে চৈতন্যব্যক্তিত্বের নবনির্মাণ ও বিনির্মাণ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলে। এ প্রসঙ্গে আমরা চৈতন্যদেবের পদরেণুধন্য পানিহাটি গ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'পানিহাটা'(২০১৪), মহাপ্রভুর আদিলীলা নিয়ে রচিত কিন্নর রায়ের 'শ্রীচৈতন্য কথা' (২০১৮), চৈতন্যদেবের সমসাময়িক গৌড়বঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়ের লীলা পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'চেনা পথ অচেনা পথিক' (২০০৯), অলখ মুখোপাধ্যায়ের 'এক জন্মেই জন্মান্তর'(২০১৪) এবং হাল আমলে বসন্ত লস্করের 'মিথের মানুষ শ্রীচৈতন্য'(২০২০) প্রভৃতি উপন্যাসগুলি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

সর্বশেষ অধ্যায়ে আমরা 'বাংলা ছোটগল্পে চৈতন্যপ্রসঙ্গ ও বৈষ্ণব অনুষঙ্গ' নিয়ে আলোচনা করেছি। ছোটগল্প যা অনন্তে প্রসৃত মানব জীবনের রূপকে একটি মুহূর্তের অতলে একান্ত করে ব্যঞ্জিত করে তোলে সেই ছোটগল্পেও বিবিধ প্রসঙ্গে ঘুরে ফিরে এসেছে চৈতন্যদেব ও তাঁর নানা অনুষঙ্গ। ছোটগল্পের প্রথম যথার্থ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ স্বনামধন্য কথাশিল্পীদের রচিত বিবিধ ছোটগল্পে কীভাবে চৈতন্যদেবের উদার প্রেমধর্মের প্রতিফলন ঘটেছে, চৈতন্যের সর্ব জাতি-ধর্ম-বর্ণ সমন্বয়ের আদর্শ গ্রামবাংলার সমাজজীবনে প্রতিফলিত হয়েছে, কীভাবে সমাজবিচ্যুত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানুষ বৈষ্ণবধর্মের ছত্রছায়ায় এসে আত্মরক্ষা করেছে,আর বাংলা ছোটগল্পের বাস্তব পটভূমিতে কীভাবে সেই সত্য চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে তাই আমরা এই অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি। সেইসঙ্গে চৈতন্য প্রবর্তিত কীর্তন গানের সুর, বৈষ্ণব পদ ও পদাবলী কীভাবে বাংলা ছোটগল্পকারদের হাতে নব নব তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, রাঢ় বাংলার বাউল-বোষ্টম-বৈষ্ণব সমাজ এবং নিম্নবর্গীয় সম্প্রদায় প্রভৃতিদের উপর চৈতন্যদেবের প্রভাব তথা লোকজীবনে চৈতন্যের প্রভাব কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাই নিয়েই আমরা আমাদের গবেষণাপত্রের শেষ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এইভাবে সাতটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আমরা গবেষণার বিষয়টিকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

সময় বয়ে চলে অথচ কালের গণ্ডী পেরিয়ে এই একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে আজও আমরা বাংলা কথাসাহিত্যের মধ্যে দিয়ে চৈতন্যদেবকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারি। বর্তমান যুগসংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে একমাত্র চৈতন্য চেতনাই পারে জাতিকে পুনরুদ্ধার করতে, নতুন পথের দিশা দেখাতে, নতুন সমাজ, নতুন জীবন গড়ে তোলার প্রেরণা জোগাতে। তাই তিনি একদা যে 'বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন' তা একবিংশ শতাব্দী ও শত শতাব্দীতেও হবে অক্ষয়, অমলিন, চিরন্তন। আর বাংলা কথাসাহিত্যে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের প্রতিফলনই নববীক্ষণে নবপ্রজন্মকে আশার আলো দেখাবে।

প্রথম অধ্যায়

শ্রীচৈতন্য জীবনকথা

শ্রীচৈতন্যের অলোকসামান্য জীবন, তাঁর ভক্তির একনিষ্ঠতা ও প্রাবল্য সমগ্র বাঙালি জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছিল। ক্রমপ্রসারণশীল মুসলমানধর্ম হিন্দু সমাজের যে সীমাসংকোচন ঘট্টাচ্ছিল, তাতে সেদিনের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু বাঙালি হয়ে পড়েছিল আরও বেশি রক্ষণশীল। জাতিভেদ প্রথার প্রাচীর তুলে নিজেদের মধ্যে বিভেদ ও বিছিন্নতাকে বাঙালি আরও বেশি গাঢ়তর করে তুলেছিল। ধর্ম বিকৃত হয়েছিল প্রাণের স্পর্শশূণ্য ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে, দেবোপাসনা পরিণত হয়েছিল ভক্তিহীন আচার পরায়ণতায়, কখনও কখনও নীরস বিশুষ্ক জ্ঞানচর্চায়।

এই পটভূমিতেই নবদ্বীপে, যেখানে ঐশ্বর্য আর বিদ্যার দম্ভ যুগপৎ বিকৃত করেছিল মানুষের প্রাণসত্তাকে, সেখানে আবির্ভাব ঘটল শ্রীচৈতন্যের। ১৪০৭ শকে, পবিত্র জাহ্নবীতীরস্থ বিদ্বজ্জনপরিশোভিত নবদ্বীপ নগরে মনোহর ফাল্গুন মাসে, পূর্ণিমা নিশীথে, শ্রীগৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হলেন। সেই দিন ছিল চন্দ্র গ্রহণ, হরিধ্বনি ও শাঁখ ঘন্টা মাদলের বাজনায় সন্ধ্যাকালে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছিল, হরিধ্বনি মুখরিত নবদ্বীপে ভূমিষ্ঠ হলেন পতিতপাবন শ্রীগৌরচন্দ্র।

যুগে যুগে যখনই ধরিত্রী মাতা পাপে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তখনই দুষ্টকে দমন করে শিষ্টের পালনের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত ঈশ্বর অবতার রূপে মর্তে অবতীর্ণ হয়েছেন। ভাগবত ও গীতার প্রতিধ্বনি করে বৃন্দাবন দাস 'চৈতন্যভাগবত'এ চৈতন্যের আবির্ভাবের কারণ ব্যক্ত করলেন :

"ধর্মপরাভব হয় যখনে যখনে।

অধর্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে।।

সাধুজন রক্ষা দুষ্ট বিনাশ কারণে।

ব্রহ্মা আদি প্রভুর পায়ে করেন বিজ্ঞাপনে।।

তবে প্রভু যুগধর্ম স্থাপন করিতে।

সাঙ্গোপাঙ্গে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে।।

কলিযুগে ধর্ম হয় হরিসংকীর্তন।

এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন।।”[১]

অদ্বৈত আচার্য্যের হুঙ্কারে কাকুতিতেই শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব। সে যুগে বৈষ্ণবরা ছিল সমাজে অবহেলিত, অনাদৃত। সে সময় সাধারণ মানুষ বিষহরি, বাশুলী বা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করত। কৃষ্ণ নামে কারও আস্থা নেই, সাড়া নেই যারা কৃষ্ণনাম করে, যাদের কৃষ্ণনামে উন্মাদনা তারা সব উপহাসের বস্তু। শুধু বিদ্যা ও বিষয় ব্যাপারের আয়োজন, ভক্তির বাষ্প নেই কোনোখানে। বৈষ্ণবেরা ম্লান, বিমর্ষ। চারিদিকে কেবল প্রাণহীন বিদ্যা ও জ্ঞানহীন বিষয়ের হাকডাক। যে সমাজে চলমানতা রুদ্ধ, বুদ্ধি একান্তই শুষ্ক, অথচ উচ্চবর্গ বিত্তশালী, যে সমাজে বিদ্যা ও ধনের ব্যবহার অপচয় ও অপব্যবহারের নামান্তর, সে সমাজের নৈতিক মানের অধোগতি অবধারিত। নৈতিক চরিত্রের অধোগতির অন্যতম কারণ ছিল সমাজে তান্ত্রিকতার অনুপ্রবেশ। ব্রাহ্মণ সহ হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের একটি বড় অংশে তান্ত্রিকতা জীবনাচরণের অঙ্গীভূত হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান নবদ্বীপে যে বিদ্যা লাভের জন্য নানা দেশ থেকে অগণিত পড়ুয়ার সমাবেশ ঘটত সে বিদ্যা কেবল শুষ্ক মস্তিষ্কচর্চা মাত্র। বিত্তশালীরা ‘ধন নষ্ট করে পুত্র কন্যার বিভায়’ – ধনের এই ব্যবহার অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। ব্যয়বহুল ধর্মকর্মহীন অর্থহীন, প্রাণহীন আচার রীতিসর্বস্ব। শাস্ত্রীয়, লৌকিক, তান্ত্রিক বিবিধ বিচিত্র ধর্মকৃত্যের মধ্যে দিয়ে সমাজদেহে সামঞ্জস্যের অভাব সুস্পষ্ট। উচ্চ ও নিম্ন বর্ণের প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ বৃত্তিতে কঠোরভাবে সংযুক্ত। বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও প্রৌঢ় মনীষার অধিকারী হয়েও কর্মবিভক্ত হিন্দু সমাজের চলমানতার গতি রুদ্ধ, বিচ্ছিন্নতা ও উদ্দেশ্যহীনতায় সমাজদেহ পীড়াগ্রস্ত। এই সামাজিক অচলতা, মানসিক শুষ্কতা এবং ব্যবহারিক জীবনচর্চার উদ্দেশ্যহীনতার বিরুদ্ধেই চলিষ্ণু, হৃদয়ধর্মী, মানবমুখী প্রতিবাদী যে বিস্ফোরক ধর্মান্দোলনের আত্মপ্রকাশ, যাকে চিহ্নিত করা হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম নামে – শ্রীচৈতন্য ছিলেন সেই আন্দোলনের নায়ক। ড. সত্যবতী গিরির মতে, “ বৈদিক ধর্মের মানবিকতা বর্জিত অনুষ্ঠান সর্বস্বতার প্রতিবাদে যে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ঘটেছিল একসময়ে তাকেই অবদমিত করে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল বিদ্যা, বিত্ত ও জাতিগত কৌলিন্যের অহংকার। মহাপ্রভু ধর্মের সেই গ্লানিকে আবার দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধ, যীশুর মত শ্রীচৈতন্য ধর্মপ্রচারের কাজে নামেন নি। তাঁর দিব্যভাবপূত জীবনাচরণই ভক্ত পরিকদের প্রেরণা যুগিয়েছিল বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের ও ভক্তিদর্শনের নবতর নির্মিতিতে।”[২]

চৈতন্যের পৈতৃক নিবাস ছিল শ্রীহট্টের উত্তরে ঢাকা দক্ষিণ নামে এক স্থানে। জয়ানন্দ বলেছেন এই নিবাস ছিল শ্রীহট্টের জয়পুর গ্রামে। সেখানকার উপেন্দ্র মিশ্র নামে এক ‘বৈষ্ণব পণ্ডিত ধনী’ বৈদিক ব্রাহ্মণের সাত পুত্রের মধ্যে একজন ছিলেন জগন্নাথ মিশ্র। তিনি সম্ভবত নবদ্বীপের মায়াপুর পল্লীতে

বাস করতেন। তাঁর উপাধি ছিল ‘পুরন্দর’। জয়ানন্দের মতে, জগন্নাথ মিশ্রের দেশত্যাগের কারণ ছিল দুর্ভিক্ষ, মড়ক, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি বিপর্যয়। তিনি আরও বলেছেন চৈতন্যের পূর্বপুরুষ উড়িষ্যার জাজপুরের অধিবাসী ছিলেন, রাজা ভ্রমর বা কপিলেন্দ্রদেবের ভয়ে দেশ ত্যাগ করে শ্রীহট্টে উপনিবিষ্ট হন।

“চৈতন্যগোসাঞির পূর্বপুরুষ

আছিল জাজপুরে।

শ্রীহট্ট দেশেরে পলাইয়া গেলা

রাজা ভ্রমরের ডরে।

সেই বংশে পরম বৈষ্ণব

কমললোচন তার নাম।

পূর্ব্ব জন্মের তপে চৈতন্য গোসাঞি

তার ঘরে কৈল বিশ্রাম।।”[৩]

তিনি বিয়ে করেছিলেন নবদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত, সম্মানিত এবং প্রভাবশালী নীলাম্বর চক্রবর্তীর কন্যা শচীদেবীকে। এই জগন্নাথ মিশ্র এবং শচীদেবীই শ্রীচৈতন্যের বাবা-মা। তাঁদের প্রথম সন্তান বিশ্বরূপ। তারপর তাদের অনেকগুলি সন্তান জন্মেই মারা যায়। অবশেষে জন্ম হয় চৈতন্যের। মৃতবৎসার পুত্র বলে অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবী নবজাতকের নামকরণ করলেন ‘নিমাই’। ‘নিম’-এর তেতো স্বাদের ভয়ে যমরাজ ‘নিমাই’ নামধারীর ধারে কাছে ঘেঁষবেন না – এই বিশ্বাসে যমরাজকে ঠেকাতেই শচীদেবীর (সম্ভবত) দশম সন্তানের নামকরণ করা হয় ‘নিমাই’। আবার, নিমাইয়ের আঁতুড় ঘর হয়েছিল বাড়ির এক পুরানো নিমগাছের তলায়। তাই তাঁর নাম ‘নিমাই’ বলেও অনেকে মনে করেন। নবজাত শিশুর অপরূপ দেহকান্তি, অনুপম সৌন্দর্য এবং উজ্জ্বল গৌরবর্ণের জন্য পাড়ার মেয়েরা তার নাম রেখেছিল গৌরাঙ্গ, গৌরহরি। দাদা বিশ্বরূপের সঙ্গে মিলিয়ে বিদ্বানেরা নাম রাখেন ‘বিশ্বম্ভর’।

শিশু নিমাই প্রথম থেকেই মেয়েদের মন কেড়ে নিয়েছিলেন যেমন দেহকান্তিতে ও সৌন্দর্যে তেমনি তাঁদের চিত্তের ভক্তিরস আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর অবোধ আচরণে। কোনো কারণে শিশু কাঁদলে তাঁকে থামানো যেত শুধু হরিনাম করে। নিমাই বড় হয়েছেন এক স্বল্পবিত্ত বাপ-মায়ের সন্তানরূপে, পাড়া-পড়শীদের শুভকামনায় এবং সস্নেহ প্রশ্রয়ে। মায়ের কোল ছেড়ে ক্রমশ হামাগুড়ি দিয়ে চলতে শুরু

করেছেন। যে কোনো শিশুর মতোই অগ্নি সর্প যা দেখতেন ধরার জন্যে হাত বাড়াতেন। একবার বিষধর সর্পের হাত থেকে বেঁচেছিলেন। হাঁটতে শিখে প্রতিবেশীদের বাড়িতেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাটাতেন। কারও ঘরে দুধ, কারও ঘরে ভাত চুরি করতেন, খাদ্যদ্রব্য না পেলে হাঁড়ি ভাঙতেন, ঘরের শিশুকে কাঁদাতেন। প্রতিবেশীরা সস্নেহে সেসব ক্ষমা করত। এমনি ভাবে বাইরে বাইরে ঘুরতে গিয়ে শিশু নিমাই একদিন ছেলে ধরার হাতেও পড়েছিলেন। চোর স্বর্ণ আভরণে ভূষিত নিমাইকে দেখে কাঁধে তুলে নিল। মনে মনে স্থির করল, বাড়ি নিয়ে গিয়ে শিশুর গা থেকে খুলে নেবে গহনা। তারপর শিশুকে দূরে নির্জনে গিয়ে ছেড়ে দেবে অথবা সংসার থেকে সরিয়ে দেবে। নিমাইও পরম নিশ্চিন্তে কাঁধের উপর বসে পা ঝুলিয়ে চলেছে। এদিকে বাড়ির সকলে হঠাৎ নিমাইকে না দেখে চারিদিকে অনুসন্ধান করতে থাকে। এদিকে চোর বিভ্রান্ত হয়ে পথ স্থির করতে না পেরে নিমাইকে শচীর দরজায় এনেই নামিয়ে দেয়।

শিশিরকুমার ঘোষ 'শ্রী অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থে নিমাইয়ের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে : "এই যে শিশুটি শচী ও জগন্নাথ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন, ইহার আকৃতি ও প্রকৃতি ঠিক অন্য শিশুর ন্যায় নহে। প্রথমত যেরূপ বয়স তাহা অপেক্ষা তাহার শরীর অনেক বড় ···।"[৪] পূর্ণ দ্বাদশ মাস তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন। প্রতি অঙ্গের চলন, নয়নের দৃষ্টি, মুখের হাসি এবং কথা সবই লাবণ্যময়। এছাড়া শচী, জগন্নাথ ও অন্যান্যরা চৈতন্যের অনেক অলৌকিক ঘটনাও প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। কখনো শূন্য পায়ে হেঁটে গেলেও নিমাইয়ের পায়ে নূপুরের ধ্বনি শুনতে পান শচী-জগন্নাথ। কখনো নিমাই হেঁটে চলে গেলে স্বচ্ছ ঘরের মেঝেতে ধ্বজ, ব্রজ আর অঙ্কুশ বিষ্ণুর এই তিন পদচিহ্ন ফুটে উঠতে দেখা যায়। কখনো শচী দেখেন নিমাইয়ের সর্বাঙ্গ বিদ্যুৎ দ্বারা আবৃত, আবার কখনো তাঁর হৃদয়ে চন্দ্রের ন্যায় কি জ্বলতে দেখা যায়। 'চৈতন্যভাগবত' : "একদিন ডাকি বোলে মিশ্র পুরন্দর। / আমার পুস্তক আন বাপ বিশ্বম্ভর।।/ বাপের বচন শুনি ধাঞা ঘরে যায়।/ রুণুঝুনু করিতে নূপুর বাজে পায়।।/ মিশ্র বোলে কোথা শুনি নূপুরের ধ্বনি। / চতুর্দিকে চাহে দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।।/ ····· পুথি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে।/ আর অদ্ভুত দেখে গৃহের মাঝেতে।।/ সব গৃহ দেখে অপরূপ পদচিহ্ন।/ ধ্বজ ব্রজাঙ্কুশ পতাকাদি ভিন্ন ভিন্ন।"[৫]

শচীর জনক নীলাম্বর চক্রবর্তী নবজাতকের দেহে 'মহারাজলক্ষণ' দেখে বিস্মিত হয়ে যান। এই শিশু যে সাধারণ শিশু নয়, ভবিষ্যতে সে যে মহাপুরুষ হবে তার ইঙ্গিত দেন নীলাম্বর চক্রবর্তী। 'চৈতন্যভাগবত':

"বিপ্র বোলে এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ।

ইহা হইতে সর্ব ধর্ম হইবে স্থাপন।।

ইহা হইতে হইবেক অপূর্ব প্রচার।

এ শিশু করিবে সর্ব জগৎ উদ্ধার।।"[৬]

"জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-এ নিমাইয়ের বাল্য ও কৈশোরের যে পরিচয় আছে তার থেকে ভবিষ্যতের 'মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য' -এর স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়"[৭] বলে মনে করেন প্রখ্যাত সমালোচক। বাল্যকালে নিমাই ছিলেন অত্যন্ত জেদি, দুরন্ত ও তেজস্বী। সমবয়সী ছেলেদের তিনি নেতা ছিলেন। উপনয়নের পরে তাদের সঙ্গে নাচ ও কীর্তন করে বেড়াতেন। নিজেকে কৃষ্ণ বলে ঘোষণা করেছিলেন। শিক্ষকদের শাসন মানতে চাইতেন না। শিক্ষক গঙ্গাদাস শারীরিক শাস্তি দেওয়ায় তিনি তাঁর লেখার পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে দিয়ে কেঁদেছিলেন। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' :

"একদিন গঙ্গাদাস মন্দিরে বসিয়া।

পড়ুয়াকে কটাক্ষিল ঈষৎ হাসিয়া।।

কোন ব্যাটা আছে দেখো ব্যাখ্যা মোর খণ্ডে।

তার কান্ধে চড়িয়া টাকর মারোঁ মুণ্ডে।।

ইহা শুনি গুরু মারে পুস্তকের বাড়ি।

কান্দিয়া পুস্তক ছিঁড়ি খিতিতলে পড়ি।।"[৮]

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিমাই হয়ে উঠতে লাগলেন দুরন্ত, মা-বাবা প্রতিবেশীদের স্নেহাধিক্যে অত্যন্ত জেদী স্বভাবের। এক একাদশীর দিনে নিমাই জেদ ধরে বসে যে জগদীশ পণ্ডিত ও হিরণ্যভাগবত নামক দুই ব্রাহ্মণের বাড়ি থেকে একাদশীর নৈবেদ্য এনে তাকে খাওয়াতে হবে। ঐ সকল দ্রব্য বাজার থেকে এনে দিতে চাইলেও নিমাই রাজী হয় না। ব্রাহ্মণের নৈবেদ্যই তাঁর চাই। অবশেষে ঐ দুই ব্রাহ্মণ এসে নিমাইকে দেখে স্বয়ং গোপাল অধিষ্ঠান করছে ভেবে মহা আনন্দে একাদশীর নৈবেদ্য নিমাইয়ের সামনে দেয়।

একবার এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ বাড়িতে এলে আতিথেয়তায় উদ্বেল হলেন জগন্নাথ। স্বহস্তে পাক করে ব্রাহ্মণ যখন নির্জনে খেতে বসে গোপালকে অন্ন নিবেদন করছে এমন সময় কোথা থেকে ছুটে এসে

নিমাই ব্রাহ্মণের থালা থেকে অন্ন তুলে নিয়ে খেতে থাকে। ব্রাহ্মণ পুনরায় রন্ধন করে গোপালকে নিবেদন করতে গেলে, আবার একই ঘটনা ঘটে। পরিশেষে নিমাইয়ের মধ্যে গোপালকে, শ্রীকৃষ্ণকে তথা নারায়ণকে দেখে বিস্মিত, অভিভূত হয়ে যায়।

ক্রমে নিমাইয়ের হাতে খড়ি হল, তার কিছু পরে কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ। বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিমাইয়ের চাপল্য ও চঞ্চলতা বৃদ্ধি পেতে লাগল। সমবয়সীদের সঙ্গে দলবেঁধে গঙ্গার ঘাটে যেতেন, জলে দাপাদাপি করতেন, স্নানার্থীর বস্ত্র, পূজার্থীর শিবলিঙ্গ চুরি করতেন। কুল্লোল করে লোকের গায়ে দিতেন, ডুব সাঁতার দিয়ে কারো পা ধরে টানতেন। স্নানার্থীরা জগন্নাথ মিশ্রের কাছে অনুযোগ করতেন, বালিকারা অভিযোগ করত শচীদেবীর কাছে।

দুরন্ত নিমাই একমাত্র বাধ্য ছিলেন দাদা বিশ্বরূপের, বিশ্বরূপও ছোট ভাইটিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। অদ্বৈতাচার্য্য ছিলেন মিশ্র পরিবারের পরম হিতৈষী। সম্ভবত তিনি শচীদেবীর দীক্ষাগুরু ছিলেন। এই অদ্বৈতাচার্য্যের টোলেই বিশ্বরূপ বেদান্ত ও ভক্তিশাস্ত্র পড়তেন। দিন রাত অদ্বৈত সভাতেই কাটাতেন। বিশ্বরূপের যৌবন সমাগম দেখেও তাঁর বৈরাগ্যভাব, সংসারের প্রতি ঔদাসীন্য লক্ষ করে জগন্নাথ মিশ্র পুত্রের বিবাহ দিয়ে তাকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করার উদ্যোগ করেন। পিতার মনোভাব বুঝতে পেরে এক শীতের রাতে সকলের অগোচরে নিদ্রিত পিতামাতাকে প্রণাম করে, ছোটভাই নিমাইকে কৃষ্ণের পাদপদ্মে সমর্পন করে বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করে চলে যান। অল্পদিনের মধ্যে তিনি পুরী সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় শঙ্করারণ্য।

বিশ্বরূপের গৃহ ত্যাগ জগন্নাথের সংসারে প্রথম আঘাত হানল। এই সময় বিশ্বম্ভর পিতা-মাতাকে এই সান্ত্বনা দিলেন যে তিনি কখনও তাদের ছেড়ে সংসার ত্যাগ করবেন না। দাদার গৃহত্যাগে তাঁর মনেও দারুণ আঘাত লেগেছিল। তাঁর চাঞ্চল্য সাময়িকভাবে কমে যায়। তিনি পড়াশোনায় মনোযোগী হন। বেশি লেখাপড়া শিখলে অবশিষ্ট সন্তানটিও দাদার অনুসরণে সংসার ত্যাগ করবে এই আশঙ্কায় জগন্নাথ তাঁর লেখাপড়া বন্ধ করে দেন। লেখাপড়া বন্ধ হতেই আবার শুরু হল নিমাইয়ের দুরন্তপনা। একদিন তিনি আস্তাকুঁড়ের হাঁড়িকুঁড়ির মধ্যে গিয়ে বসলেন:

“একদিন মিশ্র চলিলেন কার্যান্তরে।

পড়িতে না পায় প্রভু ক্রোধিত অন্তরে।।

বিষ্ণু নৈবেদ্যের যত বর্জ্য হাণ্ডিগণ।

বসিলেন প্রভু হাঁড়ি করিয়া আসন।।”[৯]

আবার পড়াশুনা করার অনুমতি আদায় করে তবে সেই অশুচি স্থল ত্যাগ করলেন। জেদী বিশ্বম্ভরের একগুঁয়েমিতে বাধ্য হয়ে জগন্নাথ কনিষ্ঠ পুত্রকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করে দিলেন। বিশ্বম্ভর অসম্ভব রকমের প্রতিভাশালী ছিলেন। তাঁর ব্যাকরণ ও সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানে অল্পদিনের মধ্যে অসাধারণ বুৎপত্তি দেখে গঙ্গাদাস পণ্ডিত আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।

এমন সময় অকস্মাৎ জগন্নাথ পরলোক গমন করলেন। ছেলেমানুষ নিমাই রাতারাতি সাবালক ও বিচক্ষণ হয়ে গেলেন। তিনি মাকে সান্ত্বনা দিলেন, যথোচিত পিতৃকৃত্য করলেন এবং পাঠে মনোযোগ আরও বাড়িয়ে দিলেন। প্রাতঃকালে নিমাই চতুঃষ্পাঠিতে পাঠ করতেন। যখন গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন, তখন অন্যান্য টোলের পড়ুয়াদের সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করতেন। অতি অল্প বয়সে ঘরে বসে নিমাই ব্যাকরণের একখানি টিপ্পনী করেছিলেন এবং তা কেবল নবদ্বীপেই নয়, অন্যত্রও সমাজে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছিল। এরপর নিমাই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ণ করেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই ন্যায়েরও একখানি টিপ্পনী রচনা করেছিলেন। একইসময়ে তাঁর সহপাঠী রঘুনাথও একখনি ন্যায়ের গ্রন্থ লিখেছিলেন। রঘুনাথের গ্রন্থের প্রতিষ্ঠালাভের জন্য বিশ্বম্ভর নিজের ন্যায়শাস্ত্রের গ্রন্থখানি গঙ্গায় বিসর্জন দেন। আর সেই সঙ্গে নীরস শাস্ত্রের চর্চাও ছেড়ে দেন।

এরপর মাত্র ষোল বছর বয়সে বিশ্বম্ভর নিজেই মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। মুকুন্দের বালক পুত্র পুরুষোত্তম সঞ্জয় হল তাঁর প্রথম ছাত্র। অল্পদিনের মধ্যেই নিমাইয়ের টোলের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। এমন সময় একদিন গঙ্গার ঘাটে যাবার পথে নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় বল্লভাচার্যের সুন্দরী কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়ার। প্রথম দর্শনেই উভয়ের হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার হয়। বনমালী নামক একজন ব্রাহ্মণ ঘটকের তৎপরতায় শীঘ্রই নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে লক্ষ্মীপ্রিয়ার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হল। এদিকে যত দিন যায় বিশ্বম্ভরের তর্কপ্রবণতা যেন আরও বাড়তে থাকে। নবদ্বীপে অধ্যাপকরূপে নিমাই পণ্ডিতের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে; পাণ্ডিত্যে, তর্ক-বিতর্কে, শাস্ত্র আলোচনায়, ব্যাকরণের কূট তর্কে তিনি অপরাজিত, অদ্বিতীয় হয়ে ওঠেন :

“সর্ব নবদ্বীপে সর্বলোকে হইল ধ্বনি।

নিমাঞি পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি।।”[১০]

একদিকে নবদ্বীপে যেমন নৈয়ায়িকদের শাস্ত্র চর্চা চলছে তেমনি অন্যদিকে অদ্বৈতকে আশ্রয় করে নানা ভক্তজনের সমাগম ঘটতে থাকে। নিমাইও মাঝে মাঝে এই সভায় আসেন। এইসময় ঈশ্বরপুরী

ছদ্মবেশে অদ্বৈতাচার্যের ‘মন্দিরে’ উপস্থিত হন এবং নবদ্বীপে কিছুদিন থাকেন। বিশ্বম্ভরের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। বিশ্বম্ভর তাঁকে নিজ গৃহে আমন্ত্রণ জানান এবং উভয়ের মধ্যে কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ও শাস্ত্রবিষয়ে বহুবিধ আলাপ-আলোচনা হয়। ঈশ্বরপুরী নিমাইয়ের অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পান। ঈশ্বরপুরীর নিকট চৈতন্য ‘সিদ্ধপুরুষের ন্যায় পরম গম্ভীর’ রূপে প্রতিভাত হন। ‘চৈতন্যভাগবতে’ বৃন্দাবন দাস তাঁর দেহকান্তির এবং গুণপনার পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে : “এইমতে গুপ্তভাবে আছে দ্বিজরাজ।/ অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোন কাজ।। / জিনিয়া কন্দর্পকোটি রূপ মনোহর। / প্রতি অঙ্গে নিরুপম লাবন্য সুন্দর।।/ আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন।/ অধরে তাম্বুল দিব্য বাস পরিধান।।/ সর্বদায় পরিহাস মূর্তি বিদ্যাবলে।/ সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে যবে প্রভু চলে।।/ সর্ব নবদ্বীপে ভ্রমে ত্রিভুবন পতি।/ পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী।।/ নবদ্বীপে হেন নাই পণ্ডিতের নাম।/ যে আসিয়া দূষিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান।।”[১১]

একদা নবদ্বীপে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত উপস্থিত হলে তিনিও নিমাইয়ের কাছে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হন। বিশ্বম্ভর দিগ্বিজয়ীর অহংকার চূর্ণ করেন। কিন্তু দিগ্বিজয়ীকে পরাস্ত করে তিনি নিজে এবার অহংকার প্রদর্শন করলেন না। বিজিত কুমার দত্তের মতে, “দিগ্বিজয়ী বীরের পরাজয় একদিক থেকে বিশ্বম্ভরের জীবন ভাবনায় মোড় ফেরার পালা। বৈষ্ণবের তেজ আগে দেখেছি, এবার ক্ষমা। দীপ্তি এবং স্রোতস্বিনীর যুগ্মবেণী রচিত হচ্ছে।”[১২]

বিশ্বম্ভর নবদ্বীপের সমাজকে জানতে, সকলের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করতে নগর ভ্রমণে বেরিয়ে একে একে তাঁতি, গোয়ালা, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, মালাকার সকলের ঘরে ঘরে গিয়ে বস্ত্র, দুগ্ধ, ঘৃত, দই, গন্ধদ্রব্য, মালা, পুষ্প যাচঞা করেন। এইভাবে তিনি সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের সঙ্গে হৃদ্যতা স্থাপন করে সমাজে বর্ণবিভেদ, বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। “নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস।/ সবার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ”[১৩] এইভাবে তিনি নবদ্বীপের সাধারণ মানুষের চিত্ত জয় করেছিলেন।

এর কিছুদিন পরে বিশ্বম্ভর পূর্ববঙ্গে যাত্রা করেন পিতৃভূমি দর্শন করতে আর সেই সঙ্গে সংসারের অস্বচ্ছলতা দূর করতে পৈতৃক সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা করে কিছু পাওনা যদি থাকে তা সংগ্রহ করে আনবেন। চৈতন্যের জীবনে এই পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বলা যায় – তাঁর অভাবিত প্রথম ভক্তি প্রচার যাত্রা। এ যাত্রায় তিনি বিষ্ণুভক্তি প্রচার করেন নি, তবে বৈষ্ণবোচিত সদাচার করতে সকলকে অনুরোধ করেছিলেন। এই ভ্রমণেই তিনি পেয়েছিলেন তার স্বতঃ আগত প্রথম ভক্ত তপন মিশ্রকে। তাঁকে তিনি কাশী যাবার পরামর্শ দেন এবং কাশীতেই তার সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবেন বলে আশ্বাস দেন। এই পূর্ববঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

পূর্ববঙ্গ থেকে নবদ্বীপে বাড়িতে এসে তিনি এমন এক প্রচণ্ড আঘাত পেলেন যাতে করে তাঁর সংসার প্রীতি অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেল। তিনি যখন পূর্ববঙ্গে ভ্রমণরত সেই সময় গঙ্গাতীরে সর্পদংশনে লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু হয়। বিশ্বম্ভর লক্ষ্মীকে পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন, তাঁকে ভালবাসতেন। সেই ভালবাসার এই আকস্মিক পরিণতি তাঁর মনকে সংসার সম্বন্ধে উদাস করে দিল। তাঁর জীবনে বৈরাগ্যের এই প্রথম ধাক্কা। বিশ্বম্ভর পূর্ববৎ টোলে পড়ানো আরম্ভ করলেন। তবে অতঃপর পাণ্ডিত্য প্রকাশ খর্ব হয়ে গেল আর ভক্তির ব্যাখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগল। উদাসীন পুত্রের মনকে সংসারের দিকে টেনে আনতে শচীদেবী এইবার নিজে সম্বন্ধ করে পুত্রের বিবাহ দিলেন সনাতন রাজপণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে। মাতার একান্ত অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে তিনি ফের বিবাহ করতে সম্মত হলেন ঠিকই কিন্তু নিজের মনে বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি লক্ষ্মীপ্রিয়ার আসনে বসাতে পারলেন না। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক নিমাইসাধন বসু মন্তব্য করেছেন "লক্ষ্মীপ্রিয়ার আকস্মিক মৃত্যু না হলে চৈতন্যের জীবন কোন খাতে বইতো তা অনুমান করা অসম্ভব।"[১৪]

বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করার কিছুকালের মধ্যেই বিশ্বম্ভর গয়াতীর্থে গিয়ে পিতৃকৃত্য করার জন্য উৎসুক হলেন। গয়াতেই প্রথম তিনি কৃষ্ণবিরহস্ফূর্তি অনুভব করেন। অনুমান করা যায়, প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিরহ ভাবনা সূত্রেই বিশ্বম্ভরের কৃষ্ণবিরহ ভাবনার উৎপত্তি। গয়াযাত্রায় চৈতন্যের সঙ্গী ছিলেন তাঁর মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য। যাত্রাপথ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। গয়ায় ফল্গুতীর্থে পিতৃতর্পন, প্রেতশিলায় পত্নীর পিণ্ডদান ছাড়াও তিনি বিভিন্ন তীর্থাদি দর্শন করেন। এইখানে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে তিনি দশাক্ষর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নেন। ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য ছিলেন। দীক্ষা নেবার পর থেকেই চৈতন্যের মধ্যে অদ্ভুত ভাবান্তর দেখা দেয়। তিনি কৃষ্ণবিরহ সাগরে ভাসতে থাকেন। তিনি সেইখান থেকেই মথুরা-বৃন্দাবনের পথে ছুটেছিলেন, তবে সঙ্গীরা ভুলিয়ে-ভালিয়ে সে পথ থেকে নিবৃত্ত করে তাঁকে নবদ্বীপে ফিরিয়ে আনেন।

চৈতন্য যখন নবদ্বীপে ফিরে এলেন তখন তিনি একেবারে অন্য মানুষ। তাঁর আগেকার ঔদ্ধত্য, চপলতা, রঙরসপ্রিয়তা প্রভৃতি একেবারেই চলে গেল; তিনি হয়ে উঠলেন সুনম্র বিনীত অন্তর্মুখী স্বভাবের মূর্তিমান বিগ্রহ। এবারে তিনি যোগ দিলেন বৈষ্ণব গোষ্ঠীতে। তাঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে নবদ্বীপের বৈষ্ণবেরা স্বভাবতই অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। গয়া থেকে ফিরে চৈতন্য বৈষ্ণবদের সঙ্গে প্রথম মিলিত হন শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর বাড়িতে, সেখানে শ্রীমান পণ্ডিত, মুরারি, শ্রীবাসাদি গদাধর প্রভৃতি উপস্থিত হন। এই সভাতে চৈতন্যের কৃষ্ণ বিরহের আর্তি এবং ভাবালুতা দেখে সকলেই বিস্মিত হয়ে যান ঠিকই, তবে তারা নিঃসংশয় হয়ে গেলেন যে, বিষ্ণু ভক্তিধর্ম প্রচার করতে বিশ্বম্ভর রূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হয়েছেন। পরের দিন যথারীতি বিশ্বম্ভর সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে গেলেন টোলে ছাত্রদের পড়াতে। তিনি পুঁথি

খুলে পড়াতে লাগলেন কিন্তু যা পড়ান সবই ব্যাখ্যা করেন কৃষ্ণ ভক্তির তাৎপর্যরূপে। তাঁর মানসিক অবস্থা এবং ভাবালুতা এমন পর্যায় পৌঁছায় যে তার পক্ষে আর অধ্যাপনা করা সম্ভব হয় না। তিনি ছাত্রদের অন্য অধ্যাপকের কাছে যেতে বলেন, আর তাঁর টোল বন্ধ হয়ে যায়।

এদিকে পুত্রের স্বভাবের পরিবর্তনে শচীদেবী অত্যধিক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। স্ত্রী সম্পর্কে পুত্র উদাসীন। মাঝে মাঝে কাঁদেন, কখনও হুংকার দেন। ক্রমে বিকার চরমে উঠল। পূর্বের বায়ুব্যাধির নতুন আক্রমণ ভেবে শচীদেবী চিন্তিত হলেন। পাড়াপ্রতিবেশী চিকিৎসার পরামর্শ দিল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় শচীদেবী মুরুব্বিস্থানীয় প্রতিবেশি শ্রীবাসকে পরামর্শর জন্য ডেকে পাঠালেন। শ্রীবাস পণ্ডিত এসে বিশ্বম্ভরের ভাব ও চেষ্টা দেখে সহজেই বুঝতে পারলেন যে বিশ্বম্ভরের মধ্যে ঈশ্বর ভক্তির জোর আবেশ হয়েছে। তিনি খুশি হয়ে বিশ্বম্ভরের ছাত্রবন্ধুদের নিয়ে কীর্তনের দলে যোগ দিলেন এবং শচীদেবীকে আশ্বস্ত করলেন যে বিশ্বম্ভরের কোনো দুরারোগ্য ব্যাধি হয় নি, সে সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।

এই সময়ে বিশ্বম্ভর একদিন তাঁর সাধনা সহচর গদাধরকে নিয়ে নবদ্বীপে অদ্বৈতাচার্যের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। অদ্বৈত পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে নমস্কার করলেন চৈতন্যকে; অদ্বৈতের বিশ্বাস হল শ্রীচৈতন্য আসলে শ্রীকৃষ্ণের অবতার। এরপর অদ্বৈত নবদ্বীপ ছেড়ে শান্তিপুর চলে গেলেন। মনে হয় তখনও তিনি বিশ্বম্ভরের অবতারত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সংশয় মুক্ত হতে পারেননি অথবা তাঁর কাছে এতদিন না আসার অভিমানের রেশ তখনও ছিল। এরপর প্রত্যহ সন্ধ্যায় কখনো নিমাইয়ের বাড়িতে, কখনো শ্রীবাসের বাড়িতে নিয়মিত কীর্তনের আসর বসতে লাগল, বৈষ্ণবেরা মিলিত হয়ে কৃষ্ণকথা চর্চা করতে লাগলেন। এতে অবৈষ্ণব ও বৈষ্ণব বিদ্বেষীদের বিদ্রূপ উপহাস যেমন বাড়ল, তেমনি বাড়ল রাজভয়, কাজির কাছে কীর্তনের বিরুদ্ধে নালিশের পরামর্শ হতে লাগল। সেই সঙ্গে লোকের মনে জাগল প্রচুর কৌতূহল।

এইসময়ে নবদ্বীপে এলেন নিত্যানন্দ। নিত্যানন্দের জন্মস্থান বীরভূমের একচাকা গ্রাম। খুব অল্প বয়সে এক সন্ন্যাসীর সহচর হয়ে নিত্যানন্দ বহু তীর্থে ভ্রমণ করেন। সম্ভবত তিনি অবধূত ছিলেন। কেউ কেউ বলেন মাধবেন্দ্রপুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। নিত্যানন্দ নবদ্বীপে এসে নন্দন আচার্যের ঘরে উঠেছিলেন। শ্রীবাস, গদাধর, মুরারী গুপ্ত প্রভৃতি ভক্ত অনুচরের সঙ্গে শ্রীচৈতন্য নন্দন আচার্য্যের ঘরে গিয়ে নিত্যানন্দের সঙ্গে মিলিত হন। নিত্যানন্দ স্থির করলেন শ্রীবাসের বাড়িতে ব্যাসপূজা করবেন। কিন্তু ব্যাস পূজা না করে তিনি বিশ্বম্ভরকেই পূজা করলেন। বিশ্বম্ভরের ভগবৎ ভাবাবেশ হল। তিনি শ্রীবাসের ঠাকুর ঘরের বিষ্ণুর সিংহাসনে বসে নিত্যানন্দের পূজা গ্রহণ করলেন। এদিকে শান্তিপুর থেকে অদ্বৈত আচার্য নবদ্বীপে এসে নন্দন আচার্যের বাড়িতে লুকিয়ে থাকলেন। কিন্তু চৈতন্য সেকথা জানতে পেরে তাঁকে ডেকে পাঠালেন। অদ্বৈতাচার্য সস্ত্রীক শ্রীবাসের বাড়িতে হাজির হয়ে দেখলেন যে বিশ্বম্ভর ভগবতাবেশে

বিষ্ণু সিংহাসনে বসে আছেন। অদ্বৈত ষোড়শোপচারে বিশ্বম্ভরের পাদ বন্দনা করলেন। এইভাবে নবদ্বীপের ভক্ত বৈষ্ণবেরা বিশ্বম্ভরের ঈশ্বরাবতারত্ব স্বীকার করে নিলেন। আবার চৈতন্যের একান্ত অনুগত মুরারীকে তিনি বরাহ রূপে দর্শন দিলেন।

অতঃপর বিশ্বম্ভর স্থির করলেন যে ঘরে দরজা দিয়ে নৃত্যগীত করলেই চলবে না, বাইরের সংসারেও ভগবানের নাম প্রচারের দ্বারা ভক্তির প্রসার ঘটাতে হবে সব মানুষের হৃদয়ে। তিনি হরিদাস ঠাকুর ও নিত্যানন্দকে আদেশ দিলেন নবদ্বীপের পথে-ঘাটে নামসঙ্কীর্তন করে বেড়াতে। হরিদাস ঠাকুরের নিষ্ঠা আর নিত্যানন্দ স্বরূপের ভক্তি উচ্ছ্বাস মিলে নবদ্বীপে সাধারণ লোকের মনে কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ সঞ্চারিত করতে লাগলেন। একদিন তাঁরা নবদ্বীপে ত্রাস সঞ্চারকারী দুর্বৃত্ত, দুরাচার মদ্যপ দুই ব্রাহ্মণ জগাই ও মাধাইয়ের সামনে পড়ে যান। কোনোরকমে নিত্যানন্দ ও হরিদাস দৌড়ে পলায়ন করে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু দুই পাপীকে উদ্ধারের দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে নিত্যানন্দ একদিন রাত্রে তাদের নিকটে এলে মাধাইয়ের হাতে তিনি প্রহৃত হন, তাতে রক্তপাত হয়। খবর শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিশ্বম্ভর ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে সেখানে উপস্থিত হন। অনুতপ্ত জগাই-মাধাই চৈতন্যের শরণ নেয়। বিশ্বম্ভর তাদের ক্ষমা করে আলিঙ্গন করেন। তখন থেকে দুইভাই পরম ভক্তিমান বৈষ্ণবে পরিণত হন।

এই সময়ের অতি পরিচিত একটি ঘটনা কাজিদলন। রাজপথে বৈষ্ণবদের সংকীর্তন কেবলমাত্র অবৈষ্ণব হিন্দুদেরই বিরক্তি সৃষ্টি করে নি, মুসলমানদেরও অসন্তোষের কারণ ঘটিয়েছিল। উভয়পক্ষই রাজপ্রতিনিধি কাজির কাছে অভিযোগ করেছিল। একদিন পথ চলতে কাজির কানে এসেছিল মৃদঙ্গ -মন্দিরা-শঙ্খধ্বনির সঙ্গে সংকীর্তন কোলাহল।

‘চৈতন্যভাগবত’: বাদ্য কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর।।

কিবা কার বিভা কিবা ভূতের কীর্তন।

মোর বোল লংঘিয়া কেবা করে হিন্দুয়ানি।

ঝাট জানি আও তবে চলিব আপনি।[১৫]

কাজি কীর্তনীয়াদের লোক দিয়ে প্রহার করান, মৃদঙ্গ ভেঙে দেন এবং নবদ্বীপে কীর্তন নিষিদ্ধ করে দেন। কাজির এই অন্যায় নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে চৈতন্য এক বিশাল সংকীর্তন শোভাযাত্রার আয়োজন করেন। সন্ধ্যার পর চৈতন্যের নেতৃত্বে শত শত মানুষ খোল-করতাল, ঘন্টা, শাঁখ, শিঙা, মৃদঙ্গ নিয়ে এবং মশাল হাতে নিয়ে নগর সংকীর্তন করতে করতে কাজির বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। কাজি ভয়ে বাড়ির মধ্যে

আত্মগোপন করল। মারমুখী জনতা কাজির বাড়িঘর ভেঙে দেয়, বাগান লণ্ডভণ্ড করে ধ্বংসলীলা চালায়। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনানুযায়ী "আসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বম্ভর।/ ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর।।/ক্রোধে বোলে প্রভু আরে কাজি বেটা কোথা।/ ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া পেলোঁ মাথা।/··· প্রাণ লইয়া কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।/ ঘর ভাঙ ঘর ভাঙ বোলে বার বার।/ ··· কেহ ঘর ভাঙ্গে কেহ ভাঙয়ে দুয়ার।/ কেহ নাথি মারে কেহ করয়ে হুঙ্কার।। ··· পুষ্পের উদ্যান লক্ষ লক্ষ লোকে গিয়া।/ উপড়িয়া পেলে সব হুঙ্কার করিয়া।। ··· সংকীর্তন আরম্ভে আমার অবতার।/ কীর্তন বিরোধী পাপী করিমু সংহার।।"[১৬] উপায় না পেয়ে কাজি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নিমাইয়ের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করলেন এবং সংকীর্তনের নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন। কাজির অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে ওই ক্ষোভ, সংকীর্তন করতে করতে কাজীর বাড়ি অভিমুখে যাত্রা, তাঁর বাড়ির সামনে অবস্থান ও শেষপর্যন্ত অন্যায় আদেশ প্রত্যাহারে বাধ্য করা এক অভূতপূর্ব ঘটনা ছিল। এ প্রসঙ্গে 'নিমাইচরিত' প্রবন্ধে নিমাইসাধন বসুর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য, "সঙ্গত কারণেই চৈতন্যের নেতৃত্বে সেই দিনের প্রতিবাদ মিছিল ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে বাংলায় তথা ভারতবর্ষের 'প্রথম আইন অমান্য আন্দোলন বলে অভিহিত করা হয়েছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে ওই আন্দোলন গান্ধীজির নেতৃত্বে 'লবন আইন' এর বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রায় পাঁচ শতক আগে হয়েছিল।"[১৭] চৈতন্যের সেই আন্দোলনের অন্তর্নিহিত শক্তির সঙ্গে গান্ধীজির সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আত্মশক্তির সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এরপর কীর্তন, শোভাযাত্রা করে নগরসংকীর্তন বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের এক প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠল। চৈতন্যদেবই পৃথিবীর প্রথম ব্যক্তি যিনি সংগীতকে গণ-আন্দোলনের হাতিয়ার করেছিলেন। সংগীত যে একটা শক্তি এবং সেই শক্তির একটা প্রচণ্ড রূপও রয়েছে – এই পরম সত্যটি শ্রীচৈতন্য প্রত্যক্ষ প্রয়োগ দ্বারা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। পরবর্তীকালে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে কীর্তন এবং পদাবলী কীর্তন ভারতীয় সংগীতের সম্পদরূপে স্বীকৃতি ও মর্যাদা পায়।

নবদ্বীপে থাকাকালীনই চৈতন্য তাঁর সঙ্গীসাথিদের নিয়ে চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাট্যাভিনয় করেছিলেন। নাট্যপ্রযোজক ছিলেন সদাশিব ও বুদ্ধিমন্ত খান। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন অদ্বৈত, হরিদাস, শ্রীবাস, নিত্যানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, মুরারী। স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন চৈতন্য ও গদাধর। শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়াও এই অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। এইভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার ও প্রসার চলতে থাকল।

এর কিছুদিন পরে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলেন। সিদ্ধান্তের কথা প্রথম জানালেন নিত্যানন্দকে : "ভালো লোক রাখিতে করিনু অবতার।/ আপনে করিনু সব জীবের সংহার/ দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুণ্ডাইয়া।/ ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া।"[১৮] বিশ্বম্ভরের সঙ্কল্পের কথা নবদ্বীপবাসি শুনলেন। বিশ্বম্ভর ভক্তদের প্রবোধ দিলেন "লোকরক্ষা নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস।/ এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর

নাশ।”[১৯] ১৫১০ খ্রীঃ মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে নিমাই কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। দীক্ষান্তে গুরুদত্ত নাম হল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, সংক্ষেপে চৈতন্য।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি কাটোয়া ত্যাগ করে রাঢ়দেশ পরিভ্রমণ করেন। চন্দ্রশেখরকে নবদ্বীপে পাঠিয়ে দেন। তারপর তিনি বক্রেশ্বর যাবেন ঠিক করেন। কিন্তু বক্রেশ্বরের কাছাকাছি গিয়ে তিনি যাত্রা পথ পরিবর্তন করেন। পুরী যাবার সিদ্ধান্ত নেন। তবে তার আগে তিনি জননী ও জন্মভূমি পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গঙ্গার তীর ধরে কৃষ্ণনাম করতে করতে তিনি প্রথমে উপস্থিত হন ফুলিয়া গ্রামে, তারপর সেখান থেকে শান্তিপুরে। সেই সংবাদ জানাতে নবদ্বীপে পাঠানো হয়েছিল নিত্যানন্দকে। নবদ্বীপ থেকে আগত শচীদেবী সহ ভক্তদের সঙ্গে অদ্বৈতের বাড়িতে চৈতন্যের মিলন হয় এবং সেখানে কীর্তন-ভোজনে কয়েকদিন কাটে। চৈতন্য ভক্তগণকে তাঁর পুরীগমনের সিদ্ধান্ত জানান। তাঁর পুরী যাত্রার সঙ্গী হয়েছিলেন নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ এবং আরও কয়েকজন, সম্ভবত জগদানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, দামোদর ও গোবিন্দ।

শান্তিপুর থেকে যাত্রা করে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর সঙ্গীরা প্রথমে আটিসারা গ্রামে, তারপর ‘জাহ্নবীর কূলে কূলে’ এসে পৌঁছান ছত্রভোগে। কিন্তু ঠিক সেই সময় বাংলাদেশ থেকে উড়িষ্যায় যাওয়া অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহ উড়িষ্যার উত্তরাংশ আক্রমণ করেছিলেন, দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা চলছিল অনেক দিন ধরে। সেইজন্য সীমান্ত অতিক্রম করা সহজসাধ্য ছিল না। পুরীযাত্রার প্রস্তাবে শান্তিপুরের ভক্তগণ এইজন্যে চৈতন্যকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। কিন্তু তিনি সে কথা শোনেন নি। ছত্রভোগের অধিকারী রামচন্দ্র খানের সহায়তায় তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা নৌকায় নদী পার হয়ে উড়িষ্যার সীমান্তে পৌঁছান, তারপর পায়ে হেঁটে সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে জলেশ্বর বাঁশধার পর এসে পৌঁছান রেমুনায়। তারপর যাজপুর। সেখান থেকে আসেন কটকে, সেখানে সাক্ষী গোপাল দেখে পৌঁছান ভুবনেশ্বরে। অবশেষে কমলাপুরে পৌঁছে দেখতে পেলেন জগন্নাথ মন্দিরের ধ্বজা। আঠার নালায় পৌঁছে চৈতন্য সঙ্গীদের ছেড়ে একাই আগে আগে ছুটে ছিলেন মন্দিরের উদ্দেশ্যে।

তিনি সটান শ্রীমন্দিরে ঢুকে ঠাকুরকে আলিঙ্গন করবার জন্য দ্রুতবেগে যেতে যেতে ভাবাবেগে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যান। সেই সময় শ্রীমন্দিরে উপস্থিত ছিলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য। তিনি ভগ্নীপতি গোপিনাথ আচার্যের কাছে অপূর্বসুন্দর এই নবীন সন্ন্যাসীর পরিচয় পেয়ে তাঁকে শুশ্রুষার জন্য নিজের ঘরে নিয়ে যান। ইতিমধ্যে ভক্তরা এসে পড়ে। সার্বভৌম ভট্টাচার্য ছিলেন বিখ্যাত নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক পণ্ডিত। তিনি একটানা সাতদিন চৈতন্যকে বেদান্ত শিক্ষা দান করেন। কিন্তু চৈতন্যের মতে বেদান্তসূত্রের অর্থ নির্মল কিন্তু সার্বভৌমের ব্যাখ্যাই মেঘাচ্ছন্ন এবং তা শঙ্করভাষ্যের অনুযায়ী। চৈতন্য বেদের নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের

পরিবর্তে ষড়ৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা বলেন। শ্রীচৈতন্য যুক্তি দিয়ে নির্বিশেষবাদ খণ্ডন করে সবিশেষবাদ স্থাপন করেন : "অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।

মুখ্য ছাড়ি লক্ষণাতে মানে নির্বিশেষ।।

ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাঁহার।

হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার।।

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।

নিঃশক্তি করিয়া তাঁরে করহ নিশ্চয়।।

****

প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।

ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয়।।"[২০]

সার্বভৌম উদ্ধারের পর চৈতন্য দক্ষিণদেশ ভ্রমণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। সঙ্গে তিনি কাউকে নিতে রাজী হলেন না। ভক্তরা একপ্রকার জোর করে কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণকে যাত্রাপথের সঙ্গী রূপে দিয়েছিলেন। যাত্রাকালে সার্বভৌম চৈতন্যকে গোদাবরী তীরে রামানন্দ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। চৈতন্যকে দক্ষিণে ভ্রমণ পথে বিদায় দেওয়া হল আলালনাথ থেকে। চৈতন্য ও তাঁর সঙ্গী আলালনাথ থেকে ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছালেন কূর্মস্থানে, তারপর জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্রে। তারপর বিদ্যানগরের কাছে গোদাবরী নদী পেরিয়েই রায় রামানন্দের দেখা পেলেন। সেখানে দুজনের মধ্যে দশদিন ধরে 'সাধ্য-সাধন' তত্ত্ব আলোচিত হয়। এই 'সাধ্য-সাধন' তত্ত্ব বৈষ্ণব ধর্মের পরম সম্পদ।

রায় রামানন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চৈতন্য পৌঁছালেন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে। সেখানে এক ভক্ত পণ্ডিত বেঙ্কটভট্টের সঙ্গে চৈতন্যের পরিচয় হয়।। ভট্টের সঙ্গে কৃষ্ণকথায় এবং শ্রীরঙ্গমে কৃষ্ণভক্তির সৌরভ বিকিরণ করে চৈতন্যের দিনগুলি বেশ আনন্দে কেটেছিল। শ্রীরঙ্গমে চাতুর্মাস্য শেষ করে অর্থাৎ ১৪৩১ শকাব্দের আশ্বিন-কার্ত্তিক মাসে শ্রীরঙ্গম থেকে বেরিয়ে, তিনি এসে পৌঁছলেন ঋষভ পর্বতে, সেখানে তার সঙ্গে পরমানন্দ পুরীর সাক্ষাৎ হল। সেখান থেকে গেলেন দক্ষিণ মথুরায়। তারপর কন্যাকুমারী। সেখান থেকে ত্রিবান্দ্রম। সেখানে অনন্ত শয়নে পদ্মনাভকে দর্শন করলেন। সেখান থেকে কোলাপুর, তারপর পুণা, পুণা থেকে গেলেন পাণ্ডরপুর। তিনি জানতে পারলেন তাঁর দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাস নিয়ে

পাণ্ডরপুরে ছিলেন এবং সেখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। সেখানে দিন কতক কাটিয়ে নর্দমার তীর ধরে অনেক তীর্থ ঘুরে তিনি গেলেন দণ্ডকারণ্যে নাসিকে। সেখান থেকে আবার ফিরে এলেন বিদ্যানগরে রায় রামানন্দের কাছে। তারপর আগমনের পথ অনুসরণ করে তিনি গিয়ে পৌঁছলেন আলালনাথে। সে সময়টা ছিল ১৪৩২ শকাব্দের গ্রীষ্মকাল। অর্ধপথে নিত্যানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে মিলন হয়। পূর্বেই তিনি কৃষ্ণদাসকে পুরী পাঠিয়ে প্রত্যাগমন বার্তা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর সকলে মিলে সার্বভৌমের বাসায় আহারাদি সম্পন্ন করলেন। চৈতন্য দক্ষিণ ভ্রমণ করে দুটি মূল্যবান পুঁথি সংগ্রহ করে এনেছিলেন। বিল্বমঙ্গলের 'কৃষ্ণকর্ণামৃত' আর 'ব্রহ্মসংহিতা'। গ্রন্থদুটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাছে মূল্যবান সামগ্রী।

চৈতন্যের ঐকান্তিক ভক্তিব্যাকুলতা, আচরণের অসাধারনত্ব, ব্যক্তিত্ব এবং বিশেষ করে দীর্ঘোজ্জ্বল তনু প্রত্যক্ষ করে পুরীতে অনেকেই গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে মহাপ্রভুর দিব্য মহিমার কথা শুনে প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। সন্ন্যাসীর রাজদর্শন নিষিদ্ধ। চৈতন্য প্রথমে রাজা প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান নি। পরবর্তীতে অবশ্য প্রতাপরুদ্রের ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখে শ্রীচৈতন্য তাঁকে কৃপা করেছিলেন।

ইতিমধ্যে পুরীতে এসে উপস্থিত হন পরমানন্দপুরী, স্বরূপদামোদর প্রমুখ। চৈতন্য পুরীতে প্রথম জগন্নাথের রথযাত্রা দেখেন ১৪৩৫ শকের আষাঢ়ে অর্থাৎ পুরীতে আসার চতুর্থ বছরে। এই বছরই প্রথম বাংলা থেকে ভক্তেরা পুরীতে আসেন তাঁকে দেখতে এবং রথযাত্রায় যোগ দিতে। ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন অদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস, মুরারী গুপ্ত, হরিদাস, শিবানন্দ সেন, বাসুদেব দত্ত, গোবিন্দ ঘোষ, বাসু ঘোষ, রাঘব পণ্ডিত প্রভৃতি নবদ্বীপের পরিচিত ভক্তগণ। ভক্তদের সঙ্গে চৈতন্য সংকীর্তন, গুণ্ডিচা মার্জন এবং রথযাত্রায় নৃত্য করলেন। এই প্রথম রথযাত্রায় অগণিত দর্শক চৈতন্যের নৃত্যপর (ভাবোন্মত্ত) বিস্ময়কর মূর্তি প্রত্যক্ষ করে। এই সময়েই অদ্বৈতাচার্য চৈতন্যকে অবতার বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন এবং ভক্তদের নিয়ে সর্বপ্রথম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্তন' করেন। পুরীতে চার মাস থাকার পর ভক্তরা বাংলায় ফিরে গেলেন।

চৈতন্যদেব পুরীতে ফিরে মথুরা বৃন্দাবন যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে রামানন্দ প্রমুখ ভক্তরা সেই যাত্রা বিলম্বিত করেছিলেন প্রায় দুই বছর। অবশেষে তিনি মথুরা-বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে গৌড় যাত্রা করেন ১৪৩৬ শকের বিজয়া দশমী তিথিতে। চৈতন্য ও তার সঙ্গীদের সঙ্গে সার্বভৌম কটক এবং রামানন্দ ভদ্রক পর্যন্ত এসে বিদায় নিলেন। বাংলা-উড়িষ্যার সীমান্ত, মন্ত্রেশ্বর নদ পার হয়ে পিছলদা পর্যন্ত এসে নৌকায় চৈতন্য ও তাঁর সঙ্গীরা এসে পৌঁছালেন পানিহাটিতে। পথের ভিন্ন বিবরণও আছে। জয়ানন্দ বলেন চৈতন্য রেমুনা, বাঁশদা, জলেশ্বর, দাঁতন ও গড়মান্দারণ হয়ে বর্ধমানের আমাইপুরায় তাঁদের বাড়িতে এসেছিলেন।

গঙ্গাতীর পথে তাঁর পদযাত্রায় প্রচণ্ড ভিড় জমতে লাগল। পেনেটিতে একদিন থেকে তিনি চলে এলেন কুমারহট্টে। সেখানে বাসুদেব দত্ত ও শিবানন্দ সেন ইত্যাদির সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে তিনি বিদ্যাবাচস্পতির বাড়িতে কিছুদিন থাকলেন। দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড ভিড়ের জন্য তিনি কুলিয়ায় মাধব দাসের বাড়িতে এসে আত্মগোপন করলেন। চৈতন্য গঙ্গার তীর ধরে মথুরার উদ্দেশ্যে পশ্চিমদিকে চললে অসংখ্য লোক তাঁর পেছনে পেছনে যেতে থাকে। এইভাবে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা এসে পৌঁছান গৌড়ের রামকেলি গ্রামে। এক সন্নাসীর পেছনে বিপুল জনসমাবেশ দেখে কৌতূহলী হুসেন শাহ মন্ত্রী কেশব ছত্রীকে চৈতন্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে কেশব শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক মহিমা গোপন করে বলেছিলেন –

"ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্যটন!

তারে দেখিবারে আইসে দুই চারিজন।।

যবনে তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি।

তার হিংসায় লাভ নাহি হয় মাত্র হানি।।"[২১]

গৌড়েশ্বরের দুই প্রতাপশালী মন্ত্রী সাকর মল্লিক ও দবির খাস পত্র মারফত শ্রীচৈতন্যের কাছে নিজেদের অন্তর্গত দৈন্য প্রকাশ করেছিলেন। তাদের উদ্ধার করতেই প্রভুর রামকেলি আগমন। রূপ-সনাতন চৈতন্যকে বিপুল জনসমষ্টি নিয়ে বৃন্দাবনে না গিয়ে নীলাচলে ফিরে যাবার পরামর্শ দেন। চৈতন্য তাদের পরামর্শকে মান্যতা দিয়ে বৃন্দাবনে না গিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্যের ঘরে এসেছিলেন। সেখানে কয়েক দিন থেকে শচী মাতার সঙ্গে দেখা করেন। এইসময় তিনি বিভিন্ন ভক্তের বাড়িতে ঘোরেন। তখন শ্রীবাস ছিলেন কুমারহট্টে,চৈতন্য তাঁর বাড়িতে যান। তিনি শিবানন্দ সেন, বাসুদেব দত্তের বাড়িতেও যান, সেখান থেকে পানিহাটিতে রাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে, অবশেষে বরাহনগরে 'মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে' দেখা করেছিলেন। বলভদ্র ভট্টাচার্য ও দামোদর পণ্ডিতকে নিয়ে তিনি নীলাচলের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছিলেন।

শ্রীচৈতন্যের বাংলা পরিক্রমায় প্রায় আট-নয় মাস কেটেছিল। অবন্তীকুমার সান্যাল মনে করেন "শ্রীচৈতন্য খুব সম্ভবত পুরীতে ফিরেছিলেন ১৪৩৭ শকের আষাঢ়ের আগেই।"[২২] পুরীতে চাতুর্মাস্য যাপনের পর তিনি যাত্রা করেছিলেন মথুরা-বৃন্দাবন। ঝাড়খণ্ডের পথ দিয়ে গিয়ে চৈতন্য ও সঙ্গীরা প্রথমে পৌঁছান কাশীতে। অতিথি হয়েছিলেন তপন মিশ্রের এবং বৈদ্য চন্দ্রশেখরের বাড়িতে। তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ চৈতন্যকে সেবা করেছিলেন। এই রঘুনাথ মিশ্রই পরবর্তীকালের ছয় গোস্বামীর অন্যতম রঘুনাথ ভট্ট। কাশী থেকে তাঁরা প্রয়াগ হয়ে পৌঁছান মথুরায়, তারপর বৃন্দাবনে। মথুরা-বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা সম্পৃক্ত

বিভিন্ন স্থান দেখে চৈতন্য এমনই ভাবকাতর হয়ে পড়েছিলেন যে, সেখানে তাঁকে রাখা আর নিরাপদ নয় মনে করে, বলভদ্রেরা তাঁকে প্রায় জোর করে প্রয়াগে নিয়ে এসেছিলেন মকর স্নানের লোভ দেখিয়ে। এখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন রূপ এবং তাঁর ছোট ভাই অনুপম বল্লভ। প্রয়াগে তিনি দিন দশেক ছিলেন মাঘ মাসের শেষ পর্যন্ত। এই সময়ে তিনি রূপকে ভক্তি ও বৈষ্ণবরসতত্ত্ব সম্বন্ধে তার ভবিষ্যৎ কর্তব্য নির্দেশ করে শিক্ষা ও উপদেশ দিয়েছিলেন। এখান থেকে সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণদাস রাজপুতকে বিদায় দিয়ে তিনি বারানসী চললেন। বারাণসীতে চৈতন্য ছয় মাস ছিলেন। এই ছ'মাসে তিনি তিনটি বড় কাজ করেছিলেন। প্রথম মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণের নির্বন্ধে প্রকাশানন্দ প্রমুখ কাশীবাসী সন্ন্যাসীদের তর্কে পরাজিত করে ভক্তিবাদ স্থাপন। দ্বিতীয়, কাশীতে নামসংকীর্তনের প্রচার। তৃতীয়, সনাতনকে সদাচার ও ভক্তি বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ দান। তারপর সেখান থেকে যে পথে এসেছিলেন সেই পথেই নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন এবং জীবনের শেষ বছরগুলি তিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রেই কাটিয়েছিলেন।

সম্ভবত ১৪৩৮ শকেই তিনি পুরীতে ফিরে এসেছিলেন। এরপর জীবনের বাকি আঠারো বছর তিনি আর পুরীর বাইরে যান নি। মহাপ্রভুর এই আঠারো বছরের জীবনকে 'অন্ত্যলীলা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয় যে, এই আঠারো বছরের প্রথম ছয় বছর বাদে বাকি বারো বছর চৈতন্য বাহ্যজ্ঞান রহিত কৃষ্ণ বিরহোন্মাদের অবস্থায় কাটিয়েছিলেন, ভক্তরা তত্ত্বানুযায়ী যার নাম দিয়েছিলেন 'দিব্যোন্মাদ'। চৈতন্যের পুরীতে ফেরার সংবাদ পাওয়ার পর বাংলাদেশ থেকে শিবানন্দ সেনের নেতৃত্বে ভক্তজনেরা সদলবলে পুরীতে এসেছিলেন সেই বছরের রথযাত্রাতেই। সেই সময়ে রূপও কাশী ও গৌড় হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন পুরীতে। রূপ থাকতেন হরিদাসের কুটীরে। সনাতনও পুরীতে চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। চার মাস থেকে গৌড়ের বৈষ্ণবেরা গৌড় চলে গেলেন। চৈতন্য নিত্যানন্দকে গৌড়ে থাকতে পরামর্শ দিলেও তা অমান্য করে তিনি বেশ কয়েকবার পুরীতে এসেছিলেন। অদ্বৈত ও শিবানন্দ সেনের সঙ্গে নিত্যানন্দের কলহ ,বিরূপতাও চৈতন্যের অজানা ছিল না। প্রতি বৎসর পুরীতে আগত ভক্তদের মধ্যে ছিলেন নবদ্বীপ-শ্রীখণ্ড-কুলীন গ্রামের প্রায় সমস্ত ভক্তই। ভক্তদের সঙ্গে তিনি যথারীতি রথযাত্রায় নৃত্যগীত, গুণ্ডিচামার্জন, নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি ইত্যাদি করতেন। ভক্তদের গৃহে নিমন্ত্রন রক্ষা করতেন। প্রত্যেক ভক্তের নিবেদিত সুখাদ্য আনন্দে খেতেন।

এইসময় রামানন্দ রায়, পরমানন্দপুরী, স্বরূপ-দামোদর, হরিদাস, গদাধর, জগদানন্দ, শঙ্কর পণ্ডিত, বক্রেশ্বর, দামোদর পণ্ডিত, রঘুনাথ দাস প্রমুখ ভক্তরা নিত্যসঙ্গী ছিলেন। তাঁরা সর্বদা মহাপ্রভুকে ঘিরে থাকতেন। তাঁর কৃষ্ণবিরহবিকার ক্রমশই বাড়তে শুরু করেছিল। কৃষ্ণস্মরণে তাঁর এমনই ভাবাবেশ হত যাঁর সঙ্গে তাঁর তত্ত্বজ্ঞ ভক্তরা রাধার ভাবাবেশের সাদৃশ্য খুঁজে পেতেন এবং সেই সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই চৈতন্যাবতারের নতুন তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন। চৈতন্যদেব কখনো ভাবাবিষ্ট থাকতেন, কখনো তাঁর

অর্ধবাহ্যজ্ঞান থাকত, কখনো থাকত পুরোপুরি বাহ্যগান। রাত্রে ঘুম ছিল না, হাহাকার করে কাঁদতেন, রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে বা গান করে তাঁকে শান্ত করতেন। অন্তরে বাহিরে তিনি তখন কৃষ্ণবিরহে উন্মাদপ্রায়। একদিন রাসলীলার অনুকরণ করতে করতে তিনি সবার অলক্ষ্যে যমুনাভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন পরে এক জেলে তাঁকে উদ্ধার করে এনেছিল।

তবে জননীর প্রতি তিনি কর্তব্যে অবিচল ছিলেন। জগদানন্দকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মায়ের খবর আনতে। সেবার জগদানন্দ নবদ্বীপ থেকে ফেরার সময় অদ্বৈত আচার্য চৈতন্যকে জানাবার জন্য তাঁর মাধ্যমে একটি তরজা প্রহেলী পাঠিয়েছিলেন :

"বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল।

বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।

বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।

বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।"[২৩]

অদ্বৈতাচার্যের পাঠানো এই তরজা শুনে চৈতন্যদেব বুঝতে পারলেন একদিন অদ্বৈতাচার্যের আবাহনেই এই পৃথিবীতে তাঁর আগমন ঘটেছিল, এবার সময় হয়ে এসেছে বিসর্জনের। সেই দিন থেকে তাঁর বিরহ দশা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, উন্মাদ লক্ষ্মণ অতিপ্রকট হয়ে উঠেছিল : "সেই দিন হইতে প্রভুর আর দশা হৈল।/ কৃষ্ণের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল।।/ উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি-দিনে।/ রাধাভাবাবেশে বিরহ বাঢ়ে অনুক্ষণে।।"[২৪] চৈতন্যচরিতামৃতকারের মতে এই সময় সারারাত্রি চৈতন্য গম্ভীরার মেঝেয় মুখ ঘষতেন, মুখে গালে নাকে ক্ষত হয়ে রক্ত ঝরত, মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ শব্দ হত। এই রকম 'দিব্যোন্মাদ' অবস্থাতেই জীবনের শেষ সময়টুকু কেটেছিল। অবশেষে ১৪৫৫ শকে (১৫৩৩ খ্রীঃ) আট চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর তিরোধান ঘটেছিল। শ্রীচৈতন্যের তিরোধান রহস্যাবৃত। এ বিষয়ে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

তথ্যসূত্র

১) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১১, পৃ- ৫।

২) গিরি সত্যবতী, বাংলা সাহিত্যের কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, দেজ পাবলিশিং, ১৯৮৮, পৃ- ১৯০।

৩) মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা), জয়ানন্দ বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গল', উৎকল-১, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১, পৃ-১৪৪ ।

৪) ঘোষ শিশিরকুমার, শ্রী অমিয় নিমাই চরিত, প্রথম খণ্ড, বিশ্ববাণী, ২০০৯, পৃ-২০।

৫) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১১, পৃ- ১৬।

৬) তদেব, তৃতীয় অধ্যায়, পৃ- ১১।

৭) মুখোপাধ্যায় শুভঙ্কর (সম্পা.), চৈতন্যচিন্তা, বসু নিমাইসাধন, নিমাইচরিত, এম. সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৯, পৃ-১২।

৮) মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা), জয়ানন্দ বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গল', নদীয়া-১৬, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১, পৃ- ২৩ ।

৯) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ- ২৬।

১০) তদেব, আদি খণ্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ- ৫৬।

১১) তদেব, নবম অধ্যায়, পৃ- ৪২।

১২) দত্ত বিজিত কুমার, চৈতন্য-জীবনকথা, গ্রন্থনিলয়, ১৯৮৬, পৃ-১৭।

১৩) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, দশম অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪৬।

১৪) মুখোপাধ্যায় শুভঙ্কর (সম্পা.), চৈতন্যচিন্তা, বসু নিমাইসাধন, নিমাইচরিত, প্রাগুক্ত, পৃ-১২।

১৫) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, মধ্য খণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-১৯১।

১৬) তদেব, পৃ- ১৯২।

১৭) মুখোপাধ্যায় শুভঙ্কর (সম্পা.), চৈতন্যচিন্তা, বসু নিমাইসাধন, নিমাইচরিত, এম.সি.সরকার. অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী ২০০২, পৃ-২৪।

১৮) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, মধ্য খণ্ড, পঞ্চবিংশ অধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-২০৪।

১৯) তদেব, ষড়বিংশ অধ্যায়, পৃ-২০৬।

২০) সেন সুকুমার ও মুখ্যোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা) কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, আনন্দ, ১৩৯২, পৃ-১৬২।

২১) তদেব, প্রথম পরিচ্ছেদ, পৃ-১১৯।

২২) সান্যাল অবন্তীকুমার ও ভট্টাচার্য অশোক (সম্পা.), চৈতন্যদেব ইতিহাস ও অবদান, সান্যাল অবন্তীকুমার, চৈতন্যজীবন কথা, এম.সি.সরকার. অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৯, পৃ-১৪৩।

২৩) সেন সুকুমার ও মুখ্যোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ, আনন্দ, ১৩৯২, পৃ-৫০০।

২৪) তদেব, পৃ-৫০১।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির পরিচয় ও প্রাসঙ্গিকতা

ষোড়শ শতকের নবজাগরণের পুরোধা মানবতার মূর্ত বিগ্রহ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলাদেশে ও বাঙালির সমাজজীবনের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। বাঙালির চিত্তলোক মন্থন করে যে অমৃত উঠেছে, চৈতন্যদেব যেন তারই ঘনীভূত নির্যাস। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে লিখেছেন

"ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশ্বভূপের ছায়া,
বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া;"[১]

সমকালীন বাঙালির ভাবসাধনায় এই দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্যের ইতিহাসে জীবনবোধের দিক পরিবর্তন সূচিত করল। এতদিন সাহিত্যের জগত ছিল দেবকেন্দ্রিক। এবারে মানুষকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা করল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় – 'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা'। বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে লৌকিক সংসারের মানুষকে নিয়ে কাব্য রচিত হয় নি। এবার মানুষের চরিত্র মহিমা কাব্যে কীর্তিত হল। ঐতিহাসিক ব্যক্তি মানুষ শ্রীচৈতন্যকে কাব্যে অন্তর্ভুক্ত করা হল।

শ্রীচৈতন্যদেবের পূত পবিত্র প্রেমময় জীবন নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ধারার প্রবর্তন হল যার নাম হল জীবনীকাব্য। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বাংলা জীবনীসাহিত্য এক নতুন আস্বাদন নিয়ে আসে। কেননা মধ্যযুগে যেখানে সাহিত্য হয়ে উঠেছিল দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন, ধর্ম ও অলৌকিকতায় পূর্ণ সেখানে চৈতন্য জীবনী সাহিত্যে এল মানুষ। শুধু মানুষ নয়, সেই মানুষের গৃহ, পরিবার, সমাজ ও সমসাময়িক পরিবেশের কথা। যদিও চৈতন্য জীবনী সাহিত্যের মধ্যে অলৌকিকতা আছে, আছে অতিরঞ্জনের বাহুল্য তবুও এর মধ্যে রয়েছে তৎকালীন বাঙালি সমাজে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, বিভিন্ন অঞ্চলের ঐতিহাসিক তথ্য, সাংস্কৃতিক পরিচয় – যা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের পক্ষেই যে এক বিশেষ সম্পদ তাই নয়, এর মধ্যে উপন্যাসের লক্ষণ বা ক্ষীণ সংকেতও আমরা পেয়ে থাকি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, " কাব্যে, ধর্ম-গ্রন্থে, ··· যেখানেই লেখকের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমাজের একটি বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয় ··· সেখানেই উপন্যাসের ভাবী ছায়াপাত হইয়া থাকে। "[২] আর এই সূত্রেই আমরা চৈতন্যদেবের চরিতগ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে সেগুলিতে চৈতন্যদেবের মহিমা প্রচার করা হলেও সেগুলি থেকে আমরা ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীর সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক জীবনের বিস্তৃত বিবরণ পাই। তৎকালীন সমাজের রীতিনীতি, আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, রুচি-আদর্শ, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, জীবিকা, তীর্থপর্যটন, অর্থনীতিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিচয়, ধর্মীয়

বিচার-বিতর্ক প্রভৃতি প্রতিটি বিষয়ের মধ্যেই বাস্তবের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে তৎকালীন সমাজের একটি সামগ্রিক রূপচিত্র পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "এই সমস্ত গ্রন্থে যে ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার খাঁটি আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে তাহা নহে ··· তথাপি এই ধর্মোন্মাদনার প্রভাবে একটা ঐতিহাসিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি, প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট সংবাদ সংগ্রহ ও যথাশক্তি তাহার সত্যতা যাচাই করিয়া ভবিষ্যৎ কালের জন্য লিপিবদ্ধ করিবার আগ্রহপূর্বক প্রবণতা, সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।"[৩] এই প্রেক্ষিতেই আমাদের গবেষণায় বাংলা কথাসাহিত্যে চৈতন্যব্যক্তিত্বের প্রভাব অন্বেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলির উপর আলোকপাত করেছি এবং সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দানের চেষ্টা করেছি।

শ্রীচৈতন্যের অলোকসামান্য জীবনকে অবলম্বন করে চৈতন্যভক্ত ও পরিকরবৃন্দ প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলি জীবনীকাব্য ও নাটক রচনা করেছিলেন। সেসব গ্রন্থগুলি পরবর্তীকালে চৈতন্যচরিতকারদের বাংলা ভাষায় কাব্য রচনার উপাদান জুগিয়েছে।

মুরারিগুপ্তের কড়চা বা 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম':

সমগ্র চৈতন্য জীবনীকাব্যের মধ্যে মুরারীগুপ্তের কড়চা বা 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম' আদিতম এবং প্রামান্য গ্রন্থ। শ্রীহট্টের অধিবাসী মুরারি চৈতন্যদেবের সঙ্গে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পড়তেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর বয়জ্যেষ্ঠ সহপাঠী বৈদ্যবংশীও মুরারীকে প্রায়ই পরিহাসে বিব্রত করে তুলতেন। গৌরপারম্যবাদের অন্যতম প্রচারক রূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মণ্ডলে মুরারী গুপ্ত বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করে ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর বাল্য কৈশোর ও যৌবনের সমস্ত সংবাদ জানতেন বলে ভক্তগণ তাঁকে চৈতন্য তথ্য ও তত্ত্বের খনি বলে মনে করতেন।

'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম' মুরারীগুপ্তের কড়চা নামে অধিকতর পরিচিত। কড়চা বলতে সংক্ষিপ্ত নোট বোঝায় কিন্তু এই কাব্য সংক্ষিপ্ত নয়। এতে চারটি প্রক্রম এবং আটাত্তরটি সর্গ আছে। বস্তুত বাল্য থেকে তিরোধান পর্যন্ত চৈতন্যজীবনের প্রায় সবটাই এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর অর্থাৎ ১৫৩৩খ্রীঃ পরই সমগ্র গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল। তবে অনেকে মনে করেন এতে ১৫০৩খ্রীঃ পর্যন্ত ঘটনাই (অর্থাৎ চৈতন্যের আঠারো বছর বয়সের কাহিনী) বর্ণিত হয়েছে- অবশিষ্ট বর্ণনা প্রক্ষিপ্ত। চারটি উপক্রম, ৭৭ টি সর্গে এবং আঠারোশত শ্লোকে সমাপ্ত এই বিরাট কাব্যে মুরারী গুপ্তের

পাণ্ডিত্য ও ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের বর্ণনা (বিশেষত নবদ্বীপলীলা) বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। তিনি চৈতন্যের সহচর ছিলেন এবং তাঁর বাল্য থেকে যৌবন লীলা পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁর কাছে শ্রীচৈতন্যের ভগবতসত্তা জলের মতো স্বচ্ছ ছিল। বস্তুত তিনি চৈতন্যকে প্রথম থেকে ভগবানরূপে চিত্রিত করেননি, গয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর মধ্যে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরাবেশের প্রকাশ হতে থাকে।– এই রূপে শ্রীচৈতন্যের ভগবতসত্তা তিনি চিহ্নিত করেছেন। তিনি চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলার একজন চাক্ষুষ দর্শক ছিলেন, এইজন্য তাঁর কাব্যে বর্ণিত মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলার প্রামাণিকতা সকলেই স্বীকার করে থাকেন এবং পরবর্তী চৈতন্যচরিতকারগণ এ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে থাকেন।

কবিকর্ণপূর পরমানন্দ সেন রচিত চৈতন্য চরিত কাব্য:

চৈতন্যদেবের অন্যতম প্রধান পার্ষদ শিবানন্দ সেনের পুত্র পরমানন্দ সেন কবি ও নাট্যকার রূপে মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি চৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে তিন খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। (১) 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্য, (২) 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক, (৩) 'গৌর গণোদ্দেশদীপিকা'। পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপূর নামে বৈষ্ণব সাহিত্য ও সমাজে অধিকতর পরিচিত।

কবিকর্ণপূরের 'চৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্যটি ১৫৪২ খ্রীঃ রচিত। কাব্যটির আয়তন বেশ দীর্ঘ। এতে কুড়িটি সর্গ রয়েছে। চৈতন্যদেবের প্রায় সমস্ত জীবনটাই এর মূল বর্ণিতব্য বিষয়। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক কৃষ্ণমিশ্রের রূপক নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র আদর্শে রচিত। চৈতন্যদেবের তিরোধানে ওড়িশার রাজা এবং মহাপ্রভুর গুণগ্রাহী ও ভক্ত প্রতাপরুদ্র ব্যাকুল হয়ে পড়লে তাঁর শোক অপনোদনের জন্য এই নাটকের পরিকল্পনা, রচনা ও অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। প্রতাপরুদ্র ১৫৪০-৪১ খ্রীঃ মধ্যে দেহরক্ষা করেন। সুতরাং এই নাটক এর পরে রচিত হতে পারে না। তাই ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ১৫৪০-৪১ খ্রীঃ কেই 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটকের রচনাকাল বলে মনে করেন।[৪] দশ অঙ্কে সমাপ্ত এই নাটকে সংক্ষেপে চৈতন্য জীবনের সমগ্র ঘটনা বর্ণিত। প্রথম পাঁচটি অঙ্কে চৈতন্যের পুরীধাম পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ পাঁচ অঙ্কে চৈতন্যদেবের শেষ কয় বৎসরের কাহিনী নাটকাকারে উপস্থাপিত হয়েছে। এই নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য, এতে বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির পার্থক্য বিচার স্থান পেয়েছে। লেখক রূপক নাটকের কিয়দংশ অনুসরণ করেছেন এবং সুকৌশলে মানব চরিত্র ও রূপক চরিত্রের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে চৈতন্যদেবের জীবন কথা বর্ণনা করেছেন।

কবিকর্ণপূরের অবশিষ্ট রচনার মধ্যে ‘গৌরগণোদ্দেশদীপিকা’র কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এই গ্রন্থটিতে কৃষ্ণ ও তাঁর সখাসখীগণের সঙ্গে চৈতন্যাবতার ও চৈতন্য পরিকরদের অবতারত্ব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি রূপগোস্বামীর নামে প্রচারিত ‘রাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশদীপিকা’র আদর্শে রচিত হয়েছিল। দুইশ পনেরোটি শ্লোকে রচিত ক্ষুদ্র কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, চৈতন্য তিরোধানের পর শুধু চৈতন্যকেই নয় চৈতন্য –সম্পর্কিত প্রায় সকলকে নিয়ে কীভাবে অবতারচক্র গড়ে উঠেছিল এবং বাংলাদেশে চৈতন্য পরিকরগণ কীভাবে দেবদেবীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিল এই গ্রন্থ থেকে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। কবি এই পুস্তিকায় দ্বাপরের বৃন্দাবনের নরনারীর সঙ্গে কলিযুগে চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্য ভক্তদের একীকরণ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে ও তত্ত্বাদর্শে নানারূপ বৈচিত্র্য ও প্রবর্তনের কারণ স্বরূপ ‘গৌড়্গণোদ্দেশদীপিকা’ তদানীন্তন লোকসমাজে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়েছিল। উত্তর চৈতন্যযুগের বৈষ্ণব ইতিহাস ও সমাজগঠনে কবিকর্ণপূরের এই পুস্তিকাখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী

কাশীবাসী প্রবোধানন্দ সরস্বতী চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন এবং চৈতন্য মহিমা অবলম্বনে ‘চৈতন্যচন্দ্রামৃত’ নামক একখানি স্তব গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। তিনি ‘গৌরপারম্যবাদের’ অন্যতম প্রচারক। তাঁর ‘চৈতন্যচন্দ্রামৃত’ গ্রন্থটি ১৪৩ শ্লোকে সম্পূর্ণ চৈতন্য ভক্তি বিষয়ক স্তোত্রকাব্য। স্তুতি, নীতি, আশীর্বাদ, গৌরাঙ্গ ভক্ত মহিমা, ইত্যাদি মোট বারটি অনুচ্ছেদে সম্পূর্ণ এই স্তুতি কাব্য চৈতন্য জীবনী আলোচনায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বৃন্দাবনের গোস্বামী গণ ‘গৌরপারম্যবাদ’ ও ‘গৌরনাগর’ ভাব না মানলেও কাশী ও গৌড়ে এই প্রকার চৈতন্যতত্ত্ব বিশেষ ভাবে প্রচার লাভ করেছিল, তা প্রবোধানন্দের এই পুস্তিকা থেকে জানা যায়।

স্বরূপ দামোদরের কড়চা :

স্বরূপ দামোদরের কড়চা নিয়ে অত্যন্ত জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে কারণ তাঁর গ্রন্থটি পাওয়া যায় নি, অথচ নানা স্থানে এর উল্লেখ ও প্রসঙ্গ রয়েছে। স্বরূপ দামোদরের পূর্ব নাম পুরুষোত্তম আচার্য, নিবাস নবদ্বীপ। বৈষ্ণব তত্ত্ব, বিশেষত গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের আদি ভাষ্যকার দের মধ্যে তিনি অন্যতম।চৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের

যুগল তনু – এই তত্ত্ব কথাটি বোধ হয় স্বরূপের আবিষ্কৃত এবং তাঁর দ্বারাই এর প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ তাঁর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। চৈতন্যতত্ত্বের নিগূঢ় নির্যাসের তিনিই ছিলেন কাণ্ডারী। পুরীধামে স্বরূপ নিত্য নিয়ত মহাপ্রভুকে রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। কবিকর্ণপূর 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'য় বলেছেন যে, বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত পঞ্চতত্ত্বের উদ্ভাবয়িতা হলেন স্বরূপ দামোদর। কৃষ্ণদাস কবিরাজও তাঁর গ্রন্থের নানা স্থানে স্বরূপের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন।

"দামোদর স্বরূপ আর গুপ্ত মুরারী।
মুখ্য মুখ্য লীলাসূত্র লিখিয়াছে বিচারি।।"[৫]

সংস্কৃতে রচিত মুরারীর কড়চা পাওয়া গিয়েছে। স্বরূপ দামোদরও একখানি গ্রন্থ লিখেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেটিই স্বরূপ দামোদরের কড়চা নামে পরিচিত। কৃষ্ণদাস কবিরাজের মতে স্বরূপ দামোদর ও রঘুনাথ দাস চৈতন্যলীলার অন্তপর্বের সাক্ষী ছিলেন। তিনি আরও বলেছেন 'স্বরূপ সূত্রকর্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার ' অর্থাৎ স্বরূপ সংস্কৃতে সূত্রাকারের এই কড়চা রচনা করেন এবং রঘুনাথ দাস তাঁর বৃত্তি বা ব্যাখ্যা রচনা করেন। রাধাকৃষ্ণের যুগলতনু বিষয়ক চৈতন্যতত্ত্বের যে অভিনব পরিকল্পনা স্বরূপের চিত্ত আকর্ষণ করেছিল এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যাঁর পাণ্ডিত্য চৈতন্যদেবেরও প্রশংসা অর্জন করেছিল তাঁর গ্রন্থ পাওয়া যায় নি, এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

এতক্ষণ আমরা যে সংস্কৃত জীবনীগুলির আলোচনা করলাম – সেগুলি কোনোটি মহাকাব্য, কোনোটি স্তোত্র কাব্য, কোনোটি বা নাটক। সংস্কৃতে রচিত হওয়ার জন্য সাধারণ পাঠকগণ তা থেকে বিশেষ লাভবান হতেন না। বাংলার বৈষ্ণব সমাজে চৈতন্যদেবের বাংলা জীবনী কাব্যগুলিই অতিশয় প্রচার লাভ করেছিলো। কারণ সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিও এই বংলা জীবনীগুলি থেকে চৈতন্যের অলৌকিক জীবন কথা এবং বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ব ও রহস্য বুঝতে পারতেন। তাছাড়া এগুলি থেকে বাঙালির জীবন, সমাজ ও সাধনা সম্পর্কে অনেক মৌলিক ঐতিহাসিক তত্ত্বও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এগুলি মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ।

বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ :

শ্রীচৈতন্যের জীবনী কাব্যগুলির মধ্যে বৃন্দাবনদাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থটি বাংলায় রচিত প্রথম চৈতন্যজীবনী কাব্য। সেজন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর ‘চৈতন্যচরিতামৃতে’ উল্লেখ করেছেন –

“কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদ্যবাস।
চৈতন্য চরিতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।।”[৬]

চৈতন্যদেবের আদি ও মধ্য জীবনের প্রামাণ্য ঘটনার জন্য গ্রন্থটি বিশেষ জনপ্রিয়। কাব্যটি সমকালীন সমাজ জীবনের তথ্যে তথ্য সমৃদ্ধ, সুপরিচিত এবং কাব্যগুণান্বিত। চৈতন্যদেবের অন্যতম পার্ষদ শ্রীবাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণীর পুত্র হলেন বৃন্দাবনদাস। গ্রন্থমধ্যে বৃন্দাবন পিতার নাম কোথাও উল্লেখ না করলেও মাতা নারায়ণীর পরিচয় দিয়েছেন। ‘চৈতন্যভাগবত’ থেকে জানা যায় যে, নারায়ণী শ্রীচৈতন্যের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন।

“ভোজনের অবশেষে যতেক আছিল।
নারায়ণী পূন্যবতী তাহা সে পাইল।।
শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা বালিকা অজ্ঞান।
তাহারে ভোজনশেষ প্রভু করে দান।।”[৭]

‘চৈতন্যচরিতামৃতে’ আছে :

“নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট ভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন।।”[৮]

বৃন্দাবন দাসের জন্মকাল নিয়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত পোষন করেছেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী, হরমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সমালোচক ও ঐতিহাসিকদের অনুমান ১৪২৯ শকের (১৫০৭ খ্রীঃ) বৈশাখী কৃষ্ণা দ্বাদশীতে বৃন্দাবন জন্মগ্রহণ করেন। বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ প্রথমে ‘চৈতন্যমঙ্গল’ নামে পরিচিত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ কাব্যকে ‘চৈতন্যমঙ্গল’ বলেই উল্লেখ করেছেন :

“ ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিল বেদব্যাস।
চৈতন্যমঙ্গলে ব্যাস বৃন্দাবন দাস।।”[৯]

লোচনদাসের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ প্রায় একই সময় রচিত হয়। দুটি কাব্যের নাম এক দেখে মা নারায়ণীর নির্দেশে বৃন্দাবন দাস নিজ কাব্যের নাম বদলে ‘চৈতন্যভাগবত’ নামকরণ করেন। ‘চৈতন্যভাগবতে’র রচনাকাল নিয়েও নানাজনের বিভিন্ন মত রয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ১৫৩৫ বা ১৫৩৭ খ্রীঃ, সুকুমার সেনের মতে ১৫৩৪-৩৫ খ্রীঃ, বিমানবিহারী মজুমদারের মতে ১৫৪৮ খ্রীঃ ‘চৈতন্যভাগবত’ রচিত হয়েছিল।

বৃন্দাবন দাস তিন খণ্ডে এই কাব্যের পরিকল্পনা করেছিলেন। আদিখণ্ডে পনেরোটি অধ্যায়, মধ্যখণ্ডে ছাব্বিশটি, অন্ত্যখণ্ডে দশটি অধ্যায়। আদিখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের জন্ম থেকে গয়া গমন এবং নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মধ্যখণ্ডে গৌরাঙ্গের গয়া প্রত্যাবর্তন থেকে সন্ন্যাস গ্রহণ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। অন্ত্যখণ্ডে প্রভুর নীলাচল বাসের কাহিনী বর্ণিত হয়াছে। আদি ও মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা ও গৃহজীবনের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। নিমাই পণ্ডিত কী করে চৈতন্যদেব হলেন, বৃন্দাবন দাসের বিচিত্র বর্ণনায় তা চমৎকার ফুটেছে। তৃতীয় খণ্ডটি অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে বোধ হয় অকস্মাৎ সমাপ্ত। তিনি মুরারী গুপ্তের কড়চা ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত’ কাব্যের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

চৈতন্য-নিত্যানন্দকে বৃন্দাবনদাস কৃষ্ণ-বলরামের অবতার বলে সুদৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করতেন। বৃন্দাবন দাস ছিলেন নিত্যানন্দের ভক্ত শিষ্য। তিনি নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈত ও গদাধরের কাছে চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা অবগত হয়েছিলেন। মহাপ্রভুর নবদ্বীপ লীলা কবি প্রত্যক্ষ করেননি ঠিকই, কিন্তু চৈতন্যের যে ছবি তিনি এঁকেছিলেন তা জ্বলন্ত এবং প্রত্যক্ষ। ডঃ সুকুমার সেন বৃন্দাবন দাস সম্পর্কে লিখেছেন যে, “সাহিত্যের চৌহদ্দি সত্য ত্রেতা দ্বাপরের গণ্ডীঘেরা সেখানে তিনি সমসাময়িক মানুষকে সিংহাসনে বসাইয়া ঘোর কলিকালের কথা শুনাইয়াছেন। শুধু বাঙ্গালা সাহিত্যেই নয়, সমস্ত আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষার সাহিত্যে এ ব্যাপার অপরিকল্পিতপূর্ব। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যকে মনে প্রাণে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু সে বিশ্বাস তাহার বাস্তব দৃষ্টিকে রঞ্জিত করে নাই। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যকে যেভাবে আঁকিয়াছেন তাহাতে তিনি মানুষই, অত্যন্ত স্বাভাবিক অথচ অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ, অত্যন্ত হৃদয় গ্রাহী মানুষ।”[১০] দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন ও ধর্মস্থাপনই চৈতন্যাবতারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলে মনে করেন বৃন্দাবন দাস। কাজেই চৈতন্যদেবের চরিত্রে তিনি করুণ কোমোলতার সঙ্গে সুকঠোর চরিত্র, বীর্য ও পৌরুষেরও পরিচয় দিয়েছেন। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে “চৈতন্যদেব যেমন প্রেমাবতার ছিলেন, তেমনি তাঁর আর একটা কঠোর রুদ্র মূর্তিও ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বৈষ্ণব ভক্ত গণ চৈতন্যদেবকে রাধাভাবে বিগলিত প্রেমানন্দময় রূপে দেখিতে অধিকতর অভ্যস্ত।”[১১]

বৃন্দাবন দাস শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলার আদর্শে চৈতন্য লীলার বিভিন্ন পর্যায় সাজিয়েছেন। ইতিপূর্বে মুরারী গুপ্ত, শিবানন্দ সেন, স্বরূপ দামোদর এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীদের মধ্যে কেউ কেউ শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণ বলে উপলব্ধি করেছিলেন, কিন্তু পুরাপুরি কৃষ্ণলীলার ছাঁদে চৈতন্য লীলা সাজাতে চান নি। চৈতন্যের তিরোধানের কয়েক বৎসর পরে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। বৈষ্ণবগণ তাঁকে কৃষ্ণ বলেই গ্রহণ করেছিলেন, কেউ কেউ তাঁকে রাধা কৃষ্ণের যুগল তনু বলে প্রচার করেছিলেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাস আরও অগ্রসর হয়ে চৈতন্যের বাল্যলীলা থেকে যৌবন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাকে ভাগবতের আদর্শে সাজিয়েছিলেন। শৈশবে কৃষ্ণ লীলার অনুসরণ, তাঁর রূপে বালগোপালের লক্ষণ –

"এ বালক কভু নহে প্রাকৃত ছাওয়াল।
রূপে আচরণে যেন শ্রীবালগোপাল।।"[১২]

বালক কৃষ্ণের মতো দুর্ললিত ভাব –

"কারো ঘরে দুগ্ধ পিয়ে কারো ভাত খায়।
হাঁড়ি ভাঙ্গে যার ঘরে কিছুই না পায়।।"[১৩]

বাল্যকালে নিজেকে গোয়ালা বলে ঘোষণা প্রভৃতি বর্ণনায় ভাগবতের গাঢ়তর ছায়া পড়েছে। বালক নিমাই স্নানার্থিনী রমণীদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন, তাই রমণীগণ শচীমাতার নিকট অভিযোগো করেন। উপনয়ন কালে নিমাই অন্য দ্রব্য ছেড়ে ভাগবত গ্রহণ করে –

"সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
ভাগবত ধরি দিলেন আলিঙ্গন।।"[১৪]

ক্রন্দনরত শিশুকে শান্ত করার একমাত্র উপায় ছিল হরিধ্বনি –

"তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন।
হরিনাম শুনিলে রহেন ততক্ষণ।।"[১৫]

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার এ বিষয়ে বলেছেন, "অশুচি স্থানে বসিয়া কথা বলার সময় বিশ্বম্ভরের দত্তাত্রেয় ভাব, উপনয়ন সময়ে বামন ভাব, সাপের উপর শয়ন করিয়া অনন্ত লীলা এবং পিতৃবিয়োগে ক্রন্দনের সময়

রামভাব দেখাইয়া কবি প্রমাণ করিতে চাহেন যে, শ্রীচৈতন্যে সকল অবতার বর্তমান। বিশেষ করিয়া তিনি শ্রীকৃষ্ণ।"[১৬] বৃন্দাবন দাস এইভাবেই চৈতন্য চরিত্রে লীলার স্বরূপ আস্বাদন করেছেন। মুরারীর গ্রন্থে প্রভুর প্রথম আবির্ভাবের সময়ে তাঁর বরাহভাবের উদয় হয়েছিল বলে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত' মহাকাব্যে ইঙ্গিত রয়েছে। মুরারীর এই সংকেতকে বৃন্দাবন পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ মূর্তি দিয়েছেন; মহাপ্রভুর দেহে বরাহ অবতারের নোখগুলি পর্যন্ত তিনি দৃষ্টিগোচর করে তুলেছেন। এই প্রসঙ্গে চৈতন্যচরিত গ্রন্থাবলির মৌল বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ করার কথা বলেছেন ভূদেব চৌধুরী। তাঁর মতে, "এই গ্রন্থগুলি কেবল তথ্যের সঞ্চয় ও বিন্যাস নয়, তথ্যের কাঠামো অবলম্বন করে আসলে ভক্ত হৃদয়ের মৌলিক সৃষ্টি। চরিত্রকারের বিশ্বাস নিষ্ঠার মধ্যে চৈতন্যের ব্যক্তি মহিমা নবজন্ম লাভ করেছিল। ফলে, তাঁর নবজীবনের বাস্তব ঘটনাবলিকে সেই অলৌকিক বিশ্বাসের অভিমুখী করে সজ্জিত করা হয়েছে।"[১৭] বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের অন্ত্যলীলা বর্ণনায় তাঁর কৃষ্ণ প্রেম ব্যাকুল আর্তিকে প্রাধান্য দিলেও মাঝে মাঝে তাঁর মধ্যে দিব্য আবেশের দ্বারা কৃষ্ণভাবের অবতারণা করেছেন। তখন তিনি গীতার মতো উদাত্ত কণ্ঠে পতিত মানব, পাষণ্ডী, হীন, অন্ত্যজ, অহিন্দু জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করে বলেছেন, "মামেকং শরনং ব্রজ।" শ্রীবাসের ভবনে উপস্থিত হয়ে মহাপ্রভুর প্রথম বিভূতি প্রকাশের কাহিনীতে সেই সর্বভূতাত্মা ব্রজেন্দ্রনন্দনের রূপটি ফুটে উঠেছে। চারিদিকে পাষণ্ডীদের উৎপাত ও অভক্তি দেখে গৌরাঙ্গদেব দিব্যাবেশে গর্জন করে উঠলেন :

"দেখিয়া গর্জয়ে প্রভু করয়ে হুংকার।
মুই সেই মুই সেই, বলে বারবার।।"[১৮]

এই দিব্যভাবের বশেই তিনি মুরারী গুপ্তের গৃহদ্বারে বরাহ অবতার রূপে উপস্থিত হয়েছিলেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্য লীলাকে সর্বত্র এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। পাষণ্ডী পরিবেষ্টিত বৈষ্ণব সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে মহাপ্রভুকে জীবত্রাতা ও রুদ্ররূপে আঁকতে হবে; বৃন্দাবন দাস তাই করেছেন। মহাপ্রভুর লীলার অপার্থিব অধ্যাত্ম মহিমায় বিশ্বাস করেও তাঁর মানবিক আবেদনটুকু বৃন্দাবন দাস একেবারেই হারিয়ে ফেলেন নি। 'চৈতন্যভাগবত' মহাগ্রন্থের ঐতিহাসিক সমৃদ্ধি ও সরসতার পেছনে রয়েছে তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা আর বিশ্বাসনিষ্ঠ আন্তরিকতা। এই দুর্লভ গুণাবলীর সমন্বিত সমাবেশে, ইতিহাসের তথ্যে, ভক্ত হৃদয়জাত বিশ্বাস-সত্যে এবং শৈল্পিক সরসতায় 'চৈতন্যভাগবত' যথার্থই বৈষ্ণব ধর্মের ভাগবত হয়ে উঠেছে।

শুধু তাই নয়, ষোড়শ শতাব্দীর পশ্চিমবঙ্গের সমাজচিত্র হিসাবে বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল স্বরূপ গণ্য হয়ে থাকে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই নবদ্বীপ বিদ্যাচর্চার সর্ব শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। একদিকে পাণ্ডিত্য , অন্যদিকে ধনসম্পদের প্রাচুর্যে নবদ্বীপ বাংলাদেশের প্রধান সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক শহর রূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু নবদ্বীপ থেকে বিদ্যার চর্চা ক্রমশ লুপ্তপ্রায় হতে থাকে। জ্ঞানানুশীলনের পরিবর্তে তন্ত্র-মন্ত্র, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, লোকাচার প্রাধান্য লাভ করে। বিভিন্ন মঙ্গল দেবদেবী তথা লৌকিক দেবতার পূজার্চনার নামে মদ্য-মাংস সেবন ও ধনাদি ব্যয় করার প্রচলন ছিল :

"ধর্মকর্ম লোকে সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনজন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহু ধন।।
বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপচারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যজ্ঞপূজা করে।।"[১৯]

ব্রাহ্মণরা বৈষ্ণব শাস্ত্র গ্রন্থ পড়লেও তা ছিল ভক্তিশূন্য ঐশ্বর্যপ্রধান। সমাজে ন্যায় ও স্মৃতি শাস্ত্রের প্রভাব ছিল। স্মার্ত আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব এই সমাজে ব্রাহ্মণরা নিজেদের ভোগপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার তাগিদে নিম্ন শ্রেণির মানুষকে বঞ্চিত, শোষিত ও নিপীড়িত করতে থাকে। অহঙ্কার, জাত্যাভিমান, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষে সমাজজীবন ছিল আচ্ছন্ন। শুধু তাই নয়, বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর গৌড়েশ্বরের অত্যাচারের বর্ণনা দিয়েছেন। গৌড়েশ্বরের অত্যাচারে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই সেই সময় নবদ্বীপ ছেড়ে পলায়ণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এইরকম পরিবেশে হোসেন শাহের রাজত্বকালে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয় এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একত্রিত করে সমন্বয়ের বাণী শুনিয়ে প্রেমভক্তির পথে চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে নব্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন হয়। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে বাংলার তথা বৈষ্ণব সমাজের যে লিপিচিত্র ফুটে উঠেছে তাতে বৃন্দাবন দাসের সূক্ষ্ম দর্শন শক্তি ও সমাজের অভিজ্ঞতার উচ্চ প্রশংসা করতে হয়। ডঃ সুকুমার সেনের মতে, "পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর মোহনায় বিশেষ করিয়া হোসেন শাহার রাজ্যকালের প্রথম বিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের অ-রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের দুর্লভ উপাদান অনেকটা এখানেই প্রাপ্তব্য।"[২০] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'চৈতন্যভাগবতে'র ঐতিহাসিক মূল্য তাই অনস্বীকার্য।

লোচনদাসের 'চৈতন্যমঙ্গল' :

চৈতন্যজীবনী কাব্য হিসাবে 'চৈতন্যমঙ্গল' নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, এটা সাধারণ বিশ্বাসপ্রবণ বৈষ্ণবভক্তের জন্য রচিত হয়েছিল এবং মুখ্যত এটা পাঁচালী প্রবন্ধ ও মঙ্গলকাব্যের ধারা অনুসরণে গীত হত। দ্বিতীয়ত, চৈতন্যদেবের ঐতিহাসিক তথ্যাদি থাক আর নাই থাক, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শাখা বিশেষের (গৌরনাগর) মতামত ও সাধন ভজন প্রবণতা এই কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বৃন্দাবনদাসের সমসাময়িক ছিলেন। কাব্যে তার আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় বর্ধমান জেলার কোগ্রামের বৈদ্যবংশে তাঁর জন্ম। তিনি নরহরির শিষ্য ছিলেন। 'চৈতন্যমঙ্গলে'র রচনাকাল নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সতীশচন্দ্র রায়ের মতে কাব্যটির রচনাকাল ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। দীনেশ চন্দ্র সেনের মতে, কথিত আছে যে, তিনি ১৫৭৫খ্রীঃ তাঁহার গুরু নরহরি সরকারের আদেশে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে ১৫৫০-৬৬ খ্রীঃ মধ্যে কোনো সময়ে চৈতন্যমঙ্গল রচিত হয়েছিল।

'চৈতন্যমঙ্গল' চারটি খণ্ডে বিভক্ত – সূত্র খণ্ড, আদি খণ্ড, মধ্য খণ্ড, শেষ খণ্ড। এই কাব্যটি মুখ্যত স্বল্প শিক্ষিত সমাজে গানের জন্য রচিত হয়েছিল। এই জন্য সর্বত্র রাগরাগিনীর উল্লেখ আছে কিন্তু সর্গ বিভাগ বা অধ্যায় বিভাগ নেই। রচনার ধারা অনেকটা মঙ্গল কাব্যের অনুরূপ। এই সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন "লোচনের গ্রন্থ পরিপূর্ণভাবে পাঁচালী প্রবন্ধ। সেইজন্য আদ্যন্ত রাগরাগিনীর উল্লেখ আছে এবং 'শিকলি' ও 'লাচাড়ী' অংশ প্রায় সমান সমান।"[২১] সূত্র খণ্ডটি মঙ্গলকাব্যের দেব খণ্ডের অনুরূপ। বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা এবং চৈতন্য অবতারত্বের মহিমা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আদি খণ্ডে চৈতন্যের জন্ম থেকে বয়ঃপ্রাপ্তি, গয়াগমন ও গয়া থেকে প্রত্যাবর্তন বর্ণিত হয়েছে। মধ্য খণ্ডে চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলা ও উৎকল লীলা স্থান পেয়েছে। নবদ্বীপে মহিমা প্রকাশ, শ্রীগৌরাঙ্গের গয়া হতে প্রত্যাবর্তনের পর ভাববিকার, সন্ন্যাস মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ, পুরীযাত্রা ও সার্বভৌম উদ্ধার, ভক্তগণের আগমন ও চৈতন্যের সঙ্গে মিলন প্রভৃতি এই অংশের প্রথম দিকে সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। চৈতন্যদেব ভাগবতের কৃষ্ণের মতো লীলা করছেন কোন কোন জায়গায় এরূপ বর্ণনাও আছে। যেমন- বস্ত্রহরণ লীলা। শেষ খণ্ডে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ, রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলন, সেতুবন্ধ পর্যন্ত মিলন এবং পুরীতে প্রত্যাবর্তন, নীলাচলে অবস্থান ও চৈতন্যের অলৌকিক তিরোধান বর্ণিত হয়েছে। মুরারী গুপ্তের কড়চার আদর্শে লোচন কাহিনী বিন্যস্ত করেছেন। লোকমুখে শোনা গল্প কাহিনীই তাঁর রচনার অন্যতম উপাদান। 'চৈতন্যভাগবত' ও 'চৈতন্যচরিতামৃতে' গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পর্ক উপেক্ষিত হয়েছে। কিন্তু লোচন দাস সেই সম্পর্কের বর্ণনা দিয়েছেন।

চৈতন্যাবতারের প্রধান উদ্দেশ্য কী, তা নিয়ে বৈষ্ণব গোষ্ঠীর মধ্যে দুটি মত প্রচারিত ছিল। এক, ধর্মসংস্থাপন, দুষ্টের দমন ইত্যাদি। দুই, স্বরূপ দামোদর ব্যাখ্যাত রাধাকৃষ্ণের যুগলতনু ও অবতাররূপী

চৈতন্যদেবের কথা। কবি লোচন দাস দুই বৈশিষ্ট্যেরই উল্লেখ করেছেন। যুগ যুগ ধরে অধর্মের বিনাশ করে ধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালনের নিমিত্ত তাঁর আবির্ভাব।

এক

"কলি পাপময় যুগে না দেখি নিস্তার লোকে
দয়া উপজিল প্রভু চিতে।
পালিব ভকতজন আর ধর্মসংস্থাপন
জনম লভিব পৃথিবীতে।।"[২২]

দুই

"রাধাভাব অন্তরে রাধা বর্ণ বাহিরে
অন্তর্বাহ্য রাধাময় হইয়া।
সঙ্গে সখীবৃন্দ আর ভক্ত অনন্ত
ব্রজ ভাবে অখিল মাতাইয়া।।"[২৩]

কবি লোচনের কাছে শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য। তিনি চৈতন্যকে পূর্ণ ঈশ্বরের মর্যাদা দিয়েছেন –"কলিযুগে গৌরকৃষ্ণ জানিয়াছি আমি।/ বিশেষ সন্দেহ মোর ঘুচাইলে তুমি।।" কলিযুগের সমস্ত অধর্ম, পাপ দূর করার একমাত্র অস্ত্র নামসঙ্কীর্তন।

কবি গ্রন্থ মধ্যে গৌরাঙ্গের নাগররূপের বর্ণনা দিয়েছেন। কাব্যে দেখা যায় নিমাইয়ের বিবাহ উপলক্ষে পতিব্রতা নারীরা জড়ো হয়েছেন। লোচনদাসের কাব্যে দেখা যাচ্ছে – গৌরাঙ্গ এখানে নাগর আর পতিব্রতা নারীরা নগরী। তারা গৌরাঙ্গ প্রেমে আকুল। চৈতন্যের নাগর ভাবের বর্ণনা : বসিলা সুন্দরী সব প্রভুর সমীপে।/ সে অঙ্গ বাতাসে রঙ্গিনীর অঙ্গ কাপে।।/ বসন বচন সব স্খলিত হইল।/ নয়নে অলসযুত কাহারও হইল।।/ কেহো অঙ্গপরশে অনঙ্গ রঙ্গ করে।/ ফুলিয়া পড়িলা বিশ্বম্ভরের উপরে।।"[২৪] গৌর নাগরীবাদের প্রবক্তা নরহরির নির্দেশ মতো বৃন্দাবনের গোপনারী ও কৃষ্ণের সম্বন্ধকে নবদ্বীপের নিমাই ও পতিব্রতা নারীদের ক্ষেত্রে স্থাপন করেছেন লোচন দাস। লোচন দাসের গুরু নরহরি সরকার

‘গৌরনাগরভাবের’প্রধান প্রচারক। নরহরি সরকার ও লোচন দাস গৌরনাগর ভাবের অনেকগুলি পদ লিখেছিলেন যেখানে চৈতন্যদেবকে পুরাপুরী শৃঙ্গার রসের নায়ক করে তোলা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন এই গৌরনাগর ভাবই নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব ধর্মের সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করেছিল। এ প্রসঙ্গে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য ‘‘চৈতন্যভক্তগণ লোচনের মতো যখন তাহারা নদীয়ার বিবাহিতা রমনীদিগকেও চৈতন্যপ্রেমে পাগলিনী করিয়া আঁকিলেন, তখন হইতেই মহাপ্রভু ও বৃন্দাবনের গোস্বামী প্রভুদের বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও আচারনিষ্ঠা বৈষ্ণব সহজিয়াদের কবলগ্রস্থ হইল, মননশীল দার্শনিকতা ক্রমেই আবেগ প্রবল ধর্মকৃত্য ও রহস্যাচারী ‘কাল্ট’-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমাজের সুরঙ্গের গভীরে চলিয়া গেল।’’[২৫] একই সময়ে দাঁড়িয়ে বৃন্দাবন দাস কিন্তু চৈতন্যের নদীয়া নাগর ভাবের কথা বলেন নি। আসলে প্রতিটি চৈতন্যজীবনী গুরুর নির্দেশে রচিত। যখনই গুরু বদলে গেছে তখনই কবিদের দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গেছে। গুরু নরহরির প্রেরণায় লোচনের আরাধ্য হলেন বৃন্দাবনের কৃষ্ণ। কারণ নাগরালী ভাব কখনই ভাগবতের দশম-দ্বাদশ স্কন্ধের কৃষ্ণকে দিয়ে সম্ভব নয়। লোচন দাস তাই চৈতন্যকে কুরুক্ষেত্রের নায়ক কৃষ্ণের মতো করে চাইলেন না, চাইলেন বৃন্দাবনের প্রেমিক কৃষ্ণকে। লোচন দাস এভাবেই তাঁর কাব্যে চৈতন্য চরিত্র নির্মাণ করেছেন।

লোচন দাস যেহেতু বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর কাব্যে, স্বভাবতই চৈতন্যের আচরণে গোকুলের বালক কৃষ্ণের প্রভাব পড়েছে। এমনকি নামকরণের ক্ষেত্রেও তিনি এক অভিনব মত পোষণ করেছেন – ‘বিশ্ব পালন হেতু থুইল বিশ্বম্ভর নাম।’কবি দেখিয়েছেন শুধু মা নয়, পিতাও এই চঞ্চল পুত্রের দৌরাত্ম্যে অস্থির হয়েছেন। চৈতন্যের বাল্যলীলার চাঞ্চল্যের এমন কিছু দৃষ্টান্ত কবি দিয়েছেন যা অন্য চরিতকারদের সঙ্গে মেলে না।

চৈতন্যদেবের জীবনের আর একটি পর্যায় লোচনের কাব্যে অভিনব আকারে বর্ণিত হয়েছে। গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্য জীবনসম্পর্কে এ কাব্যে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ‘চৈতন্যভাগবত’ ও ‘চৈতন্যচরিতামৃতে’ যার অনুমাত্র উল্লেখ নেই। মধ্যখণ্ডে বর্ণিত হয়েছে যে, সন্ন্যাস গ্রহণের দুই একদিন পূর্বে এক রাত্রিতে বিষ্ণুপ্রিয়া এই সংবাদ শুনে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করেন:

‘‘কহ কহ প্রাণনাথ মোর শিরে দিয়ে হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোক মুখে শুনি ইহা বিদরিতে চাহে হিয়া
আগুনিতে প্রবেশিব আমি।

****

আমা হেন ভাগ্যবতী নাহি কোন যুবতী
তুমি মোর প্রাণনাথ।
বড় প্রতি আশা ছিল নিজ দেহ সমর্পিল
এ নব যৌবন দিবা হাত।।"[২৬]

গৌরাঙ্গদেব পত্নীকে সান্তনা দিয়ে বললেন :

"আমি তোরে ছাড়িয়া সন্ন্যাস করিব গিয়া
একথা বা কে কহিল তোকে।
যে করি সেকরি যবে তোমারে চাহিব তবে
এখনে না মিছা মর শোকে।।"[২৭]

এবং তারপর :

"ইহা বলি গৌরহরি আশ্লেষ চুম্বন করি
নানা রস কৌতুক বিথারে।
অনন্ত বিনোদ প্রেমা লীলা লাবন্যের সীমা
বিষ্ণুপ্রিয়া তুষিল প্রকারে।।
বিনোদবিলাস রসে ভৈগেল রজনী শেষে
পুন কিছু পুছে বিষ্ণুপ্রিয়া
হিয়ার আগুনি আছে তে কারণে পুন পুছে
প্রিয় প্রাণনাথ মুখ চাইয়া।।"[২৮]

সন্ন্যাস গ্রহণের মাত্র একদিন পূর্বে পরিতুষ্ট করার জন্য এই দাম্পত্য লীলা চৈতন্যদেবের চরিত্রের ঘোরতর বিরোধী। তবে চৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্পর্ক নিয়ে যেখানে বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রায় নীরব সেখানে লোচন দাসের এই তথ্য পরবর্তী কথাশিল্পীদের কল্পনার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এই উপাদান ব্যবহার করে ঊনবিংশ-বিংশ শতকের সাহিত্যিকবৃন্দ গল্প, উপন্যাস, গান, নাটক রচনা করেছেন যার মধ্যে দিয়ে চৈতন্যচরিত্রের অনেক অজানা দিক পাঠকের সামনে উঠে আসে।

বস্তুত প্রাচীন পুরাণ ও পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজের বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহযোগে লোচন দাস চৈতন্য জীবনের এক নতুন রসচিত্র রচনা করেছেন। এই শৈল্পিক প্রয়াসে মহাপ্রভুর জীবনের বহু তথ্য ও সত্য ঘটনা কবিকল্পনার প্রভাবে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। তা হলেও কল্পনাশক্তির অবাধ চর্চা করতে গিয়ে ভক্ত হৃদয়ের বিশ্বাসের ঐতিহ্যকে কোথাও তিনি ক্ষুণ্ন করেননি।

চৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে লোচন দাস নতুন তথ্য দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে রবিবার বেলা তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভু জগন্নাথ কলেবরে লীন হয়েছিলেন। 'চৈতন্যমঙ্গলে'র শেষ খণ্ডে রয়েছে : "তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।/ জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।।" বিংশ-একবিংশ শতকে চৈতন্য দেবের মৃত্যু রহস্য নিয়ে যেসকল ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন তাঁরা লোচন দাসের এই তথ্যটি উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল':

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত রচনার কিছুকাল পরে জয়ানন্দ মিশ্র তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনা করেন। তাঁর কাব্য সম্পর্কে সর্বপ্রথম ১৩০৪-০৫ সালের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় আলোচনা প্রকাশিত হয়। তারপর নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথের সম্পাদনায় এই গ্রন্থ ১৩১২ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপর নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথের সম্পাদনায় এই গ্রন্থ ১৩১২ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে ইতিহাস ও সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে অনেক নতুন কথাও আছে। এই সমস্ত কারণে প্রকাশের পর থেকে এই গ্রন্থের প্রতি পাঠক, ঐতিহাসিক, গবেষক, ভক্ত – সকলেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

গ্রন্থমধ্যে জয়ানন্দ প্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তিনি বর্ধমানের নিকট আমাইপুরা গ্রামে বন্দ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতা রোদনী। মাতা মৃতবৎসা ছিলেন বলে নবজাত শিশুর যমের অরুচিসুলভ নাম রেখেছিলেন গুইয়া। চৈতন্যদেব স্বয়ং নবজাত শিশুর গুইয়া নাম বদলে জয়ানন্দ নামকরণ করেন। জয়ানন্দের উক্তি অনুসারে চৈতন্যদেব নীলাচল থেকে বাংলায় ফেরার পথে বর্ধমানে আমাইপুরা গ্রামে সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। জয়ানন্দ গদাধরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। সেইজন্য তাঁর কাব্যে গৌর-গদাধর তত্ত্বের প্রভাব লক্ষ করা যায়।

'চৈতন্যমঙ্গলে'র বিশেষত্ব এইখানে যে, এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের কাহিনী বর্ণনায় জয়ানন্দ এমন কিছু অভিনব তথ্য সংযোজন করেছেন যা অন্য কোন চৈতন্যচরিতকাব্যে পাওয়া যায় না। সেই তথ্য গুলি সম্বন্ধে যদিও কিছুটা সংশয় থেকে যায় , তবুও এ কথা বলা যায় যে তাঁর দেওয়া তথ্য গুলি লোকপ্রচলিত ও বাস্তবসম্মত। তিনি নিজে বৈষ্ণব ছিলেন বলে সমগ্র কাব্য জুড়ে একাধিক স্থলে বৈষ্ণবের বন্দনা করেছেন, বৈষ্ণব ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন।

"সংকীর্তন বিস্তার নিস্তার সর্বলোকে।
দেবালয় সুপত্তন কর একে একে।।
বিধবা সধবা সভারে দেহ নাম।
****
মহান্ত বৈষ্ণব সভে অশেষ বৈষ্ণবী।
সেবকানুসেবকে ব্যাপিবেক পৃথিবী।।"[২৯]

এইখানে লক্ষনীয় কবি বিধবা সধবা সমস্ত নারীকেই বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা দানের কথা বলেছেন। চৈতন্য ভক্তি আন্দোলন প্রসারের পটভূমিতে নারীর ধর্মাধিকারের ধর্মাচরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কবি জয়ানন্দ যা পরবর্তী গবেষকদের গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। দেখা যায় চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নবদ্বীপের বৈষ্ণব ধর্ম পরিচালনার গুরু দায়িত্ব দিয়ে যান :

"শুন সতী বিষ্ণুপ্রিয়া বৈষ্ণব জননী।
নবদ্বীপ রক্ষা কর চিন্তা মনে গণি।।
তুমি না থাকিলে হব সংকীর্তনবাদ।
নবদ্বীপ লৈয়া হবে বড়ই প্রমাদ।।"[৩০]

যে সংকীর্তনের মাধ্যমে তিনি গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তারই পুরোভাগে সেদিন তিনি স্ত্রীকে স্থান দিয়েছিলেন। আরো লক্ষণীয় কীভাবে বৈষ্ণব ধর্ম পালন করতে হবে চৈতন্য সেকথাও স্ত্রীকে বলে যান : " অরুণ উদয় কালে গঙ্গা স্নান করি।/ মন্দিরে আসিয়া দিব্য ধোয়ত বস্ত্র পরি।।/ এক মুষ্টি আতব তণ্ডুল ভূমে পেলি।/ একটি তণ্ডুল লয়া হরে কৃষ্ণ বলি।।/ হরিনাম বত্রিশ অক্ষর সাঙ্গ হইলে।/ সেই তণ্ডুল গুটি থুইবে গঙ্গাজলে।।/ এই মত তিন প্রহরে যত পার।/ রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে নিবেদন কর।।/ সেই অন্ন ভক্ষণ করহ দেহ রক্ষা হেতু।/ তুমার চরিত্র লোকে ধর্মশিক্ষাসেতু।।"[৩১] এখানে লক্ষণীয় বৃন্দাবন দাস ,কৃষ্ণদাস কবিরাজের বর্ণনায় যেখানে বিষ্ণুপ্রিয়াকে একপ্রকার অন্ধকারে রেখেই চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ বর্ণিত হয়েছে সেখানে জয়ানন্দের এই বর্ণনা আধুনিক পাঠকের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। পরবর্তী বিংশ

ও একবিংশ শতকে অনেক উপন্যাস ও ছোটগল্পে আমরা গৌরাঙ্গ ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র দেখতে পাই।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' থেকে যেমন আমরা তৎকালীন সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাই তেমনি জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' থেকেও আমরা তৎকালীন বঙ্গদেশের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পাই। ষোড়শ শতকের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে তিনি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। চৈতন্যদেবের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের উপর গৌড়েশ্বরের অত্যাচারের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন জয়ানন্দ :

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়।"[৩২]

রাজার আদেশে মুসলমানরা নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের প্রাণবধ, সম্পত্তি লুটপাট করে তাদের উপর প্রবল অত্যাচার শুরু করে। কপালে তিলক ও কাঁধে যজ্ঞসূত্র দেখলে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করা হত। যবনরা নবদ্বীপের সমস্ত মঠ-মন্দির, আখড়া পাটবাড়ী ধ্বংস করতে শুরু করে। সদা সর্বদা প্রাণভয়ে ভীত নবদ্বীপ বাসীর পক্ষে নবদ্বীপে থাকাই কঠিন হয়ে পড়ে। "পিরল্যা গ্রামেতে বসে যতেক যবনে।/ উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণে।।"[৩৩] বিংশ শতাব্দীর লেখক শৈবাল মিত্র তাঁর 'গোরা' উপন্যাসে গোরার জন্মরহস্যের সন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসের আইরিশ দম্পতির সন্তান গোরার জন্ম রহস্য সূত্রে পিরালী ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন।[৩৪] পিরালী বামুনরা যে আসলে নবদ্বীপের সেই পীরল্যা গ্রামের ব্রাহ্মণ, সুলতান হোসেন শাহের আমলে যাদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল। ধর্মান্তরিত সেই মুসলিমরা অনেকে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেও নিজেদের পরিচয় বেশিদিন লুকিয়ে রাখতে পারেনি। খাঁটি বামুনরা তাদের একঘরে করে রাখলেও বিত্তসম্পদের জোরে প্রায়শ্চিত্ত করে পিরালী বামুন পরিচয়ে আলাদা সম্প্রদায় হিসাবে টিকে থাকল। এইভাবে চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলির বিবিধ বিষয় পরবর্তী সাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনার উপাদান হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মতে ১৪৭৮-৭৯ খ্রীঃ বাংলায় একপ্রকার অরাজকতা চলছিল। জয়ানন্দের মতে চৈতন্যের দাদা বিশ্বরূপের জন্মের সময় দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল : " আর এক পুত্র হইল বিশ্বরূপ নামে।/দুর্ভিক্ষ জন্মিল বড় নবদ্বীপ গ্রামে।।/ নিরবধি ডাকা চুরি অরিষ্ট দেখিয়া।/ নানাদেশে সর্বলোক গেল পলাইয়া।।"[৩৫] জয়ানন্দের বর্ণনা অনুযায়ী পিরল্যা গ্রামের মুসলমানরা রাজাকে এই

সতর্কবার্তা দিয়েছিল যে নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ রাজা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আসলে চৈতন্যদেবের জন্মের কিছু পূর্বেই নবদ্বীপ বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসাবে গড়ে ওঠে। এই সময় বাইরে থেকেও ব্রাহ্মণরা নবদ্বীপে আসতে থাকে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, "এইসব ব্যাপার দেখে গৌড়েশ্বরের বিচলিত হওয়া এবং এতগুলি ঐশ্বর্যবান ব্রাহ্মণ একত্র সমবেত হয়ে গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হওয়ার প্রবাদ সার্থক করার ষড়যন্ত্র করছে এটা ভাবা গৌড়েশ্বরের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।"[৩৬] জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে' এই সম্ভাবনার কথাই উল্লেখ করেছেন :

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে।
নিশ্চিন্তে না থাকিহ প্রমাদ হএ পাছে।।
নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ময় প্রজা।।"[৩৭]

গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হওয়ার এই প্রবাদকে কেন্দ্র করেই বিংশ শতাব্দীর কথাশিল্পী অভিজিৎ সেন লিখেছেন 'রাজপাট ধর্মপাট' নামক উপন্যাসটি। এই প্রবাদে যেসকল অনুমানের সুযোগ রয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে এই উপন্যাস। কী কী অনুমান করেছেন লেখক, কীভাবে গড়ে উঠেছে উপন্যাসের পটভূমি, হোসেন শাহের রাজত্ব, গৌড়ের ইতিহাস ও চৈতন্যদেবের গৌড় তথা রামকেলী যাত্রা, বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের প্রভাব কীভাবে লেখকের কল্পনার রসে জারিত হয়ে সার্থক উপন্যাস আকারে পাঠকের রসপিপাসা চরিতার্থ করেছে তা আমরা পরবর্তী অধ্যায় গুলিতে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

জয়ানন্দের কাব্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল কাব্যের বাস্তবতা। কবি জয়ানন্দ যথাসম্ভব বাস্তব প্রেক্ষিতকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। আর সেই কারণেই তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের কাছে জয়ানন্দের কাব্য ততখানি সমাদৃত না হলেও পরবর্তী সাহিত্যিক, সমালোচক, কথাশিল্পীদের কাছে তার কাব্য অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। মহাপ্রভুর তিরোধান সম্পর্কে তিনিই প্রথম সেই সময়ে দাঁড়িয়েও সাহসিকতার সঙ্গে একটি বাস্তব কাহিনী উপস্থাপন করেছেন যা ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও আধুনিক পাঠক সমালোচকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে। জয়ানন্দের বর্ণনা অনুযায়ী আষাঢ় মাসে রথযাত্রার দিন রথের আগে নাচতে নাচতে চৈতন্যের বাম পায়ে ইঁটের টুকরো বিদ্ধ হয়। ষষ্ঠী তিথিতে পায়ের যন্ত্রণা বেড়ে যায়। তিনি টোটা গোপীনাথ মন্দিরে আশ্রয় নেন। গদাধরকে বলেন যে, পরদিন (অর্থাৎ সপ্তমী তিথিতে) রাত্রি দশ দণ্ডের সময় দেহরক্ষা করবেন, এ বর্ণনা বেশ বাস্তব ও স্বাভাবিক। "আষাঢ় বঞ্চিতা রথ বিজয় নাচিতে।/ ইটাল বাজিল বাম পায় আচম্বিতে।।/ ··· ··· চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠী দিবসে।/ সেই লক্ষে টোটাএ শয়ন অবশেষে।।/ পণ্ডিত গোসাইকে কহিল সর্ব্বকথা।/ কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্বথা।।···

মায়া-শরীর থাকিল ভূমে পড়ি।/ চৈতন্য বৈকুণ্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি।।”[৩৮] দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, “চৈতন্যদেবের তিরোধান সংক্রান্ত নানারূপ অলৌকিক গল্পে – সত্যকাহিনী কুহাকাচ্ছন্ন হইয়াছিল, জয়ানন্দের লেখায় সেই ঘনীভূত তিমির রাশি এখন অন্তর্হিত হইবে।”[৩৯] চৈতন্যদেবের মৃত্যু সংক্রান্ত জয়ানন্দের এই তথ্যটি আধুনিক পাঠকের কাছে অনেক বেশি যুক্তিসম্মত। জয়ানন্দের এই তথ্যটি চৈতন্যদেবের মৃত্যু সংক্রান্ত ঘনীভূত তিমির রাশি উদ্ঘাটনের যে ইঙ্গিত দিয়েছিল তাই পরবর্তী সাহিত্যিক সমালোচকদের এ বিষয়ে কৌতুহলী করে তোলে। চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে বিংশ ও একবিংশ শতকে বহুবিধ চর্চা শুরু হয়। ১৯৭৬ সালে ডঃ জয়দেব মুখ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে উপন্যাস লিখলেন ‘কাঁহা গেলে তোমা পাই’। এরপর ২০১৩ সালে রূপক সাহা চৈতন্য অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে গবেষণা আকারে বিবিধ চৈতন্য চরিতকাব্য গুলি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে লিখেছেন একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ‘ক্ষমা কর হে প্রভু’। এই গবেষণা পত্রের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমরা এই উপন্যাস গুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

তথ্যের অভিনবত্বে, কবিত্বের বাস্তবনিষ্ঠ প্রকাশে জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ কাব্য রসিকদের ও ঐতিহাসিকদের কৌতূহলের বিষয় হয়ে উঠেছে। জয়ানন্দ খুব উচ্চস্তরের কবি না হলেও কল্পনা ও বাস্তব, আধ্যাত্মিকতার ও মানবিকতার পরিমিতি যেভাবে তিনি কাব্যে রক্ষা করেছেন – তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ :

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য জীবনীকার হিসাবে শুধু শ্রেষ্ঠ নয়, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে একজন অন্যতম দার্শনিক। সুগভীর পাণ্ডিত্য, অসাধারণ দার্শনিকতা ও ভক্তিশাস্ত্রে অতন্দ্র নিষ্ঠা তাঁকে মধ্যযুগের অন্যতম কবির মর্যাদা দিয়েছে। গৌড়, উৎকল, বৃন্দাবন তথা দক্ষিণ ভারতের ভক্তিধর্ম ও দার্শনিকতাকে তিনি যেভাবে রূপ দিয়েছেন তাতে তাঁকে মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলতেই হয়। কবিরাজ গোস্বামী ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে’র আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে নিজ জীবনের কিয়দংশ বিবৃত করেছের। বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকট ঝামটপুর গ্রামে কবির বাস ছিল। তিনি সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশ জাত। তাঁর পিতা ভগীরথ, মা সুনন্দা দেবী। কবি ছিলেন নিত্যানন্দের শিষ্য। আনুমানিক ১৬১২খ্রীঃ বা ১৬১৫খ্রীঃ ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ রচিত হয়েছে।

‘চৈতন্যচরিতামৃত’ ‘চৈতন্যভাগবতে’র পরিপূরক গ্রন্থ। কেননা বৃন্দাবন দাস আদি ও মধ্যখণ্ডের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, অন্যদিকে চৈতন্যলীলার অন্ত্য পর্বের উপর কবিরাজ গোস্বামী গুরুত্ব

সহকারে আলোচনা করেছেন। চৈতন্যজীবনের তাৎপর্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের মূল তত্ত্ব, চৈতন্য শাখা নির্ণয় প্রভৃতি কবি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত – আদি লীলা, মধ্য লীলা, অন্ত্য লীলা। আদি লীলা সতেরোটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তার মধ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ থেকে চৈতন্যদেবের বাল্যলীলা ও কিশোর কাহিনী সূত্রাকারে বর্ণিত হয়েছে। আদিলীলার শেষ পরিচ্ছেদে কাজীদলন চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্পের কথা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণদাস সূত্রাকারে চৈতন্যের বাল্য কৈশোর যৌবনের মুখ্য কাহিনী বর্ণনা করেছেন কারণ তাঁর পূর্বে বৃন্দাবন দাস বিস্তারিত আকারে চৈতন্যের নদীয়া লীলা বর্ণনা করেছিলেন। এই পর্বে প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত বারোটি পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস মূলত বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শন, চৈতন্যাবতারের প্রয়োজনীয়তা এবং চৈতন্য-অদ্বৈত-নিত্যানন্দের অনুচর পরিকর ও শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ঘটনা বিন্যাস পূর্ণ জীবনী বর্ণনা না করে চৈতন্যাবতারের তাৎপর্য, শাস্ত্রমার্গীয় স্মার্ত বৈষ্ণব ধর্ম ও গৌড়ীয় রাগানুগা বৈষ্ণব ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য, রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, চৈতন্য ও কৃষ্ণের সম্পর্ক, চৈতন্যাবতারের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তা এবং প্রেম ধর্মের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণে অধিকতর প্রবণতা ও নিপুণতা দেখিয়েছেন। এই পর্বটি দুটি কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমত এতে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বৃন্দাবনের গোস্বামী সম্প্রদায় বৈষ্ণব ধর্ম দর্শন ও রসতত্ত্ব বিশ্লেষিত বিধৃত ও আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত জীব উদ্ধারের জন্যই চৈতন্যাবতারের প্রয়োজনীয়তা বৃন্দাবন দাসের মতো এই তত্ত্ব স্বীকার করেও তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল তনু রূপে চৈতন্যাবির্ভাবের তত্ত্বটির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তৃতীয়ত, চৈতন্যদেব ও তাঁর বিভিন্ন ভক্তদের শাখা নির্ণয় অনুচর পরিকরগণের পরিচয় দিয়ে তিনি বৈষ্ণব ধর্ম ও সমাজের ক্রমবিকাশের স্তর পরম্পরা দেখিয়ে দিয়েছেন।

মধ্যলীলায় পঁচিশটি পরিচ্ছেদে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ থেকে শুরু করে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে কৃষ্ণদাস গৌড়ীয় ভক্তিবাদ, রাগানুগা ভক্তির ক্রম ও নীতি আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন। এই পর্বের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে মহাপ্রভুর বেদান্ত বিচার ও তাঁকে বৈষ্ণব ভক্তিবাদে আনয়ন, অষ্টম পরিচ্ছেদে গোদাবরী তীরে রায়রামানন্দের সঙ্গে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও রসপর্যায় ব্যাখ্যা, বিংশ ও চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদে সনাতনকে উপদেশের ছলে মহাপ্রভু কর্তৃক জীবতত্ত্ব, ঈশ্বর তত্ত্ব, রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত পরিচয় রয়েছে। বেদান্তের সহজ সরল ব্যাখ্যা তিনি শ্রীচৈতন্যের উক্তিতে বর্ণনা করেছেন। ব্রহ্মের তিন শক্তি – পরা, অপরা, মায়া। ঈশ্বরের স্বরূপ তিনটি – সৎ, চিৎ ও আনন্দ। সৎ অর্থাৎ ঈশ্বরের নিত্য অস্তিত্ব , চিৎ অর্থাৎ তাঁর জ্ঞানময়তা, আনন্দ অর্থাৎ ঈশ্বর সতত আনন্দময়। তাঁর স্বরূপ শক্তি তিন ভাগে প্রকটিত। আনন্দ স্বরূপ শক্তি ‘হ্লাদিনী, সৎ- স্বরূপ শক্তির নাম ‘সন্ধিনী’, এবং চিৎ স্বরূপ শক্তির নাম সম্বিত অর্থাৎ জ্ঞান। কবিরাজ গোস্বামী মধ্যলীলার অষ্টম

পরিচ্ছেদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্বের রসের পর্যায়, রাধাপ্রেম ও সখীসাধনা সম্পর্কে সংক্ষেপে যা বলেছেন, তাই পরবর্তীকালের বৈষ্ণবধর্ম তত্ত্ব ও সমাজকে সংহত আকার দেবার চেষ্টা করেছিল।

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র অন্ত্যলীলা বিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। শ্রীচৈতন্যের জীবনের শেষ বারো বৎসর প্রায় দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কেটেছিল। কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর সেই অপার্থিব ও ভাবগত জীবন কথার গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা ও আস্বাদন করতে চেয়েছিলেন। এই খণ্ডের বিশটি অধ্যায়ের মধ্যে মোট শেষের সাতটি অধ্যায়ে ওই দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্যন্ত কিছু কিছু ঘটনা কাহিনী , ভক্তদের কথা, গৌড়ীয় ভক্তদের নীলাচলে আগমন ও মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলন ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। চতুর্দশ পরিচ্ছেদ থেকে মহাপ্রভুর যথার্থ দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনা দিয়ে কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর কৃষ্ণার্তির গভীরতা বুঝিয়েছেন। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরাজ গোস্বামীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন " ভক্তগণের চৈতন্যের শেষ জীবনের অপার্থিব লীলাকাহিনী শোনার বাসনা ছিল; কৃষ্ণদাস কবিরাজ সে কামনা পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। এই জন্য তিনি বৈষ্ণব সমাজে অতিশয় মান্য, বাংলা সাহিত্যেও তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।"[৪০]

'চৈতন্যচরিতামৃত' শুধু আখ্যান গ্রন্থ নয়, তত্ত্ব গ্রন্থও। এতে চৈতন্যের জীবন কথার সঙ্গে চৈতন্যাবতার তত্ত্বকথা যুগপৎ এবং অঙ্গাঙ্গিভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত। ভূদেব চৌধুরীর মতে, "অলৌকিক ভাব উপলব্ধি সমৃদ্ধ অন্ত্যলীলার শেষ বারোটি বছরের অন্তরঙ্গ কাহিনীভুক্ত ভক্তিভাবান্বিত বিবরণ রচনাই ছিল তার সাধক মনের শ্রেষ্ঠ বাসনা।"[৪১] গ্রন্থমধ্যে তিনি নিজেই জানিয়েছেন, পূর্বসূরিগণের রচিত চরিত গ্রন্থাবলির সকল কয়টিতেই মহাপ্রভুর শেষ বারো বছরের অন্তরঙ্গ ভাব লীলার সুষ্ঠু বা পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা অনুপস্থিত। অথচ চৈতন্য জীবনে ভক্ত-ভাবুক জনের আস্বাদন তৃষ্ণা ঐ প্রসঙ্গেই ব্যাকুলতম। ফলে বৃন্দাবনবাসী মহাজন গণের নির্দেশে, তাঁদেরই আকুতি চরিতার্থ করার আকাঙ্খায় কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য জীবন রচনায় লেখনী ধারণ করেছিলেন।

তা সত্ত্বেও কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থের ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা উপেক্ষা করার কোনো সংগত কারণ নেই। চৈতন্যদেবের বহিরঙ্গ জীবনের প্রকট লীলা বর্ণনায় তিনি মুরারী, কবিকর্ণপূর ও বৃন্দাবন দাসের জীবনী গ্রন্থ এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী, রূপ গোস্বামী প্রভৃতির স্তব বন্দনাদির ঐতিহাসিক সূত্রানুসরণ করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বর্ণনায় পূর্ববর্ণিত ঘটনার সামান্য পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধন করেছেন, কখনো বা করেছেন নূতন তথ্যের অবতারণা। এদিক থেকে 'চৈতন্যচরিতামৃতে'র ঐতিহাসিক কাঠামোটুকুর তথ্যগত মূল্য অনস্বীকার্য।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিজের স্বীকারোক্তি অনুসারে তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য দুটি – (১) শ্রীচৈতন্যের শেষ দ্বাদশ বৎসরের অন্তরঙ্গ অলৌকিক লীলারস আস্বাদনে বৃন্দাবনবাসী ভক্তজনের ভাব-তৃষ্ণার চরিতার্থতা বিধান। (২) পূর্বসূরগণের প্রদত্ত তথ্যাদির পাদপূরণ এবং সম্ভব হলে নতুন তথ্যাদির দ্বারোদ্ঘাটন। ডঃ ভূদেব চৌধুরী চৈতন্যচরতামৃতের অতুল্যতা নির্ধারণ করে বলেছেন " অথচ ঐটুকুই চৈতন্যচরিত সাহিত্যের ইতিহাসে 'চৈতন্যচরিতামৃত'র বেদসম অতুল্য মহিমার উৎস, কেবল অধ্যাত্ম রসপিপাসু ভক্তের কাছেই নয়, তথ্য বিচার নিষ্ঠ পণ্ডিতের কাছেও।"[৪২] কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনার সেই মূল্য নিহিত রয়েছে চৈতন্য জীবন কথাকে কেন্দ্র করে বৃন্দাবনের গোস্বামীগণের অনুমোদিত বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের অবিসংবাদী প্রামাণিক প্রকটনে।

ডঃ ভূদেব চৌধুরীর মতে এই বৃহৎ গ্রন্থ রচনার পেছনে কৃষ্ণদাস কবিরাজের " বস্তুত দ্বাপরের দ্বৈতলীলাকে চৈতন্যজীবনে অদ্বৈতলীলা রূপে প্রতিফলিত করে 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদে'র যুক্তিসিদ্ধ প্রতিষ্ঠা বিধানই কবিরাজ গোস্বামীর গ্রন্থের দার্শনিক উদ্দেশ্য ছিল।"[৪৩] অপরদিকে ডঃ সুকুমার সেনের মতে, "অনেকে মনে করিতে পারেন, কৃষ্ণদাস চৈতন্যের মানব লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার ঐক্য দেখাইবার জন্যই 'চৈতন্যচরিতামৃত' রচনা করিয়াছিলেন। এই ধারণা ভ্রান্ত। কৃষ্ণদাস যাহা মানিয়াছিলেন সেই স্বরূপ দামোদরের সিদ্ধান্ত অনুসারে চৈতন্যের অবতার গ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'শ্রীরাধার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করিয়া স্বাত্মানন্দ অনুভব করা। তদনুসারে কৃষ্ণদাস চৈতন্যের শেষ দশায় তাঁহাকে রাধার মতোই দেখিয়াছেন।"[৪৪]

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' বাংলা সাহিত্যের অভ্রভেদী স্তম্ভ স্বরূপ। গূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনকে যেভাবে সহজ সরল সাবলীল ভাষায় পয়ার ত্রিপদী ছন্দে কাব্যে রূপায়িত করেছেন, তাতে তাঁর অসাধারণ মণীষা, সৃজন শক্তি ও কবিত্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রমাণিত হয়েছে। মননধর্মী তত্ত্ব কথাকে এরূপ কবিত্বের সঙ্গে পয়ার ত্রিপদীর বাঁধনে বেঁধে রাখার নিপুণতা অন্য কোনো বৈষ্ণব চরিতকার দেখাতে পারেন নি। বৈষ্ণব সাহিত্যে গীতি রসসিক্ত ও ভক্তিভাবে আর্দ্র পদ প্রচুর আছে, আবেগ ধর্ম বাঙালির অনেকটা স্বভাব ধর্ম বলে এরূপ রচনায় তার স্বাভাবিক প্রবণতা ও পটুত্ব দেখা যায়। কিন্তু সূক্ষাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বদর্শন বিশ্লেষণ এবং সেই তত্ত্বকে পয়ার ত্রিপদীর নমনীয় রচনার মধ্যে গেঁথে দেওয়া যে কতক দুরূহ তা কৃষ্ণদাসের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র সঙ্গে অন্যান্য চৈতন্য জীবনী কাব্য মিলিয়ে পড়লেই বোঝা যায়। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার তাই যথার্থই বলেছেন, "শ্রীচৈতন্যর ভাবকে আস্বাদন করিয়া যদি সাধন পথে অগ্রসর হইতে হয়, তাহা হইলে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ছাড়া আর গতি নাই।"[৪৫] তাই এই মহাগ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজের উপনিষদ রূপে পঠিত হয়ে থাকে। ড.ভূদেব চৌধুরীর মতে, "ফলকথা বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' 'ভাগবত' তুল্য যদি হয়, কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'

তাহলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবতার মহাবেদ। অথচ মৌলিক বৈষ্ণব স্বভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেও বাংলা ভাষা সাহিত্যের ইতিহাস এই মহাগ্রন্থ বাঙালির ঐতিহাসিক দার্শনিক চেতনার এক অতীব সার্থক প্রকাশ।"[৪৬] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এই গ্রন্থটি অদ্বিতীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "বাঙালির মনন, দর্শন, তত্ত্বজ্ঞান ও রসবোধের এরূপ বিপুল পরিচয় আধুনিক যুগের গ্রন্থেও খুব সুলভ নয়।"[৪৭]

চৈতন্য চরিত সাহিত্য রচনার যে ধারা ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে শুরু হয়েছিল সেই ধারা অব্যাহত ছিল ঊনবিংশ ও বিংশ শতকেও। এই সময়ে রচিত চৈতন্য চরিত কাব্যগুলির মধ্যে শিশির কুমার ঘোষের 'শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত', নবীনচন্দ্র সেনের 'অমৃতাভ', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলি আলোচনা করলেই বোঝা যায় যে ঊনবিংশ-বিংশ শতকেও জনমানসে চৈতন্যপ্রভাব কতখানি সুদূরপ্রসারী ছিল।

শিশির কুমার ঘোষের 'শ্রী অমিয় নিমাই চরিত' :

বৈষ্ণবতম মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ ছিলেন পণ্ডিত, সঙ্গীতজ্ঞ, সাংবাদিক। প্রথম জীবনে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে ব্রাহ্মসমাজে যিনি ছিলেন সমাদৃত , তিনিই ১৮৬৯ খ্রীঃ ব্রাহ্ম ধর্ম ত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করে ঊনবিংশ শতকের শেষে 'নব গৌরাঙ্গ আন্দোলন' নামে একটি সংগঠিত ধর্মান্দোলনের সূচনা করেন। চৈতন্যদেবের ভক্তি ধর্মকে বাংলা দেশের জনসমাজে একটি সুস্পষ্ট আন্দোলন রূপে প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বেশ কয়েকটি পথ অবলম্বন করেন : ১। বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীশ্রী গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার প্রবর্তন, ২। শ্রী গৌরাঙ্গ সমাজ প্রতিষ্ঠা, ৩। বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও বক্তৃতা, ৪। গৌরাঙ্গ সমাজের উদ্যোগে চৈতন্য জন্মোৎসব পালন ও নগরকীর্তন, ৫। দেশে বিদেশে বৈষ্ণব ভক্তি প্রচারের উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ।

ঊনবিংশ শতকের বৈষ্ণব বিতৃষ্ণাকে দূরীভূত করে জনসাধারণকে চৈতন্য সচেতন করে তুলতে শিশির কুমার ঘোষের অবদান অপরিসীম। আর এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর ছয় খণ্ডে রচিত 'শ্রী অমিয় নিমাই চরিত'। অন্যান্য চৈতন্যচরিতকারদের তুলনায় শিশিরকুমার ঘোষের কৃতিত্ব

এইখানে যে তিনি কেবল মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হন নি, পাঠকের সম্মুখে তিনি মহাপ্রভুর লীলার সত্যাসত্য যাচাই করার অবকাশ রেখেছেন। দিবানিশি মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের জন্য হাহুতাশ করছেন। রাতে ভক্তগণ তাঁকে রেখে চলে যাওয়ার পর হঠাৎ তাঁর নিদ্রা ভঙ্গ হলে তিনি কৃষ্ণ বিরহানলে উন্মত্তবৎ হইয়া বাইরে যেতে উদ্যত হন, কিন্তু দ্বার খুঁজে পান না, ফলে তাঁর নাসিকায় আঘাত লেগে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। গ্রন্থকার শিশির কুমার ঘোষ পাঠকের উদ্দেশ্যে বলেছেন "এখন অগ্রে বিচার করুন, প্রভুর এই যে কৃষ্ণবিরহ ইহা সত্য না কাল্পনিক, যদি তাঁহার কৃষ্ণবিরহ প্রকৃত না হইয়া অভিনয় হইত, তবে নাসিকায় আঘাত লাগিত না। যেরূপ কোন রঙ্গভূমিতে প্রভু সাজিয়া কৃষ্ণবিরহ দেখাইবার নিমিত্ত যদি কেহ ঘুরিয়া বেড়াইত, তবে তাহার নাসিকায় কখন আঘাত লাগিত না। কিন্তু যদি সত্য কৃষ্ণবিরহ হয় তবে তা নাসিকায় আঘাত লাগিবারই কথা, আঘাত না লাগাই আশ্চর্য্য। কথা এই, প্রভুর নাসিকায় আঘাত লাগিয়াছিল ইহাই অব্যর্থ প্রমাণ যে প্রভুর কৃষ্ণ বরহ সত্য, কাল্পনিক নয়, আর এই আঘাত একটি পরিমাপক যন্ত্রেরও কার্য্য করিতেছে, অর্থাৎ প্রভুর কৃষ্ণ বিরহ কতখানি, এই ক্ষত দ্বারা তাহার কতক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। "[৪৮] এইভাবে শিশির কুমার প্রমাণ করেছেন যে অন্যান্য অবতারের ন্যায় চৈতন্যদেবের লীলা কেবল অবাস্তব অলৌকিক নয়, কাল্পনিক নয়, তাঁর প্রত্যেক লীলার বাস্তব ভিত্তি রয়েছে, তা প্রকৃত সত্য এবং প্রমাণ সাপেক্ষ। ভূমিকায় তিনি বলেছেন " জগতে যত যত অবতার উদয় হইয়াছে, তাহার মধ্যে কেবল গৌরলীলাই প্রমাণের আয়ত্ত। ঐ লীলা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সাধুগণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।"[৪৯]

প্রশ্ন উঠতে পারে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যেক লীলার প্রামাণিকতা বিচারের প্রয়োজন কি? কেন গ্রন্থকার শিশির কুমার ঘোষ মহাপ্রভুর প্রতিটি লীলার সত্যতা যাচাই করেছেন, 'শ্রী অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থে। বৈষ্ণব ভক্তগণের নিকট তো স্বয়ং ভগবানের লীলা বিচারের প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য চৈতন্য চরিতকার বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, জয়ানন্দ, লোচনদাস প্রমুখ সকলেই চৈতন্যদেবের লীলা বর্ণনা করেছেন, সেই লীলার সত্যতা যাচাই করে দেখান নি। আসলে নব গৌরাঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ শিশিরকুমার ঘোষ ঊনবিংশ শতকের যুক্তিবাদী বুদ্ধিদীপ্ত মানুষের সম্মুখে শ্রীচৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। কেবল মহাপ্রভুর অলৌকিক লীলা বর্ণনা করে শিশির কুমার তাঁর পাঠককে ধোঁয়াশায় রাখতে চান নি। পাঠক যাতে যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা বিচার করতে পারে, পাঠক যাতে কোনভাবে বিভ্রান্ত না হয় সেই চেষ্টাই তিনি করেছেন। মধ্যযুগের পাঠক ভক্তির দৃষ্টিতে মহাপ্রভুর লীলা দেখে থাকেন, তাই মধ্যযুগের চৈতন্যচরিতকারদের প্রভুর লীলার সত্যতা যাচাই করার প্রয়োজন হয় না। আধুনিক যুগের পাঠক ভক্তির দৃষ্টিতে নয় যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে যেহেতু সব কিছু যাচাই করে নিতে চায় তাই আধুনিক যুগের চৈতন্যচরিতকার শিশিরকুমার ঘোষকে মহাপ্রভুর লীলা যে অলৌকিক নয়, কাল্পনিক নয়, তা যে প্রকৃত সত্য তার যথার্থ প্রমাণ উপস্থাপন করতে হয়। আর শিশির

কুমার কেবল বৈষ্ণব ভক্তগণের উদ্দেশ্যে তো এই গ্রন্থ রচনা করেন নি। তার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মবিমুখ, বিভ্রান্ত, কলহপরায়ণ, হিংসা দ্বেষ পূর্ণ, দ্বিধাদ্বন্দ্ব জর্জরিত মানুষের মনে চৈতন্যদেবের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করা আধুনিক যুগকে চৈতন্য সচেতন করে তোলা। হিন্দু অহিন্দু সমাজের শীর্ষ স্থানীয় থেকে নিম্ন স্তরের প্রতিটি মানুষ যাতে চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে সেকারণে শিশির কুমার গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব অপেক্ষা মহাপ্রভুর চারিত্রিক মহিমা, তাঁর কীর্তি প্রচারেই অধিকতর প্রাধান্য দিয়েছেন। স্বভাবতই এই গ্রন্থটি আধুনিক পাঠক, সমালোচক, কবি, সাহিত্যিক, কথাশিল্পী সকলের কাছেই বিশেষভাবে সমাদৃত।

নবীনচন্দ্র সেনের ‘অমৃতাভ’ :

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র সেন শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে রচনা করেছেন ‘অমৃতাভ’ কাব্যগ্রন্থ। নবীনচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগাদর্শেই লালিত হয়েছিলেন, তাঁর কাব্যাদিতেও সেই যুগেরই প্রত্যক্ষ ছাপ পড়েছে। মহাপ্রভুর জীবনী অবলম্বনে রচিত অমৃতাভ কাব্যেও একই ভাবধারার প্রতিফলন ঘটেছে। কবি নবীনচন্দ্র সেন একদিকে যেমন উনিশ শতকের নবজাগরণের চেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন অপরদিকে শিশিরকুমার ঘোষ প্রবর্তিত ‘নব গৌরাঙ্গ’ আন্দোলনের দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের বৈষ্ণব বিতৃষ্ণাকে উৎখাত করে আধুনিক যুগকে কিছুটা কৃষ্ণমুখী ও চৈতন্য সচেতন করে তুলতে যাঁরা প্রয়াসী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নবীনচন্দ্র। আর এই প্রেক্ষিতেই রচিত তাঁর ‘অমৃতাভ’ কাব্যগ্রন্থ।

‘অমৃতাভ’ কাব্যটি দ্বাদশ স্বর্গে বিভক্ত। এই কাব্যে কবি চৈতন্যদেবের প্রথম জীবনের একটি রূপচিত্র অঙ্কন করেছেন। গ্রন্থের সূচনায় বৈকুণ্ঠবাসী পতিতপাবন নর-নারায়ণকে জীব উদ্ধারের জন্য মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই প্রেম হীন হিংসায় পূর্ণ দুর্নীতিগ্রস্ত (মরুভূমিসম ধরিত্রীকে পুনরায় প্রেমবারি সিঞ্চনে সিক্ত করতে) ভারতবর্ষকে কলুষমুক্ত করতে কবি পতিতপাবন শ্রীহরিকে ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হতে আহ্বান করেন – “কি হিংসা বিদ্যাতগ্নি, দাবাগ্নি-সমান,/ আসিল ভারত বক্ষে কি মহা- শ্মশান।/ চেয়ে দেখ প্রাণনাথ, পৃথিবী পানে।/ দেখ ভারতের পানে।– তব লীলাভূমি।/ ধর্মের উদয়-ভূমি; সেইখানে তুমি/ যুগে যুগে নরজন্ম করিয়া গ্রহণ/ দেখাইলা নরচক্ষে নর-নারায়ণ।”[৫০] এই অংশে কবির জাতীয়তাবাদী মনোভাবের পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র তাঁর ‘অমৃতাভ’ কাব্যে শ্রীচৈতন্যদেবকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ রূপে চিত্রিত করেছেন। তিনি চৈতন্যদেবের সমগ্র জীবন কাহিনী বর্ণনা না করে কেবল শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলা গ্রহণ করেছেন এবং মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের মহৎ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। এই নবদ্বীপ লীলাতেই চৈতন্যের প্রতিবাদী রূপের সম্যক পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে কাজী দলন এবং জগাই-মাধাই উদ্ধারের ঘটনায়। নামসংকীর্তনে কাজীর নিষেধাজ্ঞা জারির বিরুদ্ধে তিনি নগর সংকীর্তনে বেরিয়ে সকল বৈষ্ণবকে একত্রিত করেন এবং কাজীকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে বাধ্য করেন। এই ঘটনা গণ আন্দোলনের একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইতিহাসে স্মরণীয়। চৈতন্যের চরিত্রের এই আদর্শকেই গ্রহণ করেছিলেন জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র। আর তাই তো তিনি ‘অমৃতাভ’ কাব্যে চৈতন্যকে ঊনবিংশ শতকের যুগপুরুষ রূপে চিত্রিত করেছেন।

চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ কেন্দ্রিক প্রতিবাদী সত্তার, জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ গণ আন্দোলনের নায়ক রূপে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের এই প্রভাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘গোরা’ উপন্যাসে গোরার চরিত্র গঠনে, কালকূটের ‘জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য’ উপন্যাসে, দীপক চন্দ্রের ‘সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ উপন্যাসে, শৈবাল মিত্রের ‘গোরা’ উপন্যাসের নায়ক গোরার চরিত্র নির্মাণে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদ গুলিতে বিস্তারিত অলোচনা করেছি।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ’ :

বিংশ শতাব্দীতে নগরজীবনের জটিল ঘূর্ণাবর্তে ক্লান্ত, উদভ্রান্ত, অস্তিত্বের যন্ত্রণায় কাতর, অসহায় মানুষকে পথ দেখাতে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত শ্রীচৈতন্যদেবের পুণ্য জীবনী অবলম্বনে রচনা করলেন ‘অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ’। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন এবং সাধারণ মানুষকে চৈতন্য সচেতন করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন। তিনি একদিকে যেমন শিশির কুমার ঘোষের ‘অমিয় নিমাই চরিত’ এবং বৃন্দাবন দাসের ‘চৈতন্যভাগবত’ অনুসরণে শ্রীচৈতন্যদেবের মহৎ জীবনী রচনা করেছেন অপরদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজের ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ অনুসরণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিবিধ তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তিনি শ্রীচৈতন্যলীলার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে শ্রীকৃষ্ণলীলারও বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের বিবিধ তত্ত্বকে যথাসম্ভব সহজ সরল করে পাঠোপযোগী করে তুলেছেন। ফলত ‘অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ’ হয়ে উঠেছে বিংশ শতকের পাঠকের কাছে একটি আদর্শ চৈতন্যচরিত গ্রন্থ। কেবল তাই নয় আধুনিক কবি, সাহিত্যিক, কথাশিল্পী সকলের কাছেই এই গ্রন্থটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

তথ্যসূত্র

(১) দত্ত সত্যেন্দ্রনাথ, কুহু ও কেকা, আমরা, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯২৯, পৃ- ১৫৮।

(২) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৯৬৫, পৃ-৩।

(৩) তদেব।

(৪) মজুমদার বিমানবিহারী, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬, পৃ-৯২।

(৫) সেন সুকুমার ও মুখ্যোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা), ১৩৯২, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, আনন্দ, পৃ-৩৮৯।

(৬) তদেব, অষ্টম পরিচ্ছেদ,পৃ-৫৭।

(৭) সেন সুকুমার (সম্পা), ২০১১, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড দশম অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ- ১৩৩।

(৮) সেন সুকুমার ও মুখ্যোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা), ১৩৯২, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ, আনন্দ, পৃ-৫৭।

(৯) তদেব, একাদশ পরিচ্ছেদ, পৃ- ৭১।

(১০) সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, ১৯৭৮, পৃ-২৬৪।

(১১) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা-৭৩, পৃ-৩৫৫।

(১২) সেন সুকুমার (সম্পা), ২০১১, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ- ২৩।

(১৩) তদেব, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ-১৫।

(১৪) তদেব, পৃ-১৪।

(১৫) তদেব।

(১৬) মজুমদার বিমানবিহারী, শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬, পৃ- ১৮৮।

(১৭) চৌধুরী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ-২৫৪।

(১৮) সেন সুকুমার (সম্পা), ২০১১, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, অন্ত্য খণ্ড, ষষ্ঠ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ- ২৩।

(১৯) সেন সুকুমার (সম্পা), ২০১১, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ- ০৬।

(২০) সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, ১৯৭৮, পৃ-২৬৮।

(২১) সেন সুকুমার, ১৯৭৮, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা -০৯, পৃ- ২৮৯।

(২২) ঘোষ বিশ্বরঞ্জন (সম্পা।), ২০০০, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, সূত্রখণ্ড, সাহিত্যলোক, কলকাতা-০৬, পৃ- ৪৭।

(২৩) তদেব।

(২৪) তদেব, আদি খণ্ড, পৃ- ১১৮।

(২৫) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, ১৯৮৩, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৯, পৃ- ৩৮৬।

(২৬) চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর সম্পাদিত, লোচনদাসের ‘শ্রীশ্রী চৈতন্যমঙ্গল, মধ্যখণ্ড, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-০৬, ২০১৯, পৃ- ১৪৯ ।

(২৭) তদেব।

(২৮) তদেব, পৃ-১৫০।

(২৯) মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা), জয়ানন্দ বিরচিত ‘চৈতন্যমঙ্গল’, বৈরাগ্য খন্ড, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১, পৃ-১০৫ ।

(৩০) তদেব, পৃ-১২৫।

(৩১) তদেব।

(৩২) তদেব, নদীয়া, পৃ-১৪।

(৩৩) তদেব।

(৩৪) মিত্র শৈবাল, গোরা, সেপটেম্বর ২০১২, দেজ, পৃ- ৪৮২।

(৩৫) মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা), জয়ানন্দ বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গল', নদীয়া খন্ড, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১, পৃ- ১৪।

(৩৬) মজুমদার রমেশচন্দ্র, ১৯৯৮, বাংলা দেশের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, কলকাতা-১৩, পৃ-৬৫।

(৩৭) মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা), জয়ানন্দ বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গল', নদীয়া খন্ড, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৭১, পৃ- ১৪।

(৩৮) মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখ্যোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা।), জয়ানন্দ বিরচিত চৈতন্যমঙ্গল, উত্তর খণ্ড, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা-১৬, ১৯৭১, পৃ- ২৩৪।

(৩৯) সেন দীনেশ চন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৩, ১৯৮৫, পৃ-৩৬১।

(৪০) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রা.লি., কলকাতা-৭৩, ১৯৮৩, পৃ-৪৩৫।

(৪১) চৌধুরী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৫, পৃ- ২৬২।

(৪২) তদেব, পৃ-২৬৪।

(৪৩) তদেব, পৃ- ২৬৭।

(৪৪) সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ কলকাতা-০৯, ১৯৭৮, পৃ- ২৮৩।

(৪৫) মজুমদার বিমানবিহারী, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬, পৃ- ৪১২।

(৪৬) চৌধুরী ভূদেব, ১৯৯৫, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, পৃ- ২৭০।

(৪৭) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মর্ডান বুক এজেন্সি প্রা.লি., কলকাতা-৭৩, ১৯৮৩, পৃ-৪৪০।

(৪৮) ঘোষ শিশির কুমার, শ্রী অমিয় নিমাই চরিত, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্ববানী প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, ২০০৯, পৃ-১২৩।

(৪৯) তদেব।

(৫০) দাস সজনীকান্ত (সম্পা), নবীনচন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-০৬, ১৩৬৬, পৃ-৩৯।

তৃতীয় অধ্যায়

ঊনবিংশ শতকের কথাসাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষাব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্ত্য জীবন-দর্শন বাঙালির নিকট নতুন আলো বহন করে আনে এবং বাঙালিকে অভিনব জীবন দৃষ্টি দান করে। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মসচেতনতা সাহিত্য সৃষ্টির অবলম্বন হয়ে ওঠে। ফলে মধ্যযুগীয় দেববাদের প্রাধান্য হ্রাস পায় এবং আধুনিক মানবতাবাদের প্রকাশ ঘটে। ব্যক্তি মানুষের স্বীকৃতিতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সাহিত্য সৃজনে প্রাধান্য পায়। আর এ পথেই কথাসাহিত্যের আগমন সূচিত হয়।

সাহিত্যের আঙিনায় উপন্যাস এক নবীন আগন্তুক। আধুনিক যুগের সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে উপন্যাস শিল্পের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। ইংরেজী শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রভাব, শিক্ষিত নাগরিক মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব, বাঙালির যুক্তিবাদী জীবনদর্শন, গণতান্ত্রিক চেতনা ও ব্যবস্থার উদ্ভব, ছাপাখানার ক্রমবিকাশ, সাময়িক পত্র-পত্রিকাদির প্রচলনের পথ বেয়ে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আত্মপ্রকাশ। উপন্যাসের খসড়া সংবাদপত্রের স্তম্ভেই রচিত হয়। সংবাদপত্রের সম্পাদক পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য দেশের বিচিত্র, কৌতূহল উদ্দীপক, আকর্ষণীয় ঘটনাগুলি সংগ্রহ করে সরবরাহ করতে থাকেন। বাস্তবজীবনের খণ্ড খণ্ড এই ছবিগুলি একত্রে গ্রথিত হয়ে, ঘটনার ধারাবাহিকতা ও শিল্পী মনের বুদ্ধিদীপ্ত কল্পনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক সুসম্পূর্ণ সুসংহত রূপ লাভ করে। এভাবেই উপন্যাস সৃষ্টির প্রথম অঙ্কুর সঞ্জাত হয়। এই অঙ্কুরই বৃহৎ মহীরুহে পরিণত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে একের পর এক সার্থক উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে।

উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক আধুনিকতার অন্যতম প্রাণপুরষ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতেই প্রথম উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস। মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত সন্তান সম্প্রদায় বিপ্লববাদী। ক্ষীণশক্তি মুসলমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের উপর তাঁরা ধ্বংসাত্মক কার্যে লিপ্ত হয়েছে। অথচ সত্যানন্দ নিজেকে এবং তার অনুচরবর্গকে বৈষ্ণব বলে পরিচয় দিয়েছেন। সন্তানদের প্রত্যেকের মুখে একটি ধ্বনিই গীত হয় 'হরে মুরারে মধুকৈটভারে'। কিন্তু সন্তানরা যে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত তা চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে দীক্ষিত করার সময় তাদের অনুসৃত বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন –

" স (সত্যানন্দ)। সন্তানেরা বৈষ্ণব।

ম (মহেন্দ্র)। ইহা বুঝিতে পারি না সন্তানেরা বৈষ্ণব কেন? বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম।

স (সত্যানন্দ)। সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। ..... প্রকৃত বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্তা।... পৃথিবীর উদ্ধার কর্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা।"[১]

সম্ভবত 'আনন্দমঠে'র সন্তানেরা চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মের সম্পূর্ণ মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে নি। তাই সত্যানন্দের মনে হয়েছে "চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে – উহা অর্ধেক মাত্র। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময় – কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন – তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময় – সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব – কিন্তু উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ণব।"[২] এ প্রসঙ্গে শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য "সত্যানন্দ ঠাকুরের এই উক্তি তাঁহার আদর্শের অসম্পূর্ণতার পরিচয় দেয়। তিনি শক্তির সাধনা করিয়াছেন, কিন্তু শক্তি ও প্রেমের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন নাই।"[৩]

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার লিখেছেন "প্রথমেই তো গোড়ায় গলদ; তাহার ('আনন্দমঠে'র) সন্তানেরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতা যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত; কিন্তু যেসব 'সন্ন্যাসী ফকিরেরা' সত্য ইতিহাসের লোক এবং উত্তরবঙ্গে (বীরভূম নহে) ঐ সব অত্যাচার করে, তাহারা এলাহাবাদ কাশী ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমের লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদ্গীতার নাম পর্যন্ত জানিত না। বঙ্কিমের সন্তানসেনা বৈষ্ণব আর আসল সন্ন্যাসীরা ছিল শৈব..... ।"[৪] তিনি আরও জানিয়েছেন " সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরিপুরীর দল একেবারে লুঠেরা ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারীও করিত; মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল, এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে 'আনন্দমঠে' বর্ণিত নরনারী এবং তাহাদের কার্য্য ও কথা (ইংরেজ সৈনের সহিত দুইটা খণ্ড যুদ্ধ বাদে) অনেকাংশে অসত্য এবং এ বইখানি কোন মতেই ঐতিহাসিক এই বিশেষণ পাইতে পারে না।"[৫] যদুনাথ সরকারের মত সমর্থন করে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন " কিন্তু 'আনন্দমঠ' –এ তিনি সন্তানদের যে জীবন, আদর্শ চরিত্র ও অদ্ভুত স্বদেশপ্রেম বর্ণনা করিয়াছেন তাহার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।"[৬]

শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দার 'বঙ্কিম মানস' গ্রন্থে উক্ত মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছেন, "কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই অসত্য ইতিহাসের ভিতর দিয়া সত্য মানুষ প্রাণ পাইয়াছে। যে ঐতিহাসিক মানুষকে বঙ্কিমচন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যে মানুষ জীবনের আরোপিত প্যাটার্নের বিরুদ্ধে

ক্রমাগত প্রতিবাদ এবং সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছেন, যে মানুষ সমাজের বাস্তব ভিত্তির উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অগ্রসর হইয়াছে, সেই মানুষই এই অবাস্তব ইতিহাসের মধ্যে আশ্চর্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই মানুষ বঙ্কিমের সমকালীন ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ।"[৭]

সন্তানদের সাধনা, সংগ্রাম ও সিদ্ধি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে এমন একটি আনন্দধারা, সহৃদয়তা ও অনুভূতি অঙ্কিত হয়েছে যে সমকালীন মানুষ প্রত্যেকে যেন এর মধ্যে ব্যক্তিগত মনস্কামনার অভিব্যক্তি আবিষ্কার করতে পেরেছে। সন্তানদের সংগ্রামের ভিতর দিয়েই সমকালীন রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও আন্দোলনের শক্তি ও দুর্বলতা দুইই ফুটে উঠেছে। আসলে 'আনন্দমঠ' রচনার মধ্য দিয়েই যেন বঙ্কিমমানসে সুপ্ত বাঙ্গালীর ইতিহাস, বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার অভিপ্রায়ই ব্যক্ত হয়েছে। বিবিধ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না।"[৮] তিনি আরও বলেছেন, "সাহেবরা যদি পাখি মারতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।···যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, ··· যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।"[৯]

বাঙ্গালীর দুর্বলতা, গৌরবহীনতার মনোভাবকে নস্যাৎ করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন "কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালীরা কি চিরকাল দুর্ব্বল, অসার, গৌরবশূন্য? তাহা হইলে গণেশের রাজ্যাধিকার; চৈতন্যের ধর্ম্ম, ··· জয়দেব, বিদ্যাপতি, মুকুন্দদেবের কাব্য কোথা হইতে আসিল?"[১০] তিনি আরও বলেছেন " পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠানদিগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে দুর্দশা ঘটে নাই। ···পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আবির্ভূত; ··· এই সময়েই চৈতন্যদেব; ··· চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য।"[১১] বঙ্কিমচন্দ্রের এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় তিনি চৈতন্যদেব সম্পর্কে কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিশেষ করে চৈতন্যদেবের পরগামী বৈষ্ণব সাহিত্যকথা থেকে বোঝা যায় বঙ্কিমের দৃষ্টিতে চৈতন্যদেবের অবস্থান কোথায় ছিল।

কেবল তাই নয়, ইউরোপের রেণেঁসাসের সঙ্গে বাংলার রেণেঁসাসের তুলনা করতে গিয়ে তিনি চৈতন্যদেবের সময়ে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে বাংলার নবজাগরণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন "ইউরোপ সভ্য কত দিন? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারিশত বৎসর পূর্বে ইউরোপ আমাদিগের অপেক্ষাও অসভ্য ছিল। একটি ঘটনায় ইউরোপ সভ্য হইয়া গেল। অকস্মাৎ বিনষ্ট বিস্মৃত অপরিজ্ঞাত গ্রীক সাহিত্য ইউরোপ ফিরিয়া পাইল। ··· অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়; তারপর রূপ সনাতন প্রভৃতি অসংখ্য কবি ধর্মতত্ত্ববিদ পণ্ডিত। এ দিকে দর্শণে রঘুনাথ শিরোমণি, গদাধর, জগদীশ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন ও তৎ

পরগামীগণ। আবার বাঙ্গালা কাব্যের জলোচ্ছ্বাস। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস চৈতন্যের পূর্বগামী। কিন্তু তাহার পরে চৈতন্যের পরবর্তিনী যে বাঙ্গালা কৃষ্ণবিষয়িণী কবিতা, তাহা অপরিমেয় তেজস্বিনী, জগতে অতুলনীয়া; সে কোথা হইতে?"[১২] চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালে বাংলা সাহিত্যধারা যে পুষ্ট হয়েছিল একথা বঙ্কিমের বক্তব্য থেকে বোঝা যায় এবং আরও বোঝা যায় যে তিনি চৈতন্যদেবের প্রভাবকেও মোটেই অস্বীকার করেননি।

বঙ্কিমচন্দ্র চৈতন্যদেবের প্রেমময় সত্তার পরিচয় উপলব্ধি করেছিলেন। তবে এই অহিংস প্রেমধর্ম বিতরণের মধ্যেই যে চৈতন্যদেব অসাধ্য সাধন করেছিলেন, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনি যে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছিলেন, জগাই মাধাই উদ্ধার এবং কাজী দলনের মতো ঘটনায় যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্র চৈতন্যদেবের সেই প্রতিবাদী সত্তাটিকে উপেক্ষা করে গেছেন; তাই তাঁর মনে হয়েছে "চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নয় - উহা অর্ধেক ধর্মমাত্র।"[১৩] তবে পরোক্ষে সন্তানদলের মধ্যে কিন্তু চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ কেন্দ্রিক বৈষ্ণব ধর্মাদর্শের প্রভাবই লক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য – "নতুন একটি মাত্রা যোগ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে। আনন্দমঠের সন্তানেরাও বৈষ্ণব ,তাদেরও অবলম্বন ভক্তি, কিন্তু সেই ভক্তিতে শুধু দীনতা বা করুণা নয়, দেখতে পাই বীর্য ও সংগ্রাম, যার স্ফুরণ চৈতন্যের জীবনে দেখা দিয়েছিল কাজীদলনের ঘটনাতে।"[১৪]

বৃন্দাবন দাস রচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবতের' জগাই মাধাই উদ্ধার পর্বে আমরা দেখতে পাই মাধাই যখন নিত্যানন্দকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে তখন নিমাই এসে নিত্যানন্দের অবস্থা দেখে ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেন :

"রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে।
চক্র চক্র চক্র প্রভু ডাকে ঘনে ঘনে।।

****

চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধর।
জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বম্ভর।।
দেখিয়া মূর্ছিত হই গড়িল জগাই।
বক্ষে শ্রীচরণ দিল গৌরাঙ্গ গোসাই।।"[১৫]

গৌরাঙ্গের এই রূপের মধ্যে যে বিদ্যুৎ ছলকে ওঠে তাই যেন জগাই-মাধাইয়ের অন্তরাত্মাকে আলোকিত করে তোলে। তবে চৈতন্যদেব পাষণ্ডী উদ্ধার করতে কোনো অস্ত্র হাতে তুলে নিয়ে সংহারে ব্রতী হন নি,

কেবলমাত্র হরিধ্বনি দ্বারা সকলের অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে প্রেমধন দান করে পাষণ্ডীদের উদ্ধার করেছেন। তিনি জগাইকে বরদান করেন –

"প্রভু বোলে জগাই উঠিয়া দেখ মোরে।

সত্য আমি প্রেমভক্তি দান দিল তোরে।।"[১৬]

বঙ্কিমচন্দ্র চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে সন্তানদের পালিত বৈষ্ণবধর্মের পার্থক্য নিরুপণে ত্রিগুণাত্মক ঈশ্বরের সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ – তিনটি গুণের উল্লেখ করে বিস্তৃত ব্যাখ্যা দ্বারা সন্তান ধর্মের আদর্শ পরিস্ফুট করেছেন এইভাবে: সত্যানন্দ, "··· সত্ত্বগুণ হইতে তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যাদির উৎপত্তি, তাঁহার উপাসনা ভক্তির দ্বারা করিবে। চৈতন্যের সম্প্রদায় তাহা করে। আর রজোগুণ হইতে তাঁহার শক্তির উৎপত্তি; ইহার উপাসনা যুদ্ধের দ্বারা – দেবদ্বেষীদিগের নিধন দ্বারা – আমরা তাহা করি।"[১৭] সন্তানদের বৈশিষ্ট্য আরও পরিস্ফুট করতে তিনি বলেছেন "ইহারা বিষ্ণুভক্ত, বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত নহে, অতএব দাহ করে।" [১৮]

বঙ্কিমচন্দ্র চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম থেকে সন্তানদের পালিত বৈষ্ণবধর্মকে পৃথক করে থাকলেও চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ বা প্রভাব সন্তানদের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। সত্যানন্দের কথায় : "উত্তম। তোমরা জাতিত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ, শূদ্র বিচার নাই"[১৯] –এই মহাব্রতের লক্ষণ দেখে তো অবশ্যই মনে পড়ে যায় চৈতন্যদেবের জাতি-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে আদিজচণ্ডালে প্রেমদানের কথা। সেখানে চৈতন্যদেবও জাত-পাতের উর্দ্ধে সকলকে একই হরিনামে মাতোয়ারা করে তুলেছেন। ঠিক যেভাবে বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দে মাতরম' শব্দ উচ্চারণের দ্বারা সন্তানদের মধ্যে জাগিয়ে তোলেন জাতীয়তাবাদী চেতনা, স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সন্তানেরা দেশ মাতৃকার উদ্ধারে স্বজন, স্বজাতি পরিত্যাগ করে আত্মোৎসর্গে ব্রতী হয় ঠিক সেভাবেই ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেব 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' মন্ত্র দ্বারা সকলের অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তুলে একসূত্রে গ্রথিত করে কাজীর বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'দশদিশি' পত্রিকায় 'চৈতন্য ও বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে কল্যাণ নন্দী লিখেছেন "শুধুমাত্র হরিণাম সংকীর্তন- এই ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎতরঙ্গের মতো তা মানুষের অন্তরাত্মায় পৌঁছে বিস্ফোরণ ঘটায়। ··· ব্যক্তির প্রাধান্য লুপ্ত হয়ে সামগ্রিক শক্তি জাগ্রত হয়।"[২০] রমাকান্ত চক্রবর্তীর মতে, " 'কৃষ্ণভক্তিতে নাহি জাত-কুলাদি বিচার'- এই ধরণের কথার অর্থ ছিল আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র বা spiritual democracy."[২১]

যবন হরিদাস ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হয়েও যেমন চৈতন্যের কৃপা পেয়েছিলেন তেমনি নিম্ন বর্ণের মানুষেরাও তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। কাজি দলনের পর তিনি যেমন শঙ্খ বণিকের ঘরে, তন্তুবায়ের

নগরে প্রবেশ করেছেন, তেমনি জাতিতে শূদ্র খোলাবেচা শ্রীধরের অঙ্গনে বসে ব্রাহ্মণ হয়েও লৌহপাত্রে জলপান করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নি :

"ভক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচীনন্দন।

লৌহপাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ।।

জল পিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার।

কার শক্তি আছে তাহা নয় করিবার।।"[২২]

এইরকম স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিশ্বম্ভর সকলের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন। চৈতন্যদেবের এই সমপ্রাণতা, সকলকে আপন করে নেওয়াই যে বৈষ্ণবধর্মের লক্ষণ এ কথা কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রও স্বীকার করে নিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি' প্রবন্ধে প্রকৃত বৈষ্ণবের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন। বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের উক্তি উদ্ধৃত করে বাবাজী বলেছেন : "সমত্ব অর্থাৎ সকলকে আত্মবৎ জ্ঞান করাই বিষ্ণুর যথার্থ উপাসনা। ··· এই যে সমদর্শিতা, ইহাই সেই অহিংস ধর্মের যথার্থ তাৎপর্য। সমদর্শী হইলে আর হিংসা থাকে না। এই সমদর্শিতা থাকিলেই মনুষ্য, বিষ্ণু নাম জানুক না জানুক, যথার্থ বৈষ্ণব হইল।"[২৩]

বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে যে চৈতন্যের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় সত্যানন্দের উক্তিতে। সত্যানন্দ যখন সন্তানদের আদর্শ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন "··· সামান্য মনুষ্যদিগের মন স্ত্রীলোকে আসক্ত এবং কার্যে বিরত করে। এই জন্য সন্তানের ব্রতই এই যে, রমণী জাতির সঙ্গে একাসনে উপবেশন করিবে না। ··· "[২৪] এখানে অবশ্যই আমাদের মনে পড়ে যায় শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ সম্পর্কে রমণী দর্শন ও সংসর্গ পরিত্যাগ করার কথা। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বৈরাগী সন্ন্যাসীদের নারী সম্ভাষণ ও সংসর্গ থেকে কঠোরভাবে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে আমরা ছোট হরিদাসের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে পারি। শিখি মাহিতীর ভগিনী মাধুরী দেবীর কাছে হরিদাস একবার তণ্ডুল ভিক্ষা করে এনেছিল প্রভুর ব্যঞ্জন রন্ধনের নিমিত্ত, প্রভু সেকথা জানতে পেরে হরিদাসকে পরিত্যাগ করেছিলেন, এমনকি হরিদাসের মুখদর্শন পর্যন্ত করতে চান নি –

" প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।

দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।।

দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।

দারু প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন।।"[২৫]

প্রভু হরিদাসের প্রতি এতটাই বিরূপ ছিলেন যে স্বরূপ দামোদর, পরমানন্দ পুরী সহ অন্যান্য ভক্তরা একাধিক বার তাঁর কাছে হরিদাসের অপরাধ মার্জনার জন্য প্রার্থনা জানালেও প্রভু নিজ সিদ্ধান্তে অবিচল ছিলেন এবং হরিদাসকে তিনি সহজে মার্জনা করেন নি।

"আর দিন সবে মিলি প্রভুর চরণে।

হরিদাস লাগি কিছু কৈল নিবেদনে।।

অল্প অপরাধ প্রভু করহ প্রসাদ।

এবে শিক্ষা হইল না করিব অপরাধ।

প্রভু কহে নহে বশ মোর মন।

প্রকৃতি-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শণ।।

নিজকার্য্যে যাহ সবে ছাড় বৃথা কথা।

কহ যদি পুনঃ আমা না দেখিবে হেথা।।"[২৬]

হরিদাসের প্রতি চৈতন্যদেবের এই কঠোর সিদ্ধান্তে অন্যান্য ভক্তরা, অনুচরেরা সকলে স্ত্রী সম্ভাষণ বর্জন করেছিল – "দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে। / স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী সম্ভাষনে।।"[২৭] এইভাবে প্রয়োজনে কঠিন-কঠোর ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়ে ভক্তদের শিক্ষা দান করেছিলেন চৈতন্য। তাঁর অনুগ্রহ বঞ্চিত হরিদাস শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেছিল 'বিষাদ খাইয়া হরিদাস আত্মঘাত কৈল।'[২৮] হরিদাসের অন্তর্ধান প্রসঙ্গে এই অনুমান শুনে প্রভু – "শুনি প্রভু হাসি কহে সুপ্রসন্ন চিত্ত/ প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত।"[২৯]

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই সন্তানধর্মের মূল হোতা সত্যানন্দ ব্রহ্মচারীর একান্ত অনুগত ভবানন্দ একদা মহেন্দ্রের স্ত্রী কল্যাণীর পাণিপ্রার্থী হয়েছিল। সন্তানধর্মের নিয়ম হল যার চিত্ত ইন্দ্রিয় পরবশ হবে তার প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু। ভবানন্দকেও যুদ্ধে আত্মত্যাগের দ্বারা কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল – "তথাপি মৃত্যু আমার প্রায়শ্চিত্ত; কেন না আমার চিত্ত ইন্দ্রিয়ের বশ হইয়াছে।"[৩০] এইভাবে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ ভাবে চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করলেও পরোক্ষভাবে তিনি যে চৈতন্যদেবের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন, এ কথা বলাই যায়।

শ্রীচৈতন্যদেব যেমন নবদ্বীপবাসীর উপর ইসলাম ধর্মাবলম্বী কাজীর অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে কেবলমাত্র হরিধ্বনি অবলম্বন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রও তেমনি ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে

হরিধ্বনিকেই সম্বল করেছেন – "আজিকার দিনে সন্তানদিগের ভীষণ হরিধ্বনিতে ওয়ারেন হেস্টিংস বিকম্পিত হইলেন।"[৩১] সন্তানেরা 'বন্দেমাতরম' –এর সঙ্গে সঙ্গে হরিগুণ গান করে থাকে। 'আনন্দমঠ' এর প্রথম খণ্ডের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে রয়েছে 'ভবানন্দ মঠের ভিতর বসিয়া হরিগুণ গান করিতেছিলেন।'[৩২] আবার অষ্টম পরিচ্ছেদে রয়েছে " ব্রহ্মচারীর আজ্ঞা পাইয়া ভবানন্দ মৃদু মৃদু হরিনাম করিতে করিতে ……"[৩৩]; ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে রয়েছে "কিছু দূর গিয়া সত্যানন্দ সিপাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাপু আমি হরিনাম করিয়া থাকি- হরিনাম করার কিছু বাধা আছে?"[৩৪] এইভাবে দেখা যায় হরিনামের দ্বারাই বঙ্কিমচন্দ্র সন্তানদের উদ্বোধিত করেছিলেন দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য।

সত্যানন্দকে এখানে 'মহাপ্রভু রূপে বর্ণনা করা হয়েছে 'জীবানন্দ মহাপ্রভু সত্যানন্দের সকল সঙ্কেত বুঝিতেন'[৩৫] এবং তিনি কখনও গৈরিক বসন পরিত্যাগ করতেন না – "কেবল সত্যানন্দ কোন কালে গৈরিক বসন পরিত্যাগ করিতেন না।"[৩৬] তবে চৈতন্যদেবের সঙ্গে সত্যানন্দের মূল পার্থক্য এইখানে যে চৈতন্য মুরলীধারী কৃষ্ণের উপাসক আর সত্যানন্দ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণুর উপাসক। সত্যানন্দ যখন সমবেত উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে এসে উপস্থিত হন "তখন সেই দশ সহস্র সন্তান মস্তক ……প্রণত হইল।…… সত্যানন্দ বলিলেন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী,বনমালী, বৈকুণ্ঠনাথ যিনি …… তিনি তোমাদের মঙ্গল করুণ, তিনি তোমাদের বাহুতে বল দিন, মনে ভক্তি দিন,ধর্মে মতি দিন, তোমরা একবার তাহার মহিমা গীত কর।"[৩৭]

সন্তানেরা গোস্বামী পদবীধারী এবং একে অপরকে সম্বোধন করেন 'গোঁসাই' বলে। যেমন প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে "সম্মুখে একজন বৈষ্ণব বেশধারী অপরিচিত ব্রহ্মচারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল। দেখিয়া মহেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গোঁসাই' হাস কেন? …বৈষ্ণব বলিল, আমার নাম ধীরানন্দ গোস্বামী।"[৩৮] বৃন্দাবন দাসের ষড়গোস্বামীর কথা আমরা জানি যাঁরা বৈষ্ণব সমাজে ও তার বাইরে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ভক্তি ধর্মের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রচারে ব্যাপৃত হয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লেখ করেছেন "শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।/ শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ।।/ এই ছয় গুরু শিক্ষা গুরু যে আমার।/ ইহাঁ সবার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার।।"[৩৯] পবিত্রতীর্থ ও শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম প্রচারের কেন্দ্রভূমি ছিল বৃন্দাবন। এই বৃন্দাবনে অবস্থিত ষড়গোস্বামীদের প্রচেষ্টায় ভক্তিধর্ম ব্যাপক প্রচার লাভ করে। কেননা ছয়জন সর্বত্যাগী পরম পণ্ডিত সন্ন্যাসী অতি দীনভাবে জীবন যাপন করে বৃন্দাবনে বাস করতেন। তাঁদের জীবনাদর্শ এবং তাদের রচিত বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করে।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসেও আমরা বেশ কয়েকজন গোস্বামীর পরিচয় পাই। তাঁরা হলেন সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ, ধীরানন্দ, নবীনানন্দ ও মহেন্দ্র। তাঁরা যদিও শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মের

দ্বারা উদ্বুদ্ধ নন, তারা বঙ্কিমচন্দ্রের সন্তান ধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তারাও কঠোর ভাবে জীবনযাপন করে নিজ ব্রতসাধনায় অবিচল থেকে সন্তানধর্মের আদর্শ স্থাপন করেছেন। এই সকল দৃষ্টান্ত থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম এবং তাঁর পবিত্র জীবনাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যজীবনের উপর আলোকপাত করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং সনাতন ধর্মের আবহাওয়ায় লালিত হন। তাঁর বাড়িতে নিয়মিত ভাগবত পাঠ, চণ্ডীপাঠ, শাস্ত্র আলোচনা চলত। দুর্গোৎসব, রথ, রাস প্রভৃতি বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকত। উঠানে গোবিন্দ অধিকারীর কৃষ্ণযাত্রাও হত। বাল্যজীবনে বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিবেশে লালিত হয়েছেন এবং এই ঐতিহ্যের প্রভাব তাঁর উপর অনস্বীকার্য। মধ্যজীবনে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ফলে তিনি ঘোরতর সংশয়বাদী হয়ে উঠলেও এই ঐতিহ্যের আকর্ষণ তিনি পরিপূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বহু সাধু সন্ন্যাসীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন এবং তাদের দ্বারা সংশয়াতীত রূপে প্রভাবিত হয়েছেন।

বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক আলোচনায় তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন অর্থাৎ যে সমদর্শনকে তিনি সার্থক জীবনাচরণের একমাত্র অবলম্বন বলে উপলব্ধি করেছিলেন, তাতে জাতি বৈরিতা, ধর্ম-বৈরিতা অথবা বিদ্বেষের কোনো স্থান ছিল না। অপরকে বর্জন করে নয়, অপরকে আলিঙ্গন করার মধ্যেই তার পরিপূর্ণতা। চৈতন্যদেবের জীবনেরও মূল মন্ত্রই ছিল জাত-পাত নির্বিশেষে আদ্বিজচণ্ডালে প্রেমভক্তিদান। সাম্যবাদী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন সমাজে যদি শ্রেণিগত বৈষম্য থাকে, তবে মানব সমাজে সাম্যবাদ কখনওই প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং উচ্চশ্রেণি ও নিম্ন শ্রেণির মধ্যে দূরত্ব থাকলে তা যে সমাজের তথা দেশের উন্নতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, সে কথাও বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করেছিলেন। এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একমাত্র যে রাস্তা খুঁজে পেয়েছিলেন তা হল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মধ্যে সমতা বিধান। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষকে ভালোবেসেছিলেন বলেই, সবমানুষকে সমান চোখে দেখেছিলেন। সব ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বঙ্কিমের কাছে মানবধর্মই ছিল মূল আদর্শ। আর এই মানব ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব। বঙ্কিমচন্দ্র যে সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখেন সেই সাম্যবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চৈতন্যদেব। ফলে মানবধর্ম, সাম্যবাদী চেতনা সবদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপর চৈতন্যদেবের প্রভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসগুলিতে প্রত্যক্ষভাবে চৈতন্যদেবের কথা না থাকলেও পরোক্ষ ভাবে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব লক্ষ করা যায়। তাঁর উপন্যাসগুলি অলোচনা করলে দেখা যাবে তাঁর মধ্যে কোনো না কোনোটিতে চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ এসে পড়েছে। ১৮৬৯ খ্রীঃ প্রকাশিত বঙ্কিমের

‘মৃণালিনী’ উপন্যাসটিতে আমরা এই প্রভাব লক্ষ করতে পারি। এই উপন্যাসে রয়েছে দুটি কাহিনী। দুটি কাহিনীর রস আলাদা। হেমচন্দ্র- মৃণালিনী কাহিনীটি মিলনান্তক কিন্তু পশুপতি মনোরমার কাহিনীটি বিয়োগান্তক। তবে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র আছে। এই ‘মৃণালিনী’ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র গিরিজায়ার মুখে যে গান গুলি ব্যবহার করেছেন তা পদাবলীধর্মী গান। চৈতন্য পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মের যে শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে এবং আমরা বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ করি, গিরিজায়া এখানে সেরকমই খাঁটি বৈষ্ণবী। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চেহারার যে পরিচয় দিয়েছেন তাতে দেখা যায় – “ গায়িকার বয়স ষোল বৎসর। ষোড়শী, খর্বাকৃতি এবং কৃষ্ণাঙ্গী। …। তাহার অঙ্গ পরিষ্কার, সুমার্জিত,চাকচিক্যবিশিষ্ট; মুখখানি প্রফুল্ল , চক্ষু দুটি বড়, চঞ্চল হাস্যময় … পরিচ্ছদ অতি সামান্য , কিন্তু পরিষ্কার –ধূলিকর্দম পরিপূর্ণ নহে। … প্রোকোষ্ঠে পিত্তলের বলয়, গলায় কাষ্ঠের মালা, নাসিকায় ক্ষুদ্র একটি তিলক, ভ্রূমধ্যে ক্ষুদ্র একটি চন্দনের টিপ।”[৪০] শুধু বোষ্টমীর বর্ণনা নয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ‘মৃণালিনী’ উপন্যাসে গিরিজায়ার কণ্ঠে অনেকগুলি গানের সংযোজন করেছেন, যেগুলি পদাবলীর ধাঁচে লেখা। যেমন–

১। “মথুরাবাসিনী, মধুরহাসিনী,শ্যামবিলাসিনীরে।
কহ লো নাগরী, গেহ পরহরি, কাহেঁ বিবাসিনী রে।।”[৪১]

২। “যমুনার জলে মোর কি নিধি মিলিল।
ঝাঁপদিয়া পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে,
পরেছিনু কুতূহলে যে রতনে।।”[৪২]

৩। “কন্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে।
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে।।”[৪৩]

৪। “মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে।
সঙ্গে যাবি কে কে তোরা আয় রে।।
মেঘেতে বিজলি হাসি, আমি বড় ভালোবাসি,
যে যাবি সে যাবি তোরা, গিরিজায়া যায় রে।”[৪৪]

কেবল তাই নয়, ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের হরিদাসী বৈষ্ণবীর কণ্ঠে আমরা অনুরূপ গান শুনতে পাই – এমত সময়ে হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিয়া গান করিল – “কাঁটা বনে তুলতে গেলাম কলঙ্কেরও ফুল,/ গো সখি কাল কলঙ্কেরই ফুল।/ মাথায় পরলেম মালা গেঁথে, কানে পরলেম দুল/ সখি কলঙ্কেরই ফুল।”[৪৫]

চৈতন্যপরবর্তীকালে পদাবলী সাহিত্যে যে একটা পরিশুদ্ধ রূপ এসেছিল, তাঁর সঙ্গে বঙ্কিমের এই গানগুলির একটা মিল আছে। কারণ বঙ্কিমের সৃষ্ট এসব গানের কোনো কোনোটি চৈতন্যপরবর্তীকালে লেখা পদাবলীর সঙ্গে অদ্ভুত সামঞ্জস্যপূর্ণ। বৈষ্ণব কবিতার আবেদন বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ব্যক্তিত্বকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। আর এভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্য ধারায় চৈতন্যচর্চা অব্যাহত থাকে। কেবল তাই নয়, বঙ্কিম পরবর্তী কথাসাহিত্যকদের রচনায় কীভাবে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

তথ্যসূত্র

১। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, ২০০৬, বঙ্কিম রচনাবলী, আনন্দমঠ, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, পৃ- ৯২১।

২। তদেব।

৩। দাশগুপ্ত প্রফুল্লকুমার, ১৩৭৮, উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি, ১/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কল-১২, পৃ- ৩২০।

৪। পোদ্দার অরবিন্দ, বঙ্কিম মানস, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, পৃ-৪৫।

৫। তদেব।

৬। মজুমদার রমেশচন্দ্র, ১৩৭৮, বাংলা দেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃ-২৪।

৭। পোদ্দার অরবিন্দ, বঙ্কিম মানস, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা- ৯, পৃ-৪৫।

৮। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৬১, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিবিধ প্রবন্ধ, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, সাহিত্য সংসদ, পৃ-৩৩৬।

৯। তদেব, বাঙ্গালার ইতিহাস, পৃ- ৩৩০।

১০। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৬১, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিবিধ প্রবন্ধ, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, সাহিত্য সংসদ, পৃ-৩৩৬।

১১। তদেব, পৃ-৩৩২।

১২। তদেব, পৃ-৩৩৯।

১৩। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, ২০০৬, বঙ্কিম রচনাবলী, আনন্দমঠ, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, পৃ- ৯২১।

১৪। সান্যাল অবন্তীকুমার ও ভট্টাচার্য্য অশোক (সম্পা.), ২০০২, বন্দ্যোপাধ্যায় মৃণাল, উনিশ শতকের গীতিকাব্যে বৈষ্ণবতা, চৈতন্যাবদান, সারস্বত লাইব্রেরী, পৃ- ৪৬৬।

১৫। সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, ত্রয়োদশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ- ১৪৪।

১৬। তদেব।

১৭। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, ২০০৬, বঙ্কিম রচনাবলী, আনন্দমঠ, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, পৃ- ৯২২।

১৮। তদেব, পৃ-৯৪৯।

১৯। তদেব, পৃ-৯২৩।

২০। মুখোপাধ্যায় অতনুশাসন, ২০০৯, দশদিশি, নন্দী, কল্যাণ, চৈতন্য ও বিবেকানন্দ, কলকাতা-৭, পৃ- ২৯৭।

২১। তদেব, চক্রবর্তী, রমাকান্ত, চৈতন্যাবদান, পৃ-২২।

২২। সেন সুকুমার (সম্পা), ২০১১, বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ- ১৯৩।

২৩। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩৬১, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিবিধ প্রবন্ধ, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, সাহিত্য সংসদ, পৃ-৩৩৬।

২৪। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, ২০০৬, বঙ্কিম রচনাবলী, আনন্দমঠ, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, পৃ- ৯২৬।

২৫। সেন সুকুমার ও মুখ্যোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা), ১৩৯২, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, আনন্দ, পৃ-৩৮৯।

২৬। তদেব।

২৭। তদেব।

২৮। তদেব।

২৯। তদেব।

৩০। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, ২০০৬, বঙ্কিম রচনাবলী, আনন্দমঠ, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, পৃ- ৯৩৭।

৩১। তদেব।

৩২। তদেব, প্রথম খণ্ড, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ, পৃ-৯১১।

৩৩। তদেব, প্রথম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ-৮৯০।

৩৪। তদেব, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, পৃ-৯০৪।

৩৫। তদেব, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, পৃ- ৯০৬।

৩৬। তদেব, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, পৃ-৯০৪।

৩৭। তদেব, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ-৯৪২।

৩৮। তদেব, প্রথম খণ্ড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, পৃ-৮৯৯।

৩৯। সেন সুকুমার ও মুখ্যোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), ১৩৯২, কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ, আনন্দ, পৃ-২।

৪০। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, ২০০৬, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, মৃণালিনী, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, দেজ পাবলিশিং পৃ- ২০৬।

৪১। তদেব।

৪২। তদেব।

৪৩। তদেব, পৃ- ২০৮।

৪৪। তদেব, পৃ- ২১৬।

৪৫। তদেব, বিষবৃক্ষ, পৃ-৩১৫।

চতুর্থ অধ্যায়

বিংশ শতকের প্রথমার্ধে কথাসাহিত্যে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রভাবের প্রতিফলন

এই অধ্যায়ে আমরা বিংশ শতকের কথাসাহিত্যে বিশেষত উপন্যাসে চৈতন্যদেবের প্রভাব ও নব্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব কীভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে তাই নিয়েই আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রমুখ লেখকদের উপন্যাসে কীভাবে ঘুরে ফিরে এসেছে চৈতন্য প্রসঙ্গ, উপন্যাসের চরিত্রগুলির উপর চৈতন্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব, চৈতন্যদেবের উদার সমন্বয় মূলক মানবতাবাদী আদর্শের প্রতিফলন, গ্রাম বাংলার বাউল-বোষ্টম-বৈষ্ণবদের জীবনে চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্মের নানা ছাপ, বৈষ্ণব পদাবলী, কীর্তন, বৈষ্ণবদের আখড়া নির্মাণ, মাধুকরী বৃত্তি, সর্বোপরি বাউল বৈষ্ণবদের সহজ-সরল বাস্তব জীবনের রূপচিত্র প্রভৃতি বিবিধ বিষয় নিয়ে আমরা এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এই অধ্যায়টিকে আমরা তিনটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে রবীন্দ্র সাহিত্যে ও জীবনদর্শনে নববীক্ষণে চৈতন্যদেবের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বউ ঠাকুরাণীর হাট’,‘রাজর্ষি’,‘গোরা’, ‘চতুরঙ্গ’, ‘ঘরে বাইরে’ প্রভৃতি উপন্যাসগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের বিবিধ প্রসঙ্গেও কীভাবে বার বার চৈতন্য অনুষঙ্গ , বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যবহার রবীন্দ্র মানসে চৈতন্য চেতনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয় তাই আমরা এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করেছি। পরবর্তী পরিচ্ছেদে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্ম ও সংস্কৃতির রূপ এবং রাঢ় বাংলার আউল- বাউল-বোষ্টম ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের জীবন চিত্রের প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে তাই আমরা ‘রাইকমল’, ‘রাধা’, ‘কবি’, ‘স্বর্গমর্ত্য’, ‘নিশিপদ্ম’ প্রভৃতি উপন্যাসগুলি বিস্তৃত বিশ্লেষণের মাধ্যমে আলোচনা করেছি। সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ত্রয়ী উপন্যাস (‘ময়ূরাক্ষী’, ‘গৃহকপোতী’, ‘সোমলতা’) - এও ধরা পড়েছে চৈতন্যপ্রভাবিত বৈষ্ণবতার নানা ছাপ। শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্ম পরবর্তীতে সমাজজীবনে কীরূপ নেয়, সাধারণ গ্রাম্য মানুষের জীবন সাধনার সঙ্গে, জীবনযাপনের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম কীভাবে অন্বিত হয়ে যায় তারই বাস্তব সত্য চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায় সরোজকুমার রায়চৌধুরীর এই ‘ত্রয়ী’ উপন্যাসে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রবীন্দ্র সাহিত্যে ও জীবনদর্শনে নববীক্ষণে চৈতন্য

রবীন্দ্রসাহিত্যে অর্থাৎ কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ, গদ্যরচনা, উপন্যাস এবং গানেও বৈষ্ণব আদর্শের প্রভাব নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এই পদাবলী গানের পুনর্জাগরণের মূলে যিনি, সেই চৈতন্যদেব সম্পর্কে তাঁর কী ধারণা ছিল সে সম্পর্কে বিশেষ কোনো আলোচনা হয় নি। অথচ যে পদাবলী গানের আকর্ষণে যৌবনে রবীন্দ্রনাথকে ভানুসিংহ সাজতে হয়েছিল, পদাবলীর নিবিড় শব্দ-ছন্দ যাঁর রক্তের মধ্যে, জীবনের সুখ-দুঃখ, আঘাত-বেদনা ও আনন্দের প্রকাশে যিনি বৈষ্ণব পদাবলীকে পরিশীলিত প্রতীকে তুলে ধরেন, বৈষ্ণব বাউল যাঁর অবধারিত অবলম্বন সেই রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবের জীবনাদর্শে, তাঁর ব্যক্তিত্বে কতখানি আগ্রহী ছিলেন সে সম্পর্কে স্বভাবতই আমাদের মনে কৌতূহল জাগে। আর সেই কৌতূহল নিরসনের তাগিদেই রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব কতখানি, রবীন্দ্র সৃষ্ট সাহিত্যে কীভাবে ঘটেছে চৈতন্য চরিত্রের বিনির্মাণ তা জানতে পুনরায় আমাদের একবার রবীন্দ্রসাহিত্যের পাতা ওল্টাতে হয়।

আমরা দেখতে পাই 'বিদ্যাসাগর চরিত' প্রবন্ধে চৈতন্যদেবের গৌরবময় কর্মকুশলতা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ আশা প্রকাশ করেছেন যে এরকম বলিষ্ঠ চরিত্র মানুষের আবির্ভাবেই বাংলাদেশের যাবতীয় দুর্বলতার অপবাদ ঘুচতে পারে : "বহুকালপূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।"[১] চৈতন্যদেব ছিলেন জন-গণ-মন অধিনায়ক। প্রেমভক্তি দানের মাধ্যমে সকলকে একসূত্রে গ্রথিত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবের এই প্রেমভক্তির মানবরূপকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তাঁর বিরাট মানবিকতার স্বরূপটি উপলবদ্ধি করে লিখেছেন - "আমাদের বাঙ্গালির মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘাকাঠার মধ্যে বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানবপ্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন তো বাংলা পৃথিবীর এক প্রান্ত ভাগে ছিল, তখন তো সাম্য ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি কথাগুলোর সৃষ্টি হয় নাই; সকলেই আপন আপন আহ্নিক তর্পণ ও চণ্ডীমণ্ডপটি লইয়া ছিল। তখন এমন কথা কী করিয়া বাহির হইল ---

"মার খেয়েছি না হয় আরও খাব,

তাই বলে কি প্রেম দিব না, আয়।"[২]

এই প্রেম উদার সার্বভৌম। চৈতন্যদেবই এই প্রেমধর্মের উৎস। চৈতন্যভাবনার এই বিরাট দিকটি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকে মুক্ত হয়ে চৈতন্য যে ভালোবাসার ধর্মে জাতিকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন - "আসল কথা, বাংলায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার জো হইয়াছিল। ···দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু-মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না।"[৩] চৈতন্যদেবের মতো রবীন্দ্রনাথও হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে মানবতার জয়গান রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন রক্ষণশীলতা দেশের মুক্তির প্রতিবন্ধক। আবার অন্ধ বিদেশী অনুকরণকেও তিনি ধিক্কার দিয়েছিলেন। এই রক্ষণশীলতাই পরিণামে সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ প্রথা তৈরি করে। চৈতন্যদেব একদিকে যেমন জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে অপরদিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণের অন্ধ আনুগত্যের মূলেও আঘাত করেছিলেন। এই আঘাতেই সেদিন বাংলাদেশ জেগে উঠেছিল, বাঙালি জাতির মধ্যে নব প্রাণের স্পন্দন সঞ্চারিত হয়েছিল, এতদিনের ব্রাহ্মণ শাসনের দ্বারা অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত শূদ্র জাতির মধ্যে নতুন করে বাঁচার আশা জেগেছিল, মানুষ হিসাবে তারা তাদের পরিচয় ফিরে পেয়েছিল, সেই প্রথম বাঙালি জাতি অন্ধ আনুগত্যের বেড়াজাল ডিঙিয়ে বৃহৎ স্বার্থে 'চণ্ডীমণ্ডপ' থেকে নিজেকে 'পৃথিবীর মাঝখানে' এনে দাঁড় করিয়েছিল। এই চৈতন্য আন্দোলনের তাৎপর্য আবিষ্কার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ চিঠিপত্রের ষষ্ঠ পত্রে বলেছেন যে সেদিন বাঙালি জাতিকে "আপন আপন বাঁশ বাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসনবাটির মনসা-সিজের বেড়া ডিঙাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল এবং সে আহ্বানে সকলে সাড়া দিল কি করিয়া?"[৪] সেই আহ্বানে সকলে সাড়া দিয়েছিল অন্তরের তাগিদে, ভালোবাসার টানে। সেই আহ্বানে এমন কিছু ছিল যা মানুষকে ধর্মাধর্ম, জাত-কুলাদি বিচার ভুলিয়ে দিয়েছিল, তাকে 'বৈঠকখানা' থেকে 'রাজপথে' বের করে এনেছিল। আর এই অসম্ভবকে যিনি সম্ভব করেছিলেন তিনি আর কেউ নন, আমাদের অতিপরিচিত বাংলাদেশের নবদ্বীপে শচীমাতার কোলে বেড়ে ওঠা নিমাই। রবীন্দ্রনাথের মুখে আমরা তাঁর গৌরব কীর্তির কথাই শুনতে পাই - " একজন বাঙালি আসিয়া একদিন বাংলাদেশকে তো পথে বাহির করিয়াছিল। একজন বাঙালি তো একদিন সমস্ত পৃথিবীকে পাগল করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং বাঙ্গালিরা সেই ষড়যন্ত্রে তো যোগ দিয়াছিল। বাংলার সে এক গৌরবের দিন। তখন বাংলা স্বাধীনই থাকুক আর অধীনই থাকুক, মুসলমান নবাবের হাতেই থাকুক আর স্বদেশীয় রাজার হাতেই থাকুক, তাহার পক্ষে সে একই কথা। সে আপন তেজে তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।"[৫] গভীর বিশ্বাস নিয়েই সেদিন মানুষ চৈতন্যের যাত্রার সঙ্গী হয়েছিল। খুঁটিনাটি বিচার করেন নি, তর্ক করেন নি। ঈষৎ ব্যঙ্গের স্বরে নবীনকিশোর বলেছেন 'তখন তো আর্যকুলতিলকেরা জাতিভেদ

লইয়া' তর্কে মেতে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথ একে বলেছিলেন ভাবের জাগরণ। এই ভাব বা আইডিয়া চৈতন্যদেবের কালে অভিনব।

চৈতন্যদেব আপন তেজে বঙ্গবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন – এই তেজ আত্মশক্তি জাত। রবীন্দ্রনাথও আপন তেজে বঙ্গবাসীকে কূপমণ্ডুকতা থেকে বেরিয়ে মননচর্চায় যোগ দিতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। উনিশ শতকে বাঙালির অগ্রগতিতে এই আত্মশক্তির উদ্বোধন আধুনিকতার প্রকাশ। আর এই দিক থেকে চৈতন্যদেব ও রবীন্দ্রনাথ আধুনিকতার প্রতীক।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ধর্মে, সাহিত্যে সর্বোপরি কীর্তন সঙ্গীতের মাধ্যমে একদা বাঙালি জাতির মধ্যে যে মহাভাব জেগে উঠেছিল, তাদের মন যে একসূত্রে গ্রথিত হয়েছিল উনিশ শতকে পরাধীন ভারতবর্ষে সেদিন আবার ফিরে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন রবীন্দ্রনাথ – "তাই আশা হইতেছে, আর একদিন হয়তো আমরা একই মত্ততায় পাগল হইয়া সহসা এক জাতি হইয়া উঠিতে পারিব। বৈঠকি ধ্রুপদ খেয়াল ছাড়িয়া রাজপথী কীর্তন গাহিতে পারিব। ····· সেই আর একদিন বাংলা একাকার হইবে।"[৬]

এ থেকে বোঝা যায় চৈতন্যদেব যে ভাবান্দোলনের দূত হয়ে এসেছিলেন, বৈঠকি ধ্রুপদ ছেড়ে রাজপথী কীর্তনের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, উনিশ শতকের পরাধীন চেতনায় সেই ভাবান্দোলনের প্রাণশক্তিকে, সেই একাত্ম বোধের প্রমত্ততাকে ঐতিহাসিক কারণেই রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে চাইছেন। ঔপনিবেশিক শাসনের দাসত্ব থেকে যে মুক্তির আকাঙ্খা জেগেছিল, স্বাধীন হবার জন্যে যে বৃহৎ ভাবের সঙ্গে একাত্মবোধের প্রয়োজন ছিল সেই চিন্তার সূত্রেই চৈতন্যদেবের ভাবান্দোলন রবীন্দ্রনাথের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যদেবের বিস্তৃত মানবপ্রেমের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এখানেই।

রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবের এই ভাব প্রকাশের মধ্যে সঙ্গীতের অসামান্য ভূমিকা লক্ষ করেছিলেন। চৈতন্যদেব যখন দেশের মধ্যে ভাববন্যা নিয়ে এলেন সঙ্গীত তার সহযোগী হয়ে উঠল। আর বৈঠকী গীত নয়, সঙ্গীত নেমে এল সাধারণের মধ্যে। চৈতন্যদেব কীর্তনকে নগরসংকীর্তনে পরিণত করলেন। এই কীর্তন বৈষ্ণবের শস্ত্র ও শাস্ত্র দুইই। চৈতন্যদেব সঙ্গীতকে বাঙালির নিত্যকালের সঙ্গী করে দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব ভক্ত একা ঘরে বসে যখন বিগ্রহের জন্য মালা গাঁথেন তখনও তিনি গুনগুন করে গান করেন। আবার বোষ্টমী যখন ভিক্ষায় যায় তখনো সে একতারাটি বাজিয়ে গান গেয়ে আনন্দ পায়। রবীন্দ্রনাথ গানকে তাঁর জীবনে শস্ত্রের মর্যাদাই দিয়েছিলেন। আমরা জানি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ ভাববন্যা এনেছিলেন এই গানের মাধ্যমেই। রাজপথে তখন রবীন্দ্রগীতি হয়ে উঠল ঐক্যের প্রেরণার প্রতীক। রবীন্দ্রসঙ্গীত কণ্ঠে নিয়েই ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে উঠল।

ঠাকুর বাড়ির পরিবেশ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত প্রীতির বড় প্রেরণা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ দুজনে মিলে গানের নতুন নতুন ফর্ম আবিষ্কারে তন্ময় হয়েছিলেন। ঠাকুর বাড়ির অন্যান্যরা ও কাছের পরজনেরা এই গানের তরীতে সামর্থ্য অনুযায়ী উপকরণ সাজাতেন। রবীন্দ্রনাথ গান দিয়ে দ্বার খুলেছেন। চৈতন্যের শেষ বারো বছরের দেহকান্তি এবং জীবনযাপন যেন সঙ্গীতের মতো। সে গানের তরী দুকূলের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ গানকে বাঙালির সঙ্গী করেছিলেন। আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে গান অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠল। চৈতন্য বাঙালির যে আটপৌরে জীবনে সঙ্গীতকে যুক্ত করে সৌন্দর্য জাগিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ক্রমে ক্রমে তার পূর্ণতা ঘটান। চৈতন্যের সময়ে গানের মহিমা এবং স্বরূপ যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথে পৌঁছে সে গান যেন আরও নূতন নূতন মাত্রায় উদ্ভাসিত হতে লাগল। বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তনে ভক্তি, নিবেদন, আনুগত্য, সমর্পণ। রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর গানে এ সবই আছে ,তবে তার অতিরিক্ত ও কিছু সে গানে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ গানে নিয়ে এলেন আবেগের মধ্যে মননের দীপ্তি।

ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের সুবর্ণযুগ রচিত হয়। চৈতন্যদেবের প্রভাবে যে পদাবলী সাহিত্য ভক্তি ও কবিত্বের তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করেছিল সেই পদাবলী রবীন্দ্রনাথের হাতে আরও গভীর ও ব্যাপক মাত্রা লাভ করল। বৈষ্ণব পদাবলীতে তিনি রসের সন্ধান পেলেন। এই পদাবলীর উৎসে জয়দেব যিনি কিশোর রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিলেন। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস রবীন্দ্রনাথের লেখায় অভিনন্দিত। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-রায়ের নাটকগীতি গায় শুনে পরমানন্দ চৈতন্যের সেই আনন্দ রবীন্দ্রনাথেও বর্তেছিল 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' যার পরিণাম। ব্রজবুলি ভাষার অনুকরণে ভানুসিংহের পত্রাবলীর 'গহন কুসুম কুঞ্জ মাঝে/ মৃদুল মধুর বংশী বাজে' এই কবিতায় গোবিন্দদাসের 'শারদ চন্দ পবন মন্দ' ইত্যাদি পদের ছন্দ, শব্দঝংকার, ধ্বনির প্রভাব লক্ষ করা যায়। তবে বৈষ্ণব কবিতার ধর্মীয় ভাবাদর্শকে পরিহার করে তার প্রেমভাবনার মানবিক রূপটিকে গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। পদাবলীর রসাবেদন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনাকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রকবিতার ভাবে-আঙ্গিকে-রসাস্বাদনে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাষা-ভাব-সুর-ছন্দ-রূপকল্প নতুন নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে।

বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেম ও প্রকৃতি বর্ণনার যে অনুভাবনা ধীরে ধীরে কবির মনে দানা বেঁধেছে, তারই স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখা যায় 'মানসী'র বেশ কয়েকটি কবিতায় –

"আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে -

শরতের পূর্ণিমায়

শ্রাবণের বরিষায়

উঠে বিরহের গাঁথা বনে উপবনে।

এখনও সে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে -

এখনও প্রেমের খেলা

সারানিশি সারাবেলা,

এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয় কুটীরে।"[৭]

সেকালের বৈষ্ণব কবিদের রচনার রসমাধুর্য একালে বসে মর্মে মর্মে আস্বাদন করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'পত্র', 'শ্রাবণের পত্র', 'বর্ষার দিনে' প্রভৃতি কবিতায় বর্ষণমুখর দিনের হৃদয়াবেগ মথিত পুরনো স্মৃতির খেয়ায় আপনা থেকেই চলে এসেছে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রসঙ্গ -----

"মনে পড়ে বরিষার বৃন্দাবন অভিসার

একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ –

শ্যামল তমাল তল, নীল যমুনার জল,

আর দুটি ছলছল নলিন নয়ন।

এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,

কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।

বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে

কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহ ব্যথায়।"[৮]

'সোনার তরী'র 'বর্ষাযাপন' কবিতাতেও বর্ষণমুখর প্রকৃতির পটভূমিতে কবির কাছে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে 'গীতগোবিন্দ', গোবিন্দদাস পদাবলী। ---" বর্ষা আসে ঘন রোলে, যত্নে টেনে লই কোলে।/ গোবিন্দদাসের পদাবলী।/ সুর করিয়া বার বার পড়ি বর্ষা অভিসার -/ অন্ধকার যমুনার তীর।/ নিশীথে নবীনা

রাধা নাহি মানে কোনো বাধা,/ খুঁজিতেছে নিকুঞ্জ কুটীর। ……/ আষাঢ় হতেছে শেষ, মিশায়ে মল্লার দেশ/ রচি 'ভরা বাদরের' সুর / খুলিয়া প্রথম পাতা; গীতগোবিন্দের গাথা/ গাহি 'মেঘ অম্বর মেদুর'।/ স্তব্ধ রাত্রি দ্বিপ্রহরে ঝুপঝুপ বৃষ্টি পড়ে-/ শুয়ে শুয়ে সুখ অনিদ্রায়/ 'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন'/ সেই গান মনে পড়ে যায়।"[৯]

পদাবলীর প্রকৃতিচেতনা তাঁর সৌন্দর্য ব্যাকুল কবি মানসকে একদিকে যেমন উতলা করেছে, অপরদিকে ধর্মীয় সংস্কারের গণ্ডী ছাড়িয়ে রাধার বিরহবেদনা নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে তাঁর হাতে। বৃহত্তর সাধারণ পাঠকের কাছে তত্ত্ব-দর্শন অপেক্ষা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রকৃত মানবিক প্রেমই অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পরিমণ্ডলে পদ রচনা করলেও বৈষ্ণব কবিদের কবিমনের অবচেতনায় ব্যক্তিগত প্রেমভাবনার সংমিশ্রণ ছিল অবশ্যই। আর তাই বৈষ্ণব কবিদের উদ্দেশ্য করে 'সোনার তরী'র 'বৈষ্ণব কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথের জিজ্ঞাসা –"সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,/ কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,/ ……/ হেরি কাহার নয়ান রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে।…/ এত প্রেমকথা - / রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা/ চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার/ আঁখি হতে।আজ তার নাহি অধিকার/ সে সংগীতে।"[১০]

তিনি আরও জানতে চেয়েছেন - "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান!/ পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,/ অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,/বৃন্দাবন গাথা-এই প্রণয় স্বপন/ একি শুধু দেবতার!/ এ সঙ্গীত রসধারা নহে মিটাবার/ দীন মর্ত্যবাসী এই নরনারীদের/ প্রতি রজনীর আর প্রতি দিবসের প্রেমতৃষা।"[১১] একালের কবি মানবের মাঝেই ভগবানকে উপলব্ধি করেন, মানব প্রেমের মধ্যেই ভগবৎ প্রেমের রূপ প্রত্যক্ষ করেন। মানুষের মধ্যে দেবতাকে নামিয়ে আনতে পেরেছিল বৈষ্ণবধর্ম। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন-

"কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা

নরবপু তাহার স্বরূপ।"[১২]

তারই নবতর ভাষ্য রচনা করে একালের কবি বৈষ্ণব কবিতা সম্পর্কে লেখেন – "দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই/প্রিয়জনে- প্রিয়জনে যাহা দিতে পারি / তাই দিই দেবতারে; আর পাবে কোথা!/ দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"[১৩] বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে মানবলীলার চিরন্তন প্রেমের যে রহস্যময় উৎসার, বৈষ্ণব কবিতায় তাকেই নতুনভাবে উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত বাঙালি মানস বৈষ্ণব পদাবলীকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছে। বৈষ্ণব পদাবলী ধর্মাশ্রিত হলেও মানবিক প্রেমকে অবলম্বন করে এর ভাবরূপ গড়ে ওঠায় বাঙালির কাছে বৈষ্ণব পদাবলীর আবেদন ছিল অনেক বেশি। এর রসাবেদন রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনাকেও কিভাবে আলোড়িত করেছিল তার প্রমাণ শুধু তাঁর 'সোনার তরী'র 'বৈষ্ণব কবিতা'তেই নেই- অন্য নানা কবিতায়, ছিন্নপত্রের নানা প্রসঙ্গে এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ-নিবন্ধে, এমনকি উপন্যাস ও ছোটগল্পের মধ্যেও ছড়িয়ে আছে।

'জীবনস্মৃতি' এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ থেকে জানা যায় যে ' এ ভরা বাদর মাহ ভাদর / শূন্য মন্দির মোর' ইত্যাদি পদে মনের মতো সুর বসিয়ে ঘনঘোর বর্ষায় চন্দননগরে গঙ্গাতীরের বাগান বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম যৌবনের বেশ কিছুদিন অতিবাহিত করেছিলেন। পদাবলীর রসমাধুর্যে নিমগ্ন হয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানব প্রকৃতির মধুরতায় অসীমের আনন্দ ও আহ্বান। ব্যক্তিগত জীবনের এই স্মৃতি অভিক্ষেপই লক্ষ করা গেছে 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশের মধ্যে। নিখিলেশের আত্মকথনে বিদ্যাপতির উক্ত পদ মোট চার বার উদ্ধৃত হয়েছে যার দ্বারা নিখিলেশের মনের বিচিত্র ভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। ভাদ্র মাসের বর্ষা প্রকৃতির সবুজ প্রাণোচ্ছলতার মধ্যে নিখিলেশ আত্মদর্শনের নতুন ইঙ্গিত খুঁজে পায়। প্রকৃতির ঔজ্জ্বল্য ও দীপ্তিময়তার মধ্যে সে নিজের দীপ্তিহীন প্রকাশহীন নিঃসঙ্গতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। "বিমলা প্রবাহিনী নদী; সে নিথর জলাশয়। তার মনে গভীরতা থাকতে পারে কিন্তু সঞ্চরণ নেই। এখানেই বিমলার সঙ্গে তার প্রকাণ্ড বিচ্ছেদ। আর এই বিচ্ছেদ যন্ত্রণা যখন সে অনুভব করে তখনই তার হৃদয়ে জেগে ওঠে বিদ্যাপতির আক্ষেপ জনিত বিরহ সঙ্গীত –

"ভরা বাদর, মাহ ভাদর

শূন্য মন্দির মোর"

নিখিলেশ বলে আমার মন্দির যে শূন্য থাকবার জন্যেই তৈরি, ওর যে দরজা বন্ধ, আমার যে দেবতা ছিল সে মন্দিরের বাইরেই বসে ছিল, এতকাল তা বুঝতে পারি নি। মনে করেছিলুম অর্ঘ্য সে নিয়েছে, বরও সে দিয়েছে – কিন্তু শূন্য মন্দির মোর, শূন্য মন্দির মোর।"[১৪]

প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে ভরা বর্ষায় বিমলার সঙ্গে বোটে করে ভ্রমণের স্মৃতি আজকের মর্মান্তিক বিচ্ছেদের দিনে বড় বেশি মনে বাজছে নিখিলেশের। ভাদ্র মাসের ভরা বিলে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রালোকে তাদের মিলনোৎসব কয়েক বছর ধরেই নবীভূত হচ্ছিল। এবার সেই প্রমোদোৎসবের উপর বিরতির ছেদ পড়েছে। এই ভাদ্রের অবিরল বর্ষণের মধ্যে বিদ্যাপতির সেই পুরাতন বিরহ বেদনা নিখিলের

মনে সুর হয়ে বেজে উঠেছে। দ্বিতীয়বার বিদ্যাপতির পদের উল্লেখ করে নিখিলেশ বলেছে – "বিরহে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দিরের শূন্যতার মধ্যেও বাঁশি বাজে; কিন্তু বিচ্ছেদে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দির বড়ো নিস্তব্ধ, সেখানে কান্নার শব্দও বেসুরো শোনায়।"[১৫]

তাই আজ নিখিলেশের কান্নাও বেসুরো শোনায়। কিন্তু কান্না দিয়ে সে বিমলাকে বন্দী করে নিজের কাছে রাখতে চায় না। এতটা কাপুরুষ নয় নিখিলেশ। সে বিমলাকে সম্পূর্ণ মুক্তি দিতে চায়। ভাবমুগ্ধ বিরহানলের প্রতিক্রিয়ায় আজ তার পৌরুষ সত্যের অভিমুখী হয়েছে। ভালবাসার দার্শনিক স্বরূপ আজ সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। তার মধ্যে এই প্রত্যয় দৃঢ় হয়েছে যে ভালবাসার অতিরঞ্জন, ভাববিলাস অপেক্ষা মনুষ্যত্বের দাবি অনেক উচ্চতর। তাই তার দার্শনিক মন তৃতীয়বার বিদ্যাপতির আলোচ্য পদাংশ উদ্ধৃত করে বলেছে – "শূন্য মন্দির! বলতে লজ্জা করে না? এত বড়ো মন্দির কিসে তোমার শূন্য হল? একটা মিথ্যা কে মিথ্যা বলে জেনেছি, তাই বলে জীবনের সমস্ত সত্য আজ উজাড় হয়ে গেল?"[১৬]

প্রণয়ী হৃদয়ের এই ধিক্কার নিখিলেশকে মিথ্যা মোহের মায়াজাল কাটিয়ে বৃহৎ সত্যের সম্মুখীন করে তুলেছে। নিজের নৈরাশ্য মন্থনের ব্যর্থ চক্রাবর্তন থেকে সে এখন অপরের বাস্তব দুঃখে অংশগ্রহণ করেছে। পঞ্চুর কঠোর জীবন সংগ্রাম, তার অদ্ভুত নীতিনিষ্ঠা নিখিলেশের সামনে তীক্ষ্ণ বাস্তব সত্য উদ্ঘাটিত করেছে। সঙ্গে নিজের আসক্তি মলিন সম্পর্ক বিচার বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে মাস্টার মশায়ের সঙ্গে তার তর্কের উদার সত্যটি বৈপরীত্য ক্রমে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বিমলার মোহকেন্দ্র থেকে সে ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে এনেছে এবং জীবনের বিচিত্র কর্তব্যলোকে নিজেকে সম্প্রসারিত করেছে। অন্তরের গুঞ্জন ধ্বনি ধূয়া পাল্টেছে মন্দিরের শূন্যতার ক্ষোভ ভগবৎপ্রেমের আকূতিতে লীন হয়েছে। জীবনের চরম সত্যকে উপলব্ধি করে সে বলেছে – "বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আমার দুঃখের আর সীমা খুঁজে পাচ্ছিনে। তাই আজ আমার এতটুকু ফাঁককে লোক লোকান্তরে ছড়িয়ে দিয়ে শরতের সমস্ত সকাল ধরে গান গাইতে বসেছি –

'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,

শূন্য মন্দির মোর।'

চন্দ্রনাথ বাবুর জীবনের বাতায়ন থেকে সত্যকে দেখতে পাই তখনো গানের মানে একেবারেই বদলে যায়, তখন- 'বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঁইয়ায়বি

হরি বিনে দিন রাতিয়া।'

যত দুঃখ যত ভুল সব সে ওই সত্যকে না পেয়ে। সত্যকে জীবন ভরে না নিয়ে দিন রাত কেমনে কাটাবে? আর তো পারিনে সত্য, তুমি এবার আমার জন্য শূন্য মন্দির ভরে দাও।"[১৭] বিদ্যাপতির একটি পদের দুটি পংক্তি পরপর কয়েকবার উদ্ধৃত করে নিখিলেশের মনের উতরোল ভাবপ্রক্রিয়ার ক্রমপরিণতি এত সুন্দর ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে, যা উপন্যাসের শৈলীতে এনেছে এক ভিন্নতর মাত্রা। এই ভাবে বৈষ্ণব পদাবলী আধুনিক সাহিত্যিকের কলমে সাহিত্যের বিবিধ শাখায় বিস্তৃত পরিসর লাভ করে।

শুধুমাত্র সংগীত নয়, নাটকেও চৈতন্যদেবের অনুরাগ লক্ষ করা যায়। তিনি রামানন্দ রায়ের 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক গেয়ে শুনে বিভোর হতেন। এমনকি তাঁরই নির্দেশে রূপগোস্বামী 'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব'নাটক রচনা করেন। এমনকি 'শ্রীচৈতন্যভাগবতে'র মধ্যখণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই চৈতন্যদেব রীতিমতো চন্দ্রশেখর আচার্যের বাড়িতে নাটক অভিনয় করতেন – " সদাশিব বুধিমন্ত খানেরে ডাকিয়া।/ বলিলেন প্রভু কাছে সজ্জ কর গিয়া।।/·····। গদাধর কাছিবেন রুক্মিণীর কাছ।/··· নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।/ কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার।/ শ্রীবাস নারদ কাছ স্নাতক শ্রীরাম। ····· প্রভু বোলে পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ।/ ····· লক্ষ্মী বেশে অঙ্ক নৃত্য করিব ঠাকুর।/ সকল বৈষ্ণবের রঙ্গ বাড়িল প্রচুর।"[১৮]

এবারে চৈতন্যদেবের অভিনয়প্রীতির সূত্রে রবীন্দ্রনাথের অভিনয় প্রীতির প্রসঙ্গ টানা যাক। নাটক রচনায় ও অভিনয়ে তাঁর বিপুল প্রয়াস বাংলা নাট্যচর্চায় একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে বহুবিধ নাটক রচনা করেছেন। 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'চণ্ডালিকা', 'রাজা', 'ডাকঘর', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি কাব্যনাট্য, নৃত্যনাট্য, রূপক-সাঙ্কেতিক বিবিধ আঙ্গিকের নাটক তিনি রচনা করেছেন। এগুলির মধ্যে অনেক নাটক রবীন্দ্রনাথ নিজে পরিচালনা করে মঞ্চে উপস্থাপন করেছেন এবং নিজে অভিনয়ও করেছেন বিভিন্ন ভূমিকায়। প্রশান্ত কুমার পাল 'রবিজীবনী'র দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন –" কলকাতায় আছেন রবীন্দ্রনাথ 'বিসর্জন' অভিনয়ের জন্য। সেই একই কারণ বিশ্বভারতীর অর্থের প্রয়োজন·····তবে এ কথাও সত্য, অভিনয় করে অভিনয় করিয়ে কবি নিজেও প্রভূত আনন্দ পেতেন- সেটা তাঁর আর্টিস্ট সত্তার সম্ভোগ···।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্ট ঠাকুরদা, ধনঞ্জয় বৈরাগী, বিশু পাগল প্রভৃতি চরিত্রগুলিতে চৈতন্যদেবের প্রভাব লক্ষ করা যায়। চৈতন্যদেব বার বার নিজেকে বাউল বলে পরিচয় দিয়েছেন। এই চরিত্রগুলিও খানিকটা সেই ধরনের। চৈতন্যদেব যেমন প্রেমভক্তি দানের মাধ্যমে সকলকে কাছে টানতে চেয়েছিলেন তেমনি রবীন্দ্রসৃষ্ট এই চরিত্রগুলিও ভালবাসা ও আনন্দ দিয়েই মানুষের মন জয় করতে চেয়েছে।

চৈতন্যদেব যখন সাঙ্গোপাঙ্গোদের নিয়ে চলতেন তখন সতীর্থরা তো ভরসা পেতেন, আশ্রয় পেতেন তাঁর কাছে। রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় বৈরাগী কি সেই জাতীয় চরিত্র নয়? শিবতরাইয়ের অধিবাসীরা তো, ধনঞ্জয় বৈরাগীর কাছেই পাঠ নিয়েছিলেন। তাই এ কথা বলা যায় রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় চরিত্র পরিকল্পনার আভাস চৈতন্য চিত্র ও চরিত্রের মধ্যেই ছিল।

চৈতন্যদেবের বিবিধ গুনাবলী রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যের জীবনের অলৌকিকতা মেনে নিতে পারেননি। কিন্তু চৈতন্যের শিল্পানুরাগকে তিনি নিশ্চয়ই পছন্দ করেছিলেন। বস্তুত চৈতন্যের সব প্রচেষ্টার মধ্যে ঈশ্বর ভক্তির সঙ্গে জড়িয়েছিল জীবনের প্রতি মমত্ববোধ। গৌতম বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট প্রমুখ মহাপুরুষদের 'চারিত্রপূজা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লেখনী যতটা সচল এবং ব্যাপক ছিল, চৈতন্যদেব সম্পর্কে ততটা নয় বলে কোনো কোনো সমালোচক মত প্রকাশ করেছেন। অথচ বিপুল রবীন্দ্র সাহিত্যে কতবার যে চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ এসেছে তার তালিকা করলে বিস্মিত হতে হয়। চৈতন্যদেব সম্পর্কে আলাদা করে কোনো প্রবন্ধ না লিখলেও বিভিন্ন প্রবন্ধে , চিঠিপত্রে, আত্মজীবনীতে, কবিতায়, গানে, ছোটগল্পে, উপন্যাসে বিবিধ প্রসঙ্গে এতবার চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে যে সেগুলি সংকলন করলে একটি ছোটখাটো পুস্তিকা হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়। চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তির মানবরূপকে তিনি শুধু শ্রদ্ধাই করেননি, মধ্যযুগের বাংলাদেশে সাহিত্য সঙ্গীত ধর্ম সমাজ সংস্কৃতিতে যে বাঁধভাঙা প্লাবন এসেছিল চৈতন্য রেণেসাঁর সেই মহিমাময় দিকটি রবীন্দ্রনাথের রচনায় বার বার স্বীকৃতি পেয়েছে।

অনেকে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ও চৈতন্যদেব বিপরীত স্বভাবের মানুষ। জীবনের সুখ দুঃখ আনন্দ-বিরহ ও ঈশ্বরানুভবকে চৈতন্যদেব ভাবোন্মাদনায় প্রকাশ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সমজাতীয় অভিজ্ঞতাকে কাব্যে, গানে, প্রতীক-প্রতিমানে প্রকাশ করেছেন। চৈতন্যদেব সন্ন্যাস নিয়েছিলেন, আর রবীন্দ্রনাথ তো বলেই দিয়েছেন তাঁর মুক্তি বৈরাগ্য সাধনে নয়, মোহই তাঁর মুক্তি, প্রেমই তাঁর ভক্তি। চৈতন্যদেবের প্রেমঘন রূপচিত্রটি অনন্ত দেশকালের পটভূমিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে গীতিমাল্যের ১০৮ সংখ্যক কবিতায় – 'আকাশে দুই হাতে প্রেম বিলায় ও কে।'

লক্ষ করলে দেখা যাবে চৈতন্যদেব ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই শাস্ত্র শাসনের দুরূহ জটিলতার পরিবর্তে সহজ সরল ব্যাখ্যাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। একদা নবদ্বীপে আগত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে বিশ্বম্ভরের বাকযুদ্ধ চলাকালীন তার মুখে গঙ্গার মাহাত্ম্য শুনে গৌরাঙ্গসুন্দর বলেছিলেন - "তোমার যে শব্দের গ্রন্থণ অভিপ্রায়।/ তুমি বিনা বুঝাইলে বুঝন না যায়।।/এতেকে আপন কিছু করহ ব্যাখ্যান।/ যে শব্দে যে বল তুমি সেই সুপ্রমাণ।।/··· প্রভু বোলে এসকল শব্দ অলঙ্কার।/ শাস্ত্রমতে শুদ্ধ

হইলে হয় সারাৎসার।”[২০] এ থেকে বোঝা যায় চৈতন্যদেব শব্দ-অলঙ্কারে পরিপূর্ণ কঠিন দুরুহ ভাষ্যের পরিবর্তে সহজ সরল সকলের বোধগম্য ব্যাখ্যার নিজস্বতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি শাস্ত্রের জীর্ণ অংশকে ছেটে ফেলতে চেয়েছিলেন। ভক্তিপথের পথিক চৈতন্যদেব সরল বিশ্বাসের স্থানে ‘কুটিল ভাষ্যের প্রাদুর্ভাব’ মেনে নিতে পারেননি। তাই বাসুদেব সার্বভৌমের কাছে একটানা সাতদিন বেদান্ত শ্রবণ করেও যখন ভাল-মন্দ কোনো উত্তর তিনি করেন নি তখন বিস্মিত হয়ে বাসুদেব সার্বভৌম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন –

“সাতদিন কর তুমি বেদান্ত শ্রবণ ।।

ভালমন্দ নাহি কহ রহ মৌন ধরি।

বুঝ কিনা বুঝ ইহা বুঝিতে না পারি।।”[২১]

শ্রীচৈতন্য সার্বভৌমকে উত্তরে বলেন –

“প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্মল।

তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয় ত বিকল।।

সূত্রের অর্থ ভাষ্য কহে প্রকাশিয়া।

ভাষ্য কহ তুমি সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিয়া।।

****

মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।

অভিধা-বৃত্তি ছাড়ি শব্দের কর লক্ষণা।।

****

ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ।

স্বকল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন।।”[২২]

চৈতন্যদেব সূর্যের কিরণের ন্যায় ব্যাস সূত্রের সহজ সরল নির্মল ভাষ্যের পরিবর্তে কল্পনার মেঘে আচ্ছাদিত দুরূহ ভাষ্য গ্রহণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবের নিরহঙ্কার শাস্ত্র প্রীতি লক্ষ করেছিলেন। তাঁকে মুগ্ধ করেছিল চৈতন্যের হৃদয়বত্তা। রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই কোনো বিষয়ের দুরূহ জটিল ব্যাখ্যার পরিবর্তে সহজ সরল ব্যাখ্যাকেই সমর্থন করেছেন। সাধনায় প্রকাশিত 'পৌরানিক মহাপ্লাবন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "আমাদের দেশে প্রাচীন ধর্ম যে যে স্থানে জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে নব্য পণ্ডিতেরা সেখানে বিজ্ঞানের 'ঠেকো' দিয়া তাহাকে অটল বলিয়া প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু সত্যের দ্বারা ভ্রমকে বজায় রাখা অসাধারণ বুদ্ধি কৌশলেও সুসিদ্ধ হয় না। যখনি দেখা যায় সরল বিশ্বাসের স্থানে কুটিল ভাষ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তখনি জানা যায় শাস্ত্রের স্বভাবিক মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে।"[২৩] রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন একজাতীয় আধ্যাত্মিক কুয়াশা সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সাহিত্য থেকে সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য, সত্য লোপ পেয়ে যাচ্ছে। যে আধ্যাত্মিক কুয়াশা, নব্য হিন্দুয়ানি জাতির জীবনকে রুদ্ধ আড়ষ্ট করে ফেলেছে সেই কুয়াশা থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বাঙালিকে সূর্যের মতো 'সর্বতোচক্ষু' হতে বলেছেন। সংস্কার, অন্ধ বিশ্বাস, প্রথানুগত্য থেকে মুক্ত হতে বলেছেন।

রবীন্দ্রসৃষ্ট সাহিত্যে প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, চিঠিপত্র সর্বত্রই চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর আদর্শের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এমনকি তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসের চরিত্রগুলির উপরও চৈতন্যদেবের গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চৈতন্যদেব বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সেই প্রেমেরই প্রতিফলন বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখা যায়। বৈষ্ণবীয় তত্ত্বের আনন্দ স্বরূপটি রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকে মুক্ত হয়ে চৈতন্যদেব যে উদার সার্বভৌম প্রেমধর্মে জাতিকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ সাম্যবাদের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। তার নমুনা আমরা 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে দেখতে পাই। যার সঙ্গে চৈতন্যদেবের প্রেমভাবনার একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

উপন্যাসের বসন্ত রায় চরিত্রটিকে রবীন্দ্রনাথ প্রেম ও ভক্তির মূর্তিমান স্বরূপে গড়ে তুলেছেন। দেখা যায় বৃদ্ধ বসন্ত রায় তাঁর মৃত্যুর নির্দেশদাতা প্রতারক প্রতাপকেও আশীর্বাদ করেছেন। প্রতাপের পুত্র-কন্যাদের স্নেহধারা ঢেলে দিয়েছেন। তার কাছে আপন-পর, শত্রু-মিত্র সবাই সমান হয়ে গেছে। তাঁর মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এসেছে যে মুক্তিয়ার খাঁ তাকেও তিনি পরম আদরে বুকে টেনে নিয়েছেন : " বসন্ত রায় কহিলেন, 'না সাহেব তোমার দোষ কী? তোমার কোনো দোষ নাই। তোমাকে আর মার্জনা করিব কী?' বলিয়া মুক্তিয়ার খাঁর কাছে গিয়া তাহার সহিত কোলাকুলি করিলেন; কহিলেন, 'প্রতাপকে বলিয়ো, আমি তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া মরিলাম।"[২৪] এইভাবে বসন্ত রায় চরিত্রটির মধ্যে

দিয়েই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রেমের বানী প্রচার করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর সুর মূর্চ্ছনা ও সঙ্গীতের মাধুর্য প্রকাশের মধ্য দিয়েই বসন্ত রায় শত্রুকে মিত্র করতে চেয়েছেন, সংঘর্ষের পরিবর্তে শান্তির বার্তা প্রচার করেছেন: "তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সঙ্গীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়। ··· তলোয়ার যে এতবড় ভয়ানক দ্রব্য তাহাতেও শত্রুর শত্রুত্ব নাশ করা যায় না-··· কিন্তু সঙ্গীত যে এত মধুর জিনিস, তাহাতে শত্রু নাশ না করিয়াও শত্রুত্ব নাশ করা যায়···। তলোয়ারে শত্রুকে জয় করা যায়, কিন্তু সঙ্গীতে শত্রুকেও মিত্র করা যায়,···।"[২৫] রাজশক্তি মুসলিম শাসকের বিরুদ্ধে চৈতন্যের যে আন্দোলন সেখানে কোনো অস্ত্র সংহার সংঘর্ষ নয়, কীর্তন সঙ্গীতই ছিল চৈতন্যদেবের একমাত্র অবলম্বন। যে সঙ্গীত বিভেদ-বৈষম্য ভুলিয়ে হাজার হাজার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, মুক্তির পথ দেখিয়েছিল, ব্রাহ্মণ শূদ্র চণ্ডালকে একাসনে বসিয়েছিল, যে কীর্তন সঙ্গীতের জোয়ার হোসেনশাহের সিংহাসন পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। বিশিষ্ট সমালোচকের মতে মূলত বৈষ্ণবীয় ভাবনায় ভাবিত হয়েই রবীন্দ্রনাথ বসন্ত রায় চরিত্রটি গড়ে তুলেছেন – " বসন্ত রায় বৈষ্ণব বৈরাগীর মতই জীবন এবং মৃত্যু দুই-ই অত্যন্ত সহজভাবে নিয়েছেন এবং সংসারের আনন্দময় পথে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে চলেছেন। এই উপন্যাসের আকর্ষণ মূলত তিনিই এবং তাঁর বিশ্বপ্রেম।"[২৬] বসন্ত রায়ের এহেন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্ম ও তাঁর মানবপ্রেমের কথা মনে পড়ে যায়।

চৈতন্যদেবের এই মানবপ্রেম, উদারতা, মানবধর্ম প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী প্রতিফলন আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজর্ষি' উপন্যাসেও দেখতে পাই। এই উপন্যাস সম্পর্কে ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন – "আসলে গল্পটা ছিল প্রেমের অহিংস পূজার সঙ্গে হিংস্র শক্তি পূজার বিরোধ।"[২৭] এই বিরোধে অহিংস প্রেমই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। আর, এই অহিংস প্রেমধর্মই বৈষ্ণব ধর্মের তথা চৈতন্য ধর্মের মূল কথা। কোন প্রচলিত প্রথা, শাস্ত্র নির্দেশ নয়, অহিংস প্রেমধর্মেই জগৎবাসীকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন চৈতন্যদেব এবং এই একই ভাবনায় ভাবিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারই প্রতিফলন দেখা যায় 'রাজর্ষি' উপন্যাসে। ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েও রাজা গোবিন্দমানিক্যের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ও নির্দেশে মন্দিরের দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত জীববলি প্রথা বন্ধ হয়ে যায় এবং সমগ্র নগরী প্রেমধারায় স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে।

উপন্যাসের আখ্যানভাগ আবর্তিত 'এত রক্ত কেন' – একটি বালিকার ছোট্ট এই সংলাপ তথা করুণ আর্তি রাজা গোবিন্দ্যমানিক্যের হৃদয়কে আন্দোলিত করে। এই রক্তস্রোতধারা নিবারণের জন্য তিনি ভুবনেশ্বরী মন্দিরে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত জীববলিপ্রথা বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু রাজার এই নির্দেশ মেনে নিতে পারেননি কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অহংকারী ব্রাহ্মণ পুরোহিত রঘুপতি। তিনি গোবিন্দ্যমানিক্যের বিরোধিতা করেছেন এবং প্রজাদের ও রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়কে গোবিন্দ্যমানিক্যের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছেন। যার ফলে গোবিন্দ্যমানিক্যকে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এখানে আমাদের মনে পড়ে যায় হিন্দু ব্রাহ্মণদের স্মৃতিশাসিত কঠোর অনুশাসনের বিধি নিষেধের বিরোধিতা করায় চৈতন্যদেবকেও নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল, এমনকি এও শোনা যায় যে তাদের অত্যাচারে একপ্রকার বাধ্য হয়েই চৈতন্য সন্ন্যাস নিয়েছিলেন এবং নবদ্বীপ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। 'চৈতন্যভাগবতে'র মধ্য খণ্ডে রয়েছে "কেহ বলে ভাল তো বৈষ্ণব বলে লোকে।/ ব্রাহ্মণ লঙ্ঘিতে আইসেন মহা কোপে।।/···। আমরাকি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি। ··· আমরাও তাহারে মারিব সর্বজনে।।/ ··· এইমত যুক্তি করিলেন পাপীগন/ জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।। ··· ভাল লোক রাখিতে করিনু অবতার।/ আপনে করিনু সব জীবের সংহার।।/ দেখ কালি শিখা সূত্র সব মুণ্ডাইয়া।/ ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া।।/ যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।/ ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে।"[২৮]

সন্ন্যাস নয়, তবে শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি চৈতন্যদেবের উদার মনোভাবের প্রতিফলন আমরা রাজা গোবিন্দ্যমাণিক্যের চরিত্রেও দেখতে পাই। ভ্রাতা নক্ষত্র রায় তার প্রাণনাশ করে রাজা হতে চায়- একথা জেনেও তিনি ভাইয়ের প্রতি বিদ্রূপ মনোভাব পোষন করেন নি, বরং তাকে আলিঙ্গন করে পরম স্নেহে প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন – " রাজ্য পাইতে চাও তো সহস্র লোকের দুঃখকে আপনার দুঃখ বলিয়া গ্রহণ করো, সহস্র লোকের বিপদকে আপনার বিপদ বলিয়া বরণ করো, সহস্র লোকের দারিদ্র্যকে আপনার দারিদ্র্য বলিয়া স্কন্ধে বহন করো – এ যে করে সে-ই রাজা, ··· তোমার শিরায় ও আমার শিরায় একই রক্ত বহিতেছে··· তুমি সেই রক্তপাত করিতে চাও করো, কিন্তু মনুষ্যের আবাসস্থলে করিয়ো না। কারণ যেখানে এই রক্তের বিন্দু পড়িবে, সেইখানেই অলক্ষ্যে ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে।"[২৯] এইভাবে চৈতন্যদেব শাস্ত্র শাসনের উর্ধ্বে সর্ব জাতি ধর্ম বর্ণের উর্ধ্বে সকলকে সমমর্যাদা দানের যে সাম্যবাদী ভাবনার বীজ বপন করেছিলেন, যে প্রেম-মৈত্রী-ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার চেষ্টা করেছিলেন তারই সুদূরপ্রসারী প্রভাব আমরা বিংশ শতকের উপন্যাসেও দেখতে পাই।

চৈতন্যদেবের প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের গোরা চরিত্র নির্মাণে। প্রথমেই চোখে পড়ে উভয়ের দেহসৌষ্ঠবের দিকে। চৈতন্যদেবের বিপুল জনপ্রিয়তার একটি অন্যতম কারণ অবশ্যই তাঁর দেহকান্তি। চৈতন্যচরিতকাব্যগুলি অনুসরণ করলে দেখা যায় চৈতন্যদেব ছিলেন 'সিদ্ধপুরুষের প্রায় পরম গম্ভীর'। তাঁর 'সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ', আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন'[৩০] সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাই তো রামানন্দ তাঁকে দেখে বলেছিলেন –

"সূর্যশত সমকান্তি অরূণ বসন।

সুবলিত প্রকাণ্ড দেহ কমল লোচন।।"[৩১]

আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গোরার রূপের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে " তাহার গায়ের রঙটা কিছু উগ্র রকমের সাদা। ..... মাথায় সে প্রায় ছয় ফুট লম্বা, হাড় চওড়া, দুই হাতের মুঠা যেন বাঘের থাবার মতো বড়ো - ..... তাহার মুখের গড়নও অনাবশ্যক রকমের বড়ো এবং অতিরিক্ত রকমের মজবুত; ওষ্ঠাধর পাতলা এবং চাপা। তাহার উপরে নাকটা খাঁড়ার মতো ঝুঁকিয়া আছে। দুই চোখ ছোট কিন্তু তীক্ষ্ণ;"[৩২] গোরার দেহসৌষ্ঠব রচনায় অবশ্যই আমরা চৈতন্যদেবের প্রভাব লক্ষ করতে পারি। তাই তো গোরার'হোমের আগুনের' মতো চেহারা দেখে বিস্মিত হরিমোহিনী বলেছিল – "তোমার কথা অনেক শুনেছি বাবা। তুমিই গৌর? গৌরই বটে। ঐ যে কীর্তনের গান শুনেছি –

"চাঁদের অমিয়া সনে চন্দন বাটিয়া গো

কে মাজিল গোরার দেহখানি –"[৩৩]

চৈতন্যের চেহারায় এমন কিছু ছিল যা মানুষকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করত। শ্রীচৈতন্যদেবকে যখন অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর বলা হয় তার মধ্যেই তাঁর অঙ্গের লাবণ্য দ্যোতিত হয়ে ওঠে। চৈতন্যদেবের মতো রবীন্দ্রনাথের চেহারাতেও এমন অমোঘ আকর্ষণ ছিল যাকে এড়িয়ে যাবার সাধ্য কারও ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শী রঘুনাথ দাসের কাছে চৈতন্যদেব 'হেমাদ্রি' রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন।

'গোরা' উপন্যাসের গৌরমোহনের মতোই রবীন্দ্রনাথের চেহারাও 'রজতগিরি'র মতো এবং "তাহাকে না দেখিয়া থাকিবার জো নাই, সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই ।"[৩৪] রবীন্দ্রনাথের চেহারার প্রথম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন রবীন্দ্র রূপমুগ্ধ আন্না তড়খড়। রবীন্দ্রনাথ বোম্বাইয়ে থাকাকালীন আন্না তড়খড়ের উপরেই শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। 'ছেলেবেলায়' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "মনে পড়ছে তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছিলুম আমার চেহারার তারিফ। সেই বাহবায় অনেক সময় গুণপনা থাকত। যেমন একবার আমাকে বিশেষ করে বলেছিলেন,একটা কথা আমার রাখতেই হবে,তুমি কোনোদিন দাঁড়ি রেখো না, তোমার মুখের সীমানা যেন কিছুতেই ঢাকা না পড়ে।"[৩৫]

১৮৯৪ সালের ২রা সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে যাবার সময় একবার নবীনচন্দ্রের আহ্বানে রানাঘাটে নামেন। এই উপলক্ষে নবীনচন্দ্রের 'আত্মজীবনী'তে বত্রিশ বৎসর বয়সের রবীন্দ্রনাথের একটি বর্ণনা আছে - "দেখিলাম সেই ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের নবযুবকের আজ পরিণত

যৌবন। কি সুন্দর, কি শান্ত, কি প্রতিভান্বিত দীর্ঘাবয়ব। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, স্ফুটনোন্মুখ পদ্মকোরকের মত দীর্ঘ মুখ, মস্তকের মধ্যভাগে বিভক্ত কুঞ্চিত ও সজ্জিত কেশশোভা; ··· সুবর্ণোদর্পনোজ্জ্বল ললাট, ভ্রমরকৃষ্ণ গুম্ফ ও শ্মশ্রু শোভান্বিত মুখমণ্ডল; ··· দীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল চক্ষু; সুন্দর নাসিকায় মার্জিত সুবর্ণের চশমা।"[৩৬]

বৃদ্ধ বয়সেও রবীন্দ্রনাথের চেহারার ঔজ্জ্বল্য যে এতটুকু ম্লান হয় নি, বরং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য্যের প্রতিটি রেখা যে আরও দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে তার পরিচয় পাই বিদেশিনী ওকাম্পোর বর্ণনায় : "তেষট্টি বছর বয়স, প্রায় আমার বাবার বয়সী, অথচ কপালে একটি রেখা নেই, যেন কোনো দায়িত্বভারই নষ্ট করতে পারে না তাঁর সোনালী শরীরের স্নিগ্ধতা। সুগোল সমর্থ গ্রীবা পর্যন্ত নেমে এসেছে উছলে-ওঠা ঢেউতোলা শাদা চুলের রাশি। শ্মশ্রুমণ্ডলে মুখের নিচের দিকটা আড়াল। আর তারই ফলে ওপরের অংশ হয়ে উঠেছে আরও দেদীপ্যমান। মসৃণ ত্বকের অন্তরালে তাঁর সমগ্র মুখাবয়বের গড়ন এক অবিশ্বাস্য সৌন্দর্য রচনা করেছে। তেমনি সুন্দর তাঁর কালো চোখ, নিখুঁত টানা ভারী পল্লব। শুভ্র কেশদাম আর স্নিগ্ধ শ্মশ্রু, এর বৈপরীত্যে জ্বলে উঠেছে তাঁর চোখের সজীবতা। দীর্ঘ দেহ, শোভন চলন। তাঁর প্রকাশময় দুটি অতুলনীয় শুদ্ধ হাতের সুধীর সুষমা যেন অবাক করে দেয়, মনে হয় যেন এদের নিজেদেরই কোনো ভাষা আছে।"[৩৭]

কেবল দৈহিক সৌন্দর্যই নয়, গোরার সঙ্গে আমরা গৌরাঙ্গের জীবন ও কর্মধারার সাদৃশ্যও লক্ষ করতে পারি। নবদ্বীপের নিমাইয়ের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের গোরাও ছোটবেলা থেকেই পাড়ায় ও স্কুলে ছেলেদের সর্দারি করত। তার দুরন্তপনায় সকলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। আবার বয়সকালে যে কোনো সভায় বক্তৃতা দিতে, নিমাইয়ের মতো নেতৃত্বদানে এবং প্রতিপক্ষকে যুক্তি-তর্কে পরাস্ত করতে গোরা ছিল সিদ্ধহস্ত।

প্রথম দিকে গোরার মনে জাত-পাত নিয়ে গোড়ামি ছিল। হিন্দু সংস্কার, আচার-আচরণ, সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। কিন্তু গোরা যখন ভ্রমণে বেরিয়ে ভদ্র শিক্ষিত কলকাতা সমাজের বাইরে গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেশের প্রকৃত অবস্থা ও মানুষের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করল তখন তার যাবতীয় সংস্কার এবং ধর্মীয় গোড়ামির মূলে কঠোর অভিঘাত লাগল। এই চরঘোষপুরে গোরা প্রথম উপলব্ধি করে জাত-পাতের বিচার, ধর্মীয় গোঁড়ামির উর্দ্ধে মানুষের স্নেহ-ভালবাসা, আবেগ-অনুভূতি, মানবিকতার গুরুত্ব অনেক বেশি। তাই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় নিতান্ত ক্লান্ত হওয়া সত্ত্বেও দুর্বৃত্ত অন্যায়কারী মাধব চাটুয্যের বাড়িতে গোরা অন্নগ্রহণ, এমনকি জলস্পর্শ পর্যন্ত করে না। সে চলে যায় সেই নাপিতের বাড়ি যেখানে পিতৃহারা

মুসলমানের ছেলে মানুষ হচ্ছে, যে নাপিত হিন্দুর হরি ও মুসলমানের আল্লার মধ্যে কোনো তফাৎ দেখে না। এইভাবে গোরার মধ্যে প্রকৃত ভারতবোধের উন্মেষ ঘটে।

এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় চৈতন্যদেবের কথা। ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের মধ্যেই আমরা প্রথম হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বৈষ্ণব, উচ্চ-নীচ জাতি সকলকে একত্রিত করার মত নেতৃত্ব দানের শক্তি লক্ষ করে থাকি। তাঁর নেতৃত্বেই সেদিন নবদ্বীপের অসংখ্য মানুষ একত্রিত হয়ে কাজীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিল যা ছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম 'গণ-আন্দোলন'। কাজীদলনের পর নগর ভ্রমণে বেরিয়ে নিমাই সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ তাঁতী, গোয়ালা, গন্ধবণিক, মালাকার, শঙ্খবণিক, তাম্বুল বৃত্তিজীবীদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করেন –

"নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস।

সবার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ।।"[৩৮]

এমনকি খোলাবেচা শ্রীধরের বাড়িতে গিয়ে তার দুয়ারে পড়ে থাকা লোহার পাত্র থেকে জল পান করেন - "নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর অঙ্গণে।/ জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে।।/ ভক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচীনন্দন।/ লৌহপাত্র তুলি লইলেন ততক্ষণ।।/ জল পিয়ে মহাপ্রভু সুখে আপনার।/ কার শক্তি আছে তাহা নয় করিবার।।"[৩৯] শুধু সমাজের নিম্নশ্রেণির বৃত্তিজীবী মানুষদের অনুগ্রহ দানই নয়, সমাজের পতিত, অবহেলিত মানুষদের প্রতিও ছিল তার অগাধ করুণা। তাই গোবিন্দদাস কবিরাজ লিখেছেন – "পতিত হেরিয়া কাঁদে/ স্থির নাহি বাঁধে/ করুণ নয়নে চায়।"[৪০] এ কথা বর্ণে বর্ণে সত্যি।

নিমাইয়ের এই চারিত্রিক গুনাবলী আমরা 'গোরা' উপন্যাসের গোরার চরিত্রেও দেখতে পাই। গোরা উপলব্ধি করেছিল যে সমাজ বাইরের রাষ্ট্রশক্তির ধাক্কায় ভেঙ্গে পড়েছে। তাকে পুনরুদ্ধার করতে হলে সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করতে হবে। আর তার জন্য প্রথম প্রয়োজন চারপাশে ছড়িয়ে থাকা ভাঙ্গা-চোরা মানুষগুলিকে কাছে টেনে নেওয়া, তাদের চেনা, জানা, ভালবাসা। তাই তো "গোরা প্রত্যহ সকালবেলায়……পাড়ার নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের ঘরে যাতায়াত করিত। তাহাদের উপকার করিবার বা উপদেশ দিবার জন্য নহে – নিতান্তই তাহাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিবার জন্যই যাইত।"[৪১] দেশের বৃহৎ ঐক্য স্থাপনের লক্ষ্যে গোরা এই অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, মূঢ় মানুষগুলির সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করত। তাই সুচরিতাকে সে তার অনুভবের কথা বলেছে – "ভারতবর্ষের নানা প্রকার প্রকাশে এবং বিচিত্র চেষ্টার মধ্যে আমি একটা বৃহৎ ও গভীর ঐক্য দেখতে পেয়েছি,…… সেই ঐক্যের

আনন্দেই ভারতবর্ষের মধ্যে যারা মূঢ়তম তাদের সঙ্গে একদলে মিশে ধুলোয় গিয়ে বসতে আমার কিছুমাত্র সংকোচ বোধ হয় না।"[৪২] তাই তো ঝাঁকাওয়ালা বৃদ্ধ মুসলমানের দুঃখে সে একাত্ম হতে চায়, কখনও নগরভ্রমণে বের হয়, কখনো ত্রিবেণীতে গঙ্গাস্নানে সকল তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মেতে ওঠে এই কারণে যে "সেই জনসাধারণের সঙ্গে গোরা নিজেকে এক করিয়া মিলাইয়া দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে ও দেশের হৃদয়ের আন্দোলনকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে চায়····· সাধারণের সঙ্গে সমান ক্ষেত্রে নামিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে বলিতে চায় 'আমি তোমাদের, তোমরা আমার'।"[৪৩] উপন্যাসের অন্তিম মুহূর্তে গোরা পরেশবাবুকে বলেছে – "আমি আজ ভারতবর্ষীয়, আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন। ··· আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার অপবিত্রতার ভয় রইল না।"[৪৪] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য শ্রীচৈতন্যদেব বলতেন 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ।' তাই এ কথা বলা যায় যে গোরার চরিত্র নির্মাণে চৈতন্যদেবের নবদ্বীপকেন্দ্রিক ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রভাব অবশ্যই ছিল।

আবার চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্মের রসচর্চার ভয়ঙ্কর পরিণতি তিনি দেখিয়েছেন 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে। এই উপন্যাস সম্পর্কে সুকুমার সেন লিখেছেন – " ইহাতে অধ্যাত্ম সাধনার গভীর কথা যেমন সহজভাবে ও অনায়াসে বলা হইয়াছে তেমন আর কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না আমাদের দেশে যে সহজ সাধনার দ্বারা বাউল-দরবেশ-বৈষ্ণব-বৈরাগীরা অধ্যাত্ম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন সে সাধনার মধ্যে একটা বড় সংকট ছিল যা 'উত্তর' (অর্থাৎ উচ্চতর) সাধকের পথ আটকাইত না কিন্তু 'প্রবর্ত' (অর্থাৎ নিম্নতর) সাধকেরা তাহতে বিপন্ন হইত। রসসাধনার সেই রসাল দিকটার বিপদ যে কত সাংঘাতিক তাহা রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গে' খোলাখুলি দেখাইয়াছেন।"[৪৫] অন্যপক্ষে 'গোরা' উপন্যাসে গোরার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলিয়েছেন – " ধর্মের স্থূল ও সূক্ষ্ম, অন্তর ও বাহির, শরীর ও আত্মা, এই দুটো অঙ্গকেই ভারতবর্ষ পূর্ণভাবে স্বীকার করতে চায় বলেই যারা সূক্ষ্মকে গ্রহণ করতে পারে না তারা স্থূলটাকেই নেয় এবং অজ্ঞানের দ্বারা সেই স্থূলের মধ্যে নানা অদ্ভুত বিকার ঘটাতে থাকে।"[৪৬] 'চতুরঙ্গে'র লীলানন্দ স্বামীর উপাখ্যানে বৈষ্ণব ধর্মের সেই স্থূল বিকারের দিকটিই তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। মধুর রসের সাধনার দুর্বলতাই বিশেষ ভাবে স্পষ্ট হয়েছে তাতে। প্রেমসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে রাধা-কৃষ্ণের অপ্রাকৃত নিত্যলীলার সাধন ভজন করার পদ্ধতিটি রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে কোনোদিনই স্বীকার করে নিতে পারেননি। পরবর্তীকালে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একাধিক পত্রে তাঁর এই মনোভাব খুব জোরালো ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে একটি চিঠিতে লিখেছেন "বাংলা দেশে আমরা শাক্ত কিম্বা বৈষ্ণব ধর্মে মুখ্যত রসসম্ভোগ করতে চাই। হৃদয়াবেগের মধ্যে তলিয়ে যাওয়াকেই সাধনার

সার্থকতা মনে করি। একে আধ্যাত্মিক বিলাস বলা যেতে পারে। সবরকম বিলাসের মধ্যেই বিকারের সম্ভাবনা আছে।”[৪৭] গল্পগুচ্ছের ‘উদ্ধার’(১৩০৭), এবং ‘চতুরঙ্গে’র সমসাময়িক ‘বোষ্টমী’ গল্পে (১৩২১) এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কবিমনের অনুভব শিল্পরূপ লাভ করেছে।

এই ধরনের জীবন বিচ্ছিন্ন সাধনায় গুরুবাদ বিভ্রমের ভাববিহ্বল অন্ধ ভক্তিবিলাসের পটভূমিতেই ‘চতুরঙ্গে’র লীলানন্দ স্বামীর উপাখ্যানে শচীশের অবস্থান। শচীশের জীবনবৃত্তের দ্বিতীয় পর্যায়ে তাকে দেখা যায় লীলানন্দ স্বামীর শিষ্যরূপে। নাস্তিক শচীশ পুরোদস্তুর গুরুবাদী। কীর্তনানন্দে মাতোয়ারা। রসসাগরে নিমজ্জিত শচীশ গুরুর সেবায় আত্মনিবেদিত। কিন্তু শচীশের এই ভাবোন্মত্ততা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি।। তার রসসাধনার মাদকতা ভেঙ্গে দিয়েছিল দামিনী। এই ভক্তির আসরে দামিনী ছিল মূর্তিমান বিদ্রোহ। লীলানন্দ স্বামীর বৈষ্ণব রসসাধনা যে জীবন বিচ্ছিন্ন এবং প্রতিমুহূর্তে প্রেমভক্তি যে সেখানে লাঞ্ছিত, দামিনী তা নিজের জীবন দিয়েই টের পেয়েছিল। জীবনরসে পরিপূর্ণ দামিনী পার্থিব বিষয়কে ছেড়ে অপার্থিব ভাবরসে মত্ত হতে পারে নি।

শচীশ রসসাধনার যে স্বর্গালোকে বিরাজ করছিল তাতে প্রবল ধাক্কা লাগে আখড়ার কীর্তন দলের গায়ক নবীনের প্রথমা স্ত্রীর ‘আত্মনাশের ঘটনায়। এই ঘটনায় রসসাধনার অন্ধকারময় কুৎসিত রূপ, ভয়ঙ্কর পরিণতি ধরা পড়ে। ‘‘লীলানন্দ স্বামীর কীর্তন বাসরের অধ্যাত্ম রসের স্রোতও অচিরে শচীশের কাছে তার ভগ্নাংশ স্বরূপ নিয়ে প্রকট হল।”[৪৮] তার ভাবের সাধনার অন্তঃসারশূন্যতা স্পষ্ট হয়ে গেল দামিনীর প্রশ্নবানের তীক্ষ্ণতায় – “তোমরা দিনরাত যা লইয়া আছ তাহাতে পৃথিবীর কী প্রয়োজন? ⋯ দিনরাত রস রস করিতেছ, ওছাড়া আর কথা নাই। রস যে কী সে তো আজ দেখিলে। ⋯ এই নির্লজ্জ নিষ্ঠুর সর্বনেশে রসের রসাতল হইতে মানুষকে রক্ষা করিবার কী উপায় তোমরা করিয়াছ?” “⋯ তোমার গুরু যে পথে সবাইকে চালাইতেছেন সে পথে ধৈর্য নাই, বীর্য নাই, শান্তি নাই। ঐ যে মেয়েটা মরিল, রসের পথে রসের রাক্ষসীই তো তার বুকের রক্ত খাইয়া তাকে মারিল। কী তার কুৎসিত চেহারা সে তো দেখিলে!”[৪৯] এইখানে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব রসসাধনার কলুষময় দিকটি তুলে ধরেছেন। লীলানন্দ স্বামীর গুরুবাদী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্ব আলোচনা, আখড়ার কীর্তনের আসর এর মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর বৈষ্ণব ধর্মের গুরুবাদী সাধনার স্বরূপ এবং বৈষ্ণব ধর্মের স্বরূপ ও বৈষ্ণব ধর্মের অবক্ষয়ের চিত্রটি পরিস্ফুট করে তুলেছেন। ‘শান্তিনিকেতনে’র ভাষণেও কবি বারংবার বলেছেন “এই কথাটি মনে রাখতে হবে, ভক্তিরসের প্রেম রসের মধ্যে যে দিকটি সম্ভোগের দিক, কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুললে দুর্বলতা ও বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক আছে, যেটি না থাকলে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।”[৫০]

চৈতন্যদেব যে বৃহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে অগ্রসর হয়েছিলেন তাঁর তিরোধানের পর বৈষ্ণব সমাজ সেই আদর্শ থেকে দূরে সরে আসে। চৈতন্যদেব উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের বিভেদ বৈষম্য দূর করে সকলের মধ্যে ঐক্যের মনোভাব গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর উদার সমন্বয়বাদী বৈষ্ণব ধর্ম ক্রমশ রক্ষণশীল, অনুশাসন নির্ভর হয় পড়ে। ফলে বৈষ্ণব ধর্মের বিভেদ সুনিশ্চিত হয়ে পড়ে। একদল হয়ে পড়েন বৃন্দাবনের ষড় গোস্বামীদের অনুশাসন নির্ভর, আরেকদল তার প্রতিবাদী এবং নবদ্বীপ কেন্দ্রিক গৌর পারম্যবাদে বিশ্বাসী। ননীগোপাল গোস্বামী তাঁর 'চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব' গ্রন্থে লিখেছেন : "শ্রীচৈতন্য যতদিন বর্তমান ছিলেন, ততদিন বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে কোনও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নাই। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পর নেতৃত্বের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে কয়েক বছরের মধ্যেই নিজেদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হইয়া পরস্পর বিবদমান কতকগুলি উপশাখার সৃষ্টি হইল – গৌরবাদিগণ, অদ্বৈত সম্প্রদায়, গদাধর সম্প্রদায় ও নিত্যানিন্দ বিদ্বেষী সম্প্রদায়। ··· যিনি যেভাবে পারিলেন নেতা হইয়া বসিলেন। এইভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ যখন বিপর্যস্ত, তখন সেখানেও আরও বিশৃঙ্খল দেখা দিল গুরুবাদের প্রবর্তনে।"[৫১]

এই গুরুর হাতেই এসে গেল দীক্ষা শিক্ষার ভার, তাই কালক্রমে গুরুছাড়া গৌর ভজন হল অসাধ্য। ভক্ত আর গৌরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন গুরু। এই গুরুবাদ বৈষ্ণব ধর্মের অবক্ষয় ও বিভাজনে অনুঘটকের কাজ করেছিল। গুরু মহান্ত গিরির দিকে ঝুঁকে একদল বৈষ্ণব যেমন অর্থ ও ভোগবাদে আচ্ছন্ন হলেন, 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে দামিনীর স্বামী ও আখড়ার কীর্তন দলের গায়ক নবীনের চরিত্রে যার প্রতিফলন আমরা লক্ষ করতে পারি; তেমনি আরেকদল বিকৃতবুদ্ধি স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তি শূদ্রদের গুরুগিরি শুরু করলেন, লীলানন্দ স্বামীর চরিত্রে যার প্রতিফলন দেখা যায়।

এইভাবে চৈতন্যদেব ও তাঁর ভক্তিধর্মের প্রভাব আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনচর্চায় ও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক প্রভৃতি সাহিত্যের সব শাখাতেই পূর্ণমাত্রায় লক্ষ করতে পারি। দুই যুগের দুই মহাপুরুষ সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের হলেও উভয়েই মানবপ্রেম তথা মনবধর্মই সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন এবং উভয়েই রেণেসাঁস তথা নবজাগরণের প্রতীক। তাই এই দুই যুগপুরষ আমাদের চিরস্মরণীয়, চিরনমস্য।

তথ্যসূত্র

(১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পত্র ৬, বিশ্বভারতী, পৃ- ৫২৮।

(২) তদেব।

(৩) তদেব।

(৪) তদেব।

(৫) তদেব।

(৬) তদেব, পৃ- ৫২৯।

(৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, মানসী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃ- ৩২০।

(৮) তদেব, পৃ- ৩৩২।

(৯) তদেব, সোনার তরী, বর্ষাযাপন, পৃ- ৪৫২।

(১০) তদেব, বৈষ্ণব কবিতা, পৃ- ৪৬০-৪৬১।

(১১) তদেব।

(১২) সেন সুকুমার ও তারাপদ মুখ্যোপাধ্যায় (সম্পা), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’, মধ্যলীলা, একবিংশ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯২, পৃ- ৩২২।

(১৩) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, সোনার তরী, বৈষ্ণব কবিতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৮৭, পৃ- ৪৬১।

(১৪) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৩৯৪, পৃ-৫২১।

(১৫) তদেব, পৃ-৫২২।

(১৬) তদেব

(১৭) তদেব, পৃ- ৫২৫

(১৮) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, অষ্টাদশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ- ১৬১।

(১৯) পাল প্রশান্তকুমার, রবিজীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ- ১২২।

(২০) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ- ৫৩।

(২১) সেন সুকুমার ও তারাপদ মুখ্যোপাধ্যায় (সম্পা), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯২, পৃ- ১৬১।

(২২) তদেব।

(২৩) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, পৌরাণিক মহাপ্লাবন, বিশ্বভারতী, ১৪০৭, পৃ-৬৭৪।

(২৪) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তম খণ্ড, বউ ঠাকুরাণীর হাট, ত্রয়োস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৩৯২, পৃ- ৯৫।

(২৫) তদেব, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পৃ- ১৬।

(২৬) রায় অনিলকুমার, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ- ৭৪।

(২৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ, বিশ্বভারতী, ১৩৯৭, পৃ- ১০৫।

(২৮) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ- ২০৩- ২০৪।

(২৯) রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৪১৫, পৃ- ৭১৯-৭২০।

(৩০) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, একাদশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ- ৫২।

(৩১) সেন সুকুমার ও তারাপদ মুখ্যোপাধ্যায় (সম্পা), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯২, পৃ- ১৭৫।

(৩২) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, গোরা, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩, পৃ- ৩৮৩।

(৩৩) তদেব, পৃ- ৫৯০।

(৩৪) তদেব, পৃ- ৩৮৩।

(৩৫) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, ছেলেবেলা, বিশ্বভারতী, ১৩৯৮, পৃ- ৭২৫।

(৩৬) মুখ্যোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনকথা, আনন্দ, পৃ- ৪৫।

(৩৭) ঘোষ শঙ্খ, ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ, দেজ পাবলিশিং, ১৯৭৩, পৃ-৬৫।

(৩৮) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, দশম অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ- ৪৬।

(৩৯) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাস বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য খণ্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ- ১৯৩।

(৪০) সেন সুকুমার ও মিত্র খগেন্দ্রনাথ (সম্পা), বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ- ৭।

(৪১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, গোরা, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩, পৃ- ৪৩৭।

(৪২) তদেব, পৃ-৪৬০।

(৪৩) তদেব, পৃ- ৩৯৮।

(৪৪) তদেব, পৃ-৬৬৪।

(৪৫) সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, পৃ- ৪০৮।

(৪৬) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, গোরা, বিশ্বভারতী, ১৩৯৩, পৃ- ৪৩৭।

(৪৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃ-৬-৭।

(৪৮) বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, উপন্যাসের কালান্তর, পঞ্চম সংস্করণ, কার্তিক ১৪১০, পৃ-১৫৯।

(৪৯) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ভাদ্র ১৩৯৪, পৃ-৪৫৪।

(৫০) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী, ১৩৯৫, পৃ-৫৪৯।

(৫১) গোস্বামী ননীগোপাল, চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, প্রথম প্রকাশ, করুণা প্রকাশনী, পৃ- ১৬৫।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তারাশঙ্করের উপন্যাসে চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতিফলন

রবীন্দ্রোত্তর পর্বের যথার্থ কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর কথাসাহিত্যে মানবজীবনের বিশাল রূপ ও মানব মনের বিভিন্ন স্তর উন্মোচিত করেছিলেন বাস্তবের পটভূমিতে। তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পে একদিকে যেমন মুমূর্ষু সামন্ততান্ত্রিক ব্যক্তি, জীবন ও সমাজের ছবিটি ফুটে উঠেছে, অপরদিকে রাঢ় বাংলার অতি সাধারণ নিম্নবিত্ত শ্রেণির বেদিয়া, বাজিকর, সাঁওতাল, ডোম, আউল-বাউল-বোষ্টম, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখ ভরা জীবন কাহিনী চিত্রিত হয়েছে।

জয়দেব চণ্ডীদাসের স্মৃতিবাহী সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনা ও জীবন চর্যার প্রধান কেন্দ্র বীরভূমের সন্তান হলেন তারাশঙ্কর। জন্মসূত্রে তিনি ছিলেন শাক্ত পরিবারের সন্তান। তবে রাঢ় বাংলার সহজিয়া বাউল বোষ্টম বৈরাগীদের জীবনের সঙ্গে ছিল তাঁর আবাল্য পরিচয়। জমিদার পরিবারের সন্তান হিসাবে তাঁদের বাড়িতে মোহান্ত, কীর্তনীয়া, বৈষ্ণব ভিখারী প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষের অবাধ যাতায়াত ছিল। তাই তাদের জীবিকা ও জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবিই ধরা পড়ে তারাশঙ্করের রচনায় : " পশ্চিম বাংলার রাঢ়দেশ। এদেশের মধ্যে অজয় নদীর তীরবর্তী অঞ্চলটুকুর একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পশ্চিমে জয়দেব-কেন্দুলী হইতে কাটোয়ার অজয় ও গঙ্গার সঙ্গমস্থল পর্যন্ত 'কানু বিনে গীত নাই'। অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। এমনকি যেদিন শান্তিপুর ডুবুডুবু হইয়াছিল, নবদ্বীপ ভাসিয়া গিয়াছিল, সেদিনেরও অনেক কাল পূর্ব হইতেই এই অঞ্চলটিতে মানুষেরা 'ধীর সমীরে যমুনা তীরে' যে বাঁশি বাজে, তাহার ধ্বনি শুনিয়াছে। এ অঞ্চলে সুন্দরীরা নয়ন-ফাঁদে শ্যাম-শুকপাখী ধরিয়া হৃদয় পিঞ্জরে প্রেমের শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিতে তখন হইতেই জানিত। এ অঞ্চলের অতি সাধারণ মানুষেও জানিত, 'সুখ দুখ দুটি ভাই,সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি, দুখ যায় তারই ঠাঁই।' …"[১] এই সুখ-দুঃখ ভরা রাঢ়ের পল্লীসমাজের বাউল আশ্রিত নিম্নকোটির মানুষজনের তথা সহজিয়া বৈষ্ণব সমাজের রসমধুর কাহিনীই অত্যন্ত মমতার সঙ্গে রচনা করেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন এমন এক সংস্কৃতির বাতাবরণ তৈরি করেছিল যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বাংলা কথাসাহিত্যেও ফুটে উঠেছে। বিশেষত তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতি ও বৈষ্ণব সমাজের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে। শ্রীচৈতন্যদেব, মহাজন পদাবলী, বৈষ্ণব ভিখারী, মোহান্ত, কীর্তনীয়া, আখড়া নির্মাণ, মাধুকরী বৃত্তি, বাউল-বোষ্টম-বৈষ্ণবদের

জীবনচিত্র প্রভৃতি নানা অনুষঙ্গে পরিপূর্ণ তাঁর রচনা। বিশেষত চৈতন্যদেবের বৃহৎ গণ আন্দোলনের পটভূমিতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের বিপরীতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষকে হরিভক্তি সূত্রে একত্রিত করার যে আদর্শ ব্রাহ্মণ-শূদ্র-চণ্ডালকে সমমর্যাদা দানে ও সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছিল চৈতন্যদেবের সেই উদার মানব ধর্মই পরবর্তীতে যেসকল সাধারণ মানুষ মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিল সেই জাত বৈষ্ণব সমাজ ও সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জীবন চিত্রের বাস্তব সত্য চিত্রের প্রতিফলনই আমরা লক্ষ করে থাকি কথাশিল্পী তারাশঙ্করের উপন্যাস ও ছোটগল্পে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তাঁর প্রথম ও প্রধানতম বৈষ্ণবধর্মী উপন্যাস 'রাইকমল'। এই উপন্যাসে বাউল বৈষ্ণব সমাজে শ্রীচৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবের প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। বাউল বৈষ্ণবের নিয়ম কানুন, তাদের চালচলন, রীতি-নীতি, মাধুকরী, সমাধি, মালাচন্দন, রসকলি সবই যেন ভিন্ন সুরে বাঁধা। তারাশঙ্কর কিন্তু অত্যন্ত নিপুণ হাতেই তাঁর রূপচিত্র অঙ্কণ করেছেন এই উপন্যাসে। এই উপন্যাস প্রসঙ্গে সমালোচক ক্ষেত্র গুপ্ত মন্তব্য করেছেন, "বৈষ্ণব ভাব পরিমণ্ডল, সামাজিক বিশিষ্ট রীতিনীতি, ধর্মীয় আচার ও বিশ্বাস এই উপন্যাসের শুধু পৃষ্ঠভূমি নয়, অন্তর্ভূমি। বাউল বোষ্টম সম্প্রদায়, জাত বোষ্টম, ভেকধারী নবধর্মান্তরিত বোষ্টম – এই গল্পে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের ভিক্ষাই জীবিকা।"[২]

তাই উপন্যাসে দেখা যায় "আখড়ায় থাকে মা ও মেয়ে – কামিনী ও কমলিনী।… বৈষ্ণবের সংসার চলে ভিক্ষায়। কামিনী খঞ্জনী বাজাইয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া আনে।"[৩] এই ভিক্ষা বা মাধুকরী বৃত্তিই চৈতন্যের সন্ন্যাস জীবনের একটি অঙ্গ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভিক্ষালব্ধ অন্নেই তাঁর আহার পরিবেশিত হত। চৈতন্যদেবের সময় থেকেই বৈষ্ণবেরা হরিনাম কীর্তন করে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা সংগ্রহ করত। আরও পরবর্তীতে বৈষ্ণবরা আখড়া নির্মাণ করে বসবাস শুরু করল। এই ভিক্ষাবৃত্তি, হরিনাম সংকীর্তন, আখড়া নির্মাণ প্রভৃতি বৈষ্ণবদের জীবনযাত্রার এবং বৈষ্ণব সমাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে এই উপন্যাসে। হরিদাসের কাছেই কামিনী শখ করে গান শিখেছিল ঠিকই তবে সেই নামগানই আখড়াধারী বৈষ্ণবী কামিনীর একাকী জীবনে অন্নসংস্থানের একমাত্র সম্বল হয়ে উঠেছিল। আমরা দেখতে পাই চৈতন্যদেব প্রবর্তিত নামসংকীর্তন, কীর্তন গান পরবর্তীতে একদল মানুষের জীবিকা হয়ে উঠেছিল। আর এখানেই কীর্তন গানের গুরত্ব উপলব্ধি করা যায় একেবারে বাস্তবের পটভূমিতে।

আর রাঢ় বাংলার বাস্তব পটভূমিতে বোষ্টমদের ভিক্ষাবৃত্তি কিংবা মুখে মুখে গান পরিবেশনের যে নিপুণ চিত্র তারাশঙ্কর তুলে ধরেছেন তা যেন 'রাইকমল' উপন্যাসকে অনেকবেশি বৈষ্ণব রসে পরিপুষ্ট করেছে। দেখা যায় – "কোথা হইতে বুড়া বাউল রসিকদাস একতারা হাতে গান

গাহিয়া ভিক্ষা করিতে করিতে এই গ্রামে আসিয়া কামিনীদের আখড়ার পাশেই আখড়া বাঁধিল ⋯ বুড়া বাউল গ্রামে ঢুকিয়া গান করিয়াছিল –

‘ মধুর মধুর বংশী বাজে কোথা কোন কদম তলিতে
কোন মহাজন পারে বলিতে?
আমি পথের মাঝে পথ হারালেম ব্রজে চলিতে।
ও গো ললিতে।
হায় পোড়ামন –
ভুল করিলি চোখ তুলিলি পথের ধূলা থেকে
রাই যে আমার রাঙা পায়ের ছাপ গিয়েছে এঁকে।
আলোর ছটা চোখ ধাঁধালো চন্দ্রাবলীর কুঞ্জগলিতে।”[৪]

তখন বৈষ্ণব পদাবলীর সুললিত সুর ঝংকার বৈষ্ণবের গানের ভাবরসে পরিস্নাত হতে দেখা যায়।

শুধু তাই নয় চৈতন্যদেবের প্রভাবে যে বৈষ্ণব পদাবলী একদা ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছিল সেই বৈষ্ণব পদাবলী কিন্তু এই পল্লীবাংলার মানুষগুলির জীবনেরও একটি অঙ্গ। তাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, কথাবার্তা সবই বৈষ্ণব পদাবলীর সুরে বাঁধা। কমলিনীকে দেখে রসিকদাস গান ধরে – ‘বহুদিন পরে বঁধুয়া আইল।/ দেখা না হইত পরাণ গেল।’[৫] আবার কখনওবা গায় –

“সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।”[৬]

আবার কখনো কমলিনী গুনগুন স্বরে গেয়ে ওঠে –‘সখি বলিতে বিদরে হিয়া/ আমারি বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙিনা দিয়া।’[৭] এইভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর সুর ঝংকারের মধ্যে দিয়েই তাদের মুখে মুখে ফিরতে থাকে গোরাচাঁদের কথা : “ গোরার সেরা গোরা চান্দ চল দেখে আসি !”[৮]

আবার, কামিনী, কমলিনী, রসিকদাস নবদ্বীপে এসে আখড়া নির্মাণ করে বসলে সেখানে বৈষ্ণব মহান্তদের , সাধু সঙ্গদের ভিড় হতে থাকে, সকাল- সন্ধ্যায় আখড়ায় নামগান জমে ওঠে, এই প্রসঙ্গে আসে চৈতন্যদেব তথা গোঁরাচাদের কথা। রসিকদাস বলে : “⋯ এ যে চাঁদের হাট বসিয়ে দিলে গো রাইকমল! আহা –হা কী সুন্দর রূপ গো! গোরাচাঁদের দেশের রূপই আলাদা।”[৯] এইভাবে চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নবদ্বীপের প্রসঙ্গ ঢুকে পড়ে উপন্যাসে। কেবল তাই নয়, রাইকমল তার মনের কথা জানাতেও গোরার প্রসঙ্গ টেনে আনে। “প্রবল বিস্ময়ে রসিকদাস বলিল, এমন সোনার গোরায়

তোমার মন উঠল না রাইকমল? হাসিয়া কমলিনী বলিল, না, বগ-বাবাজী। তবে হ্যাঁ, ওই রূপের মানুষটি যদি পেতাম তা হলে পায়ে বিকতাম, তবে মন উঠত।"[১০]

এইভাবে গানে গানে বৈষ্ণব পদাবলীর সার্থক প্রয়োগ, 'দুয়ারে দুয়ারে বৈষ্ণব ভিখারীর গান গেয়ে ভিক্ষা করা, আখড়া নির্মাণ করে মোহান্ত সাধু সঙ্গ মিলিত হয়ে হরিনাম কীর্তন সব মিলিয়ে বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব সমাজের ছবি উপন্যাসটিতে যেভাবে ফুটে উঠেছে তাতে শ্রীচৈতন্যদেবের সুদূরপ্রসারী প্রভাবের প্রতিফলনই ধরা পড়ে।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব ধর্মে রাধার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে নারীর মর্যাদা সেদিনের সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছিল। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনে জাতি-ধর্ম-বর্ণই শুধু নয়, লিঙ্গও নির্বিশেষে সকলের জন্যই যে সাম্য ও স্বাধীনতার বা আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল তাতে মধ্যযুগের অবরোধবাসিনী, অন্তঃপুরচারিনী নারীও যথোচিত সন্মান ও মর্যাদা লাভ করেছিল। এই চেতনাই আরো পরবর্তীকালে বাউল-বোষ্টম-বৈষ্ণবদের জীবনে বিবর্তিত হতে থাকে। নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব সমাজের পাশাপাশি জাত বৈষ্ণব ও সহজিয়া বৈষ্ণব সমাজে নারীর গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সমাজ নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা তথা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার পথ খুলে দেয়। তারই সার্থক রূপচিত্র ধরা পড়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রসকলি', 'রাইকমল', 'রাধা', 'স্বর্গমর্ত্য' প্রভৃতি রচনায়।

চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের বৃহৎ সুবিস্তৃত পরিধিতে যুগ যুগ ধরে অবহেলিত অবদমিত বঞ্চিত নারীর উজ্জীবনের ভাবনাও গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল। মধ্যযুগীয় অবরোধবাসিনী, অন্তঃপুরচারিণী নারী বৈষ্ণবধর্মের উদারতার সূত্রে অন্দরের ঘেরাটোপ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে পুরুষের সঙ্গে একত্রে ধর্ম প্রচারের ও ধর্মাধিকারের সুযোগ পেয়েছিল, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই গৌরাঙ্গের নির্দেশ ছিল -

"দশ পাঁচ মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।

কীর্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া।।

হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।

সংকীর্তন করিল তোমা সবাকারে।

স্ত্রী পুত্র বাপে মিলি কর গিয়া ঘরে।।"[১১]

নবদ্বীপে শ্রীবাসের গৃহে লীলা বিস্তারের কালে তিনি নিজেই বন্দীত্বের শিকল ভেঙে নারীকে আহ্বান করেছিলেন ধর্মের বৃহত্তর প্রাঙ্গনে-

"স্ত্রী পুত্র আদি যত তোমার বাড়ীর।

দেখুক আমার রূপ করহ বাহির।।

সস্ত্রীক হইয়া পূজ চরণ আমার।

বর মাগ যেন ইচ্ছা মনেতে তোমার।।"[১২]

কেবল তাই নয়, কাজীর বিরুদ্ধে তিনি সমগ্র নবদ্বীপ জুড়ে যে বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিলেন সেখানে শূদ্র আদি চণ্ডাল থেকে শুরু করে স্ত্রীজাতিরও সংকীর্তনে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকে যে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ডঃ সত্যবতী গিরি লিখেছেন - " বৃন্দাবন দাসের মতে নদীয়ার 'অনন্ত অর্বুদ লক্ষ লোক' এই শোভাযাত্রায় অংশ নিয়েছিল। ……

হৈল দেউটিময় নবদ্বীপপুর।

স্ত্রী বাল বৃদ্ধেরও রঙ্গ বাড়িল প্রচুর।।

লক্ষণীয় এই বিপুল সংকীর্তনে স্ত্রীলোকেরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন।"[১৩]

এইভাবে বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের সূত্রে মধ্যযুগের অবরোধবাসিনী নারী অন্দরমহলের ঘেরাটোপ থেকে বাইরে বেরিয়ে প্রকাশ্য রাজপথে নামসংকীর্তনের অধিকার লাভ করেছিল। পুরুষের সঙ্গে একত্রে ধর্মাচরণের অধিকার লাভ করেছিল। বৈষ্ণব কবি লিখেছেনঃ

"বঙ্গদেশীয় লোক বড় ভাগ্যবান।

স্ত্রীপুরুষে মিলি করে সংকীর্তন গান।।"[১৪]

কেবল তাই নয়, চৈতন্যের আন্দোলনে মেয়েদের দীক্ষালাভের অধিকারও স্বীকৃত হয়েছিল। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' রয়েছে - 'বিধবা সধবা সভারে দেহ নাম।'[১৫] কেবল দীক্ষাদানই নয়, নারীর ক্ষমতার উপর শ্রদ্ধাবশতই চৈতন্যদেব তাঁর অবর্তমানে নবদ্বীপের নামসংকীর্তনের গুরুদায়িত্ব দিয়ে যান বিষ্ণুপ্রিয়াকে -

"শুন সতী বিষ্ণুপ্রিয়া বৈষ্ণব জননী।
নবদ্বীপ রক্ষা কর চিন্তা মনে গণি।।
তুমি না থাকিলে হব সংকীর্তনবাদ।
নবদ্বীপ লৈয়া হবে বড়ই প্রমাদ।।"[১৬]

যে সংকীর্তনের মাধ্যমে তিনি গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তারই পুরোভাগে সেদিন তিনি স্ত্রীকে স্থান দিয়েছিলেন।

এইভাবে সমাজে নারীর ধর্মাধিকার প্রতিষ্ঠায়, তার আত্মবিকাশে, আত্মপ্রতিষ্ঠায় চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা স্মরণ করে ডঃ রমাকান্ত চক্রবর্তী লিখেছেন - "One of the positive result of the Chaitanya movement was evaluation of the social and religious status of women in Bengal."[১৭] এমনকি যদুনাথ সরকারও বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের যে সুফলগুলির কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হল 'স্ত্রীলোকের সন্মান বৃদ্ধি'।

আর এই সূত্রেই নারী সমাজ শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতেও পদচারণার সুযোগ পেয়েছিল। এই শিক্ষাই হয়ে উঠেছিল তাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রেরণা। এরই অনিবার্যতায় চৈতন্যোত্তর কালে বাংলাদেশে বৈষ্ণবীয় ধর্মান্দোলন পরিচালনার মুখ্য সাংগঠনিক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল মেয়েরা।[১৮] সেখানে জাহ্নবা দেবী, সীতা দেবী, হেমলতা ঠাকুরাণীর মতো মহিলারা ধর্মান্দোলন পরিচালকের দায়িত্ব নেন এবং বাংলার মহিলা বৈষ্ণব গুরুর স্বীকৃতি ও সন্মান অর্জন করেন। রমাকান্ত চক্রবর্তী তাঁর ' বাঙালীর ধর্ম ,সমাজ ও সংস্কৃতি' গ্রন্থে তেরো জন[১৯] বৈষ্ণবীর কথা বললেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান সূত্রে আরও তিরিশ থেকে পঁয়তিরিশ জন বৈষ্ণবীর নাম পাওয়া যায় যারা শুধু শিক্ষিতাই ছিলেন না, ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ও স্ত্রীগুরু হিসাবে সন্মানিত।

তবে চৈতন্যের ধর্মান্দোলন সূত্রে মেয়েদের সামাজিক উর্ধ্বায়নের প্রবহমানতাও ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণীয় বৈষ্ণবতার সংকীর্ণ আশ্রয় ছেড়ে বর্ণাশ্রমবিরোধী মানবিকতার (যা প্রকৃতপক্ষেই ছিল কাঙ্ক্ষিত) বৃহৎ ক্যানভাসে নিজের গতিপথ করে নেয়। এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিল 'সহজিয়া' ও 'জাত বৈষ্ণব সম্প্রদায়'। ব্রাত্য, অস্পৃশ্য গৌড়ীয় সমাজ বহির্ভূত এইসব সমাজে চৈতন্যোপাসক মানুষের আখড়াগুলি হয়ে উঠেছিল একইসঙ্গে সামাজিক নিষ্পেষণে হতশ্বাস নারীদের সম্মানজনকভাবে বাঁচার জায়গা, অন্যদিকে শাস্ত্র-সাহিত্য চর্চার অন্যতম কেন্দ্র। চৈতন্যভক্তিধর্ম প্রসারের ফলশ্রুতিরূপে এই আখড়াগুলিতে আর্ত, আতুর, অসহায়, নিরাশ্রয় ,স্বামীপরিত্যক্তা,সধবা বিধবা নারীরা স্থান লাভ করে সমাজে পুনরায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। যদিও এই আখড়াগুলিতে অনেক অনাচার, কদাচার চলত তবুও এই আখড়াগুলিই ছিল নিঃসহায়, নিরলম্ব, সমাজ বিচ্যুত, বঞ্চিত, জাতহারা, মানহারা নারীদের একমাত্র আশ্রয়।

আর বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রসারে আখড়াগুলির ভূমিকা, আখড়াগুলিকে কেন্দ্র করে বোষ্টমী, সেবায়েতদের জীবনবৃত্ত রচনা, আখড়াগুলির নিখুঁত বর্ণনায় সবচেয়ে বেশি সার্থকতা দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। রাঢ় অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব , বৈষ্ণবধর্মের প্রসার ও পরিবর্তন ,আখড়া নির্মাণ, বৈরাগী বোষ্টমীদের জীবনচিত্র প্রভৃতি তারাশঙ্করের রচনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে - " ---- গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত অঞ্চলটি অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। আকাশের চাঁদকে লজ্জা দিয়া নবদ্বীপে শচী মায়ের কোলে গৌরতনু শিশুর আবির্ভাব যেদিন হয় – সেদিনও বুঝিতে পারি নাই এই শিশুর পদরেখা ধরিয়া নতুন ভাব ভাগীরথী উদ্ভূত গোটা দেশটা ভাসাইয়া দিবে।--- এ অঞ্চলে প্রতি পাঁচখানি গ্রামে একটি করিয়া বৈষ্ণবের আখড়া।"[২০] আমরা দেখতে পাই এই আখড়াকে কেন্দ্র করেই কীভাবে তারাশঙ্করের উপন্যাস ও ছোটগল্পের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে এবং নারী চরিত্রগুলি আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিচয় রেখেছে।

'রসকলি' গল্পের নায়িকা মঞ্জরীই 'রাইকমল' উপন্যাসের কমলিনী হয়ে ফুটে উঠেছে। রাইকমলের জীবনাচরণের মধ্যে একদিকে যেমন আছে দেহজ আকাঙ্ক্ষা, তেমনি অন্যদিকে আছে সেই আকাঙ্খা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মানবিক প্রেমের অভীপ্সায় নিরন্তর পথ চলার প্রয়াস। একদিকে বৈষ্ণবীয় জীবন ও ধর্মের সংস্কার অন্যদিকে অবচেতন মনের সুপ্ত কামনা – এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে কমলিনী ক্ষতবিক্ষত। কমলিনীর সাজসজ্জা, পোশাক- পরিচ্ছদের মধ্যে যথার্থ বৈষ্ণবের লক্ষণই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে – "সে চুল সে পরিপাটি বিন্যাস করিয়া রাখাল চূড়া বাঁধে। ঈষৎ বাঁকা নাকটির সুবঙ্কিম মধ্যস্থলেই শুভ্র তিলক মাটি দিয়া একটি সূক্ষ্ম রসকলি আঁকে। ---- গলায় থাকে দুকণ্ঠি মিহি তুলসি কাঠের মালা।"[২১] এই বৈষ্ণবীয় সাজ-সজ্জার বিন্যাসেই কমল রাইকমল হয়ে ওঠে – "কচি মুখে রসকলি ও খাটো চুলে

বাঁধা চূড়া ঝুঁটি দেখিয়া বাউল বলিয়াছিল, এ যে দেখি খাসা বোষ্টমী! কি নাম গো তোমার? - কমলিনী বলিয়াছিল, আমি কমল। বাউল বলিয়াছিল, শুধু কমল ন্যাড়া শোনায়, তুমি রাইকমল।"[২২] বাস্তবে সামাজিক ভ্রুকুটি, দুর্বৃত্তদের হিংস্র লোলুপতা প্রভৃতি প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে বুড়া বাউল রসিক দাসকেই সে মালাচন্দন করতে বাধ্য হয়। এ সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন - " তাহার রাইকমলের স্বপ্ন বিভোর তন্ময়তা, তাহার প্রণয়াবেশের পার্থিব হইতে অপার্থিব স্তরে উন্নয়ন সাধারণ বৈষ্ণবের অনুভূতির অনেক উর্ধ্বে। রসিকদাসের সহিত রাইকমলের মালাবদল ঘটনা হিসাবে অবিশ্বাস্য হইলেও, এই ব্যাপারে ---- আসক্তি ও বৈরাগ্য, পার্থিব ও ঐশ প্রেমের অবিরত অন্তর্দ্বন্দ্বে উভয়েই শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে।"[২৩] অচিরেই রসিকদাসের মধ্যে কামনার হিংস্রতা উদগ্র হয়ে ওঠে , আর তার কুৎসিত রূপ দেখে কমলিনীর নারী সত্ত্বা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। রসিকদাসকে সে গুরুপদে বরণ করলেও তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে নি।

কণ্ঠীবদল করে পতিগ্রহণের বৈষ্ণবীয় রীতি অনুসারেই কমলিনী জীবনের উপান্তে রঞ্জনের সঙ্গে মালাবদল করেছে। রঞ্জনের সাথে তার অবিচ্ছিন্ন মিলনের গাঢ় আনন্দ যখন ফিকে হয়ে এসেছে তখন রঞ্জন আর একটি তরুণীকে ঘরে নিয়ে এসেছে। কিন্তু কমল পুরুষের এই বহুগামিতা, স্বেচ্ছাচারিতা, রূপপযৌবনের ক্ষুধাকে মোটেই মেনে নিতে পারে নি। রঞ্জন যখন তাকে কিশোরী ভজনার ইঙ্গিত দিয়ে বলেছে "তুমি তো জান, বৈষ্ণবের সাধনা – রাধারাণীর কল্পনা – যৌবনরূপ – "[২৪] তার প্রত্যুত্তরে কমলিনী শান্ত প্রতিবাদের সুরে বলেছে " তোমার সাধন পথেই তো যাচ্ছি আমি। আমিও তো বৈষ্ণবী, আমারো তো চাই একটি শ্যাম কিশোর ---- তারই সন্ধানে চলেছি আমি। ---- কমল পথে বাহির হইয়া পড়িল।'[২৫]

ড. সত্যবতী গিরির মতে, "লোকায়ত বৈষ্ণবধর্মের সাধন পন্থা শুধু পুরুষের জন্য নয়, নারীর জন্যও। পুরুষ শাসিত সমাজ নারীর সেই অধিকার হরণ করতে চাইলেও মালাচন্দনের নায়িকা তুলসী তা হতে দেয়নি।"[২৬] এখানে 'রাইকমলে'র কমলিনীও তা হতে দেয় নি। এ সম্পর্কে বিশিষ্ট অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত লিখেছেন - " তার গৃহ ত্যাগের নিগূঢ় বেদনা , আত্মসন্মান বোধ এবং বৈরাগ্যকে সহজে বরন করার শক্তি একযোগে কাজ করেছে। কমল বোষ্টমী শুধু প্রণয়ে স্বাধীন নয়, প্রণয় বন্ধন ছিন্ন করায়ও সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোথাও তার বোষ্টম সমাজকে বিচলিত না করেই লেখক এক আধুনিক রমনীকে আবিষ্কার করেছেন রাইকমলে।"[২৭] এইভাবে বৈষ্ণবীয় আবহে রাইকমল চরিত্রটির মধ্য দিয়ে এক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী নারী সত্তারই পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। আর এখানেই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে ঔপন্যাসিকের ভাষ্য - "কমল শুকায়, কিন্তু রাইকমল ,সে তো কখনও শুকায় না।"[২৮] " তাই বৈষ্ণবী পথের পর পথ পিছনে ফেলিয়া চলে। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে গান গাহিয়া ভিক্ষা চায় ⋯ রসিক শ্রোতার দল ⋯ হাসিয়া বলে, বোষ্টমীর গান যেমন মিষ্টি , হাসিও তেমনি মিষ্টি। ⋯ বৈষ্ণবী হাসিয়া উত্তর দেয়, বৈষ্ণবীর ওই তো সম্বল

প্রভু।”[২৯] এর মধ্য দিয়ে চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন সূত্রে নারীর স্বাধীনসত্তা উন্মোচনের তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের প্রতিফলনই লক্ষ করা যায়।

এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী নারীই বারে বারে ফিরে আসে কথাসাহিত্যের পথ ধরে। তারাশঙ্করের ‘মালাচন্দন’ এ আমরা দেখতে পাই তুলসী স্বামীর নিবিড় আত্মসমর্পণ চেয়েও পায় নি। কারণ মোহনদাস ছিল রূপের ভিখারি, হৃদয়ের নয়। তাই মোহনদাস আবার তৃতীয় স্ত্রী যখন ঘরে এনেছে তখনই তুলসীর নারীত্বে, সম্ভ্রমে তীব্র আঘাত লেগেছে। স্বামীর ভালোবাসার অভিনয়কে সে সহ্য করতে পারে নি, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। মধ্যযুগীয় পরিকাঠামোয় অবরোধবাসিনী যে নারী সতীনের সঙ্গে ঘর করতে বাধ্য হত সেখানে দাঁড়িয়ে বৈষ্ণবধর্মে নারীর স্বাধীনতার সূত্রে পরবর্তী কথাসাহিত্যে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসে উজ্জ্বলতম নিদর্শন হয়ে থাকে রসকলি, রাইকমল, তুলসী। বিশিষ্ট সমালোচকের মতে – “ … ‘রসকলি’র মঞ্জরী, ‘রাইকমলে’র কমলিনী, ‘মালাচন্দনে’র তুলসী চরিত্রধর্মে তাই তিন সহোদরা, কিন্তু শীল ধর্মে তারা সকলেই পৃথক ও স্বতন্ত্র।”[৩০]

শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসের প্রধান পদক্ষেপই হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা। কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তিরূপে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের মধ্য দিয়েই গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে নতুন ধারা সূচিত হয়। আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘রাধা’ উপন্যাসে রাধার শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন করেছেন বাস্তবের পটভূমিতে বাস্তবের রাধা মোহিনী চরিত্রটির মধ্য দিয়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মের বিবর্তন ও অবক্ষয়ের পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাস। চৈতন্যের মধ্যে দিয়ে এক জাতীয় অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছিল বৈষ্ণব ধর্মে, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় বিভূতি রূপান্তরিত হয়েছিল মাধুর্যরস রূপময়তায়। শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যসম্প্রদায়ের উজ্জ্বল উপস্থিতির কালে প্রেমাবতারের ভাবের প্লাবন দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেই প্রতক্ষ্য অনুভূতি ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একথা ইতিহাস স্বীকৃত যে চৈতন্যদেব অপ্রকট হওয়ার পর বৈষ্ণবধর্মের অনেক ক্ষেত্রে স্বধর্মচ্যুতি ঘটে, শুদ্ধতার অবনমন ঘটে।‘চৈতন্যচরিতামৃত’ অনুসরণে শ্রীমতি রাধার মধ্যেই যেখানে পরকীয়া প্রেমের সর্বাত্মক বিকাশ – “সর্ব রস হৈতে শৃঙ্গারে অধিক মাধুরী।/ অতএব মধুর রস কহি তার নাম।/ স্বকীয়া পরকীয়া ভাবে দ্বিবিধ সংস্থান।।/ পরকীয়া ভাবে অতি রসের উল্লাস।/ …… তার মধ্যে শ্রী রাধিকার ভাবের অবধি ।।”[৩১] সেই পরকীয়া তত্ত্ব পরবর্তীতে স্বধর্মচ্যুত হয়ে লোকসমাজে বিকৃত কদাচারের রূপ নেয়। উপন্যাসে কৃষ্ণদাসী চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে লেখক বৈষ্ণব ধর্মের সেই অবনমনের অবক্ষয়ের ধারাটি চিত্রায়িত করেছেন।

বৈষ্ণব ধর্মের এই পরিণতি, এই লালসালাঞ্ছিত ক্লেদ পিচ্ছিলতা মাধবানন্দকে কংসারী সাধনের একক পথের পথিক করে তুলেছিল। বৈষ্ণবধর্মের সংস্কারের আদর্শে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মাধবানন্দ পরকীয়া তত্ত্বের উচ্ছেদ করে 'স্বকীয়া মত' প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন এবং দণ্ড হাতে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যময় রূপকে প্রতিষ্ঠিত করার নিমিত্ত রাধার সংসর্গ পরিত্যাগ করতে চেয়েছেন। তবে তার ধর্মসাধনের একদেশদর্শিতা দূর করার জন্য রাধারূপী এক কিশোরী তিলে তিলে নতুন হয়ে ওঠবার জন্য বিন্দু বিন্দু মাধুরী দিয়ে রূপে স্বরূপে বৈষ্ণব সাধনার পূর্ণতার অবয়বে সৃজিত হয়ে উঠেছিল। তারাশঙ্কর তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে - " মেয়েটি অপরূপা। কিশোরী অথবা যুবতী বোঝা যায় না। ··· মুখে আশ্চর্য একটি দ্যুতি। সুকোমল সারল্যের মাধুর্য, বর্ষাসন্ধ্যায় অর্ধবিকশিত জুঁইফুলে ভরা জুঁইলতার মত শুভ্র নিষ্কলুষতায় প্রসন্ন ও পবিত্র।"[৩২]

ন্যাড়ানেড়ী সম্প্রদায়ের পঙ্কে জন্মেও সে যেভাবে এক অভিনব তপস্যায়, একাগ্রতায়, শিশিরস্নাত পবিত্রতায় আত্মপরিশুদ্ধিকরণের মধ্য দিয়ে পঙ্কজ হয়ে ফুটে উঠেছে, তাতে প্রকৃতঅর্থে মোহিনী এক অন্যনসাধারণ নারী চরিত্র হিসাবে আত্ম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস রচনা করেছে। প্রেমে-পরিচর্যায়-আত্মনিবেদনে সে যেভাবে কংসারী সাধক মাধবানন্দের কঠিন হৃদয় পাথরকে ফাটিয়ে প্রেম প্রবাহিনী হয়ে উঠেছে, মধুর রসের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছে তাতে তার ব্যক্তিত্বময়ী নারী সত্ত্বা উজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। তাই যে মাধবানন্দ একদা তাকে অস্বীকার করেছিলেন, জীবন সায়াহ্নে এসে সেই মাধবানন্দই মোহিনীর মধ্যে রাধার অস্তিত্ব অনুভব করে অন্তরের সত্যস্বরূপকে উপলব্ধি করেছেন – "মাধবানন্দের চোখ থেকে জলের ধারা নেমে এল। ··· তুমি রাধা, তুমি রাধা, তুমি রাধা।"[৩৩] আর এখানেই মোহিনীর নারী ব্যক্তিত্বের, তার আত্মপ্রতিষ্ঠার জয় সূচিত হয়েছে এবং বাংলা সাহিত্যে বাস্তবের পটভূমিতে রাধার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্যধর্মের বিবর্তন, অবক্ষয়ের মধ্যেও মানুষকে চিরজীবিত রাখে যে প্রেম তাকে যে শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি দিতে পেরেছেন মাধবানন্দ, এখানেই এ প্রেম ধর্মের জয় ঘোষিত হয়েছে যা শ্বাশত, চিরন্তন, ধ্রুব সত্য। প্রখ্যাত সমালোচক সমরেশ মজুমদারের মতে, " লেখকের বিশ্বাস মতে আছে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান, তিনি রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ এবং অন্তরঙ্গে তিনি শ্রীকৃষ্ণ বহিরঙ্গে তিনি শ্রীরাধা – বৈষ্ণব তাত্ত্বিকদের এই ধারণা শেষ পর্যন্ত মাধবানন্দের জীবনে সার্থক হয়ে উঠুক একথা ভেবে কৃষ্ণদাসীর পরকীয়া সাধনের অস্বচ্ছতার মধ্যে বৃন্তহীন পুষ্পসম মোহিনীকে এনে উপস্থাপিত করেছেন তারাশঙ্কর, ····· লেখকের ঈপ্সিত লক্ষ শক্তিসম্ভূত কংসারী কৃষ্ণের পাশাপাশি অনন্ত প্রেমময় নীরদনয়নে নীরঘন সিঞ্চনে পুলক মুকুল অবলম্বিত স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত ভাবকদম্বময়

শ্রীচৈতন্য সত্ত্বা স্বরূপ প্রেমে অনুরাগে অভিসিঞ্চিত হয়ে ওঠার মধ্যে সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রেমের দেবতা প্রাণের দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন।"[৩৪]

আমরা দেখতে পাই তারাশঙ্করের 'স্বর্গমর্ত্য' উপন্যাসে স্বামী পরিত্যক্তা বোষ্টুমী ব্রজদাসী কুড়িয়ে পাওয়া একটি সন্তানের জন্য সমস্ত কলঙ্ককে মাথায় করে নরোত্তম দাস বাবাজীর প্রতিষ্ঠিত আখড়ায় গোপালের সেবায়েত নিযুক্ত হয়। লেখকের বর্ণনায় : " সুবলপুরের গোপাল ঠাকুরের আখড়ায় জন্মাষ্টমীতে খুব সমারোহ। ..... আখড়ার সেবায়েত ব্রজদাসী বষ্টুমী।..... থান কাপড় পরিয়া কপালে তিলক ও নাকে রসকলি কাটিয়া ব্রজদাসী ঘনশ্যাম পল্লবঘেরা আখড়াটিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। আখড়াটি যেন স্নিগ্ধ হইয়া থাকে।"[৩৫] এই উপন্যাসটিকে তারাশঙ্করের 'রাইকমল', 'রসকলি', 'রাধা' প্রভৃতি বৈষ্ণব জীবনাশ্রিত রচনার ঐতিহ্যধারার অনুসারী বলা যায়। তবে অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় এই উপন্যাসটির স্বাতন্ত্র্য এই যে এখানে বাৎসল্য রসের ফল্গুধারা বোষ্টমীর জীবনকে প্রবাহিত করেছে। এই উপন্যাসে বৈষ্ণব আখড়ার চিত্রটা একটু ভিন্নধর্মী। এখানে কৃষ্ণের নন্দোৎসব পালিত হয় মহা ধূমধামে। দূর-দূরান্ত থেকে বৈষ্ণব মহাজনেরা আসেন, নামসংকীর্তন,ভাগবত পাঠ চলতে থাকে। তবে আখড়ার প্রধান আকর্ষণ ব্রজদাসীর গান। এই ব্রজদাসী তার অতীতের কথা স্মরণ করে গেয়ে ওঠে ----

" সখি বলিতে বিদরে হিয়া

আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙিনা দিয়া।।

নানা জনে নানা কথা বলিত। কুৎসিত অশ্লীল ইঙ্গিত মন্তব্য। কিন্তু সে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গান ধরিত -----

কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন

এ দুটি নয়নতারা।

গাহিতে গাহিতে সে গানের মধ্যেই নিজেকে ডুবাইয়া দিত ---

গঞ্জে গুরুজন বলে কুবচন

সে মোর চন্দন চুয়া

শ্যাম অনুরাগে অঙ্গ বেচিয়াছি

তিল তুলসী দিয়া।।" [৩৬]

আর তার সুমিষ্ট স্বরে, মধুর পদাবলী কীর্তনে, সর্বোপরী ব্রজদাসীর শান্ত নিরীহ স্বভাব বৈশিষ্ট্যে সজ্জন দুর্জ্জন সকলেরই চিত্ত প্রশমিত হয়ে যেত। লেখকের কথায় "গানের মহিমায় মানুষগুলির মনে উচ্ছৃঙ্খলতা, কুৎসিত লালসা আপনি শান্ত হইয়া আসিত। ভাবান্তর ঘটিত। মুহূর্তপূর্বে যাহারা কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছিল তাহারাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিত, যাহারা অশ্লীল মন্তব্য করিয়াছিল তাহারাই বলিত আহা-হা!"[৩৭] এখানেই ব্রজদাসীর নারীসত্তার জয় ঘোষিত হয়। গোপাল ঠাকুরের আখড়াকে কেন্দ্র করেই সে সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিচয় রেখেছে। আর এই আখড়ায় পুরুষ মোহান্ত কীর্তনীয়াদের সঙ্গে একাসনে বসে মহাজন পদাবলীগান, কীর্তন, ভক্তসমারোহ ইত্যাদি ব্রজদাসী চরিত্রটির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরই পরিচয় বহন করে।

শ্রীচৈতন্যের উদার সাম্যবাদী মানবিক প্রেমধর্মের আদর্শ কেবল ষোড়শ-সপ্তদশ শতকেই যে মানুষকে উদ্ধার করেছিল তাই নয়, এই ধর্মনীতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু পিছিয়ে পড়া অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষকে উদ্ধারের পথ দেখিয়েছে ; তাদের আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপিত করেছে। চৈতন্যদেব তাঁর বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন সূত্রে কেবল হরিনাম উচ্চারণের মধ্য দিয়েই নিচজাতি,হীনবৃত্তিধারী, সমাজের পতিত ও পতিতাদেরও উদ্ধারের আহ্বান জানিয়েছিলেন। আর তারই সুদূরপ্রসারী প্রভাব বাংলা কথাসাহিত্যেও ধরা পড়েছে। বিশেষত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ় বাংলার প্রান্তবাসিনী বারাঙ্গনা তথা দেহোপজিবীনি, ডোম সম্প্রদায় প্রভৃতি সমাজের উপেক্ষিত নিম্নবিত্ত মানুষগুলির বৈষ্ণব ধর্মের উদারতার সুবাদে উন্নততর জীবনে উত্তরণের বাস্তব সত্যচিত্র তুলে ধরেছেন তাঁর রচনায়।

এ প্রসঙ্গে আমরা তাঁর 'কবি' উপন্যাসটির কথা উল্লেখ করতে পারি। এই উপন্যাসে হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশের একটি ছেলে নিতাইচরণের কবি হয়ে ওঠার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। লেখকের কথায় – "এই নিতাইচরণ সেই বংশের ছেলে। খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙ্গাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র – নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। ··· বড় বড় চোখের দৃষ্টি তাহার বড় বিনীত এবং সে দৃষ্টির মধ্যে একটি সকরুণ বিনয় আছে। সেই নিতাই অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল।"[৩৮] ডোমের সন্তান হয়েও কবিয়াল নিতাই উপলব্ধি করেছিল – পথই তার পথ, বৈরাগ্যেই উদ্ধার। শুধু প্রতিষ্ঠাই তার পুরুষার্থ ছিল না, সে চেয়েছিল নীচ জীবন থেকে উদ্ধার পেতে, চেয়েছিল অন্ধকার থেকে মুক্তি, নীচ জন্ম যে কারণে সেই কর্মফল অবসিত হোক, সার্থক হোক এই জন্ম, এই ছিল তার পুরুষার্থ : "আমার কর্মফল/ দয়া করে ঘুচাও হরি জনম কর সফল।"

চৈতন্যদেব তথাকথিত কোনো ধর্মপ্রচারক ছিলেন না, এমনকি সমাজ সংস্কারকও ছিলেন না। তবে তিনি যেভাবে হরিনাম সূত্রে প্রেমভক্তি প্রচারের মধ্যে দিয়ে ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, উচ্চ-নীচের বিভেদ বৈষম্য দূর করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে এক অখণ্ড ভাবৈক্যসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন তাই পরবর্তীতে সমাজে এক বিরাট সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা হয়ে উঠেছিল। এ প্রসঙ্গে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য : "ঠিক যাহাকে সমাজ সংস্কার বলে বা য়ুরোপীয় আদর্শে যাহা humanism নামে পরিচিত, চৈতন্যদেব সজ্ঞানে তাহার প্রবক্তা বা প্রচারক ছিলেন না ঠিকই; কিন্তু চৈতন্য প্রভাবে সমাজের নিম্ন বর্ণেরাও যে উত্তর চৈতন্যযুগে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার্য।"[৩৯] তারই সুদূরপ্রসারী প্রভাব আমরা তারাশঙ্করের রচনায় এই প্রান্তবাসিনী সমাজের হিনবৃত্তিধারী মানুষগুলির সুখ-দুঃখ ভরা জীবনালেখ্যতে ফুটে উঠতে দেখি।

'কবি' উপন্যাসের নিতাই কবিয়াল তার বংশ পরম্পরাগত দস্যুবৃত্তি ও বর্বরোচিত কুৎসিত জীবনচর্যাকে গ্রহণ না করে কবিয়াল জীবনে প্রতিষ্ঠা পেতে চেয়েছে। তাই গ্রামের নৈশ বিদ্যালয়ে সামান্য পড়াশুনা করে আর রামায়ণ মহাভরতের কাহিনীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে গ্রামের ভদ্র সন্তানদের মতো সৎ জীবনাচরণে আগ্রহ দেখিয়েছে নিতাই কবিয়াল। কবিগান পরিবেশনের মধ্যে দিয়েই ভবিষৎ জীবনে কবিয়াল হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে সে। তাই বংশ পরম্পরাগত চৌর্যবৃত্তি, দুষ্কর্ম থেকে এমনকি সেই নাম থেকে পর্যন্ত বেরিয়ে আসার জন্য সে আত্মীয়-পরিজন এবং গ্রাম পর্যন্ত ত্যাগ করেছে। চণ্ডী মায়ের পূজা উপলক্ষে প্রথম কবিয়াল রূপে তার আত্মপ্রকাশ। যদিও সেখানে মহাদেব কবিয়ালের অশ্লীলতার কাছে সে পরাজিত হয়েছে কিন্তু ভদ্র সমাজের চাকুরে বাবু তার কবিত্বের প্রশংসা করে তাকে মেডেল দিতে চেয়েছে এবং প্রকাশ্যে তাকে কবি বলে সম্বোধন করেছে : "চাকুরে বাবুটি ··· বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন – ইউ আর এ পোয়েট, এ পোয়েট!"[৪০] এখানেই প্রথম নিতাই তার প্রকৃত সন্মান পায় এবং 'নিতে', 'নেতা', 'নেতাই' থেকে নিতাইচরণ হয়ে ওঠে। তার কবিগান পরিবেশনের সূত্রেই উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে বৈষ্ণবীয় রসের উপাদান। নিতাইয়ের একটি বিশেষ গান আসরময় সারা ফেলে দিত –

"আহা – ভালোবেশে – এই বুঝেছি

সুখের সার সে চোখের জলে রে –

তুমি হাস – আমি কাঁদি

বাঁশী বাজুক কদম তলে রে!

আমি নিব সব কলঙ্ক তুমি আমার হবে রাজা

****

আমার ভালবাসার ধন হবে তোমার চরণপূজা

তোমার বুকের আগুন যেন আমার বুকে

পিদীম জ্বালে রে।”[৪১]

এখানে আমরা নিতাইয়ের কণ্ঠে প্রচ্ছন্নে চণ্ডীদাসের পদাবলীর সুর ভেসে উঠতে দেখি। কেবল তাই নয় ঝুমুর দলের মেয়ে বসনের কণ্ঠেও শোনা যায় চণ্ডীদাসের পদের অনুসরণ -

“তোমার চরণে আমারই পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি,

জাতিকুলমান সব বিসর্জিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।”[৪২]

স্বভাবতই আমরা বুঝতে পারি চণ্ডীদাসের বিখ্যাত নিম্নলিখিত এই পদটিই বসনের কণ্ঠে ভিন্নরূপে উচ্চারিত হয়েছে -

“বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।

দেহ মন আদি তোহারে সঁপেছি

কুল শীল জাতি মান।।”[৪৩]

এইখানে আমরা লক্ষ করি বৈষ্ণব ধর্মের উদারতার সুবাদে চৈতন্যদেব ধর্মজগতে নারীর স্বাধীন ধর্মাচরণের যে পথ খুলে দিয়েছিলেন, কীর্তনের অধিকার দিয়েছিলেন, তারই প্রভাবে আমরা বারাঙ্গনা বসনের কণ্ঠেও বৈষ্ণব পদাবলীর সুর শুনতে পাই। সে যখন নিতাইয়ের বাহুবন্ধনে ধরা দিয়ে গেয়ে ওঠে –

“পরাণ-বঁধুয়া তুমি,

তোমার আগেতে মরণ হউক এই বর মাগি আমি।”[৪৪]

তখন চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত এই পদটির কথাই আমাদের মনে পড়ে –

"বঁধু যদি তুমি মোরে নিদারুণ হও।

মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও।।"[৪৫]

চৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলন সূত্রে নারী লাভ করেছিল সাম্য ও স্বাধীনতার অধিকার। তার ফলে সে আর কেবল কামনা-বাসনার আধারই রইল না, বরং তারই অনুপ্রেরণায়, উৎসাহে যে একজন পুরুষ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন 'কবি' উপন্যাসের বসন চরিত্রটি।

ঝুমুর দলের নাচিয়ে গাইয়ে এই বারাঙ্গনা নারীর অকৃত্রিম প্রেম, নিষ্কলুষ ভালোবাসাই ডোম সম্প্রদায়ের ছেলে নিতাইয়ের কবি জীবনকে উদ্বুদ্ধ করেছে, তার চলার পথের পাথেয় হয়েছে। আবার কবির প্রেমের স্পর্শেই বারাঙ্গনার নারীত্বের তথা মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটেছে। গোবিন্দদাসের পদে পাই -

"পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে

পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।

আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাহিয়া রে

রতন হইল কত জনা।।"[৪৬]

তাই পঙ্কে বাস করেও পঙ্কিল হয় নি প্রেমিকের জীবন, বরং বলা চলে পঙ্কজের মতই সেই জীবনে ফুটে উঠেছে কবিত্ব, মনুষ্যত্ব। আর এসবই চৈতন্যদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের উদার ধর্মনীতির সুদূরপ্রসারী প্রভাব। গৌরাঙ্গ প্রেমের জোয়ারেই সমাজের প্রান্তবাসিনী নিম্নবিত্ত, নিম্নবর্গের মানুষেরাও মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল, সমাজ বিচ্যুত, অবহেলিত মানুষেরাও গৌর প্রেমের আদর্শেই পুনরায় বেঁচে থাকার, সমাজে নিজ অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার রসদ পেয়েছিল। এখানেই চৈতন্য প্রবর্তিত নব্য বৈষ্ণব ধর্মের বৃহৎ সার্থকতা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে সমাজের প্রান্তবাসিনী বারাঙ্গনা রমণীদের কথা উল্লেখ করে ডঃ রমাকান্ত চক্রবর্তী লিখেছেন- "---- এইসব মেয়েরা তাঁদের জীবনে বৈষ্ণব ধর্মকেই অবলম্বন করে পবিত্রতার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন।"[৪৭]

এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের 'নিশিপদ্ম' উপন্যাসে কাঞ্চনমালা চরিত্রটির কথা উল্লেখ করতে হয়। বর্ধমানের নামকরা কীর্তনওয়ালী কাঞ্চনমালা প্রথমে ছিল দেহব্যবসায়িনী খেমটাওয়ালী। তার দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত পঙ্কিল জীবনে বিপুল পরিবর্তন এনেছিল কীর্তন গান। একদা মিঃ বোসের বৈষ্ণবীয় প্রেমভক্তির গান তার অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তোলে। বড়লোকের প্রলোভন, কুমারসাহেবের অমানুষিক অত্যাচার, এমনকি নিজের মায়ের বঞ্চনা সত্ত্বেও কাঞ্চনমালা পুনরায় সেই ক্লেদাক্ত পঙ্কিল জীবনে ফিরে যেতে রাজী হয় না। পরশমণির স্পর্শে লোহার সোনা হওয়ার মতোই মিঃ বোসের স্পর্শে বারবিলাসিনী কাঞ্চনমালা হয়ে উঠেছিল কীর্তন গায়িকা, প্রেমতপস্বিনী। একমাত্র কীর্তন গানকে অবলম্বন করে কাঞ্চনমালা তার কঠিন জীবন সংগ্রামে জয়ী হয়েছিল। চৈতন্যদেব নারীকে যে কীর্তন গানের অধিকার দিয়েছিলেন সেই কীর্তন গানই পরবর্তীতে কখনও কাঞ্চনমালার মতো বারাঙ্গনা নারীকে মুক্তির পথ দেখিয়েছে, কখনও আখড়াধারী কামিনীর ('রাইকমল') একাকী জীবনে অন্নসংস্থানের একমাত্র সম্বল হয়ে উঠেছে। কামনার পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করে দুস্তর বাধা ও প্রতিকূলতাকে জয় করে মনের মানুষের সঙ্গে মিলনের জন্য কাঞ্চনমালার তীব্র ও গভীর আর্তি তাকে প্রেম ও মাধুর্যের শতদল রূপে বিকশিত করেছিল। কাঞ্চনমালা তার জীবনের উত্থান-পতনের ইতিহাসে উপলব্ধি করেছে - "মানুষের দেহ কাঞ্চন – এ দেহে কামনাই হল কালিন্দীর স্রোত – দিনরাত- জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বইছে। এরই তটে ভগবানের বাঁশি বাজে কিনা জানিনা-শুনিনি-তবে বাঁশি বাজে, সেই আত্মপুরুষের বাঁশি বাজে। সে ডাকে। কাকে ডাকে তা জানিনে – তবে এক একজনকে দেখে মনে হয় এর মধ্যেই তার বাস, একে পেলেই তাকে পাব। জীবনের সব চাওয়া পাওয়া হয়ে যাবে।"[৪৮] 'সেই আত্মপুরুষ যে গোবিন্দ, কৃষ্ণ, প্রাণপ্রিয় প্রেমের ঠাকুর তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। সেই আত্মপুরুষ প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ-গোবিন্দের ডাক শুনেছিলেন শ্রীচৈতন্য, অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন কৃষ্ণ-গোবিন্দকে, আর এই প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণলাভের ইচ্ছায় তিনি সারাজীবন হাহাকার করে গেছেন। শুধু তাই নয়, এই কৃষ্ণনামের দ্বারাই তিনি কেবল নিজের অন্তরাত্মার জাগরণ ঘটিয়েছেন তাই নয়, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের, সমস্ত বাঙালি জাতির, বৃহৎ অর্থে সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষের অন্তরাত্মার জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন। সবার উপরে মানুষ সত্য, মানুষের সেবাতেই ঈশ্বরের সেবা, মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের উপলব্ধি, সর্বোপরি চৈতন্যদেব যে মানবতার জয়গান রচনা করেছিলেন সেই সাম্যবাদী মানবধর্মের আদর্শকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ;আর তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পেও সেই আদর্শেরই সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে।

তথ্যসূত্র

(১) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, রাইকমল, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৮, পৃ- ৩৭৩।

(২) গুপ্ত ক্ষেত্র, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড), গ্রন্থ নিলয়, ২০০২, পৃ- ৩৯।

(৩) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, রাইকমল, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৮, পৃ- ৩৭৫।

(৪) তদেব, পৃ-৩৭৫।

(৫) তদেব, পৃ- ৪০৬।

(৬) তদেব, পৃ-৪১১।

(৭) তদেব, পৃ-৪৩৯।

(৮) তদেব, পৃ- ৩৯০।

(৯) তদেব, পৃ- ৩৯১।

(১০) তদেব।

(১১) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাসের চৈতান্যভাগবত, মধ্যখন্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, সাহিত্য আকাডেমি, ১৯৮২, পৃ-১৮৪।

(১২) তদেব, মধ্যখন্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ-১৮৪।

(১৩) গিরি সত্যবতী, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চা, দিয়া, ২০১৭, পৃ-২১৩।

(১৪) গোস্বামী বিজন (সম্পা), নিত্যানন্দ দাসের ‘প্রেমবিলাস’, মহেশ লাইব্রেরী, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৯, চতুর্বিংশ বিলাস, পৃ-২৪০।

(১৫) মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা), জয়ানন্দ বিরচিত ‘চৈতন্যমঙ্গল’ বৈরাগ্য খন্ড, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৬, পৃ-১০৫।

(১৬) তদেব।

(১৭) Chakraborty Ramakanta, Vaishnavism in Bengal, 1486-1900, Sanskrit Pustak Bhander, 1985, p-174।

(১৮) তদেব, P-176।

(১৯) চক্রবর্তী রমাকান্ত, বাঙালির ধর্ম – সমাজ ও সংস্কৃতি, সুবর্ণরেখা ২০০২, পৃ-১৫২।

(২০) বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলি, ষষ্ঠ খন্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, পৃ-১৫২।

(২১) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, রাইকমল, মিত্র ও ঘোষ, পৃ-৪১৫।

(২২) তদেব, পৃ- ৩৭৭।

(২৩) বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৯৬৫, পৃ- ২৯৪।

(২৪) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, রাইকমল, মিত্র ও ঘোষ, পৃ-৪৩৮।

(২৫) তদেব।

(২৬) মিত্র সনৎ কুমার (সম্পা), লোকসংস্কৃতি গবেষনা, কার্ত্তিক- পৌষ ১৪০৪, গিরি সত্যবতী, তারাশঙ্কর : বৈষ্ণবীয় জীবন ও আখড়া, পৃ- ৪১১।

(২৭) গুপ্ত ক্ষেত্র, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, গ্রন্থ নিলয়, ২০০২, পৃ- ৪৩।

(২৮) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৬।

(২৯) তদেব, পৃ- ৪৩৮।

(৩০) মুখ্যোপাধ্যায় আদিত্যকুমার, শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার, কোরক, শরৎ সংখ্যা, ১৪০৮, পৃ- ২৬৮-২৬৯।

(৩১) সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ১৩৯২, পৃ- ২০।

(৩২) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, রাধা, মিত্র ও ঘোষ, পৃ-৪৮৬-৪৮৭।

(৩৩) তদেব, পৃ- ৫০০।

(৩৪) সমরেশ মজুমদার, তারাশঙ্করের রাধা দর্শন ও জীবনে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১২, পৃ- ৯২।

(৩৫) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলি, ষষ্ঠ খন্ড, স্বর্গমর্ত, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, পৃ-১৫৪ ।

(৩৬) তদেব।

(৩৭) তদেব।

(৩৮) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, কবি, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, পৃ-৩।

(৩৯) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মর্ডান বুক এজেন্সী, পৃ- ১২৫।

(৪০) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, কবি, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, পৃ- ১২।

(৪১) তদেব, পৃ- ৪২।

(৪২) তদেব, পৃ- ৮৩।

(৪৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী চয়ন, ২০১১, পৃ- ৮৩।

(৪৪) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, কবি, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, পৃ-৯১।

(৪৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী চয়ন, ২০১১, পৃ- ৭৬।

(৪৬) মুখ্যোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ, বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়, সাহিত্য সংসদ, ১৯৮০, পৃ- ২৫১।

(৪৭) চক্রবর্তী রমাকান্ত, বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ-১৪০।

(৪৮) তারাশঙ্কর রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, ১৩৫৯, পৃ-৩২৯।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ‘ত্রয়ী উপন্যাসে’ চৈতন্যপ্রসঙ্গ

বিংশ শতকের আর এক প্রখ্যাত সাহিত্যিক সরোজকুমার রায়চৌধুরীও তাঁর উপন্যাসে রাঢ় বাংলার পটভূমিতে চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণবজীবনের সহজ-সরল বাস্তব চিত্রই ফুটিয়ে তুলেছেন, সেইসঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর স্বতন্ত্র মানবিকতাবোধকে। সরোজকুমার ছিলেন বৈষ্ণব বংশের সন্তান এবং তাঁর রক্তস্রোতে ছিল বৈষ্ণব রসের ধারা। তাঁর জন্মস্থান মালিহাটি। সেখানে একদিকে উদাসী বাউলের একতারা, অপরদিকে বৈষ্ণবীয় সুরের মূর্ছনা যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। এইরকম বাউল-বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে বড়ো হয়ে ওঠার ফলে স্বভাবতই তাঁর উপন্যাসে রাঢ় অঞ্চলের বাউল-বৈষ্ণবদের ছবিই ফুটে উঠেছে। বিশেষত ‘নতুন ফসলে’র ত্রয়ী উপন্যাস (‘ময়ূরাক্ষী’, ‘গৃহকপোতী’, ‘সোমলতা’) - এ ধরা পড়েছে চৈতন্যপ্রভাবিত বৈষ্ণবতার নানা ছাপ। উপন্যাসগুলিতে ঘুরে ফিরে এসেছে চৈতন্যদেবের নানা প্রসঙ্গ, বৈষ্ণব পদাবলী কীর্তন, বৈষ্ণবদের আখড়া নির্মাণ, মাধুকরী বৃত্তি, সর্বোপরি বাউল-বৈষ্ণবদের সহজ-সরল বাস্তব জীবনের রূপচিত্র। এ প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন “বৈষ্ণব জীবনের সত্য চিত্র হিসাবে শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ‘ময়ূরাক্ষী’, ‘গৃহকপোতী’, ‘সোমলতা’ তিন খণ্ডে রচিত উপন্যাসাবলী উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বৈরাগী-বৈরাগিনীরা সমাজ জীবনের সহিত বেশ সুসম্বন্ধ – অতিরিক্ত আদর্শবাদের দ্বারা স্ফীত ও বাষ্পায়িত হয় নাই। ইহারা অনেকটা উদাসীন, নীড় রচনায় ঐকান্তিক আগ্রহহীন; সমাজের সহিত সংস্রবও অনেকটা শিথিল। মনে সংস্কারহীন মুক্তির আনন্দ, মুখে গানের ফোয়ারা, সমাজের নৈতিক শাসন অপেক্ষা স্বাধীন খেয়ালের দ্বারাই ইহাদের জীবন অধিকতর নিয়ন্ত্রিত। সাধনায় আড়ম্বর নাই, বিধিনিষেধের কঠোরতা নাই। তবে এই বৈষ্ণব সাধনা যে জীবনের উপর সত্যই প্রভাবশালী তাহা প্রমাণিত হয় চিত্তের নির্মল শান্তিতে ও পারিবারিক বন্ধনের মোহমুক্ত শিথিলতায়।”[১] এইভাবে শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্ম পরবর্তীতে সমাজজীবনে কীরূপ নেয়, সাধারণ গ্রাম্য মানুষের জীবন সাধনার সঙ্গে, জীবনযাপনের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম কীভাবে অন্বিত হয়ে যায় তারই বাস্তব সত্য চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায় সরোজকুমার রায়চৌধুরীর এই ‘ত্রয়ী’ উপন্যাসে।

বৈষ্ণবধর্মের সহজ-সরল ও নির্লিপ্ত মনোভাব ফুটে উঠতে দেখা যায় রসময়, গৌরহরি ও ললিতার মধ্যে। সমাজ সংস্কারের বাধাবন্ধনহীন মুক্ত জীবনের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে তাদের গানে গানে। মনের টানে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী জোড় বাঁধে, আখড়া গড়ে বাস করে একত্রে কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ কারও উপর অসপত্ন অধিকারের দাবি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ললিতা ও রসময় গৃহী বৈষ্ণব। মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে একতারা, খঞ্জনি বাজিয়ে, বাউল গান গেয়ে তারা ঘুরে বেড়ায় গ্রাম-গ্রামান্তরে, আবার

আখড়া নির্মাণ করে একত্রে বাস করে। কিন্তু তাদের মধ্যে গার্হস্থ্য জীবনের দাম্পত্য প্রতিষ্ঠার তীব্র অসহিষ্ণুতা নেই। রসময়ের কথায় – "আমরা কেউ কাউকে বাঁধিনি, তাই নিজেও বাঁধা পড়ি নি। আমরা নিজেদের সন্দেহ অবিশ্বাস করি না, তাই অন্যের উপরেও সন্দেহ অবিশ্বাস হয় না। ··· এ ক্ষ্যাপা বাউলের খোলা মাঠ। এখানে যার যা খুশি সে তাই করবে। মুখে দূরে থাক মনে মনেও কেউ তা নিয়ে নালিশ করতে পারবে না। ··· নালিশ করবেন রাধারাণী, বিচার করবেনও তিনি।"[২] এই মুক্ত অনাবিল জীবনানন্দই বাউল-বৈরাগী-বৈষ্ণবের জীবনদর্শন। তাই দেখা যায় ললিতা তারাপদর কাছে এবং বিনোদিনী গৌরহরির কাছে আত্মসমর্পণ করলেও তাদের মন এমন সংস্কারমুক্ত যে কোনো গ্লানি বা অশুচিতা তাদের স্পর্শ করে না। এ প্রসঙ্গে ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "এই নৈতিকতার প্রভাবমুক্ত ও সাংসারিক আসক্তির দ্বারা অশৃঙ্খলিত মনের স্বচ্ছন্দ গতিই বাউল জীবনের বিশেষত্ব।"[৩]

এই বাউল সম্প্রদায়ের সুনিপুণ-চিত্র, গ্রাম্য মানুষের অন্তর্বেদনা কিংবা লোকবিশ্বাসকে সাহিত্যের উপজীব্য করে তুলেছেন কথাসাহিত্যিক সরোজকুমার তাঁর 'ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী', 'সোমলতা' – এই ত্রয়ী উপন্যাসে। এই উপন্যাসগুলিতে লোকায়ত জীবনচিত্র পরিবেশনের মধ্যেই ফুটে উঠেছে বৈষ্ণবীয় রসের উপাদান। আর এভাবেই আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের হাত ধরে চৈতন্যচর্চার ধারা অব্যাহত থাকে এবং চৈতন্যদেবের সুদূরপ্রসারী প্রভাব কথাসাহিত্যে ফুটে ওঠে।

'সোমলতা' পর্বে লেখক বড় বাবাজীর আখড়ার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় – "বড় বাবাজীর আখড়ায় যেন মেলা বসেছে। সামনের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে মস্ত বড় একটা চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে। সেখানে পাঁচ দল বিখ্যাত কীর্তনীয়া পালা করে কীর্তন গাইছেন। আখড়ার সম্মুখের মাঠে অনেকগুলি চালা বাঁধা হয়েছে। কিন্তু তাতেও নেড়া-নেড়ীর স্থান সংকুলান হচ্ছে না। বড় বড় তেঁতুল গাছগুলির নিচেও তাদের জন্য জায়গা করা হয়েছে। সেখানে চব্বিশ ঘন্টা অবিরত গঞ্জিকা চলছে, আর গোপীযন্ত্র ও ডুবকির সহযোগে গান। স্ত্রীলোক এবং বয়স্ক লোকের ভিড় কীর্তনের আসরে।"[৪]

বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর প্রয়াণের পর সপ্তদশ শতকে বাংলায় বৈষ্ণবদের নেতৃত্ব দেন নরোত্তম দাস, শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দ। রাজশাহীর খেতুরিতে একটি বৈষ্ণব মহাসম্মেলন আহুত হয়। সেখানে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের এক বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়। বৈষ্ণবধর্ম মহাসম্মেলন খেতুরি মহোৎসবের সেই ধারাই অনুসৃত হয়েছে উদ্ধৃত অংশে নেড়ানেড়ির মধ্যে দিয়ে। পাশাপাশি এসেছে কীর্তন গানের কথা। এসবই চৈতন্য প্রেমভাবনার ফসল। 'সোমলতা' পর্বে ঔপন্যাসিক বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে – "সেখানে একটা মহাসমারোহ চলেছে। ভোর থেকে রান্না আরম্ভ হয়েছে, এখনও চলছে। কত লোক যে খেলে এবং আরও কত লোক যে খাবে তার ইয়ত্তা নেই। ক্রমাগতই 'দীয়তাং ভুজ্যতাম'

চলেছে। এখানে জাতি বিচার নেই। দলে দলে লোক আসছে, যে যেখানে পাচ্ছে বসে খাচ্ছে আর খেয়ে উঠে যাচ্ছে। আবার একদল আসছে। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বড় বড় জোলে রান্না চড়েছে।··· থেকে থেকে ধ্বনি উঠছে জয় জয় মহাপ্রভুকী জয়।"[৫] এইভাবে চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ বারে বারে ফিরে এসেছে উপন্যাসে।

যে কীর্তন গানের সূত্রধর স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভু সেই কীর্তন গানই বাউল-বৈষ্ণবের জীবনাচরণের একটি অন্যতম অঙ্গ – " সামনের উঠানে কীর্তনীয়া তখনও গাইছেন। ছোট বাবাজি শুনছেন, আর তাঁর চক্ষু দিয়ে বিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরছে ··· ।"[৬] কীর্তন গানের মতোই আখড়াও এই বৈষ্ণবদের জীবন ধারণের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ছোট বাবাজীর কথায় "বৈষ্ণবের একটা আখড়া থাকা দরকার। নইলে ভজন-সাধনের বিঘ্ন হয়।"[৭] এই আখড়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র ধরা পড়ে ললিতা-রসময়ের আখড়া গড়ে জীবনযাত্রা নির্বাহে। তাদের কীর্তন গানের মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর পরিচয়ই ধরা পড়ে। গৌরহরি যখন কীর্তনের আসরে উঠে আসে "সেখানে তখন কীর্তনীয়া হাঁটু গেড়ে গাইছে : 'আমি কালো রূপ আর হেরব না গো।'

কালো রূপের উপর শ্রীমতির বিতৃষ্ণা এসেছে। তাঁর যত দুর্গতির কারণ তো চিকণকালা। বলছেন, আমি কালো রূপই আর দেখব না। চাইব না আর যমুনার কালো জলের দিকে, কালো মেঘের দিকে। মাথার কালো কেশজাল তাও ফেলব কেটে।

- আর তোমার আয়ত নয়নের কালো তারা?
- তাও ফেলব উপড়ে।"[৮]

এখানে আমাদের মনে পড়ে যায় চণ্ডীদাসের সেই বহুপঠিত বহুশ্রুত পদটির কথা –

"কালো জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।

নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে।।

কালো কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।

কালো অঞ্জন আমি নয়নে না পরি।।

আলো সই মুঞি শুনিলাম নিদান।

বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ।।"[৯]

কেবল কীর্তন গানের আসরেই নয় এই বাউল-বৈষ্ণবদের প্রাত্যহিক জীবনাচরণে, কথা-বার্তায়, হাসি-ঠাট্টায়ও মুখে মুখে ঘুরতে থাকে বৈষ্ণব পদগুলি। লেখক দেখিয়েছেন :

"ওদের কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা হয় এইরকমভাবে :

নিম গাছে ঠেস দিয়ে রসময় হয়তো গাইলে :

'কি কহব রে সখি আনন্দ ওর'।

ভাতের হাঁড়িতে কাঠি দিয়ে ললিতা অমনি গেয়ে উঠল :

'চিরদিন মাধব মন্দির মোর'।"[১০]

এইভাবে তাদের মুখে মুখে ফিরতে থাকে বৈষ্ণব পদগুলি। এই বৈষ্ণবপদ ব্যবহার করে তারা জীবনের রসও উপভোগ করে। বিনোদিনীকে একান্ত ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পেয়েও তার মধ্যে গৌরিহরি নিজের স্বপ্নের রাইকিশোরীকে না পেয়ে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা অনুভব করে। রসময়ের বাড়িতে ক্ষুধার্ত আশাহত গৌরহরির প্রতি রসময় সরস কটাক্ষে গান ধরে –

"পাসরিতে চাহি তারে পাসর না যায় গো।

না দেখি তাহার রূপ মন কেন টানে গো।।

খাইতে বসি যদি খাইতে কেন নারি গো।

কেশ পানে চাহি যদি নয়ান কেন ঝুরে গো।।"[১১]

এখানে আমাদের মনে পড়ে যায় চণ্ডীদাসের সেই বিখ্যাত পদটির কথা –

"যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় রে।

আন পথে যাই সে কানু পথে ধায় রে।।

এ ছার রসনা মোর হইল কি বাম রে।

যার নাম নাহি লই লয় তার নাম রে।।

এ ছার নাসিকা মুই যত করি বন্ধ।

তবু ত দারুণ নাশা পায় শ্যামগন্ধ ।।

****

কহে চণ্ডীদাস রাই ভাল ভাবে আছ।

মনের মরম কথা কারে নাহি পুছ ।।"[১২]

এইভাবে হাসি-ঠাট্টায়, আনন্দে যেমন তারা বৈষ্ণব পদগুলিকে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে গান গায়, তেমনি দুঃখ-বেদনায়ও তাদের সম্বল বৈষ্ণব পদবলী। সমবেত ভদ্রজনের সামনে ছোট মহারাজ গৌরহরি ও তমাললতার মালাবদলের কথা ঘোষণা করলে ললিতার মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, সে এসে এই অবস্থার কথা জানালে, বিনোদিনী গেয়ে ওঠে – 'আমারই বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙ্গিনা দিয়া।'[১৩] এইভাবে দেখা যায় হাসি-ঠাট্টায়, সুখে-দুঃখে গানই তাদের জীবনের অঙ্গ, সাধনার অঙ্গও বটে।

এই গানের ন্যায় মাধুকরী বৃত্তিও বৈষ্ণবদের জীবন সাধনার আর একটি অন্যতম অঙ্গ। বিনোদিনীর মনে পড়ে "ছেলেবেলায় বিনোদিনী বেশ মিষ্টি গাইতে পারত। তার বাপের বাড়ির পাশেই দুঘর বৈষ্ণবের বাস। গান গেয়ে ভিক্ষে করা তাদের ধর্মের অঙ্গ।"[১৪] এই মাধুকরী বৃত্তি চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসজীবনের একটি অন্যতম অঙ্গও বটে। আবার, আদর্শ বৈষ্ণবের সার্থক প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে গৌরহরি চরিত্রটির মধ্য দিয়ে। "গৌরহরির নাকের সূক্ষ্মাগ্র-রসকলি, তার প্রশস্ত ললাটের তিলক রেখা, তার স্কন্ধ বিলম্বিত কেশদাম। ··· মুখের দাঁড়িতে, মাথার চুলে, ঢিলা গৈরিক আলখাল্লায় তার কেমন হেলাফেলা ভাব।"[১৫] যেমন বেশভূষায় তেমনি জীবনাচরণেও গৌরহরি একজন আদর্শ বৈষ্ণব। সে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে পথে পথে বৈষ্ণব গান গেয়ে বেড়ায়, আখড়া নির্মাণ করে বৈষ্ণব-বাউলদের একত্রিত করে, আর সবকিছুই 'রাধারাণীর ইচ্ছা' বলে মনে করে।

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলি যেমন সেদিনের বাউল-বোষ্টম সমাজে মুখে মুখে প্রচার লাভ করতো, তেমনি মহাজন গ্রন্থ হিসাবে 'চৈতন্যচরিতামৃত'ও ছিল সেদিনের মানুষের নিত্য সহচর।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরণের বোষ্টমরা হত অশিক্ষিত। ফলে 'চৈতন্যচরিতামৃত' বোঝার মতো সামর্থ্য তাদের না থাকলেও তারা মহাজন গ্রন্থ হিসাবেই তা গ্রহণ করতো এবং এই গ্রন্থ পাঠে নিজেদের নিয়োজিত রাখতো। 'গৃহকপোতী'তে রসময়-ললিতার আখড়ায় তারই স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে –

"রসময় কোন ভোরে স্নান সেরে এসে আহ্নিকে বসেছিল। তার আহ্নিক সারা হয়েছে। সুর করে সে 'চৈতন্যচরিতামৃত' পড়ছিল :

'সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম 'আশ্রয়'।

সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'।।

বিষয় জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ।

আমা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ।।' "[১৬]

" 'চৈতন্যচরিতামৃত' হয়তো রসময় কিছুই বুঝছিল না। ললিতা আবার তাও বুঝছিল না। তাছাড়া কিছু না বুঝলেও 'চৈতন্যচরিতামৃত' সুরের সঙ্গে রসময়ের চিত্তের কোথায় যেন যোগ আছে। তাই বইখানি ছোঁয়ামাত্র তার চোখ অশ্রুতে আপ্লুত হয়ে ওঠে। ··· গ্রন্থ বন্ধ করে রসময় মাথায় ঠেকালে। ললিতাও দুই হাত জোড় করে উদ্দেশে প্রণতি জানালে।"[১৭]

'চৈতন্যচরিতামৃতে'র মতো গ্রন্থকে যে তারা পবিত্র গ্রন্থ জ্ঞানে প্রণাম জানাতো তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। সুধীর চক্রবর্তী 'বাউল বৈষ্ণবের মিলিত চৈতন্য' প্রবন্ধে লিখেছেন "এই কৃষ্ণদাস কবিরাজ গৌড়বঙ্গে সহজিয়া তত্ত্বের স্রষ্টা এমন একটা মত প্রচলিত আছে। যদিও তার সত্যাসত্য নির্ণয় করা আজ কঠিন।"[১৮] তিনি আরও বলেছেন, "এইসব সাধারণ মানুষ যারা শ্রীচৈতন্যকে জানে পরিত্রাতা বলে, নিত্যানন্দকে বলে পরম পুরুষ, তারা তাদের পরম গুরু বলে মানে রূপ-সনাতন-শ্রীজীবকে নয়। মানে রূপ কবিরাজকে। ··· এমনও শোনা যায় রূপ কবিরাজ ছিলেন পরকীয়াবাদের ঘনিষ্ঠ প্রচারক। ··· সহজিয়া ও অন্যান্য অনেক লোকধর্মের মানুষ 'শ্রীরূপ' বলতে বোঝে তাদের শিক্ষাগুরু কবিরাজকে আবার তাদের কাছে শ্রীরূপ একটা সন্ধ্যা ভাষা। তার আরেক অর্থ সাধন সঙ্গিনী নারী।"[১৯]

'গৃহকপোতী' অংশে দেখা যায় রসময়ের প্রভাত ও সন্ধ্যা উপাসনায় কাটে বলেই সে পরম শ্রদ্ধায় 'চরিতামৃত' যেমন পাঠ করে তেমনি বিচার বিতর্কে সে 'চরিতামৃত' থেকেই শ্লোক উদ্ধার করে যুক্তি দেয়। যেমন, ললিতার সম্বন্ধে রসময়ের মনের কথা যখন জানতে চেয়েছে তারাপদ, তখন রসময়কে বলতে শোনা যায় : "নারী আমার কাছে শুধু সাধনার উপকরণ। ওরা প্রিকৃতির অংশ। ওদের নইলে পুরুষ

সম্পূর্ণ হয় না। কথা হচ্ছে ওরা নিজে বাঁধা না পড়লে, গায়ের জোরে বাঁধবার তো উপায় নেই। ⋯ আবার কি জানেন? ওদের পাপ নেই। মা গঙ্গার জলের মতো আপনা থেকেই পবিত্র। শুধু পুরুষকে উদ্ধার করার জন্যেই ওদের পৃথিবীতে আসা। মা গঙ্গার মতো। একেই বলে লীলা। আহা!"[২০]

হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের বিপরীতে সহজিয়া বৈষ্ণবদের চিন্তাধারায় এখানে সমস্ত আচার-বিচার সংস্কারের উর্দ্ধে নারীকে সম্মান জানানো হয়েছে। মূর্খ, অধম, চণ্ডাল, শূদ্রের সঙ্গে স্ত্রীজাতির জীবনকেও ভক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন অদ্বৈত, গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ। নারীর ধর্মীয় অধিকারের স্বীকৃতি চৈতন্যদেবেরই প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ। পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে শূদ্রের মতো নারীকেও ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল; কামিনী বলে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। অন্যদিকে সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম চৈতন্যদেবের সমতার আদর্শকে গ্রহণ করেছিল বলেই পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও তারা ধর্মে-কর্মে-সমাজে-সংসারে সমান মর্যাদা দিয়েছিল, নারীর স্বাধীনতাকে স্বাগত জানিয়েছিল, এমনকি তাদের সাধনার পথে নারীকে তারা শ্রদ্ধা-বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল। তাই তো সহজিয়া সাধনার পথে পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয় করতে গিয়ে রসময় 'চৈতন্যচরিতামৃত'থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে এইভাবে : "রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।/ লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ।।"[২১] সে কেমন? না – "মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।/ অগ্নি জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ।।"[২২] রসময়ের কথায় : "এই হল পুরুষ আর প্রিকৃতিতে সম্বন্ধ। ওঁরা হলেন রসের উপকরণ।"[২৩]

বাউল ভাবনায় চৈতন্যদেব প্রকৃতি-পুরুষের মিলনরূপ দেহমধ্যস্থিত পরমতত্ত্ব বা দিব্যসত্তা। সহজিয়ারা নিজেদের প্রেমসাধনায় চৈতন্যদেবের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয় করে এইভাবে যে যিনি রাধাকৃষ্ণ তিনিই শ্রীচৈতন্য। এ প্রসঙ্গে তারা কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'কেই আঁকড় গ্রন্থ বলে মনে করে :

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।

অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি।।

সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।

ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই।।"[২৪]

রাধাভাব ও রাধাকান্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণস্বরূপ কৃষ্ণচৈতন্যদেবকেই বাউলেরা তাদের পরম আরাধ্য মনে করে। শ্রীচৈতন্যদেব রাধাকৃষ্ণের মিলিত রূপ বা রসরাজ মহাভাবতত্ত্বের কারণে 'রসিক পাগল' বা 'মহাবাউল'। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি, সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল মানুষকে সমান মর্যাদা দানের ঔদার্যতা বা তথাকথিত নিম্নবর্গ উদ্ভূত প্রবর্তক কেন্দ্রিক সম্প্রদায়গুলিকে প্রভাবিত করার সূত্রে চৈতন্যদেব বাউলের আদিপুরুষ। এ প্রসঙ্গে 'চৈতন্যচরিতামৃত' অনুসরণে বলা যায় অদ্বৈতাচার্য মহাপ্রভুর নিকট জগদানন্দের মাধ্যমে যে প্রহেলিকা পাঠিয়েছিলেন সেখানেও তিনি চৈতন্যদেবকে 'বাউল' বলেই সম্বোধন করেছেন :

"বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।

বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল।।

বাউলকে কহিও কাজে নাহিক আউল।

বাউলকে কহিও ইহা কহিয়াছে বাউল।।"[২৫]

এমনকি চৈতন্যদেব নিজেও সন্ন্যাসী বাউল বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। ফলে চৈতন্যদেবের সঙ্গে 'বাউল' শব্দটি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

বাউলদের সাধানার স্বরূপ ফুটে ওঠে উপন্যাসে। বাউলদের সাধনা যে অত্যন্ত গুহ্য ব্যাপার তা ধরা পড়ে রসময়ের চরিত্রে : "রসময় হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ঘরে গিয়ে জপে বসল। ঘরের দরজা সে বন্ধ করে দিলে। বাউলদের ভজন অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এবং সেই সম্প্রদায়ের লোক না হলে জানবার উপায় নেই। এই গোপনীয়তা সকল ক্ষেত্রে তারা অত্যন্ত যত্ন ও সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করে চলে।"[২৬]

বাউলের সাধনায় নারী একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই বাউলের সাধানার কথা বলতে গিয়ে গৌরহরিকে "ছোটবাবাজী বললেন, আর একটি বৈষ্ণবীও দেখ। আমাদের সাধন-ভজনে বৈষ্ণবীও একটি অঙ্গ কি না। ··· ছোট বাবাজী আপন মনেই বলতে লাগলেন, আমাদের সাধন ভজন অত্যন্ত কঠিন কি না। সবাই পারে না। ··· কিন্তু তুমি পারবে। ··· তোমার উপর মহাপ্রভুর আশীর্বাদ আছে।"[২৭] এ থেকে বোঝা যায় মহাপ্রভুর আশীর্বাদই তাদের একমাত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভের উপায়। এইভাবে ঔপন্যাসিক সরোজকুমার শ্রীচৈতন্যের সত্তার একটি ভিন্নরূপ উপস্থিত করেছেন তাঁর 'ত্রয়ী উপন্যাসে'।

রাঢ় বাংলার চাষি অধ্যুষিত গ্রাম কমলপুরের সাধারণ গৃহস্থ নরনারীর জীবনচর্যার সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে বৈষ্ণবসংস্কৃতি। কমলপুরের সাধারণ নারী পুরুষের দৈনন্দিন কথাবার্তা,

রঙ্গ রসিকতা, বিদ্রূপ কটাক্ষের মধ্যেও জনজীবনের গভীরে প্রোথিত সেই বৈষ্ণবীয় ভাবনার প্রভাব কোথাও প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষ আবার কোথাও বা তা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। 'ময়ূরাক্ষী' উপন্যাসে দেখা যায়, দুপুরে এক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর যখন রোদ উঠেছে, "তখন রাহী লোক একলা পথে চলতে চলতে মনের আনন্দে গান ধরেছে 'বৃন্দাবনের কালো শশী নদেয় এসে উদয় হল।"[২৮] বৃন্দাবনের কালাচাঁদ কৃষ্ণই যে নবদ্বীপে শচী গর্ভসিন্ধুতে উদিত হয়েছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এই তত্ত্বকথাই এখানে লোককথার আধারে প্রকাশ পেয়েছে। আসলে বৈষ্ণবীয় উপধর্মগুলি চৈতন্যের মানব লীলার ঘটনাকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে, শ্রীচৈতন্য তাদের দৃষ্টিতে যতটা পতিতপাবন বা ত্রাতা , তার চেয়েও বড় মানুষ হিসাবে। আর এই মানুষ শ্রীচৈতন্যকেই আমরা খুঁজে পাই সরোজকুমারের রচনায়।

এইভাবে লোকজীবনে চৈতন্যদেবের সুদূরপ্রসারী প্রভাব, বৈষ্ণবীয় কীর্তন গান, আখড়া নির্মাণ, ভিক্ষা বৃত্তি, মোচ্ছব, বাউল-বৈষ্ণবদের সাধনার স্বরূপ প্রভৃতি নানা অনুষঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে সরোজকুমারের এই 'ত্রয়ী উপন্যাস'। বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় এভাবেই চৈতন্যচর্চার ধারাও নিরন্তর প্রবহমান থাকে।

তথ্যসূত্র

১। বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি., ১৯৬৫, পৃ- ২৯৫।

২। রায়চৌধুরী সরোজকুমার, গৃহকপোতী, 'নতুন ফসল' এর দ্বিতীয় পর্ব, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রা.লি., ১৯৬৪, পৃ- ৮।

৩। বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি., ১৯৬৫, পৃ- ২৯৫।

৪। রায়চৌধুরী সরোজকুমার, গৃহকপোতী, 'নতুন ফসল' এর দ্বিতীয় পর্ব, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রা.লি., ১৯৬৪, পৃ- ২৫।

৫। তদেব, পৃ-৩১-৩২।

৬। তদেব, পৃ-২৭।

৭। তদেব।

৮। তদেব, পৃ-৩২।

৯। মিত্র খগেন্দ্রনাথ, সেন সুকুমার ও চৌধুরী বিশ্বপতি ও চক্রবর্তী শ্যামাপদ সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ-৮০।

১০। রায়চৌধুরী সরোজকুমার, গৃহকপোতী, ১৯৬৪, প্রাগুক্ত, পৃ- ৭।

১১। তদেব, সোমলতা, নতুন ফসল' এর তৃতীয় পর্ব, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রা.লি., ১৯৬৪, পৃ-৮২।

১২। প্রাগুক্ত, বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-৭৫।

১৩। রায়চৌধুরী সরোজকুমার, সোমলতা, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৬।

১৪। তদেব, ময়ূরাক্ষী, পৃ- ১২।

১৫। তদেব, পৃ-১৭।

১৬। তদেব, গৃহকপোতী, পৃ-২০।

১৭। তদেব, পৃ-৭৬।

১৮। মুখোপাধ্যায় শুভঙ্কর (সম্পা.), চক্রবর্তী সুধীর, 'বাউল বৈষ্ণবের মিলিত চৈতন্য', চৈতন্যচিন্তা, এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রা. লি., পৃ- ১২৭-১২৮।

১৯। তদেব।

২০। রায়চৌধুরী সরোজকুমার, গৃহকপোতী, প্রাগুক্ত, পৃ- ১১২-১১৩।

২১। সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৩৯২, পৃ- ২২।

২২। তদেব।

২৩। রায়চৌধুরী সরোজকুমার, গৃহকপোতী, প্রাগুক্ত, পৃ- ১১২-১১৩।

২৪। সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদি লীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৩৯২, পৃ- ২১।

২৫। তদেব, অন্ত্যলীলা, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ-৫০০।

২৬। রায়চৌধুরী সরোজকুমার, গৃহকপোতী, প্রাগুক্ত, পৃ- ১১০।

২৭। তদেব, সোমলতা, পৃ-২৮।

২৮। তদেব, ময়ূরাক্ষী, পৃ- ৫৭।

পঞ্চম অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কথাসাহিত্যে চৈতন্যচর্চার নবনিরীক্ষণ

বাঙালির মধ্যযুগের ইতিহাসে চৈতন্যদেব যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিত্ব এ কথা অবিসংবাদী সত্য। চৈতন্যদেবই বাঙালির জাতীয় চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ গুলো নির্দিষ্ট করে গিয়েছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে বাঙালি ধর্ম-দর্শনে, ভাষা-সাহিত্যে, সঙ্গীত-ভাস্কর্য-চিত্রকলায় এক মহৎ চেতনার বিস্ফার ঘটিয়েছিল, পাঁচশো বছর পরেও যার ঔজ্জ্বল্য নিষ্প্রভ হয়ে যায় নি। তিনি আজও আমাদের সমাজে দৃষ্ট, পৃষ্ট, কীর্তিত ও স্মরণের বিষয়ীভূত। তিনি জনগনমন অধিনায়ক। এই অধিনায়ক চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও রচিত হয়েছে বেশ কিছু উপন্যাস যেখানে চৈতন্যজীবনীই উপন্যাসের প্রধান কথাবস্তু। সেখানে একদিকে যেমন বিশিষ্ট কথাশিল্পীদের কলমে চৈতন্যব্যক্তিত্বের নবনির্মাণ ঘটেছে, আধুনিক সামাজিক প্রেক্ষাপটে চৈতন্যদেবের প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে, অপরদিকে নবনিরীক্ষণে চৈতন্যচর্চার ধারাও বাংলা উপন্যাস শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে।

তারাশঙ্করের উপন্যাস ও ছোটগল্পে আমরা রাঢ় বাংলার পটভূমিতে বৈষ্ণব আখড়াকে কেন্দ্র করে বোষ্টম-বোষ্টমীর জীবন আবর্তিত হতে দেখেছি আর সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর 'দিগ্‌ভ্রান্ত' (১৯৬৬) উপন্যাসে সম্পূর্ণ ভিন্ন পটভূমিতে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব আশ্রমকে কেন্দ্র করে তথাকথিত শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত একটি পরিবারের সদস্যদের জীবনাবর্তের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম পরিবর্তিত রূপ লাভ করে সমাজজীবনে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার চিত্রই আমরা উপন্যাসে প্রতিফলিত হতে দেখি। ষোড়শ শতাব্দীর নবজাগরণের পুরোধা চৈতন্যদেব। বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি সর্বত্র তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল এই মহান ব্যক্তিত্বের তিরোধান রহস্যাবৃত। জীবৎকালেই যিনি অবতারজ্ঞানে পূজিত হয়েছেন, ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষদর্শীরা যাঁর জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন, ভক্তজনেরা অষ্টপ্রহর যাঁকে চোখে চোখে রেখেছেন, তাঁর তিরোধান সম্পর্কে নীরবতা সত্যিই বিস্ময়কর। আর এই বিস্ময়ের বিষয়কেই একটি রোমাঞ্চকর কাহিনীর রূপদান করেছেন ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কাঁহা গেলে তোমা পাই'(১৯৭৬) উপন্যাসে। আবার চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে যে নবজাগরণ এসেছিল তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব প্রতিফলিত হয়ে ওঠে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাগরিক'(১৯৮০) উপন্যাসে। এই উপন্যাসে লেখক চৈতন্যজীবনের নানান দিক সমাজ সংস্কারক রূপে তাঁর ভূমিকা, বিধর্মী শাসকের হাত থেকে হিন্দুধর্ম রক্ষা, সর্বোপরি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিভেদ-বৈষম্য দূর করে সাম্য ও ঐক্যবোধ প্রচার প্রভৃতি চৈতন্যজীবনের নানান দিক সাম্প্রতিক কালের

প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন। আবার কথাসাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র চিরাচরিত বিষয় নিয়েই যার উপন্যাসগুলি বিখ্যাত; শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী নিয়ে রচিত তাঁর উপন্যাস 'কান্তাপ্রেম'(১৯৮৪)। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই গোদাবরী তীরে রায়-রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব আলোচনায় শ্রীচৈতন্যদেব যখন একের পর এক সাধ্যকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে থাকেন তখন শেষ পর্যন্ত রামানন্দ বলেন 'কান্তাপ্রেম সর্বসাধ্যসার'। এই সাধ্য শিরোমণি 'কান্তাপ্রেম' লাভের আশায় বিশ্বেশর (উপন্যাসের চরিত্র) তথা বিশ্বম্ভর চৈতন্যদেবের জীবন কীভাবে আবর্তিত হয়েছিল তাই নিয়েই গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস 'কান্তাপ্রেম'। এখানে আমরা দেখতে পাই ঔপন্যাসিক 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বর্ণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের পঞ্চরসের উপাদানকে ব্যবহার করেছেন এবং চৈতন্যচরিত্রের মধ্য দিয়ে কীভাবে এই রসগুলি উপলবদ্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় সেই পথই বর্ণনা করেছেন। আবার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু ইতিহাসকে আশ্রয় করে মানবপ্রেমিক ও জনসংঘের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিত্ব হিসাবে চৈতন্যচরিত্রের নবরূপায়ণ ঘটিয়েছেন তাঁর কালকূট ছদ্মনামে লেখা 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য' (১৯৮৭) উপন্যাসে। শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বের অলৌকিকতাকে পরিহার করে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনটি পর্বে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলার ইতিহাস রচনা করেছেন। এই উপন্যাসগুলিকে কালানুক্রমে বিন্যস্ত করে আমরা বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

সতীনাথ ভাদুড়ী: 'দিগ্‌ভ্রান্ত' (১৯৬৬)

সতীনাথ ভাদুড়ীর 'দিগ্‌ভ্রান্ত' একেবারে ভিন্নধর্মী একটি উপন্যাস। তারাশঙ্করের উপন্যাস ও ছোটগল্পে আমরা রাঢ় বাংলার পটভূমিতে বৈষ্ণব আখড়াকে কেন্দ্র করে বোষ্টম-বোষ্টমীর জীবন আবর্তিত হতে দেখেছি আর সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসে সম্পূর্ণ ভিন্ন পটভূমিতে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব আশ্রমকে কেন্দ্র করে তথাকথিত শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত একটি পরিবারের সদস্যদের জীবন কীভাবে আবর্তিত হয়েছে তারই ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন।

এই উপন্যাসে বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ এবং বৈষ্ণবদের আশ্রমকেন্দ্রিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে। বৈষ্ণব আশ্রমের নিয়ম-কানুন, রীতি-নীতি, আচার-সংস্কার কীভাবে অতসীবালা, সুশীল ও মণির জীবনকে প্রবাহিত করেছে তাই নিয়েই উপন্যাসের কাহিনি। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় অতসীবালা-সুবোধবাবুর সংসারে মূর্তিমান উৎপাতের মতো এসে আস্তানা গাড়ে হরিদাস, সে অতসীবালার দেশের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ধীরে ধীরে এই সাধু-সন্ন্যাসী গোছের লোকটি অতসীবালার সংসারে স্থায়ী আসন করে নেয় এবং নাম-কীর্তন, পাঠ, হরিসভা করে গ্রামের সকলের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে।

এদিকে সুবোধবাবুর সংসারে তিনি নিজে এবং স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে সকলেই যখন ম্যালেরিয়ায় ভুগছেন দীর্ঘদিন, এমন সময় তার বোন হাওয়া বদলের জন্য তাদের সকলকে দেওঘরে আমন্ত্রণ জানায়। সুবোধবাবু ছাড়া বাড়ির সকলেই সেখানে যায়। এই দেওঘরে গিয়ে তারা 'রেখাকুঞ্জ' নামে একটি আশ্রমে যাতায়াত শুরু করে। এই 'রেখাকুঞ্জে' বৃন্দাবনের একদল বৈষ্ণবদের বাস। সেখানে এসেছেন বৃন্দাবনের স্বনামধন্য শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী এবং তার অন্যতম শিষ্য চিত্রাসখী। এই আশ্রমের পরিবেশ অতসীবালাদের আকর্ষণ করে। তারা নিয়মিত সেখানে যাতায়াত করতে থাকে। রেখাকুঞ্জের আশ্রমবাসীরা সকলেই অষ্টপ্রহর ভজন-পূজন, শ্রবন-কীর্তন নিয়ে থাকেন। তাদের সমস্ত কাজের মধ্যেই একটা ছন্দ রয়েছে। সবই হচ্ছে সেবা। তাদের এই বাধা-বন্ধনহীন উন্মুক্ত জীবনের অনাবিল আনন্দ সাংসারিক জীবনের গণ্ডীবদ্ধ অতসীবালাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে থাকে। আবার আশ্রমের বিভিন্ন উৎসব আয়োজন, নির্দিষ্ট সময়ে ঠাকুরের ভোগ-রাগ, কীর্তন, আশ্রমবাসীর সুমিষ্ট ব্যবহার তাদের মুগ্ধ করে এই রেখাকুঞ্জের আশ্রম জীবন অতসীবালা ও তার ছেলে মেয়েদের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে।

দেওঘর থেকে ফিরে আসে অন্য এক অতসীবালা। গলায় সে কণ্ঠি ধারণ করেছে এবং স্বপাক নিরামিষ আহার করে। একাদশী পালন করে। ঠাকুর ঘরের পূজা-আর্চা, নাম জপতপেই সময় কাটে। সংসারের কাজে, স্বামীর প্রতি কর্তব্যে ধীরে ধীরে অবহেলা ধরা পড়ে। কিন্তু অতসীবালা এ সবের পিছনে যুক্তি খোঁজে ভগবৎ সেবাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য। নিজের ধর্ম-কর্ম, আচার পালন, নিরামিষ ভোজনে ছেলে-মেয়েকেও অভ্যস্ত করে তোলে। একদিকে সংসারের দায়িত্ব-কর্তব্য অপরদিকে ধর্ম-কর্মের মোহ এই দুয়ের মাঝে পড়ে অতসীবালার প্রাণ হাঁস-ফাস করতে থাকে। তাই সংসারের গণ্ডী থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে ধর্ম-কর্ম করার আশায়, বৃন্দাবনের বৈষ্ণব আশ্রমবাসীদের সঙ্গে একত্রে ভজন-পূজনের আনন্দ পাবার জন্য অতসীবালা ননদকে ডেকে আবার ছেলে-মেয়ে ও হরিদাসকে নিয়ে বৃন্দাবন যাত্রা করে। সুবোধবাবু কখনওই স্ত্রীর ইচ্ছা ও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন নি, এবারও করলেন না।

এবারে বৃন্দাবন থেকে অতসীবালারা ফিরে এলেন একেবারে রূপ পালটে। দেখা গেল সুশীল ও মণির গলায়ও উঠেছে কণ্ঠিমালা। আর অতসীবালা মাথার চুল ছেঁটে একেবারে রূপ পাল্টে বৃন্দাবনের আশ্রমবাসিনী হয়ে ফিরেছে। সুবোধবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, আহত হলেন স্ত্রীর ব্যবহারে। তিনি তড়িঘড়ি মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন এবং অতসীবালার মত না নিয়েই কলকাতায় মেয়েকে বিয়ে দিয়ে দিলেন। অতসীবালা স্বামীর ব্যবহারে আরও কঠিন হয়ে উঠল এবং সংসার ছেড়ে সুশীলকে নিয়ে বৃন্দাবনে চলে গেল।

বৃন্দাবনের এই আশ্রম সুশীলের জীবনকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। সুশীল সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণব জনোচিত ধর্মে-কর্মে আত্মনিয়োগ করে। গুরুদেবের কাছে বসে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রন্থ ও বৈষ্ণব শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, আলোচনা করে। সুশীল বুঝেছে সাধন-ভজন করতে হলে যথেষ্ট পড়াশোনা করতে হয়। বৈষ্ণবশাস্ত্র অগাধ সমুদ্র। সে 'গীতা', 'চৈতন্যভাগবত', 'চৈতন্যমঙ্গল', 'চৈতন্যচরিতামৃত' ইত্যাদি গ্রন্থগুলি আশ্রমবাসীদের সম্মুখে পাঠ করে। আশ্রমের প্রভাবের ফলেই সুশীলের পাঠক্রমে সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়গুলো প্রাধান্য পেল। গুরুদেবের নির্দেশেই সে ম্যাট্রিক পাশের পর ডাক্তারি ছেড়ে আই. এ. তে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত লজিক নিয়ে পড়তে শুরু করে। বৈষ্ণবভক্ত আশ্রমবাসী সুশীলের গুরুদেবের প্রতি ছিল অন্ধ আনুগত্য। তারপর হঠাৎই একদিন সুশীলের মোহভঙ্গ ঘটে, ধর্মান্ধতার আবরণ খসে পড়ে, গুরুদেবের আসল উদ্দেশ্য তার সামনে ধরা পড়ে। সারাজীবন আশ্রমের মোহান্তগিরি করে কাটাতে হবে- এ প্রস্তাব সুশীল মেনে নিতে পারে না। সুশীল বুঝতে পারে সে একটি বড় ষড়যন্ত্রের স্বীকার। তার কাছে গুরুদেব কৃষ্ণদাস বাবাজী ও সাধুমার এতদিনকার আচরণ, পক্ষপাতীত্ব, বিশেষ খাতির-যত্নের উদ্দেশ্য জলের মতো স্পষ্ট হয়ে যায়।

সুশীল এই পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে এবার বংশপরম্পরায় ডাক্তারি পড়তে কলকাতায় যায়। দীর্ঘ চার বছর পড়াশোনা করে সে ডাক্তার হয়ে এসে গরীব লোকের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। তবে আশ্রমের প্রভাব তার মধ্যে থেকেই গেছে। ডাক্তারি করেও সে বৈষ্ণবশাস্ত্র অনুশীলন করে। আশ্রম জীবনের মধুর স্মৃতি এবং বর্তমানে ডাক্তারি ও পরিবারকে সঙ্গদান –এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখেই সুশীল জীবনে এগিয়ে চলে।

আর অতসীবালা ভগবানের কৃপালাভের আশায় স্বামী-সংসার ত্যাগ করে শেষপর্যন্ত পরিণামে কি পেল? প্রথম প্রথম অতসীবালার কাছে বৃন্দাবনের সব কিছুই ছিল আকর্ষণের বিষয়। একাধিকবার ব্রজপরিক্রমা করেও দেখবার আশ মেটে না, এর প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে শ্রীরাধিকার চোখের জল না হয় আনন্দাশ্রু মেশানো। ব্রজবাসী ও ব্রজবাসিনীদের বেশ-ভূষা, কথাবার্তা, আহার-বিহার, হাসি-কান্না, এমনকি ছলনা-বঞ্চনার মধ্যেও তিনি সুদূর অতীতের লীলাকেলি, মান-অভিমান, মিলন-বিরহের ক্ষণদীপালির আভাস পান।সব কিছু দেখে শুনে অতসীবালা খুব আনন্দ পায় ঠিকই তবু কোথাও যেন তার মধ্যে স্বামী-সন্তান-সংসারের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যের অবহেলা তার মনে অপরাধবোধ জাগিয়ে তোলে। আশ্রমে থাকার জন্য স্বামীর দেওয়া মাসোহারার উপর তাকে নির্ভর করতেই হয়।

বছরের পর বছর যত এগোতে থাকে ততই অতসীবালার আশ্রমের মোহ কাটতে থাকে, মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। যখনই হতাশা আর অসাফল্যের গ্লানিতে মন ভরে ওঠে তখন সে আরও দ্বিগুণ উদ্যমে ভগবানের সাধন ভজনে নিজেকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করে এবং এই আশায় দিন গুনতে থাকে একদিন নিশ্চয়ই রাধারাণীর কৃপা সে লাভ করবে। কিন্তু বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয় ও নৈরাশ্য তাকে আঁকড়ে ধরতে থাকে। আত্মবিশ্লেষণে সে বুঝতে পেরেছে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার আবেশে, অভিমানে, জেদে, ভগবানকে পাবার তীব্র আকাঙ্খায় অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে তিনি অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। যখন তার ধর্মান্ধতার মোহ কাটল তখন জীবনের অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। আত্মগ্লানিতে জর্জরিত অতসীবালা অসুস্থ হয়ে পড়লে আশ্রমবাসীরা তার শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্য মুমূর্ষু রোগীকে বাড়িতে দিয়ে যায়। ডাক্তার স্বামী-পুত্র মিলে সেবা-যত্ন করে তাকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করে।

দিগ্‌ভ্রান্ত এই পরিবারের চারটি সদস্য পুনরায় খড়কুটো অবলম্বন করে এলোমেলো সংসারকে গুছিয়ে তুলতে চায়। কিন্তু ফেরার পথের চাবিকাঠি খুঁজে পায় না নির্বাসিতের দল। এইরকম অবস্থায় যখন পরিবারটি পুনরায় ছন্দে ফেরার পথে এগোচ্ছে এমন সময় অতর্কিতে এই পরিবারের উপর আছড়ে পড়ে এক অনাহুত বিপদ। সুবোধবাবুর বাড়ির সামনের যজ্ঞডুমুরের গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করে হরিদাস। যেদিন সে এই সংসারে ঢুকেছিল সেইদিন থেকে পরিবারটি দিশাহীন হয়ে পড়ে, ভাঙতে শুরু করে, পরিবারের সদস্যদের জীবন এলোমেলো হয়ে যায়; এমনকি সে মরে গিয়েও এই সংসারে অভিশাপ হয়ে থেকে যায়। হরিদাসের আত্মহত্যা যেন এই পরিবারের প্রতি তার বিক্ষোভ প্রদর্শন। মুহূর্তের জন্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দুরতিক্রম্য প্রাচীর ধ্বসে পড়ে, ভয়ের উদ্বেল স্রোতের মধ্যে দিয়ে তারা মনের সীমান্তের বাধা অতিক্রম করে যায়। শঙ্কাকুল অসহায় চারটি হৃদয় চরম বিভ্রান্তির মুহূর্তে সুরসংগতি খুঁজে পায়।

জয়দেব মুখোপাধ্যায়: কাঁহা গেলে তোমা পাই (১৯৭৬)

শ্রীচৈতন্যদেব অবতার পুরুষ। অবতারকে কেন্দ্র করে নানাবিধ অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত থাকে। ভক্তের দৃষ্টিতে ভগবানের স্বাভাবিক মৃত্যু হতে পারে না। তাই অনেকেই মনে করেন শ্রীচৈতন্যের স্বাভাবিক মৃত্যু অসম্ভব বলেই তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে নানারকম অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। এ কথা মেনে নিলেও পাশাপাশি এটাও তো আমাদের মনে রাখতে হবে যে তিনি মনুষ্য দেহ ধারণ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর জন্মের যদি সন, তারিখ, তিথি, সময় সব কিছুর নির্দিষ্ট উল্লেখ থাকতে পারে তবে তাঁর মৃত্যুর নির্দিষ্ট 'সময়' এবং প্রকৃত 'কারণ' নিয়ে এত মতবিরোধ কেন? তাঁর জন্মের সময়কাল সম্পর্কে তো প্রায় সব চৈতন্যচরিতকারই একমত, তাহলে তাঁর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কেউ একমত নন কেন? কেন প্রত্যেকেই নিজের মতো করে এক একটা কাহিনী জুড়ে দিয়েছেন। কেন তাঁর মৃত্যুর যথার্থ কারণ উল্লেখ করতে কেউ রাজী নন? কেনই বা তাঁর মৃত্যুকে রহস্যাবৃত করে তোলা হল? এর কারণ কি কেবলমাত্র তিনি অবতার পুরুষ? না কি এর পিছনে রয়েছে কোন রাজনৈতিক চক্রান্ত? এইসকল প্রশ্নকে সামনে রেখেই ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় বহুদিন ধরে গবেষণা করে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে ১৯৭৬ সালে রচনা করেন 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' উপন্যাসটি। একটি ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় বস্তুকে তিনি যেভাবে রোমাঞ্চকর কাহিনীর আকারে প্রকাশ করেছেন, তাতে তার অসাধারণ শিল্পীসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি থাকা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানের প্রতি তাঁর গভীর নির্ভীক নিষ্ঠাও সত্যিই প্রশংসনীয়।

ষোড়শ শতাব্দীর মৃত্তিকার স্তর খুঁড়ে চলেছি আমরা। কোথায় চৈতন্য! তার সমাধি! মৃত্যুর সঠিক বর্ণনা কই? নেই কেন? তিনি মহাপুরুষ কি ভগবান? আকাশ থেকে নেমে এসেছিলেন এই পৃথিবীতে? কই, ইতিহাস তো তা বলছে না! ইতিহাস বলছে তিনি ষোল আনা মানুষ। তাঁর জন্মবৃত্তান্তের সঠিক বর্ণনা রয়েছে। তাছাড়া চৈতন্যের মতোই বিশেষ গুণের অধিকারী যাঁরা, সেই কৃষ্ণ থেকে রামকৃষ্ণ, তাঁদের তো মৃত্যুর সঠিক বর্ণনা আছে! অথবা সমাধিস্থল আছে। তবে? প্রশ্নটাকে তীক্ষ্ণ করলেই অন্ধকারের দোলাচল অস্পষ্টতা সমসাময়িক গ্রন্থ প্রণেতাদের মধ্যে এক রহস্যময় আড়াল করার প্রচেষ্টা।

ভগবান যীশুখ্রীষ্ট প্রকাশ্যেই ঘাতকের দ্বারা দেহত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন, ভারতের প্রাণপুরুষ স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গুপ্ত ঘাতক ব্যাধের গুপ্তবাণের আঘাতে দেহত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাতে সেই ভগবানের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র ন্যূনতা প্রাপ্ত হয় নি। যীশুভক্ত বা শ্রীকৃষ্ণভক্ত গণের ভক্তিও কোনোরকম বাধা বা ন্যূনতা প্রাপ্ত হয় নি। তাই আজ যদি ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধান ও তথ্য এটাই প্রমাণ

করে যে নিয়তির বলে নর-বপু ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব স্বাভাবিকভাবে বা অস্বাভাবিকভাবে মাতৃগর্ভজাত নরবপুত্যাগ করেছিলেন এবং গোপনে সমাধিনিহিত হয়েছিলেন। তাতে তাঁর অলোক সাধারণ দিব্য মহিমা কিছুমাত্র ক্ষুন্ন হবে বলে প্রকৃত ভক্তের মনে করা উচিত হবে না, যদিও তাঁদের হৃদয় অব্যক্ত বেদনায় ব্যথিত হয়ে উঠতে পারে। প্রকৃত ভক্তের ভক্তিও তাতে ক্ষুন্ন বা ন্যূনতা প্রাপ্ত হবে না। কারণ ভাবভক্তির সাধনা চিরদিনই বাস্তবকে স্বীকার করেও বাস্তবেই আবদ্ধ থাকে না, বাস্তবকে অতিক্রম করে বাস্তবাতীত ভাবরাজ্যে বিচরণ করে। ভাবরাজ্যে তাঁদের প্রকৃতি নিয়মাধীন প্রাকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ ও অপ্রাকৃত তনুর রূপ ধারণ করে।

দীর্ঘ বাইশ বছর ধরে পুরীতে থেকে, প্রাচীন ওড়িয়া পুঁথির পাঠোদ্ধার করে জয়দেব মুখোপাধ্যায় গবেষণা শুরু করেছিলেন। তাঁর গবেষণার বিষয় : চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত। বইয়ের নাম 'কাঁহা গেলে তোমা পাই'। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। সেই সময় তিনি নিহত হন। এ ঘটনার পরেই দ্বিতীয় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। জয়দেব মুখোপাধ্যায় তাঁর পূর্বসূরিদের সঙ্গে সহমত ছিলেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন, ডঃ নীহাররঞ্জন রায় দুজনেই সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন যে, চৈতন্যদেবকে পুরীতেই গুম খুন করা হয়। এ বিষয়ে প্রথম সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়। শ্রীচৈতন্যের দেহাবসান কীভাবে ঘটেছিল সে সম্বন্ধে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের কিছু যুক্তিনির্ভর ধারণা ছিল। কিন্তু সেই ধারণা তিনি প্রকাশ্যে বলতে বা ছাপার অক্ষরে লিখতে রাজি হন নি। তাঁর ভয় ছিল সেই ধারণা প্রকাশ্যে এলে বঙ্গদেশে তিনি প্রাণ নিয়ে বাঁচতে পারবেন না। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় দেশ বরেণ্য ইতিবৃত্তকারের ধারণায় চৈতন্যের দেহাবসানের এমন এক চিত্র জ্বলজ্বল করছে, যে চিত্রটি আজ পর্যন্ত কোন ইতিহাস বা কাব্যে পাওয়া যায় নি এবং যে চিত্রটি প্রকাশ করলেই সমূহ বিপদ ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তাঁর ওপরে। এই বিপদের ঝুঁকি নিয়েই প্রকৃত চিত্রটি তুলে ধরতে ব্রতী হয়েছিলেন ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়। তিনি প্রায় প্রমাণ করে দিয়েছেন শ্রীচৈতন্যকে কেন হত্যা করা হয়েছিল। হত্যার ষড়যন্ত্রকারী কারা ছিলেন এবং চৈতন্যকে কোথায় কীভাবে সমাধিস্থ করা হয়েছিল?

লেখক জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের ভাবনাকে আলোড়িত করেছিল দীনেশচন্দ্র সেনের 'চৈতন্য এণ্ড হিজ এজ' গ্রন্থটি। সেখানে দীনেশ চন্দ্র সেনের এই উদ্ধৃতিটি তিনি চয়ন করেছেন – "For fifty years after the tirodhan of the great teacher, the vaishnab community lay enervated by the great shock. Their kirtana music which had taken the whole country by surprise, stopped for a time. After that melancholy evnt and was not heard for nearly half a century in the great provinces of Bengal and Orissa."[১] এখানে ঐ great shock কথাটি লক্ষণীয়। যাঁর জন্ম হয়েছে তার একদিন তো মৃত্যু হবেই। তাতে এমন shock পাবার কী

থাকতে পারে যার দরুণ দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলা ও উড়িষ্যায় একটা গোটা বৈষ্ণব সম্প্রদায় মহাপ্রভুর পরম প্রিয় কীর্তন গান পর্যন্ত বন্ধ রাখল। লেখক মনে করেন যে আসলে এই shock এর মুখ্য কারণ গৌরাঙ্গের তিরোধানের সমস্ত ঘটনাটাই ছিল তৎকালীন বৈষ্ণব সমাজের কাছে ভীষণ রকমের আকস্মিক, অস্বাভাবিক এবং অবিশ্বাস্য। মাত্র কয়েক ঘন্টা আগেও গম্ভীরার মধ্যে যাঁকে মহাভাবে কীর্তন করতে দেখেছে অনেকেই, তিনিই বেলা চারটে থেকে রাত এগারোটার মধ্যবর্তী যে কোনো একটা সময়ে হঠাৎ জগন্নাথের শ্রীমূর্তির সঙ্গে মিশে গেলেন – এরকম একটা আজগুবি ব্যাপারকে কোন বাস্তবধর্মী মন কখনও বিশ্বাস করতে রাজী নয়।

লেখক আরও মনে করেন একটা ভয়ে আতঙ্কে আত্মহারা হয়ে পড়েছিল চৈতন্যদেবের ভক্ত এবং শিষ্যরা যখন জানতে পারল অমিতবীর্য দিব্য শক্তি সম্পন্ন মহাপ্রভুকে লোকচক্ষুর সামনে থেকে চিরদিনের মত সরিয়ে দিয়েছে কোন এক দুষ্ট চক্র। যে চক্র কোনোদিনই ভাল চোখে দেখেনি শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত প্রেমভক্তি আন্দোলন এবং সেই আন্দোলনের সমর্থক, অনুসারী ও পৃষ্ঠপোষকদের। এমন কি তার মরদেহটিকে পর্যন্ত লোপাট করে দিয়েছে ঐ পাপচক্র।

গ্রন্থে লেখক জয়দেব মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন কীভাবে আলোকসামান্য প্রতিভাধর এই মহাপুরুষ ধীরে ধীরে সকলের চোখের বালিতে পরিণত হলেন। সর্ব প্রথম স্মার্ত পণ্ডিতেরা তাঁর শত্রু হয়ে উঠল। জয়দেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন " নীলকণ্ঠ দাস তাঁর ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য নামক পুস্তকে বলেছেন মহাপ্রভু স্মার্তদের দুর্ব্যবহারে একদিন নবদ্বীপ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আবার পুরীতে এসেও তাঁকে স্মার্তদেরই বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হয় প্রথমেই। নীলকণ্ঠ বাবু ঠিকই লিখেছেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পরপর সাতদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করার পর যেদিন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আদি শঙ্করাচার্যের নিন্দা করলেন, বললেন শঙ্কর ভাষ্য প্রকৃত প্রস্তাবে বেদান্ত বিরুদ্ধ, বললেন মায়াবাদীগণ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক। আমার মনে হয় শঙ্করানুরাগী স্মার্তরা সেদিন থেকেই বিষ নজরে দেখতে শুরু করলেন সদ্য নীলাচলাগত নবদ্বীপজাত বিপ্লবী সেই প্রেমধর্মীকে। এই স্মার্ত পণ্ডিতরাই এর পরে যখন দেখলেন মায়াবাদী স্মার্ত চূড়ামণি রাজপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য গৌরাঙ্গের একজন স্তবকারী ভক্তে পরিণত হলেন। তখন তাঁদের মস্তিষ্কে যে ঈর্ষা ও ক্ষোভের দাবানল প্রজ্জ্বলিত হল তা সর্বগ্রাসী, তা বড়ই ভয়ঙ্কর।"[২] শুধু তাই নয়, যখন রাজ-মহেন্দ্রীর রাজ প্রতিনিধি প্রবল প্রতিপত্তিশালী রায় রামানন্দ চৈতন্যের উপদেশে কৃষ্ণ নাম কণ্ঠে নিয়ে অতবড় সন্মানিত রাজপদ ত্যাগ করলেন, যখন উড়িষ্যাধিপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পন করলেন চৈতন্যের চরণে তখন স্মার্ত সমাজের সঙ্গে সঙ্গে সারা উৎকলের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং রাজার পরিজনবর্গও শ্রীচৈতন্যের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। এইভাবে ধীরে ধীরে মহাপ্রভুর শত্রু ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল।

১৫০০ খ্রীঃ প্রতাপরুদ্র পরাভূত করেন গৌড়রাজকে এবং ১৫০০-১৫০৩ খ্রীঃ মধ্যে তিনি অধিকার করেন চন্দ্রগিরি। যে প্রতাপরুদ্র ১৫০৯ এ মান্দারণ দুর্গের কাছে নবাব আলাউদ্দীন হোসেনের সেনাপতি ইসমাইল গাজীকে অনায়াসে পরাস্ত করলেন প্রচণ্ড বিক্রমে অপূর্ব রণকৌশল প্রদর্শন করে, দক্ষিণে কৃষ্ণানদীর তট পর্যন্ত দখল করে নিলেন – সেই প্রতাপরুদ্রকেই চৈতন্যদেব উপদেশ দিলেন –

"কৃষ্ণকার্য বিনা তুমি না করিবা আর।

নিরন্তর কর গিয়া সংকীর্তন।

তোমার রক্ষিতা বিষ্ণুচক্র সুদর্শন।।"[৩]

প্রতাপরুদ্র নিমজ্জিত হলেন কৃষ্ণভক্তিরসের জোয়ারে। ফলে, একের পর এক তাঁর দুর্গের পতন হতে লাগল। রণক্ষেত্রে যতবারই প্রতাপরুদ্রের পরাজয় ঘটতে লাগল ততবারই চৈতন্যবিরোধী গোষ্ঠী ঐ পরাজয়ের কারণ হিসাবে জনসাধারণের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল চৈতন্য মহাপ্রভুকেই। রটনা করতে লাগল রাজাকে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা করে তুলে তাঁর সমস্ত শৌর্য বীর্য নষ্ট করে দিয়েছে কীর্তন সর্বস্ব রাধিকা ভাবের সাধক ঐ নবদ্বীপ নন্দনই। এ সম্পর্কে প্রমাণ স্বরূপ ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় 'History of Orissa' থেকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন – 'chaitanya was one of the principle causes of the political decline of the empire and the people of Orissa"[৪] ১৫২৯-৩০ খ্রীঃ পুরীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যা এইসময়কার ঈর্ষান্বিত ব্রাহ্মণ ও স্মার্ত সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রতাপরুদ্রের রাজত্ব পরিচালনায় অসাফল্যের কারণ হিসাবে চৈতন্যদেবকে দায়ী করেছেন। তাদের বিদ্বেষ আরও ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করল যখন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রায় রামানন্দ সহোদর দণ্ডপাটের প্রশাসক গোপীনাথ পট্টনায়ক সসম্মানে মুক্তি পেলেন চৈতন্যদেবেরই অনুগ্রহে এবং আনুকূল্যে। রাজ্য শাসনকার্যের ওপরেও মহাপ্রভুর এমন অভাবনীয় প্রভাব বিস্তার লক্ষ করে মহামন্ত্রী, অমাত্য, রাজকর্মচারী প্রভৃতি বুদ্ধিজীবী প্রায় সকলেই রোষে এবং আক্রোশে রাজাকে কেমন করে চৈতন্য প্রভাব জাল থেকে মুক্ত করা যায় সেই কথা গভীর ভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন।

অন্যদিকে আবার মন্দিরের পূজারী ও পাণ্ডাদের মধ্যেও একটি অসহিষ্ণুতা ক্রমেই বেশ ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগল। তার কারণ, নবদ্বীপাগত এই সর্বজীবে সমদর্শী ধর্মবিপ্লবী মহাপুরুষটি 'ব্রাহ্মণে দেন আলিঙ্গণ আর চণ্ডালে দেন কোল'। সেই যুগের সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ এবং বর্ণ হিন্দু অস্পৃশ্য বলে যাদের সর্বদাই দূরে সরিয়ে রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন, সেই নিপীড়িত নিষ্পেষিত মানুষগুলিকেই শ্রীচৈতন্য টেনে নিলেন আপন অঙ্কে পরম করুণাভরে। ঘটালেন এক বিশ্বজনীন উদার ধর্মের অভুদ্যয়।

এতে সংস্কারান্ধ এবং স্বার্থসন্ধ ধর্মধ্বজীরা যে অচিরেই আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে তাতে বিস্ময়ের অবকাশ কোথায় !

একসময় বৌদ্ধরাও চৈতন্যবিরোধী হয়ে ওঠে। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের যে প্রবল সংঘর্ষ ছিল তা কিন্তু নয়। প্রথমদিকে বৌদ্ধদের সঙ্গে মহাপ্রভুর দু-চারবার তর্কযুদ্ধ হয়েছিল বটে কিন্তু তাতে বৌদ্ধরা তাঁর প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে ওঠেনি তখনও। সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি কারণে ভুলবশত বৌদ্ধরা মহাপ্রভুর প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন। চৈতন্য বিরোধীরাই চক্রান্ত করে মহাপ্রভুকে বৌদ্ধদের চোখে বিদ্বেষী করে তোল। ঘটনাটি হল প্রতাপরুদ্রদেবের রাণী পদ্মাবতী হঠাৎ বীরসিংহ নামক এক বৌদ্ধের অনুগামী হয়ে ওঠেন। এই কারণে যখন রাজ্যের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ ভীষণভাবে রুষ্ট ও বিচলিত হয়ে উঠলেন তখন প্রতাপরুদ্র নিরুপায় হয়ে বসালেন এক বিচারসভা, যে সভা বিচার করবে কোন ধর্ম শ্রেষ্ঠ – বৌদ্ধ না সনাতন ধর্ম। এই অসম তর্কযুদ্ধে তান্ত্রিকদের সাহায্যে বীরসিংহকে পরাজিত করা হয় এবং ব্রাহ্মণদের জয় ঘোষিত হয়। এর ফলে বৌদ্ধদের অন্তরে ঐ চৈতন্যবিরোধী চক্রই এমন এক ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম হল যাতে বৌদ্ধরা প্রায় নিশ্চিত ভাবেই বিশ্বাস করে নিল যে চৈতন্যভক্ত উৎকলাধিপতি 'প্রতাপরুদ্র সংত্রাতা' বলে পরিচিত ব্রাহ্মণ চৈতন্য দেবেরই কূট মন্ত্রণায় ঐ বিচারসভা থেকে প্রথমে ছলনা দ্বারা তাদের পরাভূত এবং পরে নিধন করতে প্ররোচিত করা হয়েছিল। সুতরাং এইবার উৎকলের বৌদ্ধসম্প্রদায়ও চৈতন্য বিরোধী চক্রের অন্যতম সমর্থক হয়ে উঠল অনতিবিলম্বে।

এই চৈতন্য বিরোধী চক্রের কেন্দ্রে ছিল গোবিন্দ বিদ্যাধর। যে ১৫০৯ খ্রীঃ থেকেই চেষ্টা করে চলেছিল ক্রমাগত উৎকলের সিংহাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। শ্রীচৈতন্যের নিকট আত্মসমর্পন করার পর প্রতাপরুদ্র রাজকার্য পরিচালনায় যে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে চৈতন্যের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। প্রতাপরুদ্র বলতেন –

"প্রভু কৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায়।।

যদি মোরে কৃপা না করিবে গৌরহরি।

রাজ্য ছাড়ি যোগী দিব হইব ভিখারী।।"[৫]

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় প্রতাপরুদ্র তখন নামে মাত্র রাজা ছিলেন, সকল রাজকার্য পরিচালিত হত চৈতন্যের নির্দেশে। সেই সঙ্গে গোবিন্দ বিদ্যাধর আরও লক্ষ করেছিলেন যে দিনে দিনে চৈতন্যের জন্য সারাদেশের লোক কেমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল ভক্তিতে ও শ্রদ্ধায়। এত বড় জনপ্রিয় লোকনেতা , ধর্মনেতা, সমাজনেতা বেঁচে থাকতে তার পক্ষে পতাপরুদ্রকে সিংহাসন চ্যুত করা এক প্রকার অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল। ১৫০৯ খ্রীঃ যখন বঙ্গদেশের সুলতান কর্তৃক উড়িষ্যা আক্রান্ত হয় সেই সময়ই

সর্বপ্রথম গোবিন্দ বিদ্যাধর বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল মহারাজ প্রতাপরুদ্র দেবের প্রতি অর্থাৎ ১৫০৯ থেকে আরম্ভ হয়েছিল গোবিন্দ বিদ্যাধর কর্তৃক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার। উদার মন প্রতাপরুদ্র তা বুঝতে পারেননি। তাই রণাঙ্গনে অতবড় বিশ্বাসঘাতী কাজ করার পরেও তিনি গোবিন্দকে কেবল ক্ষমার চোখেই দেখেননি, তিনি গোবিন্দকে রাজকার্যে উচ্চপদেও বহাল রেখেছিলেন অনুকম্পাবশত। আর সেই অনুকম্পারই প্রতিদান দিয়েছিল গোবিন্দ বিদ্যাধর প্রতাপরুদ্র সমর্থক অনন্য ব্যক্তিত্ব মহাপ্রভুকে চিরদিনের মতো ভক্তচক্ষু থেকে অপসারিত করার জঘন্য ষড়যন্ত্র করে, প্রতাপরুদ্রের সিংহাসনে স্বয়ং আসীন হবার পর ঘৃণ্য অভিসন্ধি এঁটে প্রতাপরুদ্রের পুত্র কালুয়া দেব ও কখারুয়া দেবকে হত্যা করে।

চৈতন্যদেবের বিরুদ্ধে একদল যে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে এ কথা সম্ভবত স্বয়ং চৈতন্যদেবও বুঝতে পেরেছিলেন। অদ্বৈতাচার্য এই ষড়যন্ত্রের সংকেত দিয়ে চৈতন্যকে একটি তর্জা পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি চৈতন্যকে সাবধান করে দিয়েছিলেন –

"বাউলকে কহিয় লোক হইল বাউল।

বাউলকে কহিয় হাটে না বিকায় চাউল।।

বাউলকে কহিয় কাজে নাহিক আউল।

বাউলকে কহিয় ইহা কহিয়াছে বাউল।।"[৬]

চৈতন্যদেব যখন ভক্তবৃন্দের মধ্যে বসে নীলাচলে ইষ্টগোষ্ঠীতে মেতে ছিলেন, সেই সময়ে জগদানন্দ গিয়ে শান্তিপুর থেকে আনা অদ্বৈতাচার্যের তর্জাটি শোনালেন তাঁকে। স্বরূপ দামোদর এই তর্জার অর্থ জানতে চাইলে মহাপ্রভু বলেন

"প্রভু কহে আচার্য্য হয় পূজক প্রবল।

আগম শাস্ত্রের বিধি বিধানে কুশল।।

উপাসনা লাগি দেবের করে আবাহন।

··· পূজা নির্ব্বাহ হৈলে পাছে করে বিসর্জন।

তরজার কিবা অর্থ না জানি তাঁর মন।।"[৭]

এটুকু বলেই নীরব হলেন প্রভু। কিন্তু তিনি যে আসল কথাটি গোপন করলেন তা বুঝতে অসুবিধা হল না স্বরূপ দামোদরের। অদ্বৈতের আবাহনেই একদিন ঘটেছিল চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ভাগীরথী তীরে নবদ্বীপে। আচার্য তাঁর দেবতা শ্রীচৈতন্যের বিসর্জনের ইঙ্গিত পাঠিয়েছিলেন ঐ তর্জার প্রহেলিকাময়

শব্দগুলির মধ্যে দিয়ে স্বয়ং মহাপ্রভুরই কাছে। এই তর্জার মধ্যে যে ষড়যন্ত্রের আভাষ রয়েছে, তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় 'শ্রীচৈতন্যদেব' গ্রন্থে সুন্দরানন্দ বিদ্যা বিনোদ এই তর্যার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা উল্লেখ করে বলেছেন যে , ঐ যে হাটে না বিকায় চাউল' অর্থাৎ তোমার গোপী প্রেমের বিরোধীতা এবার আসন্ন, আর বেশি লোক তোমার ঐ গোপী প্রেমের তাৎপর্য গ্রহণ করতে রাজী হবে না। অদ্বৈতাচার্যের এই সাবধানবাণী তর্যার ভেতর দিয়ে পাওয়ার পর শ্রীচৈতন্যের মানসিক ভারসাম্য যে কি সাংঘাতিক বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ –

"সেই দিন হইতে প্রভুর আর দশা হইল।

কৃষ্ণের বিরহ দশা দ্বিগুণ বাড়িল।।

উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।

রাধা ভাববেগে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে।।

··· রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলাপন।

স্বরূপে পুছেন জানি নিজ সমাপন।।"[৮]

ইতিহাস বলছে ঐ তর্জা প্রাপ্তির পরেই ভক্তগণ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছিল মহাপ্রভু গম্ভীরার মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন অতি অকস্মাৎ। সাধারণের মধ্যে বেরুনোও তিনি প্রায় বন্ধ করে দিলেন স্বেচ্ছায়। তর্যা শুনে শ্রীচৈতন্যের প্রতিক্রিয়া ছিল এইরকম –

"তর্জা শুনি মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিলা।

তাঁর যেই আজ্ঞা বলি মৌন ধরিলা।।"[৯]

অর্থাৎ তিনি বললেন বেশ তাই হবে। তাঁর (অদ্বৈতাচার্যের) আজ্ঞাই প্রতিপালিত হবে। ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের মতে "তাহলে বুঝতেই পারছ ঐ তর্যার মাধ্যমে অদ্বৈতাচার্য কেবল আসন্ন বিপদের ইঙ্গিতই দেননি চৈতন্যকে, প্রচ্ছন্নভাবে আজ্ঞাও দিয়েছিলেন গোপীপ্রেম প্রচার অর্থাৎ ভক্তি আন্দোলন থেকে নিজেকে অবিলম্বে সরিয়ে নেবার এবং বলাই বাহুল্য, এই ঘটনার অনতিকাল পরই হঠাৎ একদিন ঘটে গেল মহাপ্রভুর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক সেই অন্তর্ধান।"[১০]

জয়দেব মুখোপাধ্যায় আরও বলেছেন যে রায় রামানন্দ মহাপ্রভুকে একটি পত্র লিখেছিলেন যে পত্রে মহাপ্রভুর কয়েকজন ভক্তের নাম উল্লেখ করে মহাপ্রভুকে তাদের সম্পর্কে সাবধান হতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন রায় রামানন্দ। উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখা যায় প্রভুজী গোবর্ধন বাবুকে চৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য উন্মোচনে এই পত্রের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন : " ··· আমি ফিরে আসি রাজমহেন্দ্রী থেকে মহাপ্রভুর কাছে লেখা রায় রামানন্দের সেই পত্রটি নিয়ে। যে পত্রে মহাপ্রভুর কয়েকজন ভক্তের নাম উল্লেখ করে মহাপ্রভুকে তাদের সম্পর্কে সাবধান হতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন রায় রামানন্দ। লিখেছিলেন – ঐ ভক্তরা আসলে ভক্তই নয়, ওরা গোবিন্দ বিদ্যাধরের ঐ পাপচক্রের চর। ··· ও পত্রের অনুলিপি আমার হাতে পৌঁছে গেছে ইতিমধ্যেই। এখন যাচ্ছি আসল পত্রটি উদ্ধার করতে। ··· আমি ফিরে এসেই তোমাকে বিশদভাবে বর্ণনা দেব কেমন করে দুঃখী-তাপী-ত্রাতা গৌরাঙ্গকে ত্যাগ করতে হয়েছিল ইহলোক, আর কোথায় কেমনভাবে অদৃশ্য হল তার দেহখানি ··· "।[১১] উপন্যাসের চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে আমরা যেন লেখক জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের কথাই শুনতে পাই। দুঃখের বিষয় জয়দেব মুখোপাধ্যায় আর সকলের সামনে চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের প্রকৃত সত্য চিত্র তুলে ধরতে পারলেন না। কারণ ইতিমধ্যে তাঁকে ইহজগৎ ছেড়ে চলে যেতে হল। শোনা যায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল নৃশংসভাবে। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত 'ক্ষমা কর হে প্রভু' উপন্যাসে রূপক সাহা এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে জয়দেব মুখোপাধ্যায় খুন হওয়ার সঙ্গে তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তুর কোন সম্পর্ক ছিল না, উনি খুন হয়েছিলেন সেটা ঠিক, তবে জমিজমা বিবাদকে কেন্দ্র করে।[১২] আশ্রমের কিছু জমি দখল করে নিয়েছিল স্থানীয় লোকেরা। উনি প্রতিবাদ করেছিলেন। তারপরই খুন। তবে খুন হওয়ার কিছুদিন আগে তিনি তাঁর প্রকাশককে একটি চিঠি লিখে জানান, মহাপ্রভুর মৃত্যু রহস্য নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে ফেলেছেন, কিন্তু ডাক মারফত পাঠাতে উনি ভরসা পাচ্ছেন না। পুরীতে গিয়ে প্রকাশক যদি পাণ্ডুলিপিটি নিয়ে আসেন, তা হলে বাধিত হবেন। আশ্চর্যের বিষয়, জয়দেব মুখোপাধ্যায় খুন হওয়ার পর আশ্রম থেকে সেই পাণ্ডুলিপি উধাও হয়ে যায়, তাছাড়া প্রথম বইটিতেও তিনি জীবনহানির আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবং এ কাজে তাঁর জীবনের ঝুঁকিও যে কম নয় সেকথা বলেছেন।

চৈতন্যদেবের যে জীবনহানির আশঙ্কা রয়েছে, চৈতন্যবিরোধী একদল যে তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করছে, এ বিষয়ে কিন্তু চৈতন্য অন্তরঙ্গ কয়েকজন পার্শ্বচর অবহিত ছিলেন। যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো) তাঁর 'শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন, " অনুসন্ধানের দ্বারা এটুকু প্রমাণিত হয়, শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য খুব কম করে হলেও তিন-চারজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ জানতেন। তার মধ্যে অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ, গদাধর পণ্ডিত ও স্বরূপ গোস্বামী। স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা আজও অনাবিষ্কৃত। এছাড়া অন্য তিনজন তৎকালে কেউ কিছু বলেননি।"[১৩]

‘অন্য তিনজন’ অর্থাৎ অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ এবং গদাধর পণ্ডিত কেন মুখ খুললেন না? জয়ানন্দের ‘চৈতন্যমঙ্গল’ অনুসরণ করলে দেখা যায় অদ্বৈতাচার্য ও নিত্যানন্দ সম্ভবত প্রভুর সমূহ বিপদ আঁচ করতে পেরেছিলেন।

“আষাঢ় সপ্তমী শুক্লা অঙ্গীকার করি।

রথ পাঠাইহ জাব বৈকুণ্ঠপুরী।।

নিত্যানন্দ গেল রথযাত্রার নিকটে।

অদ্বৈতচন্দ্রের সব কহিল নিষ্কপটে।।”[১৪]

এ থেকে অনুমান করা যায় প্রভুর অন্তর্ধানের কথা নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন। অদ্বৈতাচার্য শ্রীচৈতন্যদেবের উদ্দেশ্যে যে তর্যাটি জগদানন্দের মাধম্যে পাঠিয়েছিলেন সেখানেও তিনি চৈতন্যদেবকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। জয়ানন্দের বর্ণনা অনুযায়ী ১৪৫৫ শকে সম্ভবত রথযাত্রার আগেই অদ্বৈতাচার্য পুরীতে এসেছিলেন। রথ যাত্রা না দেখেই তিনি গৌড়ে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। যাত্রার আগের দিন তাঁকে নিভৃতে ডেকে চৈতন্যদেব তাঁর গোপন সঙ্কল্পের কথা বলেছিলেন :

“অদ্বৈত চলিলা প্রাতঃকালে গৌড়দেশে।

নিভৃতে কর্ম কথা কহিল বিশেষে।।”[১৫]

আরও দেখা যায়, মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যকে সংকীর্তনের সকল ভার অর্পন করেন এবং অকপটে ঘোষনা করেন যে আটাশ বছর তিনি নীলাচলে আছেন, এরপর স্থানান্তরে যাবেন –

“নিত্যানন্দ অদ্বৈতের সমর্পনা করি।

সংকীর্তন যজ্ঞ সব তোমরা অধিকারী।।

আটাইশ বৎসর আমি নীলাচলে রহি।

স্থানান্তরে যাব আমি নিষ্কপটে কহি।।”[১৬]

এই স্থানান্তর কোথায়? স্বর্গে কি? তার কোনো স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তবে রাত্রি দশ দণ্ডের সময় যে তিনি যাবেন এ কথা তাঁর সবচেয়ে প্রিয় পার্ষদ গদাধর পণ্ডিতকে বলেছিলেন :

“পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্বকথা।

কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা।।”[১৭]

এরপর দেখা যায় তাঁর মায়ার শরীর পরে থাকল, তিনি বৈকুণ্ঠে চলে গেলেন। এতে অবশ্য তাঁর মৃত্যুই বোঝায়।

শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পার্ষদদেরও কি জীবনহানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল? এই সন্দেহ প্রকাশ করে ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের নবম পরিচ্ছেদে রাজমহেন্দ্রী থেকে আনন্দকে লেখা প্রভুজীর একটি চিঠিতে লিখেছেন : "প্রাচীন বৈষ্ণব কবি শ্রীবৈষ্ণব চরণের লেখা 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থের ছয়শ বিরাশী পৃষ্ঠাটা ভাল করে পড়ে নিও একবার, দেখবে কেবল মহাপ্রভুই অন্তর্ধান হলেন না, তাঁর পরেই তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ যাঁরা ছিলেন, তাঁদেরও অনেকেই এক এক করে অন্তর্ধান করতে লাগলেন। ··· এর মানে কি বুঝতে পারছ? ঐ চৈতন্য বিরোধী চক্র কেবল চৈতন্যকেই লোকচক্ষুর সামনে থেকে সরিয়ে নেয় নি, নিয়েছে তাঁর প্রিয় পার্ষদদেরও বেশ কয়েকজনকে।"[১৮]

শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার সাক্ষী ছিলেন গদাধর। জয়ানন্দের বর্ণনা অনুযায়ী গদাধরকে মহাপ্রভু তাঁর সঙ্কল্পের কথা বলেছিলেন। বৃন্দবান দাসের 'চৈতন্যভাগবত' অনুসরণে দেখা যায় কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ হয়ে চৈতন্যদেব যখন জগন্নাথ বিগ্রহ আলিঙ্গন করতে মন্দিরের দিকে ছুটে যান তখন তার পিছন পিছন গদাধরও গিয়েছিলেন এবং প্রভু গদাধরকে বলেছিলেন :

"গদাধরে বোলে প্রভু শুন গদাধর।

আমি আগে যাই তুমি আসিহ পশ্চাতে।।

এতেক বলি শ্রীদেউলে প্রবেশ কৈল নাথে।।"[১৯]

চৈতন্যদেব শ্রীদেউলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায় :

"তখন দুয়ারে নিজ লাগিল কপাট।

সত্বরে চলিয়া গেল অন্তরে উচাট।।"[২০]

এই কপাট বন্ধ হওয়ার ঘটনায় দেখা যায় মূল দেউলের কপাট এত বৃহৎ যে, সে কপাটকে ঝপ করে বন্ধ করা সহজ সাধ্য নয়। গদাধর কি বাইরেই রয়ে গেল? না কি সে প্রভুর সঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করেছিল? সে কথা বৃন্দাবন দাস স্পষ্ট করে বলেন নি। তিনি কেবল বলেছেন যে গদাধর বুঝতে পারলেন প্রভু অন্তর্ধান করেছেন।

"গদাধর জানিলেন প্রভুর গমন।

প্রভুর বিরহে তান না রহে জীবন।।

আচম্বিতে গদাধরের হইল অন্তর্ধান।

না পায় দেখিতে কেহ বোলে রাম রাম।।"[২১]

যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো) –র মতে, "এই যে গদাধর আচম্বিতে অন্তর্ধান করলেন অর্থাৎ ঢুকে গেলেন মন্দিরে শত্রুরা সবাই মিলে তাকেও মেরে ফেললো বা আধমরা করে অজ্ঞান অবস্থায় নিয়ে গেল গোপন কক্ষে।"[২২]

এবারে আসা যাক চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ সহচর স্বরূপ দামোদর কথায়। স্বরূপ দামোদর কি জানতেন বা অনুমান করতে পেরেছিলেন চৈতন্যবিরোধীদের চক্রান্ত? আমরা 'চৈতন্যচরিতামৃত' অনুসরণে দেখতে পাই শান্তিপুর থেকে অদ্বৈতাচার্য যে তর্জাটি শ্রীচৈতন্যকে পাঠিয়েছিলেন, সেই তর্জার অর্থ স্বরূপ দামোদর চৈতন্যদেবের কাছে জানতে চাইলে মহাপ্রভু ঈষৎ হাসবার চেষ্টা করে বলেছিলেন, আগম আচার্য শাস্ত্রে পরম পারঙ্গম একথা অজানা নয় স্বরূপ। দেবতার আবাহন এবং বিসর্জন দুই অনুষ্ঠানই তাঁর উত্তমরূপে জানা আছে। মাত্র এইটুকু বলেই নীরব হয়েছিলেন মহাপ্রভু।

শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের সংবাদ শুনে তাঁর ভক্তগণের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ তাঁর রচিত 'শ্রী অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে একটি চমৎকার ফুটনোট দিয়েছেন। চৈতন্যচরিতগুলির কোন কোনটিতে পাওয়া যায় যে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের পরে "ভক্তগণ সকলেই মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলে ক্রমে চেতনা পাইলেন, কেবল স্বরূপ নয়। দেখা গেল তাহার হৃদয় ফাটিয়া প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে।"[২৩] এ প্রসঙ্গে ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "হার্ট বা হৃদপিণ্ড বা হৃদয়কে ফাটা অবস্থায় দেখা যেতে পারে কেবল তখনই, যখন বক্ষদেশে অথবা পৃষ্ঠে কোনও সুগভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং শিশিরকান্তির ঐ দেখা গেল শব্দ দুইটির কেবল একটি অর্থই সম্ভব এখানে – যা হচ্ছে, স্বরূপ দামোদরের বুকে অথবা পিঠে এমন কোনও গভীর জখমের গর্ত সৃষ্টি হয়েছিল যার ভেতর দিয়ে তাঁর ক্ষতবিক্ষত বা চিড়ধরা হৃদপিণ্ডটা দেখতে পেয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যের ভক্তবৃন্দ।"[২৪] 'শ্রীচৈতন্য অন্তর্ধান রহস্য' গ্রন্থের লেখক যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো) এ সম্পর্কে বলেছেন " স্বরূপ দামোদর গুণ্ডিচা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করতে গিয়েছিলেন, এমন সময় বল্লম, কিংবা কুঠারের আঘাতে তাঁর বুকে মারা হয়। ফলে তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন।"[২৫]

প্রাচীন বৈষ্ণব কবি বৈষ্ণবচরণ চৈতন্যভাগবতে বলেছেন যে শুধু স্বরূপ দামোদর নয়, শ্রীচৈতন্যের গম্ভীরা লীলার অনেক পার্ষদই একে একে অন্তর্ধান করেছিলেন আশ্চর্যজনকভাবে। শিশিরকুমার ঘোষ তাঁর 'অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থে বলেছেন যে মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কথা শুনে ভক্তগণ সকলে হাহাকার করে উঠলেন। "এই নিদারুণ আঘাত সহ্য করতে না পারিয়া কেহ কেহ মরিলেন, কেহ

কেহ বা মরিতে মরিতে বাঁচিয়া উঠিলেন। যাঁহারা বাঁচিয়া উঠিলেন, তাঁহারা আর সেখানে তিষ্ঠাইতে না পারিয়া নীলাচল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করিলেন।"[২৬] যেসকল ভক্ত বৃন্দ বাঁচিলেন তারা সেখানে অর্থাৎ পুরীতে আর থাকতে পারলেন না কেন? কেন তারা বৃন্দাবনে পালিয়ে গেলেন? মহাপ্রভুর শোকে? না চৈতন্য বিরোধী চক্রের ভয়ে? আতঙ্কে? জয়ানন্দ বলেছেন চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর 'অনেক সেবক সর্প দংশাইয়া মেল'। এই সর্প আসলে গোবিন্দ বিদ্যাধর রূপ সর্প। অর্থাৎ গুপ্ত ঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন বৈষ্ণব গোস্বামীগণ। গোবিন্দ বিদ্যাধর বৈষ্ণব নিধন যজ্ঞ শুরু করেছিল। যে সকল দুঃসাহসী বৈষ্ণব মহাজন সামান্যতম প্রতিবাদ করতে গিয়েছেন তাঁরা সকলেই প্রাণ হারিয়েছেন এই চৈতন্য বিরোধী চক্রের হাতে। যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো) র মতে, "উড়িয়া চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যদেব ছাড়া আরও অনেক বৈষ্ণব মহান্তগণের অন্তর্ধানের কথা পাচ্ছি। এই অন্তর্ধান পলায়ন নয়, নিধন অর্থাৎ নির্মমভাবে হত্যা।"[২৭]

মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবও যে গোবিন্দ বিদ্যাধর এবং তার সৃষ্ট ঐ দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন এবং সর্বদাই সন্ত্রস্ত থাকতেন তার প্রধান প্রমাণ, চৈতন্যদেব অন্তর্হিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ত্রাসে পুরী ত্যাগ করে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন কটকে। বৈষ্ণব চরণ দাসের 'চৈতন্যচকড়া'য় দেখা যায় প্রতাপরুদ্রদেব শ্রীচৈতন্যকে সমাধি দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন, আবার মাধবের চৈতন্যবিলাসেও আমরা দেখেছি প্রতাপরুদ্রদেব যখন জানতে পারলেন যে মহাপ্রভু দেহত্যাগ করেছেন তখন তিনি স্বয়ং শ্রীমন্দিরে চলে আসেন। শ্রীচৈতন্যের জগন্নাথে লীন হওয়ার ঘটনাটি যে ভক্তদের অলক্ষ্যে ঘটে নি, প্রত্যক্ষদর্শী অনেকেই ছিলেন, এমনকি মহারাজা প্রতাপরুদ্রদেবও উড়িয়া সাহিত্যেও সে প্রমাণ রয়েছে। বিমানবিহারী মজুমদারের 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' –এ শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক লেখক ও শ্রীচৈতন্যের কৃপাপাত্র অচ্যুতানন্দের শূন্যসংহিতায়ও মহাপ্রভুর তিরোভাবের সময় রাজা প্রতাপরুদ্রদেবের উপস্থিতির কথা রয়েছে।[২৮]

নবদ্বীপ এবং পুরী কোন জায়গাতেই চৈতন্যদেবের শত্রুর অভাব ছিল না। নবদ্বীপে যেমন, 'সকল পাষণ্ডী মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে', যেমন পাষণ্ডী প্রধান গোপাল চাপালের মত সমাজবিরোধী লোকের ছড়াছড়ি, উৎকলে তেমনি স্বার্থান্বেষী স্মার্ত, ছদ্ম বৌদ্ধ এবং মন্দির পাণ্ডাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সর্দার ভঞ্জরাও নানাভাবে চৈতন্য আন্দোলনের অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয়তাকে খর্ব করতে উঠে পড়ে লেগেছিল তখন। আর এদের সবাইকে সমস্ত শক্তি দিয়ে উৎসাহ জুগিয়ে চলেছিল প্রতাপরুদ্রের সিংহাসনলোভী মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর।

ড. বিমান বিহারী মজুমদারের মতে, "উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা শ্রীচৈতন্যের প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে আসায় প্রতাপরুদ্র ও রামানন্দ রাজকার্য্যে অবহেলা করিতে

লাগিলেন; বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায় ও গৌড়ের হুসেন শাহের আক্রমণের ফলে উৎকল রাষ্ট্রের সীমা সংকুচিত হইল। শ্রীচৈতন্যের ও তাঁহার উড়িয়া ভক্ত অচ্যুত, যশোবন্ত প্রভৃতির প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণের সন্মান ও মর্যাদা হ্রাস পাইল। এমনকি 'মহাপ্রভু' বলিলে জগন্নাথকে কিংবা চৈতন্যকে বুঝাইবে তাহা লইয়া অথবা উভয়ের মধ্যে কে বড় তাহার সম্বন্ধে উড়িয়াদের সহিত গৌড়ীয়দের বিবাদ বাধিত। এ জন্য এরূপ ঘটনা আশ্চর্য নহে যে চৈতন্য ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের আষাঢ়ের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে অসুস্থ শরীরে একা জগন্নাথ দর্শন করিতে গিয়াছিলেন ও তথায় ভাবাবেশে তিনি মূর্ছিত হইয়াছিলেন। সেই সুযোগে তাহার প্রতি আক্রোশ বশত জগন্নাথের পাণ্ডাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া তাঁহার দেহ লুকাইয়া ফেলেন। শেষে রাজার কাছে কৈফিয়ৎ দিবার জন্য তাঁহারা প্রচার করেন যে শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ দেহে বিলীন হইয়াছিলেন।"[২৯]

ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ড. বিমানবিহারী মজুমদার প্রমুখদের ধারণা মহাপ্রভুকে পুরীর পাণ্ডারা হত্যা করেছিলেন। এই পাণ্ডাদের কথা আমরা বৃন্দাবন দাস এবং লোচন দাসের বর্ণনাতেও পাই। বৃন্দাবন দাস বলেছেন :

"পরিছা বোলে – কোথা যাহ বলহ সন্ন্যাসী।

প্রভু কহে জগন্নাথ পরশিয়া আসি।।

রহ রহ – বোলে সভে বেত্র লয় করে।

নিষেধ না শুনি প্রভু চলিলা ভিতরে।।"[৩০]

এরপরই, লোচন দাসের বিবরণ অনুযায়ী :

"তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।

জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে।।

গুঞ্জাবাড়িতে ছিল পাণ্ডা যে ব্রাহ্মণ।

কি কি বলি সত্বরে আইল তখন ।।

বিপ্রে দেখি ভক্ত কহে শুনহ পড়িছা।

ঘুচাহ কপাট প্রভু দেখিতে বড় ইচ্ছা।"[৩১]

মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন অন্যভাবে। তাঁর মতে, "উপরে যে বিপ্রে দেখি কথা আছে উহার অর্থ যে, বিপ্রকে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন এমন নয়, কারণ বিপ্র মন্দিরের মধ্যে। ইহার

অর্থ এই যে, বিপ্রের চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া ভক্তগণ বলিলেন – "পরিছা – ঠাকুর শীঘ্র দ্বার উন্মোচন কর, প্রভুকে দেখিব।"[৩২]

এই সকল প্রমাণ থেকে ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায় অনুমান করেন যে জগন্নাথ মন্দিরের ভেতরেই পাণ্ডাদের বেতের বা লাঠির প্রহারে মহাপ্রভুর দেহ থেকে প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যায়। বৃন্দাবন দাসের বর্ণনা অনুযায়ী 'মহাপ্রভু জগন্নাথ পরশিয়া হৈলা অন্তর্ধান।' এ থেকে অনুমান করা যায় শ্রীদেউলেই প্রভুকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। শোনা যায় মন্দিরের উত্তর দ্বারের বহির্বেড়ে অবস্থিত কৈবল্য বৈকুণ্ঠ যেখানে নবকলেবরের সময় পূর্ববর্তী বিগ্রহগুলির শ্রীঅঙ্গ প্রোথিত করা যায়, সেখানেই প্রভু জগন্নাথের পুরনো দারুমূর্তির নীচে সমাধিস্থ করা হয় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে। লোচনের বিবৃতি অনুযায়ী আবার দেখা যায় মহাপ্রভু জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন অথচ পাণ্ডারা প্রচার করলেন যে 'গুঞ্জাবাড়ির মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন।'[৩৩] এরপর পারিষদবর্গের করুণ আর্তিতে কপাট খুলে পরিছা ঘোষণা করলেন যে মহাপ্রভু জগন্নাথ দেহে লীন হয়ে গেছেন। তারপর গোবিন্দ বিদ্যাধরের অনুচরদের চললো জরুরী পরামর্শ। এখন কি করা যাবে প্রভুর দেহকে। কোথায় কিভাবে গুম করা যাবে। নগরে ছড়িয়ে পড়ছে সংবাদ দ্রুত গতিতে। মহারাজ প্রতাপরুদ্র সব জেনেও নির্বাক নিশ্চল। তিনি জগন্নাথের মতো দারু মূর্তিমাত্র। তিনি জানেন সমস্ত ক্ষমতা চলে গেছে গোবিন্দ বিদ্যাধরের হাতে। সৈন্যরাও সবাই গোবিন্দ বিদ্যাধরের সঙ্গেই চক্রান্তে জড়িত। এদিকে রথের সময়। মন্দিরের দরজা ৩ টা থেকে রাত্রি ১১ টা পর্যন্ত বন্ধ। বাইরে ভক্তবৃন্দের ভিড়। তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙছে। তারা ক্রমশই অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। তাও আবার মন্দিরের দরজা বন্ধের ঘটনা এই প্রথম। হঠাৎ মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের কথা শুনে ভক্তদের মধ্যে শোকের পরিবর্তে ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। কারণ যে মানুষটা কীর্তন করতে করতে সকলের সম্মুখে মন্দিরের ভেতরে কিছুক্ষণ আগেই প্রবেশ করলেন তিনি হঠাৎ উধাও হয়ে গেলেন কোথায়? জগন্নাথে লীন হওয়া যে অবিশ্বাস্য ঘটনা। তা কি কোন মতে সম্ভব? যদিও ভক্ত বৃন্দ মহাপ্রভুকে জগন্নাথের অংশ বলে মনে করতেন; ভক্ত হৃদয় ভক্তির দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই অলৌকিক ঘটনা মেনে নিল ঠিকই কিন্তু সম্পূর্ণ কি তারা স্বীকার করতে পারল এই ঘটনাকে। কোন যুক্তিবাদী মন কি মেনে নিতে পারে এই ঘটনা। পাঞ্চভৌতিক নশ্বর দেহ হঠাৎ কোথায় চলে গেল? রাত্রি এগারোটা নাগাদ যখন সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল তখন গোবিন্দ বিদ্যাধরের অনুচরেরা ভাবল এই মস্ত সুযোগ। তারা অচৈতন্য শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে ছুটল সমুদ্রের দিকে। হয় সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবে না হয় বালিতে পুতে ফেলবে। কিন্তু মন্দিরের দিকে আসতে আসতে গরুড় স্তম্ভের কাছে দূরে দেখা গেল জন কোলাহল। নগরের কিছু লোক চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানকে সুস্থ চিত্তে মেনে নিতে না পেরে দল বেঁধে আসছে এগিয়ে। দুর্বৃত্তরা তখন ভয়ে অচৈতন্য প্রভুকে স্তম্ভের পিছনে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল দৌড়ে। রাত তখন প্রায় এগারোটা। সেকালের সেদিনের রাত। তাইতো ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায় বৈষ্ণবচরণ দাসের 'চৈতন্যচকড়া'য় যে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন সেখানে লেখক বলেছেন,

"রাত্রি দশ দণ্ডে চন্দন বিজয় যখন হলো

তখন পড়িলা প্রভুর অঙ্গ স্তম্ভ পছ আড়ে

কান্দিল বৈষ্ণব গণ কুহাতো কুহারে।।"[৩৪]

যুধিষ্ঠির জানা (মালীবুড়ো) র মতে "ঠিকই বলেছেন বৈষ্ণব চরণ। চন্দন বিজয় উৎসব শেষ হওয়ার পর পথে লোকজন কমে আসে।"[৩৫] এই যে দেখা গেল গরুড় স্তম্ভের কাছে প্রভুর মৃতদেহ পড়ে থাকতে, সে মৃত দেহ পরে টোটা গোপীনাথ মন্দিরে এল কেমন করে? বৈষ্ণবচরণ বলেছেন :

"কানাই খুঁটিয়া শিখি মাহান্তি আবর।

ঘেনিল অঙ্গুক তোটা গোপীনাথ পুর।।"[৩৬]

প্রভুর ওড়িয়া ভক্ত শিখি মাহান্তি ,কানাই খুঁট্যা প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তাঁকে নিয়ে এলেন টোটা গোপীনাথ মন্দিরে। জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে' লিখলেন :

"চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠীর দিবসে।

সেই লক্ষ্যে টোটায় শয়ন অবশেষে।।"[৩৭]

ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে আরও দেখিয়েছেন যে ভক্তিরত্নাকরে ঘনশ্যাম দাসও বলেছেন চৈতন্যদেব অপ্রকট হবার সামান্য কিছুদিন আগে আচার্য নরত্তোম মহাপ্রভুকে দর্শন করবার আশায় পুরী যাত্রা করেন, কিন্তু তিনি নীলাচলে পৌঁছবার পূর্বেই মহাপ্রভু অপ্রকট হন। আশাহত নরোত্তম শোকার্ত হৃদয়ে গদাধরের কুটিরে হাজির হলে গদাধর পণ্ডিতের সেবক কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে চৈতন্য সমাধি দেখিয়ে বলেন-

"ওহে নরত্তোম এইখানে গৌরহরি।

না জানি কি পণ্ডিতে কহিলা ধীরি ধীরি।।"[৩৮]

যদিও এখানে প্রমাণিত হয় না যে টোটা গোপীনাথেই শ্রীচৈতন্যের সমাধি আছে, তবে চৈতন্য সম্প্রদায়ীদের মধ্যেও নাকি একটি প্রবাদ খুব প্রচলিত রয়েছে –

"কি করব কোথায় যাব বচন না সরে।

গোরাচাঁদে হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে।।"[৩৯]

এইগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে চৈতন্যদেবের শেষ লীলার সঙ্গে কোন না কোনভাবে টোটা গোপীনাথের একটা সম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্কে আমরা ডঃ বিমানবিহারী মজুমদারের মত উদ্ধৃত করব। 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' বইটিতে তিনি বলেছেন " নির্দিষ্ট সময়ের সামান্য বিরোধ থাকিলেও জয়ানন্দ ও লোচনের মধ্যে তিথি ও তারিখের মিল আছে। কিন্তু তিরোভাব স্থানের মিল নাই। লোচনের মতে গুঞ্জাবাড়ীতে তিরোভাব, জয়ানন্দের মতে টোটা গোপীনাথ মন্দিরে। শ্রীচৈতন্য যে সমুদ্রে তিরোহিত হন নাই তাহা দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় সুষ্ঠুভাবে প্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের স্বাভাবিক মৃত্যু যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার প্রিয় সুহৃদ গদাধরের নিকট টোটা গোপীনাথে তিনি শেষ সময় ছিলেন, ইহাই অধিকতর সম্ভব। কিন্তু গুঞ্জাবাড়ীতে বা জগন্নাথের দেহে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব কাহিনীর মধ্যে যেন একটা গুপ্ত হত্যার ইঙ্গিত আছে বলিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করেন।"[৪০]

উপন্যাসে দেখা যায় প্রজ্ঞাপ্রাণা প্রবীণা অধ্যাপিকা শান্তামায়ি বলেন সম্পূর্ণ অন্য কথা। তার মতে এই টোটা গোপীনাথের মন্দির থেকেই ছদ্মবেশে অর্থাৎ জটাজুট বিলম্বিত সন্ন্যাসী সেজে শ্রীচৈতন্য সকলের অজ্ঞাতে পালিয়ে গিয়েছিলেন পুরী থেকে। তারপর আনোরপুর পরগণার ঘোলাদুবলী গ্রামে গিয়ে তিনি আত্মগোপন করেন। এই ঘোলাদুবলী গ্রামে বেশ কয়েকবছর তিনি অতিবাহিত করেন। সেখানে থেকে তিনি একদিন পালিয়ে যান। পরে উলাগ্রামে মহাদেব বারুইয়ের বরজে গিয়ে তাকে দর্শন দান করলে সন্তানহীন মহাদেব মহাপ্রভুকে বারো বছর নিজের পুত্রের মতো লালন পালন করেন। এরপর ছল করে মহাপ্রভু মহাদেব বারুইয়ের গৃহ ত্যাগ করে এবং গন্ধবণিকের ঘরে আশ্রয় নেন। সেখানে অল্পকিছুদিন থেকে চলে যান এক ভূস্বামীত বাড়িতে। সেখানে বাস করেন প্রায় দেড় বছর। অনন্তর পূর্ববঙ্গের অনেকগুলি স্থান পরিভ্রমণ করে শেষে একসময় গিয়ে বাস করতে থাকেন বেজড়া নামে একটি গ্রামে। এই বেজড়াতেই আউলিয়া চাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন বাইশ জন ভক্ত। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। কর্তাভজা সম্প্রদায় মনে করে গোরাচাঁদ আসলে আউলিয়াচাঁদ। আরবী ভাষায় আউল শব্দের মানে হচ্ছে আদি। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের স্রষ্টা হিসাবে চৈতন্যদেব আদি পুরষ। চৈতন্যদেবের সঙ্গে আউলিয়া চাঁদের অনেক মিল পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের মতো আউলিয়া চাঁদও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। শ্রীচৈতন্যের যেদিন জন্মদিন অর্থাৎ ফাল্গুনের দোল পূর্ণিমাতেই আউলিয়া চাঁদের জন্মদিনও পালন করা হয়। আউলিয়া চাঁদের পূর্ব জীবনের ইতিহাস ভক্তদের কাছে ছিল অজ্ঞাত। নীলাচল থেকে পালিয়ে চৈতন্য তো সম্পূর্ণ অজ্ঞাতবাসই করেছিলেন। তাছাড়া শোনা যায় আউলিয়া চাঁদ ছিলেন দীর্ঘকায়, আজানুলম্বিত ছিল তাঁর দুই বাহু। আউলিয়া চাঁদ যে গোরাচাঁদ তা উভয়ের ধর্মের মূল নীতি দেখলে সহজেই অনুমান করা যায়। এই আউলিয়া চাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল যে বাইশজন তারা প্রত্যেকেই ছিল সমাজের নিম্নশ্রেণিভুক্ত। ইতিহাসের অনুসরণে দেখা যায় সামাজিক অবহেলা আর পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা ইসলাম ধর্মের প্রতি যখন আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল ঠিক সেই সময় কৃষ্ণ নামের

জোয়ার বইয়ে অবজ্ঞাত নিষ্পেষিত তথাকথিত এই নিম্নশ্রেণীর মানুষকেই সর্বাগ্রে তাঁর সমদর্শী উদার বক্ষপটে জড়িয়ে ধরেছিলেন গৌরহরি। এইভাবে চৈতন্যদেবকে নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত রয়েছে যেগুলি সম্পূর্ণ সত্যি না হলেও অবাস্তব নয়।

বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে –'জগন্নাথ পরশিয়া হৈল অন্তর্ধান'।[৪১] এখানেই কিন্তু চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান কাহিনীর শেষ নয়। তারপরও আছে। বিস্ময়াভিভূত সকল ভক্তগণ অনুমান করলেন মহাপ্রভু কি মিলিয়ে গেলেন দারুময় জগন্নাথের অঙ্গে? না না জগন্নাথে মিলিয়ে যান নি শ্রীচৈতন্য। অধিকারীগণ দেখেছেন জটাজুট বিলম্বিত সন্ন্যাসীর বেশে কে একজন চলে যাচ্ছেন মদন গোপাল মন্দিরের দিকে। অধিকারী সকলে দেখেছেন তাঁকে চলে যেতে। কিন্তু তারপর প্রভু যে কোথায় গেলেন তা লক্ষ করা গেল না অর্থাৎ দেখা গেল না।

"এথা সে যখন প্রভু হৈলা অন্তর্ধান।

ন্যাসী রূপে গেলা মদন গোপালের স্থান।।

অধিকারী সকল দেখিল তানে যাইতে।

পুনঃ কোথা গেলা প্রভু না পারে লখিতে।।"[৪২]

বৃন্দাবন দাসের বর্ণিত ঘটনার সঙ্গে শান্তামায়ির কাহিনীর সঙ্গতি লক্ষ করা যায়। তাই শান্তামায়ির কাহিনীটি যুক্তিগ্রাহ্য না হলেও একেবারে নস্যাৎ করা যায় না। তবে গোরাচাঁদ ও আউলিয়া চাঁদ সম্ভবত একই ব্যক্তি নন। শান্তামায়ির বিবরণ অনুযায়ী আউলিয়া চাঁদ দেহ রেখেছেন ১৬৯১ শকে। আর নিমাই জন্মেছিলেন ১৪০৭ শকে। তাহলে কি গৌরাঙ্গদেব বেঁচে ছিলেন ২৮৪ বছর? এও কি সম্ভব? সম্ভব অসম্ভবের বিচার কর্তা আমরা নই। গবেষণার জন্য বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করা এবং সেগুলিকে যুক্তিপূর্ণভাবে সাজিয়ে সম্ভাবনাগুলিকে উত্থাপন করাই আমাদের কাজ।

মহাপ্রভু তাঁর অন্ত্যলীলায় জীবদ্দশার শেষের দিকে 'দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কৃষ্ণ প্রেমে অধীর হয়ে কেবলই মুখ ঘষতেন কাশীমিশ্র ভবনের গম্ভীরার ভেতরে; ফলে প্রায়ই রক্তাত হয়ে যেত তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর মুখাবয়ব। যথা 'চৈতন্যচরিতামৃতে':

"প্রেমাবেশে মহাপ্রভু গরগর মন।

নাম কীর্তন করি বসি করে জাগরণ।।

বিরহে ব্যাকুল প্রভুর উদ্বেগ উঠিলা।

গম্ভীরার ভিতরে মুখ ঘর্ষিতে লাগিলা।।

মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার।

ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার।।"[৪৩]

শ্রীকৃষ্ণ বিরহে উন্মাদ অবস্থায় ঐ যে ঘন ঘন মহাভাবাক্রান্ত হয়ে মহাপ্রভুর সংজ্ঞা লোপ – একে রোমা রোলাঁ মৃগীরোগের লক্ষণ বলে মনে করেছিলেন। তাঁর মতে মহাপ্রভু মারা গেছেন এপিলেপসিতে। তবে ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় রোমা রোলাঁর সঙ্গে একমত নন।

রোমা রোলাঁ চৈতন্যদেবের মৃত্যুর একটি বাস্তবসম্মত কারণ নির্ণয় করেছিলেন। বাংলা এবং উড়িয়া চৈতন্যচরিত কাব্যগুলি অনুসরণ করলে আমরা দেখতে পাই বাংলা কবিদের মধ্যে একমাত্র জয়ানন্দ এবং উড়িয়া কবিদের মধ্যে মাধব পট্টনায়ক চৈতন্যদেবের তিরোধানের বাস্তবসম্মত কাহিনী বর্ণনা করেছেন। যদিও মহাপ্রভুর তিরোধানের সময় নিয়ে উভয়ের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। সে যাই হোক, তবে উভয়েই শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর কারণ স্বরূপ একই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। মহাপ্রভুর পায়ে ইঁটের আঘাতে ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান। কিন্তু মহাপ্রভুর মৃত্যুর কারণ স্বরূপ এই ঘটনাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছেন ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়।[৪৪]

এমনকি চৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের সময় মন্দিরের দ্বার দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ রাখার কারণ স্বরূপ ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের যে অভিমত "We may however, make a reasonable guess as to the fact of the case. Chaitanya was in the jagannath temple when he suffered from high fever. When the priests apprehended his end to be near they shut the gate against all visitors. This they did to take time for burying him whithin the temple. …… the priests would not like to shew him dying of fever as an ordinary man. They declared that they had witnessed with their own eyes that chaitanya passed into the image of Jagannath. This report would certainly prove his divinity and make it absolutely beyond doubt. They buried him somewhere under the floor of the temple and would not allow any outsider to enter it until the place was thoroughly repaired and no trace left after his burial."[৪৫] তাঁর সঙ্গেও এক মত নন ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় : "এইখানে ডঃ সেনের সঙ্গে আমার মতান্তর। তিনি বোধ করি জয়ানন্দের বর্ণনাকে মনে রেখেই ধরে নিয়েছিলেন মহাপ্রভু প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার পরে মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি কতকগুলি স্বাভাবিক ব্যাপার চিন্তা করে

করে দেখেন নি। রথের সময় গৌড় দেশ থেকে প্রতিবারের মত সেবছরও নীলাচলে এসেছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, অদ্বৈতাচার্য ইত্যাদি বহু ভক্ত শিষ্য।"[৪৬]

জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যে বেশ কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' ভালোভাবে লক্ষ করলে দেখা যাবে যে উত্তর খণ্ডে কবি পরিষ্কার বলেছেন যে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য সে বছর রথের সময় নীলাচলে এসেছিলেন ঠিকই কিন্তু চৈতন্যদেবই তাদের রথের আগেই গৌড়ে পাঠিয়ে দেন। কেন? সে সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের আর এক জায়গায় মতভেদ রয়েছে। তিনি বলেছেন, "পুরীতে তখনও ছিল স্বরূপ দামোদর, জগদানন্দ পণ্ডিত, রঘুনাথ দাস, শংকর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ লীলাসহচরবৃন্দ। এটা তো খুবই স্বাভাবিক যে প্রবল জ্বর নিয়ে চৈতন্যদেব সত্যিই যদি মন্দিরে যেতেন তাহলে এতগুলি ভক্ত, শিষ্য এবং অন্তরঙ্গ সেবকদের কেউ না কেউ নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে যেতেন। কিন্তু ইতিহাস বলছে ··· স্বরূপ গোস্বামী, রঘুনাথ, জগদানন্দ বা গোবিন্দ এঁদের কেউই চৈতন্যের সঙ্গে সেদিন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেন নি বা তাঁদের মধ্যে একজনও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেননি শ্রীচৈতন্যের বিলীন হয়ে যাওয়ার বা দেহত্যাগ করার দৃশ্যটি।"[৪৭]

এখানে আমাদের প্রশ্ন তাঁরা কি করে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করবেন? অথবা মহাপ্রভুর বিলীন বা দেহত্যাগের দৃশ্যটি দেখবেন? কারণ বিবিধ চৈতন্যচরিত কাব্য থেকে দৃষ্টান্ত তুলে যথাসম্ভব পর্যালোচনা করে আমরা দেখেছি যে চৈতন্য মন্দিরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই তো মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, আর সকল ভক্তবৃন্দ এবং পারিষদ বর্গ মন্দিরের বাইরে রয়ে যান। আর, মহাপ্রভুর সঙ্গে কেউ যায় নি এমন তো নয়। প্রায় সকল চৈতন্যচরিতকারই বলেছেন যে পারিষদ বর্গ মহাপ্রভুর পিছন পিছন গিয়েছিলেন। এমনকি বৃন্দাবন দাস তো শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রিয় পার্ষদ গদাধরের নাম পর্যন্ত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায় আরও বলেছেন, "যে পার্ষদরা শ্রীচৈতন্যের সুস্থ থাকা অবস্থাতেও অষ্টপ্রহর তাঁর পাশে পাশে থাকত, মুমূর্ষু চৈতন্যদেবের প্রবল জ্বরাক্রান্ত অবস্থাতেও তাঁদের একজনও রইল না তাঁর পাশে। ··· তাছাড়া মুমূর্ষু যিনি তিনি কি পারেন গম্ভীরা থেকে কীর্তন করতে করতে মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করতে? সুতরাং জ্বরের আক্রমণ যে শ্রীচৈতন্যের শ্রীমন্দিরের মধ্যে মৃত্যু ঘটে নি সে বিষয়ে যে কোনো ঐতিহাসিক সামান্য একটু বুদ্ধি ব্যবহার করলেই সুনিশিচিত হতে পারবেন আশা করি।"[৪৮] কিন্তু আমরা ড. মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে একমত হতে পারি না। চৈতন্যদেব জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন না, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন – এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। আবার, কেবল এই কারণেই যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বা তিনি জগন্নাথ দেহে লীন হয়ে গেছেন - এ কথাও মেনে নেওয়া যায় না। চৈতন্যদেবের যে স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নি এটা নিশ্চিত। চৈতন্য বিরোধী চক্র যে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে গুম খুন করেছিল এ কথা অনুমান

করাই যায়। এই অনুমানের সমর্থনে বেশ কছু প্রমাণ আমরা এই পরিচ্ছেদে আলোচনা করলাম। তবে এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়।

আবার ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় এই উপন্যাসে দেখিয়েছেন বিভিন্ন ঐতিহাসিকেরা যেভাবে উড়িষ্যার রাজনীতিতে মহাপ্রভুর অংশগ্রহণ ও প্রতাপরুদ্রের পরাজয়কে দায়ী করেছেন সেটাও সর্বাংশে সত্য নয়। এ প্রসঙ্গে ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হরেকৃষ্ণ মহাতবের যে মন্তব্যগুলি উদ্ধৃত করেছেন আমরা সে বিষয়ে আলোকপাত করব । যদিও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'history of orissa' গ্রন্থে সুস্পষ্টভাবে চৈতন্যপরবর্তী যুগে উড়িষ্যার পতনের জন্য শ্রীচৈতন্যকে দায়ী করে লিখেছেন " suddenly from the beginning of the 16th century a decline set in the power and priestige of Orissa, with a corresponding decline in the military spirit of the people. The decline is intimately connected with the long residence of the Bengali vaishnava saint chaitanya in the country. ····· we must admit that chaitanya was one of the principle cause of political decline of the empire and people of Orissa." [৪৯]

রাখালদাসের অভিমত অন্যান্য অনেক পণ্ডিতই গ্রহণ করেছেন। ডঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাবও এই মতানুসারী হয়ে বলেছেন – " a doctrine that preaches inaction and sentimentalism is harmful to the ordinary man in his daily walk of life and it is simply fatal to administrator who holds the destiny of millions. The attempt to make the vakti cult a mass religion and to the influence the king and his officers by its sweet pessimistic philosophy had no doubt been fatal to the social political life of the country." [৫০]

এমনকি জয়ানন্দ জানিয়েছেন যে মহাপ্রভু প্রতাপরুদ্রকে বাংলা দেশ আক্রমণ থেকে বিরত করেছিলেন – "প্রতাপরুদ্র গৌড় জিনিতে করে আশা।/ শুনিয়া গৌড়েন্দ্র তারে করেন উপহাসা।।/ চৈতন্যদেবের রাজা আজ্ঞা মাগিল।/ প্রভু বলেন প্রতাপরুদ্র কুবুদ্ধি লাগিল।।/ কাল যবন রাজা পঞ্চগৌড়েশ্বর।/ সিনহ শার্দূল দেখ কতেক আন্তর।।/ ওড্রদেশ উচ্ছন্ন করিবেক যবনে।/ জগন্নাথ নীলাচল ছাড়িবেক এতদিনে।।/ লজ্জা পাবে প্রতাপরুদ্র আমার বাক্য ধর।।"[৫১] কিন্তু জয়ানন্দের এই কথায় যুক্তিযুক্ত

ভাবেই সংশয় প্রকাশ করেছেন ডঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় সেই প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করেছেন "ঐতিহাসিক প্রভাত মুখুজ্জে তাঁর 'The history of medieval vaishnavism in Orissa' গ্রন্থে লিখেছেন – " the real cause of the fall of the empire was not the acceptance of Neo-Vaishnavism', but the weakness of the successors. It is a law of nature that no family can produce uninterrupted line of geniuses. The tottering empire, surrounded by powerful foes, was like the bow of Ulysses which only a strong man could handle. প্রতাপরুদ্র কখনই তেমন লৌহস্নায়ুর মানুষ যে ছিলেন না তা তাঁর সময়কার উড়িষ্যার ইতিহাস পড়লেই জানতে পারা যায়। প্রভাতবাবু বলেছেন – It is difficult to link this sickening tale of moral turpitude with the chaitanya movement, which taught mankind to be faithful and honest··· thus Vaishnavism or no vaishnavism – the succession of weaklings, the moral degeneration of high officials of the state and the decline in the military strength of the nation would have brought about the downfall, sooner or later.(chap. Xi pp. 177-78)"[৫২] ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের মতে, "উড়িষ্যার পতনের জন্য চৈতন্যদেব কোনোভাবেই দায়ী নন। যে বিষয় বিরক্ত সন্ন্যাসী শ্রীচৈতন্য বিষয়ীর সংস্পর্শ ভয়ে প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে সাক্ষাত করতে স্বীকৃত হন নি। তিনি প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ-বিগ্রহাদি রাজকার্যে হস্তক্ষেপ করবেন, তা মনে হয় না। বিশেষত মহাপ্রভু শেষ দ্বাদশ বৎসর যেভাবে আত্মমগ্ন থাকতেন, তাতে বিষয়কর্মে পরামর্শদান তাঁর পক্ষে সম্ভব বলেও মনে হয় না।"[৫৩]

মহাপ্রভু কাশী মিশ্রকে বলছেন যে তিনি পুরীতে থাকতে চান না বিষয়ীর উপদ্রবে। তিনি সন্ন্যাসী রাজদর্শন করতে চান না, বিষয়ীর কথায় তাঁর মন ক্ষুব্ধ হয় – " বিষয়ীর বার্তা শুনি ক্ষোভ হয় মন। / তাতে ইহা রহি মোর নাই প্রয়োজন।।"[৫৪] তাছাড়া রাজা প্রতাপরুদ্রদেব মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের একান্ত অনুরাগী ভক্ত হলেও বৈষ্ণবধর্ম পুররোপুরি গ্রহণ করেন নি। শ্রীচৈতন্যও পুরীতে আত্মভাবরসে নিমগ্ন হয়ে থাকতেন। প্রতাপরুদ্র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতশ্বাস হয়ে জীবনের শেষদিকে একপ্রকার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলেন। সুতরাং এই সময়ে তিনি ধর্মের দিকে অধিকতর মনোযোগী হওয়ায় চৈতন্যদেবের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এই সুযোগে সীমান্ত প্রদেশের শক্তিশালী সামন্ত রাজারা কার্যত স্বাধীন হয়ে উঠলেন। সুতরাং উড়িষ্যার দুর্বলতার ও মুসলমান অধিকারের জন্য চৈতন্যকে দায়ী করা মোটেই সমীচিন নয়। উড়িষ্যার পতনের জন্য মূলত দায়ী প্রতাপরুদ্রের বংশধরদের দুর্বলতা। এ প্রসঙ্গে ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'Gajapati kings of orissa'গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি চয়ন করে দেখিয়েছেন – "R.D.Banerjee has done great injustice to the memory of the great saint by holding him responsible for military decline of Orissa in the reign of Pratapa Rudra."[৫৫]

আচার্য সুকুমার সেন এ সম্পর্কে লিখেছেন, "কেহ কেহ এমনও ইঙ্গিত করিয়া থাকেন যে চৈতন্যের প্রভাবেই বীর্যবান উড়িয়ারা স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। এসব ভাবনা অলস কল্পনামাত্র, ইতিহাস সমর্থিত যুক্তিযুক্ত চিন্তা নয়। উড়িষ্যার গজপতি রাজা দুইপুরুষ- পুরুষোত্তম ও প্রতাপরুদ্র ক্রমে ক্রমে রাজ্যাংশ হারাইতেছিলেন। চৈতন্য নীলাচলে যাইবার ঠিক আগেই বাঙ্গালা উড়িষ্যা সীমান্তে হোসেন শাহার সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধ হইয়াছিল এবং তাহাতে উড়িষ্যা সীমান্তের কিছু অংশ মুসলমান অধিকারে আসে। চৈতন্যের গতায়াতের দ্বারাই উড়িষ্যা বাঙ্গালার উপকূল সীমান্তপথ আবার খুলিয়া যায় এবং চৈতন্য নীলাচলে থাকার ফলেই বাঙ্গালার সুলতানের সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের আর সংঘর্ষ বাঁধে নাই। চৈতন্যের তিরোধানের আট নয় বৎসর পরে তবে উড়িষ্যা মুসলমান শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত হয়। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পরে উড়িষ্যার অবনতি চৈতন্যপ্রভাবিত বৈষ্ণব ভাবের জন্য নয়। তাহার সাক্ষাৎ কারণ রাজসভায় ষড়যন্ত্র এবং রাজপুত্রদের যোগ্যতাহীনতা।"[৫৬] সুতরাং এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর প্রেমধর্ম বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার ক্ষতিসাধন করে নি। বরং সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে নবযুগ আনয়ন করেছিল।

তথ্যসূত্র

(১) Sen Dinseh Chandra, Chaitanya and His Age, University of Calcutta, 1922, p. 260-261.

(২) তদেব, পৃ- ৪৯।

(৩) সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ-২৬০।

(৪) মুখোপাধ্যায় জয়দেব, কাঁহা গেলে তোমা পাই, পঞ্চম সংস্করণ, প্রাচী পাবলিকেশন, ২০১৭, পৃ- ৫২।

(৫) সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৩৯২, পৃ-২২০।

(৬) তদেব, অন্ত্যলীলা, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ- ৫০০।

(৭) তদেব।

(৮) তদেব।

(৯) তদেব।

(১০) মুখোপাধ্যায় জয়দেব, কাঁহা গেলে তোমা পাই, পঞ্চম সংস্করণ, প্রাচী পাবলিকেশন, ২০১৭, পৃ- ৬২।

(১১) তদেব, পৃ- ৮৩।

(১২) ঘোষ ঋতুপর্ণ (সম্পা.), রোববার, প্রতিদিন, সাহা রূপক, ক্ষমা কর হে প্রভু, বি.এল.পাবলিকেশন, ২৭শে জুন, ২০১০, পৃ-৪৬।

(১৩) জানা যুধিষ্ঠির (মালীবুড়ো), শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য, ময়না প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃ- ৫৭।

(১৪) মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা.), জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, উত্তর খণ্ড, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৬, পৃ-২৩৩।

(১৫) তদেব।

(১৬) তদেব।

(১৭) তদেব।

(১৮) মুখোপাধ্যায় জয়দেব, কাঁহা গেলে তোমা পাই, পঞ্চম সংস্করণ, প্রাচী পাবলিকেশন, ২০১৭, পৃ- ১৪৯।

(১৯) সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, চতুর্দশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ- ৩০৬।

(২০) ঘোড়ই বিশ্বরঞ্জন (সম্পা.), লোচন্দাসের চৈতন্যমঙ্গল, অতিরিক্ত পাঠ, ২০০০, সাহিত্যলোক, পৃ- ২৫৭।

(২১) সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, চতুর্দশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ- ৩০৭।

(২২) জানা যুধিষ্ঠির (মালীবুড়ো), শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য, ময়না প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃ- ৬৩।

(২৩) ঘোষ শিশির কুমার, শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত, ষষ্ঠ খণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়, বিশ্ববানী, ২০০৯, পৃ-১৪৮।

(২৪) মুখোপাধ্যায় জয়দেব, কাঁহা গেলে তোমা পাই, পঞ্চম সংস্করণ, প্রাচী পাবলিকেশন, ২০১৭, পৃ-১৫০।

(২৫) জানা যুধিষ্ঠির (মালীবুড়ো), শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য, ময়না প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃ- ১৫৯।

(২৬) ঘোষ শিশির কুমার, শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত, ষষ্ঠ খণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়, বিশ্ববানী, ২০০৯, পৃ- ১৪৭।

(২৭) জানা যুধিষ্ঠির (মালীবুড়ো), শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য, ময়না প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃ- ১৪৭।

(২৮) মজুমদার বিমানবিহারী, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬, পৃ-২৭৮।

(২৯) তদেব।

(৩০) সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, চতুর্দশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ- ৩০৭।

(৩১) চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর সম্পাদিত, লোচনদাসের 'শ্রীশ্রী চৈতন্যমঙ্গল, শেষখণ্ড, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-০৬, ২০১৯, পৃ- ২১১ ।

(৩২) ঘোষ শিশির কুমার, শ্রীঅমিয় নিমাই চরিত, ষষ্ঠ খণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়, বিশ্ববানী, ২০০৯, পৃ- ১৪৭।

(৩৩) চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর সম্পাদিত, লোচনদাসের 'শ্রীশ্রী চৈতন্যমঙ্গল, শেষখণ্ড, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-০৬, ২০১৯, পৃ- ২১১ ।

(৩৪) মুখোপাধ্যায় জয়দেব, কাঁহা গেলে তোমা পাই, পঞ্চম সংস্করণ, প্রাচী পাবলিকেশন, ২০১৭, পৃ- ৭৬।

(৩৫) জানা যুধিষ্ঠির (মালীবুড়ো), শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য, ময়না প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃ- ৮৩।

(৩৬) মুখোপাধ্যায় জয়দেব, কাঁহা গেলে তোমা পাই, পঞ্চম সংস্করণ, প্রাচী পাবলিকেশন, ২০১৭, পৃ- ১১৭।

(৩৭) মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা.), জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, উত্তর খণ্ড, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ-২৩৪।

(৩৮) মুখোপাধ্যায় জয়দেব, কাঁহা গেলে তোমা পাই, পঞ্চম সংস্করণ, প্রাচী পাবলিকেশন, ২০১৭, পৃ- ১১৭।

(৩৯) তদেব।

(৪০) মজুমদার বিমানবিহারী, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০০৬, পৃ-২৭৭।

(৪১) সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখণ্ড, চতুর্দশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ- ৩০৭।

(৪২) তদেব।

(৪৩) সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য লীলা ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৩৯২, পৃ-৫০২।

(৪৪) মুখোপাধ্যায় জয়দেব, কাঁহা গেলে তোমা পাই, পঞ্চম সংস্করণ, প্রাচী পাবলিকেশন, ২০১৭, পৃ- ২৮।

(৪৫) Sen Dinseh Chandra, Chaitanya and His Age, University of Calcutta, 1922, p. 264-265.

(৪৬) মুখোপাধ্যায় জয়দেব, কাঁহা গেলে তোমা পাই, প্রাগুক্ত, পৃ- ৭৮।

(৪৭) তদেব।

(৪৮) তদেব, পৃ- ৭৯।

(৪৯) ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৪, পৃ-৪৫৭।

(৫০) তদেব, পৃ- ৪৫৮।

(৫১) মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা.), জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বিজয় খণ্ড, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ-২৩৪।

(৫২) মুখোপাধ্যায় জয়দেব, কাঁহা গেলে তোমা পাই, পঞ্চম সংস্করণ, প্রাচী পাবলিকেশন, ২০১৭, পৃ- ১০৭।

(৫৩) ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৪, পৃ-৪৫৭।

(৫৪) সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য লীলা, নবম পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৩৯২, পৃ- ৪৪৬।

(৫৫) ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৪, পৃ-৪৬১।

(৫৬) সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, পৃ-৩১৪।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'সাগরিক' (১৯৮০)

মধ্যযুগে বাংলাদেশে নবজাগরণের যে আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তার প্রাণপুরুষ ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। বাঙালির জাতীয় জীবনের প্রথম অধিনায়ক তিনি। জাতিভেদ লাঞ্ছিত বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যের ধর্মান্দোলন এক বিশেষ বিপ্লব বয়ে এনেছিল, যার ফলশ্রুতি হিসেবে বিভেদ জর্জর জাতির জীবনে প্রবর্তিত হল এক আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনে জীবনদর্শন ও সমাজদর্শনে যে উদার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল তাতে বাংলাদেশের সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি গতিশীল হয়ে উঠেছিল, নতুন পথের সন্ধান পেয়েছিল, সর্বত্রই নবজাগরণের ছোঁয়া লেগেছিল। এই ঘটনাকে চৈতন্য রেনেসাঁস নামে অভিহিত করা যায়।

এই চৈতন্য রেণেসাঁসের আলোকশিখায় আধুনিক কথাসাহিত্যও প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। আধুনিক কথাসাহিত্যিককেও 'চৈতন্য রেণেসাঁস' গভীরভাবে প্রভাবিত করে, আর তারই প্রতিফলন দেখা যায় তাদের উপন্যাসে, গল্পে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাগরিক' তেমনই একটি উপন্যাস যার মধ্যে চৈতন্যজীবনের নানান দিকের কথা সাম্প্রতিক কালের প্রেক্ষাপটে ফুটে উঠেছে। চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে যে নবজাগরণ এসেছিল 'সাগরিক' উপন্যাসে সেই প্রসঙ্গই উত্থাপন করে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন " ··· কিন্তু সমাজেই বলুন আর সাহিত্যেই বলুন, বাংলাদেশে চৈতন্যই প্রথম ডিমোক্র্যাসির বন্যা এনে দিয়েছে। যে যুগে কায়স্থ গুরুর পায়ের ধুলো ব্রাহ্মণ শিষ্য মাথায় রেখেছেন, তার সোশ্যাল ভ্যালু ভাবতে পারেন? আরও সেই অদ্বৈতবাদের ভয়াবহ প্রতিপত্তির সময়? দেখুন না – মনের বন্ধনটা ঘুচল বলেই বাংলা সাহিত্যে কী বিরাট একটা স্বর্ণযুগ গড়ে উঠল সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সাহিত্যের উৎকর্ষই জাতির একটা রেণেসাঁসের লক্ষণ।"[১]

চৈতন্যদেবের প্রভাবেই বাংলা সাহিত্যে গড়ে উঠল নতুন শাখা – চৈতন্যজীবনী সাহিত্য। শুধু চৈতন্য জীবনী নয়, তারপরেও রচিত হল নানা ধরনের বৈষ্ণব মহান্ত জীবনী। বাংলায় প্রথম চৈতন্যজীবনী কাব্য হল বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'। সমকালীন বাংলার সমাজজীবনের একটি নিখুঁত প্রতিচ্ছবি এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। তারই সঙ্গে ভাগবতে কৃষ্ণলীলার অনুকরণে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবের বাল্য লীলা বর্ণনা করলেন। ড.সত্যবতী গিরির মতে, "এর ফলে চৈতন্যের জীবনী হয়ে উঠল সন্ত জীবনী অর্থাৎ দেবোপম মানুষের জীবনকথা।"[২] এই 'চৈতন্যভাগবতে'র পরিপূরক গ্রন্থ হল কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'। চৈতন্যদেবের জীবনের অন্ত্যলীলা যেখানে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। এই মহাগ্রন্থটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের একটি প্রামান্য দলিল।

শ্রীচৈতন্যদেবেরই প্রভাবে গড়ে ওঠা সংস্কৃত ভাষায় লেখা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন আর অলঙ্কার শাস্ত্রও মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যের এক বিশিষ্ট সম্পদ। সনাতন গোস্বামী লিখেছিলেন – ১) বৃহদভাগবতামৃত, ২) হরিভক্তিবিলাস, ৩) লীলাস্তব, ৪) বৈষ্ণবতোষণী। আর রূপ গোস্বামীর লেখা রসতত্ত্ব ও অলংকারশাস্ত্র সমন্বিত গ্রন্থ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'উজ্জ্বলনীলমণি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তাঁর 'বিদগ্ধমাধব'ও 'ললিতমাধব' নাটক এবং 'হংসদূত' ও 'উদ্ধবসন্দেশ' –এর ন্যায় কাব্যগুলিও উল্লেখযোগ্য।

কেবল তাই নয় শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলা পদাবলী সাহিত্যেও এক যুগান্তকারী পরিবর্তন দেখা দিল। শুধু চৈতন্যজীবনী নয়, চৈতন্য সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিরা শ্রীচৈতন্যের জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে পদ রচনা করলেন। নবদ্বীপে থাকার সময়ই মুরারী গুপ্ত, বাসু ঘোষ, মুকুন্দ ঘোষ, বংশীবদন প্রমুখ কবিরা তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে পদ রচনা করেছেন। ডঃ সত্যবতী গিরির মতে, " ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যেরই প্রত্যক্ষ প্রভাবে যেন এক বিপুল ভাবের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে বাঙালির কাব্য প্রেরণা উৎকর্ষের চরমসীমাকে স্পর্শ করেছিল।"[৩] বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ কবি শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুসারী ভক্তি কবিতাই লেখেন নি, নিপুণ শব্দ বন্ধে ছন্দ-মাধুর্যে এগুলি প্রথম শ্রেণির কবিতা হয়ে উঠেছে। সুতরাং বলা যায় সাহিত্যের উৎকর্ষই নবজাগরণের পথকে প্রশস্ত করে।

আর এই সূত্রেই সমাজ সংস্কারক রূপে তাঁর ভূমিকাটিও উল্লেখযোগ্য। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চৈতন্যদেবের এই ভূমিকাটির কথা উল্লেখ করে 'সাগরিক' উপন্যাসে লিখেছেন – "চৈতন্যদেবের ধর্মতত্ত্ব যাই থাক, আসলে তিনি সোশাল রিফর্মার। রামমোহন রায়ের হাতে পড়ে যা ঘটেছে, চৈতন্য তারই সূচনা করে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর মূর্তি পার্কে বসানো উচিত - মন্দিরে নয়। - চৈতন্যের এ কি বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা মশাই !"[৪] এভাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসের সামাজিক প্রেক্ষাপটে চৈতন্য আন্দোলনের বিভিন্ন ইতিবাচক দিক তুলে ধরেছেন। তিনি আরও বর্ণনা দিয়েছেন : "এটা ঐতিহাসিক সত্য। ওঁর সময়টা দেখুন। তিন দিক থেকে ওঁকে লড়তে হয়েছে। একদিকে মহাযান তন্ত্রের বিকৃত রূপ, অন্যদিকে অদ্বৈতবাদের মরিচীকা, আর একদিক থেকে হোসেনশাহী ঔদার্যের পথে ইসলামের জয়যাত্রা। দেশের লোকে ডাঙায় তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছিল। চৈতন্য তাদের হাতে বাঁচবার উপায় তুলে দিলেন শুধু হরিনাম যপের সোজা রাস্তায়। অভিচার ব্যভিচার থেকে লোকে রক্ষা পেল, পরিত্রান পেল 'তত্ত্বমসি'র দুর্বোধ্য শুষ্কতা থেকে। ওদিকে আচণ্ডালকে কোল দিয়ে ঐসলামিক ভ্রাতৃত্ব এনে দিলেন সমাজের ভেতর। নইলে এতদিনে দেশে একটাও হিন্দু থাকত নাকি?"[৫]

বর্ণবৈষম্য এবং জাতপাতের অভিশাপে হিন্দু সমাজ ছিল খণ্ডিত বিচ্ছিন্ন। ব্রাহ্মণেরা বর্ণশ্রেষ্ঠর গর্বে গর্বিত, যাগযজ্ঞ ক্রিয়া কর্মের একমাত্র অধিকারী হওয়ায় অহংকারে দাম্ভিক। নিম্নবর্ণের হিন্দু নিজের সমাজেই পতিত, অস্পৃশ্য, লাঞ্ছিত এবং নির্বাসিত। বিধর্মী শাসক সমাজের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লোভ দেখিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করতে লাগল। আর, নিজেদের সমাজে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত হয়ে মানুষ স্বভাবতই অন্য ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। ইসলাম ধর্মের উদারতা এবং নানাবিধ সুযোগ সুবিধা স্বভাবতই বঞ্চিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উদ্দীপিত করে। দলে দলে মানুষ মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে ধর্মীয় আশ্রয় লাভ করে। এইভাবে হিন্দুধর্ম ক্রমশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

তাই এই বিপন্ন অবস্থায় হিন্দুধর্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিমাই প্রথমেই জাতি-ধর্ম-বর্ণের মধ্যে বিভেদ বৈষম্য দূর করে সকলকে একসূত্রে গাঁথার উদার নীতি গ্রহণ করেন। চৈতন্যদেবের চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ' বানীটির মধ্যে দিয়ে দ্বিজ ও চণ্ডালের মধ্যেকার বিভেদ-বৈষম্য দূর করার চেষ্টা করলেন। তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু যারা নিজেদের সমাজেই এতদিন ছিল উপেক্ষিত, বঞ্চিত, অস্পৃশ্য তারা পুনরায় বৈষ্ণব ধর্মে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা পায়। এই এক হরিভক্তির সূত্রে তিনি ব্রাহ্মণ-শূদ্র, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্রের মধ্যেকার বৈষম্য দূর করে প্রকৃতই সমাজসংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তবে তিনি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে সমাজসংস্কারে নেমেছিলেন তা কিন্তু নয়, মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তাঁর অন্তরে বেঁধেছিল, তিনি মর্মে মর্মে মানুষের যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছিলেন, আর তাই ওইসব অবহেলিত পতিত মানুষকে উদ্ধারের জন্য তিনি পতিতপাবন হয়ে উঠেছিলেন। প্রেমের আদর্শে, সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে সাম্যবাদী চেতনায় তিনি সমস্ত সামাজিক রীতিনীতির উর্দ্ধে, আচার-বিচার প্রথা, কুসংস্কারের বাইরে মানবিকতার মহান আদর্শ স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন, 'সবার উপরে মানুষ সত্য' – এই আদর্শের আলোয় তিনি সমাজের সমস্ত অন্ধকার দূর করতে চেয়েছিলেন, তিনি বুঝেছিলেন ধর্মে নয়,প্রেমে মানুষ সুন্দর হয়, মহান হয়। প্রেমই মানবতা। ড. সুকুমার সেনের মতে, "··· চৈতন্য ধর্মপ্রচারক ছিলেন না এবং তিনি কখনো কোন ধর্ম প্রচার করেন নাই। ··· চৈতন্য বলিতেন, মনে ভালো-মন্দ কোনো মতলব ইহলোক পরলোক ঘটিত কোনো বাসনা না রাখিয়া হরিনাম কর, তাহা হইলে কৃষ্ণ তোমাদের উদ্ধার করিবেন। ··· চৈতন্য সব মানুষকে যে খোলা হাওয়ার চলা পথে ডাক দিলেন তাহাতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র একসঙ্গে জুটিতে সংকোচ বোধ করে নাই।"[৬] আবার অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলেছেন – " ঠিক যাহাকে সমাজসংস্কারক বলে বা য়ুরোপীয় আদর্শে যাহা humanism নামে পরিচিত, চৈতন্যদেব সজ্ঞানে তাহার প্রবক্তা বা প্রচারক ছিলেন না ঠিকই; কিন্তু চৈতন্যপ্রভাবে সমাজের নিম্ন বর্ণেরাও যে উত্তর চৈতন্যযুগে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার্য।"[৭]

আসলে চৈতন্যধর্ম আনুষ্ঠানিক বৈষ্ণব ধর্ম নয়, তা মানবধর্মের উদার আলোকে চৈতন্যলাভের ধর্ম, আত্মজাগরণের ধর্ম। তাই চৈতন্যরেণেসাঁসের স্পর্শে তৎকালীন ব্যক্তি ও সমাজজীবন সার্বিকভাবেই আত্মজাগরণ ও আত্মশুদ্ধির এক আলোকদীপ্ত চেতনা লাভ করেছিল – যা মধ্যযুগীয় মানসিকতাকে অতিক্রম করে আধুনিক যুগচেতনাকেও সমৃদ্ধ করেছিল। আর তাই তো আধুনিক কথাসাহিত্যেও সেই প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যের প্রেমের বন্যায় উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে ভাসতে দেখা যায়। প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাগরিক' উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই পুরীর মন্দির দর্শন করতে গিয়ে সর্বকালের মহামানব শ্রীচৈতন্যদেবের কথা মনে পড়ায় এক অভূতপূর্ব অনন্য অনুভূতি লেখকের মধ্যে দেখা দেয়। পুরীর মন্দির ঘুরে ঘুরে দেখতে গিয়ে লেখক এক জায়গায় হোঁচট খেলে উপন্যাসের চরিত্র রামকুমার তাকে বলে :

" – জানেন, কী এটা?

- কী?

- গরুড় স্তম্ভ। এইখানে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন আকুল দৃষ্টিতে মহাপ্রভু তাকিয়ে থাকতেন নীলমাধবের মূর্তির দিকে – দু চোখ দিয়ে অবিরাম জল ঝরে পড়ত। পড়েননি?

- 'গরুড় স্তম্ভের নীচে আছে নিম্নখালে,

- সেই খাল ভরল প্রভুর অশ্রুজলে'

- আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। - আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। ভক্তি নয় – ধর্ম নয় – কিছুই নয়। হঠাৎ এই অন্ধকার মন্দিরের ভেতর থেকে যেন একটা করুণ আর্তি, একটা তীব্র আকাঙ্খার জ্বালা আমার চারপাশে এসে কুয়াশার মত ঘিরে দাঁড়াতে লাগল। মনে পড়ল – কী অসহ্য আকুলতায় সেদিন ঘর-সংসার সমস্ত ছেড়ে সেই 'কনকবরণ গোরা' নীলাচলের এই তীর্থপথে ছুটে এসেছিলেন। হয়তো এইখানেই ভাবের আবেগে তিনি অচেতন হয়ে পড়েছিলেন – নিশ্বাস ছিল না- জীবনের লক্ষণ ছিল না। মন্দিরের পুরোহিতেরা এই অনধিকারীকে আঘাত করবার জন্যে ছুটে এসেছিলেন। আর সেই সময় তাঁদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছিলেন সৌম্য শান্ত এক দীর্ঘকায় মানুষ। নীলাচলের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তিনি – তাঁর নাম বাসুদেব সার্বভৌম। তারপর :

- 'যে ভট্টাচার্য পড়ে পড়ায় মায়াবাদে।

তাঁর ঐছে বাক্য স্ফুরে চৈতন্যপ্রসাদে।।

লোহাকে যাবৎ স্পর্শি হেম নাহি করে।

তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে।।

ভট্টাচার্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্বজন।

প্রভুকে জানিল সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।।'

কোথায় গেল দুর্জয় তার্কিক – মিথিলা বিজয়ী সেই দুর্ধর্ষ পণ্ডিত! এই গরুড়স্তম্ভের তলায় যে অশ্রুর বিন্দু দিনের পর দিন ঝরে পড়ল- সেই অশ্রুতে কত সার্বভৌম, কত বেদান্তবাগীশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেন!

ধর্মবিশ্বাস নয়-ভাবের আবেগ নয়, একটা অপূর্ব বেদনা ভরা ইতিহাস যেন মনের মধ্যে ছায়া জমাতে লাগল! মনে হতে লাগল, এই অন্ধকার মন্দিরের প্রতিটি অণুতে অণুতে একটা নিঃশব্দ হাহাকার বেজে উঠেছে :

হা কৃষ্ণ হা জনার্দন – মোর প্রাণনাথ।"[৮]

খুব চমৎকারভাবে ঔপন্যাসিক এখানে শ্রীচৈতন্যদেবের জগন্নাথ মন্দিরে বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটিকে ছুঁয়ে গেলেন। এখানেই ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব। আর এভাবেই বাংলা কথাসাহিত্যে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে।

সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত নয় বটে, তবে চৈতন্যদেবের জীবনের টুকরো টুকরো প্রসঙ্গ আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুব নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন লেখক। যেমন :

"মন্দির ছাড়িয়ে খানিকদূর হাঁটবার পরে রামকুমার জিজ্ঞাসা করলেন, সোনার গৌরাঙ্গ দেখেছেন?

- বুঝলাম আমার ভাবনাটা অনুমান করেছেন। হেসে বললাম, না কোথায়?
- চক্রাতীর্থ ছাড়িয়ে আরও খানিকটা। যান- দেখে আসুন!
- থাক উৎসাহ হচ্ছে না।
- কেন বলুন তো? রামকুমার অভয় দিলেন : ভয় নেই, সেখানে পাণ্ডাতে উপদ্রব করবে না।
- পাণ্ডাদের জন্যে নয়। আমি ভাবছিলাম, সনাতন গোস্বামীর গায়ে তিন টাকা দামের ভোট কম্বল পর্যন্ত যিনি সহ্য করতে পারেন নি, নিজের সোনার মূর্তি দেখে সে সন্ন্যাসী কতটা খুশি হচ্ছেন।
- রামকুমার মৃদু হাসলেন : ভক্তির ওপরে তো আর ভক্তি ভাজনের হাত নেই –ওটা ভক্তের এলাকায়। তারা যেমন করে খুশি তাঁর পুজো করবে।

- তা বটে। তবে ভক্তির উপসর্গটা মাঝে মাঝে দেবতাকে অনেকখানি টেনে নামায়। বিশ্বনাথ মাখেন ছাই, আর তার সেবায়েত পরেন সোনার হার।”[৯] এইভাবে চৈতন্যজীবনের উপাদান আধুনিক বাংলা উপন্যাসে অভিনব মাত্রা লাভ করে এবং সাম্প্রতিক কালে চৈতন্য চর্চার ধারা নতুন গতিপথ লাভ করে।

তথ্যসূত্র

(১) গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, রচনাবলী ,তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৭, পৃ- ৩০।

(২) মুখোপাধ্যায় শুভঙ্কর (সম্পা.), গিরি সত্যবতী, তিনিই সাহিত্য, তাঁরই সাহিত্য, চৈতন্যচিন্তা, এম সি সরকার এণ্ড সন্স, জানুয়ারী ২০০২, পৃ-১৭৬।

(৩) তদেব, পৃ- ১৭৯।

(৪) গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৭, পৃ- ২৯।

(৫) তদেব, পৃ- ২৯-৩০।

(৬) সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ-২৫৩।

(৭) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মর্ডান বুক এজেন্সী, পৃ-২৫৩।

(৮) গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৮৭, পৃ- ২৮-২৯।

(৯) তদেব, পৃ-২৯।

গজেন্দ্রকুমার মিত্র: 'কান্তাপ্রেম' (১৯৮৪)

কলোল উত্তর কালে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে আধুনিকতা আনয়নে যাঁরা সচেষ্ট ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন গজেন্দ্রকুমার মিত্র। শ্রীচৈতন্য জীবনী অবলম্বনে রচিত তাঁর উপন্যাস 'কান্তাপ্রেম'। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স থেকে মাঘ ১৩৯০ সালে উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলা অষ্টম পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই গোদাবরী তীরে রায়রামানন্দের সঙ্গে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব আলোচনায় শ্রীচৈতন্যদেব যখন একের পর এক সাধ্যকে অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে থাকেন তখন শেষ পর্যন্ত রামানন্দ বলেন – " রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব সাধ্যসার··· / পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে / এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে।"[১] এই সাধ্যশিরোমণি 'কান্তাপ্রেম' লাভের আশায় বিশ্বেশ্বর (উপন্যাসের চরিত্র) তথা বিশ্বম্ভর চৈতন্যদেবের জীবন কীভাবে আবর্তিত হয়েছিল তাই নিয়েই গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাস 'কান্তাপ্রেম'।

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লিখিত শ্রীরাধার প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধির জন্য রাধিকার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করে কৃষ্ণস্বরূপ শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব, সাধ্যশিরোমণি কান্তাপ্রেমলাভ তথা মধুর রস লাভ প্রভৃতি উপাদান ব্যবহার করে লেখক উপন্যাসটি রচনা করেছেন। এখানে তিনি চৈতন্যদেব তথা উপন্যাসের নায়ক বিশ্বেশ্বর চরিত্রটির মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন কীভাবে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। বিশ্বেশ্বর অনুভব করে ঈশ্বরকে লাভের একমাত্র উপায় অকুণ্ঠ প্রেম ভালোবাসা। মানুষের এই নশ্বর জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে একমাত্র ঈশ্বরের সাধনা, আরাধনা। তবেই মানুষ এই জরাজীর্ণ পঙ্কিল সমস্যা জর্জর দুঃখ-কষ্ট-বঞ্চনার জগৎ থেকে মুক্ত হতে পারবে। কোন কিছু লাভের আশায় নয়, অভীপ্সা বা ইষ্টপূরণের লক্ষ্যে নয় কেবল ঈশ্বরের জন্যই ঈশ্বরকে ভালবাসার কথা বলেছেন চৈতন্য তথা বিশ্বেশ্বর। তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে চান না, তিনি চান এমন সাধনার পথ যে পথে গিয়ে আপামর সাধারণ পাপীতাপী দুর্বল অজ্ঞান মানুষ, ভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী মানুষও ইহ জীবনের যা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্য, সর্বোত্তম ঈপ্সার বস্তু সেই ভগবদপ্রেমের স্বাদ লাভ করতে পারে।

'নিবেদন' অংশে লেখক এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন – "মানুষ যেমন ঈশ্বরকে ভক্তি করে ভালবেসে পূজা করে আনন্দ রসাস্বাদ করে – ভগবানও তেমনি ভক্তের এই প্রেমপূজা আস্বাদ করে আনন্দলাভ করেন, তৃপ্ত হন – এ বিশ্বাস দীর্ঘকালের। ··· বৈষ্ণব ভক্তদের বিশ্বাস শ্রীরাধার শতবর্ষ ব্যাপী বিরহের ব্যথা ও আনন্দ উপভোগের জন্য শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার কান্তি ও তাঁর আকৃতি নিয়ে গৌর রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কান্তাপ্রেমের নায়কও দয়িতরূপে প্রিয়তমরূপে ঈশ্বর তথা

শ্রীকৃষ্ণকে পেতে চেয়েছিলেন – তার জন্যই তাঁর জীবনপন কঠোর সাধনা।"[২] 'প্রারম্ভিক' অংশে ঔপন্যাসিক আরও বলেছেন – " ঈশ্বর বা ইষ্ট ছিলেন শাস্ত্রের আর তর্কের জালে আচ্ছন্ন, তাঁকে লাভ করার যেটুকু প্রচেষ্টা – তা ছিল একমাত্র জ্ঞানের মধ্য দিয়ে – তাঁকে ভালবাসার কথা কেউ ভাবত না, তাঁকে অন্তরে পাবার আকূতিও না। ···। তবু একদা নবদ্বীপে জ্ঞানের পঙ্কেই সেই প্রেম-সাধনার কমলটি বিকশিত হয়েছিল। ঈশ্বরকে যে ভালবাসা যায়, বিরহিণী নারীর মতো তাঁকে উগ্র কামনায় আকর্ষন করা যায়, নরদেহ ধারীর মতো তাঁকে সেবা করে তৃপ্তি ও সার্থকতা লাভ হয় – সে কথা জনৈক নবদ্বীপ বাসীর কাছেই শুনল মানুষ।"[৩]

উপন্যাসের নায়ক বিশ্বেশ্বর ঈশ্বরকে পেতে চান ভালবাসার পথে –যেমন ভাবে রক্তমাংসের মানুষ, আর একটা মানুষকে ভালবাসে', মনুষ্যরূপে , দেহধারীরূপে। লেখক তাঁর মনোভাব বর্ণনা করেছেন এইভাবে – "উনি চান ভালবাসতে, প্রেমময় রূপে, রক্ষাকর্তা রূপে চান। ভালবাসবেন, ভালবেসে ভালবাসা আদায় করবেন। পিতারূপে, জননী রূপে, ভার্যারূপে, দয়িতরূপে, সন্তানরূপে নানা রসের সরোবর রয়েছে চারিদিকে, সবগুলি ভালবাসার অমৃতে পূর্ণ।"[৪] তাতে অবগাহন করে মানুষের জীবনে সেই প্রেমের লীলা ও রস তিনি নিজে উপভোগ করে ঈশ্বরকে পেতে চান ; " সেই নিখাদ ভালবাসার আকর্ষণে তিনি ঈশ্বরকে ধরবেন। হ্যাঁ ঈশ্বরকেই চাই তাঁর। সেই তাঁর লক্ষ্য। আচারে নয়, আচরণে নয়; অনুষ্ঠান কি শাস্ত্রের কচকচিতে নয়- ··· লক্ষ্যে পৌঁছবেন তিনি ভালবাসার পথেই।"[৫]

এখানে আমরা দেখতে পাই ঔপন্যাসিক 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বর্ণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের পঞ্চরসের উপাদান গ্রহণ করেছেনে এবং চৈতন্যচরিত্রের মধ্য দিয়ে কীভাবে এই রসগুলি উপলব্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় সেই পথই বর্ণনা করেছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ পাঁচ প্রকার মুখ্যরসের বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে :

"ভক্তিভেদে রতিভেদে পঞ্চ পরকার।

শান্তরতি দাস্যরতি সখ্যরতি আর।।

বাৎসল্যরতি মধুর রতি পঞ্চ বিভেদ।

রতিভেদে কৃষ্ণরতি রস পঞ্চভেদ।।

শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর রস নাম।

কৃষভক্তি রসমধ্যে এ পঞ্চ প্রধান।।"[৬]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারানুযায়ী শান্তের গুন দাস্যে, দাস্যের গুন সখ্যে, সখ্যের গুণ বাৎসল্যে, ও বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বর্তমান। অর্থাৎ শান্ত রতির গুণ শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠা। দাস্যের সেবার সঙ্গে যুক্ত হয়। দাস্যভক্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা তো আছেই অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণের মমতাবুদ্ধি থাকায় শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত সেবা আছে। কিন্তু দাস্যভাবে সেবা করলে মাঝে মাঝে এরূপ সংকোচ হতে পারে যে তাদের সেবায় কিছু ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। সুতরাং এই সংকোচ হীন প্রেম রয়েছে সখ্যপ্রেমে। এই রূপে সখ্য রসে আছে শান্তের কৃষ্ণনিষ্ঠা, দাস্যের সেবা এবং সখ্যের সম্ভ্রম শূন্যতা ও সমপ্রাণতা। বাৎসল্য রসে পূর্ববর্তী রসগুলির সঙ্গে যুক্ত হয় স্নেহ প্রীতি এবং মমতা ও তাড়ন ভর্ৎসনার অধিকার। পূর্বোক্ত চারটি রসের গুণের দ্বারা মধুর সমৃদ্ধ কেননা এতে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের সংকোচহীনতা, বাৎসল্যের লালন-পালন সবই আছে, উপরন্তু আছে 'নিজাঙ্গ' দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকার। কান্তা যেমন প্রেমবান কান্তকে সেবা করে, এদের কৃষ্ণসেবা তদপেক্ষাও প্রীতিময়ী। তাই 'কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার'। কান্তাপ্রেম সর্বশ্রেষ্ঠ কারণ দাস্যে, সখ্যে, বাৎসল্যে কৃষ্ণ সম্বন্ধযুক্ত। দাস্যপ্রেমে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রভু, সখ্যের সখা, বাৎসল্যে সন্তান। এইসব ক্ষেত্রে কৃষ্ণসেবা এই সর্ব সম্বন্ধের অনুগামী। এগুলো হচ্ছে সম্বন্ধানুগামী ভক্তি। আগে সম্বন্ধ পরে সেবা- তাই সেবা বাসনা এখানে অবাধভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে না। কিন্তু কান্তা ব্রজ সুন্দরীদের মধ্যে সম্বন্ধ থাকলেও সেখানে সম্বন্ধই সেবানুগত। ফলে সেবার এখানে অপ্রতিহত গতি। এই সেবা বাসনার প্রাবল্যে কুল-শীল-জাতি-মান সমস্ত তৃণের মতো দূরে ভেসে যায়। আপন অঙ্গের দ্বারা কৃষ্ণ সেবন করেন তাঁরা। সেবাবাসনার সর্বাতিশায়ী বিকাশ এই কান্তাপ্রেমে।

এই কান্তাপ্রেমেই শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। লেখক গজেন্দ্রকুমার মিত্র কান্তাপ্রেমকেই তাঁর উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন এবং বিশেশ্বর চরিত্রটির মধ্য দিয়ে কীভাবে কান্তাপ্রেমে ঈশ্বরকে আহ্বান করতে হয় তাই দেখিয়েছেন। বিশ্বেশ্বর উপলব্ধি করে ভালবাসার পথ ছাড়া অন্য কোনো পন্থাই নেই মানুষের। ভালবাসা ও বিশ্বাস। পূর্ণ নির্ভরতা, পূর্ণ বিশ্বাস। এই ভালবাসাতেই একমাত্র ঈশ্বরকে পাওয়া যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ মধুর, মধুরতর, মধুরতম। তাই মাধুর্য দিয়েই তাকে সেবা করতে হবে। উপন্যাসের নায়ক বিশ্বেশ্বর এক এক সময় কখন যেন এক অনির্বচনীয় সেবারসে নিমগ্ন হয়ে যায় – " কল্পনা করেন তিনি দাসরূপে – কখনও বা নিজেকে দাসী বলেও কল্পনা করেন – সেই পরম প্রিয়র সেবা করছেন, কখনও পদসেবা, কখনও অঙ্গমার্জনা; কখনওবা তাকে স্কন্ধে বহন করছেন; কখনওবা মনে হয় মাল্য চন্দন বস্ত্রে রাজবেশে সজ্জিত করছেন, আবার কখনও মনে হয় সেই পরম পুরুষ ওঁকে আলিঙ্গন করছেন,……।"[৭] 'চৈতন্যচরিতামৃত অনুসরণে লেখক নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্বেশ্বর চরিত্রটির মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের পঞ্চ রস উপলব্ধি ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ তাঁর 'শ্রী অমিয় নিমাই চরিত' গ্রন্থে লিখেছেন, "সর্বোচ্চ ভজন কান্তাভাবে। কান্তাভাবে

শ্রীভগবানকে কীভাবে ভজনা করতে হয়, তা শ্রীভাগবত গ্রন্থে আছে ঠিকই কিন্তু মহাপ্রভু নিজে কান্তাভাবে ভগবানের ভজনা করে জীবকুলকে দেখালেন, শুধু তাই নয় শেখালেনও বটে। স্ত্রীলোক যেমন পতির কি উপপতির প্রতি প্রীতি আরোপ করে, সেভাবে নিজেকে স্ত্রীলোক অর্থাৎ প্রকৃতি ভেবে ভগবানকে পতি বা উপপতি ভাবে ভজনা করা।"[৮]

ঔপন্যাসিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের উপন্যাসেও চৈতন্য তথা বিশ্বেশ্বরের মুখে একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় – দুটি আকাঙ্খা তাঁর। ঈশ্বরকে লাভ করা, প্রত্যক্ষভাবে যেমন নারী তার দয়িতকে লাভ করে – সেইভাবে এবং ঈশ্বরের সেই প্রত্যক্ষ স্বরূপ, নরদেহধারী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের জন্য সাধনা, আর সে সাধনার সে আকুলতার অমৃতসর – দুঃখী, সন্তপ্ত, প্রপীড়িত, রিক্ত, সুখ সৌভাগ্যাদি সর্ববঞ্চিত পথভ্রষ্ট অজ্ঞান মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তা দিতে গেলে আগে নিজেকে তার অধিকারী হতে হবে – পরিপূর্ণ পাত্র সে অমৃত লাভ করতে হবে – নচেৎ তা অপরকে দিতে পারবেন কেন?"[৯] সে অমৃত কঠোর তপস্যালভ্য বস্তু। সে তপস্যা সে সাধনা সংসারে থেকে ভোগের মধ্যে সম্ভব নয়, তাই সন্ন্যাস গ্রহণ ছিল অবশ্যম্ভাবী।

সন্ন্যাস নিয়ে নিজের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত জগৎ বাসীর সম্মুখে ভগবানের লীলারস আস্বাদনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বৃহৎ জীবকুলকে উদ্ধার এবং কান্তাপ্রেম লাভের আকাঙ্খায় তাঁর পথ চলা। আর সেই লক্ষ্যে তিনি পৌঁছাতে চেয়েছিলেন ভালবাসার পথে, প্রেমের পথে। শেষ পর্যন্ত তিনি উপলব্ধি করেছেন, " নানা রূপে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর প্রিয়তম, তাঁর প্রভু এসেছেন তাঁর কাছে। সেবক রূপে এসেছেন সেবা করতে, সন্তানের মতো এসেছেন স্নেহ আস্বাদ করতে। ··· যুগ যুগান্তর ধরে, জন্ম জন্মান্তর ধরে আসছেন তিনি – নানাভাবে নানারূপে ভক্তদের কাছে। লীলাময় তিনি – এ সৃষ্টিও তাঁর লীলা, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য, প্রেম – এই সব বৃত্তিও তাই। তিনি নিজ সৃষ্টির এই সমস্ত সুধা, এই সমস্ত অমৃত রসস্রাবী বৃত্তি সম্ভোগ করতে চান।"[১০] এইভাবে ঔপন্যাসিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র কল্লোল উত্তর পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের আঙিনায় চিরাচরিত প্রথা অবলম্বন করে 'চৈতন্যচরিতামৃত' অনুসরণে চৈতন্যদেবের জীবনকে উপন্যাস শিল্পে রূপ দান করে আধুনিক পাঠককে আর একবার চৈতন্যজীবন চর্চার আস্বাদ ফিরিয়ে দেন।

তথ্যসূত্র

(১) সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’, মধ্যলীলা, অষ্টম পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯২, পৃ-১৭৮।

(২) মিত্র গজেন্দ্রকুমার, কান্তাপ্রেম, নিবেদন অংশ, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯০।

(৩) তদেব, ‘প্রারম্ভিক’অংশ।

(৪) তদেব, পৃ-২৩।

(৫) তদেব।

(৬) সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত ‘শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’, মধ্যলীলা, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯৬।

(৭) মিত্র গজেন্দ্রকুমার, কান্তাপ্রেম, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৯০, পৃ- ৭৩।

(৮) ঘোষ শিশিরকুমার, অমিয় নিমাই চরিত, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্ববানী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ-২৮।

(৯) মিত্র গজেন্দ্রকুমার, কান্তাপ্রেম, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৫-৮৬।

(১০) তদেব, পৃ- ১৯৭।

কালকূট : ‘জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য’ (১৯৮৭)

পঞ্চাশ দশকের প্রথম পর্ব থেকে শুরু করে আশির দশকের মধ্যপর্ব পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকাল কালকূট তাঁর মানব-সন্ধানী আগ্রহ নিবিষ্ট রেখেছেন নানাবিধ আঙ্গিকে ও প্রথা-প্রকরণে। হয়তো কালকূটের আশ্রয় কখনও নিসর্গ প্রেমে, কখনও অধ্যাত্মিক রসের উন্মোচন স্পৃহায়, কখনও ইতিহাসের ভাঙাগড়ার বিচিত্র ঘটনাবলীতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, কালকূটের চূড়ান্ত আগ্রহ মানুষের জীবনকে ঘিরেই পরিক্রমা করে। জীবনী লিখতে বসেও তাই লেখক উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পরিবার, পরিজন, পরিবেশ, সমাজ ও তাঁর জীবিতকালের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির সমগ্র পরিমন্ডলটিকে নিয়ে ভাবেন; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে দেখতে চান। ‘জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য’ উপন্যাসটি যদিও শ্রীচৈতন্যের জীবনী কিন্তু কালকূটের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু মন শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখতে গিয়ে ভক্তিরসপ্লাবিত বৈষ্ণব সমাজের তদ্গতভাব থেকে নিজের শিল্পীসত্তার স্বেচ্ছাবিচ্যুতি ঘটিয়েছেন। বৈষ্ণবভক্ত ও জীবনীকারেরা শ্রীচৈতন্যের জীবনকে যেভাবে দেখেছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে কালকূটের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি স্বাতন্ত্র্য সহজেই ধরা পড়ে। তিনি শ্রীচৈতন্যের অবতারত্বের অলৌকিকতাকে পরিহার করে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে ধরতে চেয়েছেন। তিন বছর ধরে তিনটি পর্বে শ্রীচৈতন্যের বাল্যলীলা, মধ্যলীলা ও অন্ত্যলীলার ইতিহাস রচনা করেছেন যথাক্রমে 'প্রেম নিত্য', 'প্রেম নিত্য অনিত্য সংসার', এবং 'প্রভু কার হাতে তোমার রক্ত' শিরোনামে। ১৯৮৬তে শ্রীচৈতন্যের জন্মের পাঁচশো বছর পূর্তিকে সামনে রেখে ঔপন্যাসিক তাঁর তিনটি রচনাকে একত্রিত করে ‘জ্যোর্তিময় শ্রীচৈতন্য’(১৯৮৭) নামে প্রকাশ করেন।

এখানে তাঁর জীবনের অধ্যায়গুলিকে যেমন একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তাঁকে করে তোলা যায় আমাদের ঘরের ছেলে; সেখানে থাকে না কোন ভক্তিরসপ্লাবিত বৈষ্ণবসমাজের তদ্গতভাব; আবার, বর্তমান যুগসংকটের মধ্যে বাস করতে গিয়ে তাঁর মত দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর গুরুত্বও আমরা মনে-প্রাণে স্বীকার করে নিতে পারি। স্বার্থবাদী, প্রেমহীন প্রতিযোগিতার বিশ্বে আমাদের চৈতন্যে ভেসে ওঠে তাঁরই নাম। উপন্যাস পাঠের প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি ‘এখনও জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য’। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। শ্রীচৈতন্যের ভূমিকায় ভারতে অহিংস আন্দোলনের জাত-পাতহীন সমাজের আধ্যাত্মিক গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল। ফলে মধ্যযুগের তমসাচ্ছন্ন ভারতবাসী সেই পরিস্থিতিতে তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়েছে। যুগ যুগ ধরে বাহিত লাঞ্ছনা, অপমান আর নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তিদাতাকে দেবকল্প মূর্তি হিসাবে কল্পনা করাটাই স্বাভাবিক ছিল। ফলে ক্রমশ খসে পড়ে মানুষটির মানবত্ব। তাঁর দেবত্বটুকুকে ঘিরেই তৈরি হয় নানা কিংবদন্তী, অলৌকিক কাহিনি, গল্প। শরণাগতের ত্রাতা যিনি তাঁর জীবনকাহিনি কি কখনো অলৌকিকে ভরা না হয়ে পারে! কিন্তু কালকূট শ্রীচৈতন্যকে তাঁর

পরিবার পরিবেশ দেশকালের প্রেক্ষিতে বিচার করেছেন। এই উপন্যাসটিতে শ্রীচৈতন্য ধর্মপ্রচারক বা অবতার নন, বড়ো হয়ে উঠেছে তাঁর মানবিক সত্তা। বৈষ্ণবদের উপর যে অত্যাচার নেমে এসেছিল তা প্রতিহত করতে গণ-আন্দোলন গড়ে তোলেন শ্রীচৈতন্য। উপন্যাসে তিনি বাস্তবের মানুষ। তিনি নেতা-তিনি প্রেমিক-তিনি স্বামী-তিনি সন্তান।

প্রথম খন্ডে আছে নিমাইয়ের বেড়ে ওঠার কাহিনি। আছে নবদ্বীপের পন্ডিতদের কথা, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস, বাবা-মাকে নিমাইয়ের সান্ত্বনা, নিমাইয়ের বিবাহ, দাম্পত্যসুখের কথা, লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু, শেষে নিমাইয়ের ভাবান্তরের মধ্য দিয়েই এই খন্ডের সমাপ্তি। ঔপন্যাসিক ইতিহাস অনুসরণে হোসেন শাহের রাজত্বকাল, গৌড়ের সিংহাসন দখলের ইতিহাস ইত্যাদি রাজনৈতিক ইতিহাসের যেমন পরিচয় দিয়েছেন তেমনি নবদ্বীপের ভৌগোলিক পরিচয়ও লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে রয়েছে নিমাইয়ের জন্মগ্রহণ থেকে শুরু করে তার নামকরণ, তার দৌরাত্ম্য, গঙ্গার ঘাটে বালকের ক্রীড়া, চঞ্চলতা, নারীদের বিরক্ত করা, সকলের নিমাইয়ের প্রতি স্নেহ, গুরুগৃহে পড়াশোনা, পন্ডিত হয়ে ওঠা, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের উত্যক্ত করার কাহিনি। সব মিলিয়ে লেখক একেবারে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে একটি বালকের বেড়ে ওঠার বর্ণনা দিয়েছেন অবশ্যই চৈতন্য চরিতকাব্যগুলি অবলম্বনে। তবে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই সাধারণ, অলৌকিকতায় মোড়া নয়।

বৈষ্ণবসমাজে নিমাই জন্ম থেকেই এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ঈশ্বর। লেখক বৈষ্ণবজনোচিত গতানুগতিকতার সরণি বেয়ে নিমাইয়ের জন্ম, অঙ্গচিহ্ন, জ্যোতিষীর ভবিষ্যধর্মী নামকরণ ইত্যাদির প্রসঙ্গ তুলেছেন ঠিকই; কিন্তু তার ব্যাখ্যা করেছেন বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গিতে। 'রাধাভাবদ্যুতি সুবলিত্যং কৃষ্ণস্বরূপম্' নন্দের নিমাইয়ের 'নিমাই' নামকরণটির পেছনে যে এক সাধারণ পরিবারের স্নেহশীলা সাধারণ গ্রাম্য মায়ের আবেগ, অকারণ আতঙ্ক, পুত্রের মঙ্গলকামনার আকুল অভিব্যক্তি আছে উপন্যাসে তাই তুলে ধরেছেন লেখক। "নিম হল তিক্ত। উপকার অপকার যা-ই হোক, এক্ষেত্রে তিক্ত হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আই। নিম+আই = নিমাই। এই শব্দের অর্থ মা।"[১] চৈতন্যভাগবতে রয়েছে - "ইহার অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা পুত্র নাঞি।/ শেষ যে জন্মায় তার নাম সে নিমাঞি।"[২] এই নামকরণে বাঙালিদের সর্বকালের প্রচলিত সংস্কার কাজ করেছে মাত্র। যে মায়ের ছেলে জন্মায় কিন্তু বাঁচে না, তার বেঁচে থাকার প্রত্যাশায় যেমন বিপরীত অর্থবোধক নাম রাখতে 'মরণচাঁদ' রাখা হয়, 'নিমাই'এর ক্ষেত্রেও সেরকমই একটি প্রয়াস কাজ করেছিল। জগন্নাথ মিশ্রের প্রথম সন্তান বিশ্বরূপের জন্মের পর শচীদেবীর গর্ভে পরপর সাতটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয় এবং তাদের অকাল মৃত্যুর পর বিশ্বম্ভরের জন্ম বলে প্রতিবেশীদের কথামতো নিমাই বলে ডাকতেন। নিজেকে তিক্ত মা বলে ভেবে,

সন্তানের চলে যাওয়ার এই বিপরীত প্রত্যাশায় আসলে সন্তানকে নিজের কাছে ধরে রাখার এই আকুল আবেদনে কোন অলৌকিকতা নেই বলেই মনে করেন লেখক।

নিমাই এর জন্মের আগে এবং পরের সমাজের সংকটকে লক্ষ করে তাঁর জন্মলগ্নকে দৈবে যুগধর্মের কাল বলে তাঁকে যুগাবতার বলে গণ্য করা হল, যিনি আচন্ডাল, যবনদের উদ্ধার করবেন। কারও মতে নিমাই চৈতন্যরূপে কৃষ্ণ, কেউ বলেছেন একই দেহে রাধা ও কৃষ্ণ অবতার। লেখক এই 'অবতার' ব্যাখ্যার অলৌকিকত্ব মোচন করেছেন। প্রথমত, অবতারত্ব সঙ্গে নিয়ে কেউ জন্মায় না। আর দ্বিতীয়ত, যে সামাজিক পরিবেশে তাঁর জন্ম তখন দুষ্টের বিনাশের জন্য অবশ্যই দেশবাসীর একটি নেতৃত্বের প্রয়োজন ছিল। তাই কালকূটের ব্যাখ্যায়, 'নেতা এখানে নামান্তরে অবতার'। সময়টা ছিল ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শুরু। সময়ের নিরিখে জনসাধারণের মনের অবস্থাটা বিচার করা দরকার। সেই সময়ে জনমানসের চাহিদা অনুযায়ী অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন পুরুষ ছাড়া, কেউ অবতার হতে পারেন না। তাই লেখকের মতে নেতৃত্বদানের নিমিত্তই নিমাইয়ের মধ্যে যাবতীয় অলৌকিকত্ব, অবতারত্ব আরোপ করা হয়েছে।

নিমাইয়ের আদি বাল্যলীলার চিত্রণে কালকূট কোনপ্রকার অলৌকিকত্ব আরোপ করেননি। নবদ্বীপের এক অপরূপ সাধারণ দুষ্টু বালকের চিত্রই অঙ্কন করেছেন। প্রতিবেশীদের ঘরে ঢুকে চুরি করা, ঘুমন্ত শিশুকে জাগিয়ে দেওয়া, ব্রাহ্মণকে ভেঙানো, বাবার পৈতে কেড়ে নেওয়া, গঙ্গাঘাটে লোকের গায়ে জল ছেটানো, পূজা উপকরণ নষ্ট করা, স্নানরত ব্যক্তির ধুতি নিয়ে পালান এ সমস্ত নিষিদ্ধ কাজেই তার ঝোঁক নিতান্তই এক দূরন্ত বালকের লক্ষণ। আবার অন্যান্য বালক স্বভাবের মতোই অন্যায় করেও চতুরতার মাধ্যমে তার থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায়ও নিজেই নির্ণয় করে। বালক নিমাই চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি নিতান্তই সাধারণ ঘরের ছেলের।

লেখক নিমাইয়ের সাঁতার শেখার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন আধুনিক শহুরে ছেলেমেয়েদের সাঁতার শেখার সঙ্গে মিলিয়েই –"আধুনিক শহরবাসী হয়তো ভাবতেই পারেন না, পাঁচবছরের ছেলে রীতিমত গঙ্গায় সাঁতার কেটে স্নান করে। তবু দেখি উত্তর কলকাতা বা শহরতলীর ছেলেমেয়েরা অনেক অল্পবয়সেই সাঁতার কাটতে শেখে। গ্রামাঞ্চলের তো কথাই নেই, দিন রাত্রি জলে ডোবায় থেকে থেকে জলের ভয় তাদের এমনিতেই কেটে যায়।"[৩] বিয়ের প্রস্তাব শুনে অগ্রজ বিশ্বরূপ যখন গৃহত্যাগ করলেন, তখন থেকেই বস্তুতপক্ষে নিমাই যেন কেমন বিমর্ষ শান্ত হয়ে গেল। সে সব সময়ে বেদনাহত বাবা মায়ের সান্নিধ্যে থাকত। শোকাহত বাবা-মায়ের উদ্দেশ্যে বারবারই নিমাই বলেছে যে, বড় হয়ে সেই বাবা মায়ের সেবা করবে। এখানে তাঁর কর্তব্যবোধের পরিচয় ধরা পড়ে। পূজাপার্বনের পর বর্জনীয় হাঁড়ি মালসা, প্রসাদের অবশিষ্টের ওপর বসে পড়লে শুচিবায়ুগ্রস্ত শচীদেবী রেগে যান। কিন্তু নিমাই গম্ভীর

গলায় মাকে জানায় যে বিষ্ণুর রান্নাবান্নার পাত্র যেখানে রয়েছে তা শুদ্ধস্থান, সুতরাং তা ছুঁলে অশুদ্ধ হয় না। লেখকের মতে তাঁর এই দূরদৃষ্টি, কথাবার্তার মধ্যে স্বাধীনচিন্তা, প্রচলিত নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে তর্ক করা সবই তাঁর বিপ্লবীসত্তার পূর্বলক্ষণ।

জ্ঞানচর্চায় যথেষ্ট কুশলতা অর্জন করলেও তরুন নিমাই যে বয়োধর্মের প্রতি উদাসীন ছিলেন না, কালকূট সকৌতুকে সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষন করেছেন। এখানে নিমাই রতিকুশলী, রসনাগর। স্নানার্থিনী কুমারীদের প্রতি তার অনন্ত উৎসাহ, সে তরুণীদের পূজোর ডালা থেকে নৈবেদ্য খেয়ে নেয়, ফুলের মালাটি তুলে নিয়ে নিজের গলায় পরে, চন্দন নিয়ে নিজের কপালটি চর্চিত করে, নিজেই দেবতা সেজে বসে এবং কৌতুকময়ী তরুণীদের উলটো-পালটা বর দিয়ে তাদের কৌতূহল মেটায়। কিন্তু চতুর বুদ্ধিমান আবেগপ্রবণ নিমাই তরুনী সমাজে ঢেউ তুললেও সে বাঁধা পড়ল বল্লভাচার্যের কন্যা সুন্দরী লক্ষ্মীর কাছে এবং তার সুকৌশল ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্মীকে যখন সে বিয়ে করল, তখন তার বয়স মাত্র ষোল বছর। এই প্রেমঘটিত ব্যাপারে যে নিমাইকে লেখক দেখিয়েছেন, সেখানেও তিনি কম আধুনিক নন। সব বালিকাই নিমাইকে মনে মনে পছন্দ করে। এর কারণও লেখক বলে দিয়েছেন – "চিরকাল দেখে এসেছি, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।"[৪]

লেখক প্রথম খন্ডের নামকরণ করেছেন 'প্রেম নিত্য'। উপন্যাসটি শুরু হয় শ্রীচৈতন্যের মাকে কথিত অমোঘ সত্য নিয়ে –

"ভবিতব্য যা আছে তা খন্ডিব কেমনে

এই মত কাল গতি কেহ কার নহে,

অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে।"[৫]

'সংসার অনিত্য' – এই সূত্রের স্বরূপ সন্ধানেই শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের পথ নতুন মোড় নেয়। তবে তাঁর অন্তরে নিত্য প্রেম বিরাজমান। ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু খুব সুন্দরভাবে এই অংশে নিমাইয়ের নিত্য প্রেমের বর্ণনা দিয়েছেন। নিমাই ভালবেসে লক্ষ্মীকে বিয়ে করেছিল। তার এই প্রকৃত প্রেমে পড়ার সূচনার মধ্যেও লেখক দেখেছেন একালের আধুনিক প্রেমিকের অভিব্যক্তি। প্রেমনিবেদনে, প্রেমালাপে কিংবা নিজের বিয়ের ঘটকালি নিজেই করবার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে একালের প্রেমিক যুবকের সাহস এবং আধুনিকতা। লক্ষ্মীকে ঘাটে দেখে মুগ্ধ প্রেমিক নিমাইয়ের হৃদয়ে প্রেমের উল্লাস, তাদের প্রেম নিবেদন, গঙ্গার ঘাটে দেখা করতে যাওয়া এবং শেষে বিয়ে করা – এ সমস্তই যেন আধুনিক প্রেমিকেরই লক্ষণ – "দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গাস্নানে।/ গৌরচন্দ্র হেনই সময় সেই খানে।।/ নিজ লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিল গৌরচন্দ্র / লক্ষ্মীও

বন্দিলা মনে প্রভু পাদদ্বন্দ্ব।”[৬] শচীদেবী যখন পুত্রের মন বুঝলেন তখন আর দেরি না করে বনমালী ঘটকের মধ্যস্থতায় লক্ষ্মীর সঙ্গেই বিশ্বম্ভরের বিবাহ স্থির করে ফেললেন। লক্ষ্মীদেবীর প্রতি নিমাইয়ের নিত্য প্রেমই তার পরবর্তী জীবনের যাত্রা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। লক্ষ্মীকে পত্নীরূপে পেয়ে তিনি সুখী ছিলেন। ঔপন্যাসিক এই অংশে লক্ষ্মী ও বিশ্বম্ভরের প্রেমময় দাম্পত্যচিত্র তুলে ধরেছেন।

এইসময় তরুণ নিমাই অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হন এবং তার পান্ডিত্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই অধ্যাপনা সূত্রে নবদ্বীপের সকল স্তরের মানুষকে জানবার সুযোগ করে নিয়েছেন। নবদ্বীপের তাঁতী, গোয়ালা, বেনে, মালাকার, তাম্বুলি, শঙ্খবণিক ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। এদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়েছেন – “সকল স্তরের মানুষকে জানবার দেখবার একটা মনোভাব তার বেশ প্রবল।”[৭] এই জনসংযোগই পরবর্তীতে তার নেতা হয়ে ওঠার পটভূমি রচনা করেছিল। এ থেকে বোঝা যায় বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ধরনের মানুষকে সংঘবদ্ধ করার একটা অসীম শক্তি ও আকর্ষণ তাঁর মধ্যে ছিল।

বিবাহিত নিমাই তার সুখী দাম্পত্য জীবনে স্বচ্ছলতা আনতে পূর্ববঙ্গে যান। পূর্ববঙ্গ থেকে নিমাই নবদ্বীপে ফিরে এসেছিল সন্ধ্যাবেলায় –

“হেনমতে প্রভু বঙ্গদেশ ধন্য করি।

নিজ গৃহে আইলেন গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।।

ব্যবহারে অর্থবৃত্তি অনেক লইয়া।

সন্ধ্যাকালে নিজ গৃহে উত্তরিল আসিয়া।”[৮]

নিমাইয়ের গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় থেকে লক্ষ্মীর মৃত্যুসংবাদ পাবার আগের সময়টুকু ঔপন্যাসিক নিজস্ব কল্পনায় রাঙিয়ে যেভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে পত্নীপ্রেমিক নিমাইয়ের চিত্তের অনুভব, প্রিয়ার জন্য প্রতীক্ষা, উৎকণ্ঠার মুহূর্তগুলি খুব সুন্দরভাবে ফুঠে উঠেছে। লেখক বর্ণনা দিচ্ছেন – “পূর্ববঙ্গ থেকে নিমাই নবদ্বীপে ফিরে এসেছিল সন্ধ্যার প্রাক্কালে বা সন্ধ্যাকালে। বিদেশ থেকে এসেছে। ঘরে ঢোকবার আগে, প্রতিবেশীদের নিয়ে গেল গঙ্গাস্নানে। মনে মনে ব্যাকুলতা লক্ষ্মীর জন্য। কখন লক্ষ্মীকে দেখতে পাবে। প্রতিবেশীরা সদ্য প্রত্যাগত আঠারো বছরের প্রেমিক স্বামীকে কেউই লক্ষ্মীর মৃত্যু সংবাদ দিতে পারছে না। নিমাই বাড়ি ফিরে এলে, শচীদেবীই তাকে খেতে দিলেন। নিমাই কি এসময়ে আশা করেনি, মায়ের পিছনে, আশেপাশে ঘোমটা মাথায় আর একজনকে দেখতে পাবে? চরিতকারেরা সবাই প্রথম থেকেই নিমাইকে অবতার রূপে ভেবে লিখতে বসেছিলেন। তাঁদের এসব মানবিক খুঁটিনাটি দেখবার সময় অথবা ইচ্ছেও ছিল না। কিন্তু আমার ব্যাকুল চোখ সবই দেখতে পেয়েছিল। নিমাইয়ের ব্যাকুল গোপন দৃষ্টি, দুটি

আলতা পরা পায়ের আঙ্‌টের ঝিলিক দেখতে চেয়েছিল। পায়ের নূপুরের নিক্কন, হাতের শঙ্খের সঙ্গে চুড়ির ঝনাৎকার শোনবার জন্য, চন্দনলিপ্ত শরীরের আঘ্রানের জন্য চিত্ত উদ্বেগ হয়েছিল। অথচ তার কোনটাই সে পাচ্ছিল না।"[৯] বরং দেখছিল মায়ের মুখে ক্রমশই ছায়া ঘনিয়ে আসছে। মুহূর্তেই একটা অশুভ চিন্তা তার হৃদয়ে ছায়া ফেলল। মাকে জিজ্ঞেস করলেন "দুঃখিতা তোমারে মাতা দেখি কি কারণ।/... তোমার বধূর কিছু হবে অমঙ্গল।"[১০] তখন বাড়িতে যারা উপস্থিত ছিল, তারাই লক্ষ্মীর সর্পাঘাতে মৃত্যু সংবাদ দিল। এই সংবাদ শুনে নিমাই স্তম্ভিত হতবাক হয়ে যায়।

"পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।

ক্ষনেক রহিলা কিছু হেট মাথা করি।।

প্রিয়ার বিরহ দুঃখে করিয়া স্বীকার।

স্তব্ধ হই রহিলেন সর্ব বেদসার।।"[১১]

লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু সংবাদ নিমাইয়ের কাছে বজ্রাঘাততুল্য। তবে আত্মসংবরণ করে তিনি মাকে প্রবোধ দিয়ে সংসারের অনিত্যতার কথা বলেন :

"প্রভু বোলে মাতা দুঃখ ভাব কি কারণ।

ভবিতব্য যে আছে তা খন্ডিবে কেমন।।

এইমত কাল গতি কেহো কারো নয়।

অতএব সংসার অনিত্য বেদে কয়।।"[১২]

চৈতন্যচরিতকাররা নিমাইয়ের মুখ দিয়ে এই কথা উচ্চারণ করিয়েই ক্ষান্ত হয়ে যান, কিন্তু ঔপন্যাসিক নিমাই ব্যক্তিটির অন্তরের চিত্র, মর্মস্থলের বেদনা অনুভব করেন এইভাবে "এ সব সে বলল সকলের সামনে মনে মনে বলল লক্ষ্মী, সংসারে কেউ কারো নয়, এ জ্ঞান তুমি দিয়ে গেলে। এর আগে কোন মৃত্যু তো আমাকে এ জ্ঞান দেয় নি।"[১৩] লেখক আরও বলেছেন "প্রেম নিত্য, এই কথাই অন্য রকমে আমি নিমাইয়ের মুখ থেকে শুনেছিলাম। আর বুঝেছিলাম, বাইরের থেকে নিমাইকে না দেখা গেল, তার চেয়েও অতি গভীরতর ক্রিয়া তার অন্তরে ঘটে গেল।"[১৪] মাত্র ষোল বছর বয়সে ভালোবেসে নিজে ঘটক পাঠিয়ে লক্ষ্মীকে বিবাহ, তারপর দুবছর সুখের ও শান্তির সংসার। "পুরুষ হিসাবে নিতান্ত নারীর প্রতি যে আকর্ষণ, ভবিষ্যতের চৈতন্য মহাপ্রভু, নিমাইয়ের সঙ্গে লক্ষ্মীর সেই প্রেমই ঘটেছিল।"[১৫] পত্নীর বিয়োগ সত্যিই একজন পুরুষের কাছে মর্মান্তিক। ঔপন্যাসিক সেই পত্নীপ্রেমিক যুবা পুরুষটির মনের অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন। লক্ষ্মীদেবীর বিয়োগই নিমাইয়ের জীবনের নতুন অধ্যায় রচনা করে।

পত্নীবিচ্ছেদের আঘাত থেকেই জীবনের নিত্যতা নিয়ে তার মনে সংশয় জাগে। শচীদেবীকে বলেন – "মাগো, সংসার অনিত্য"। এখান থেকেই নিমাইয়ের মধ্যে চৈতন্যরূপের বিকাশ ঘটতে শুরু হয়। কালকূট লিখছেন : "তবে নিমাই অন্তর থেকে এই প্রথম শ্রীচৈতন্য রূপ ধারণ করল, এই গভীরতর বিকাশ কেউ দেখতে পেল না। সংসার অনিত্য বটে, প্রেম নিত্য এবার সেই নিত্য প্রেমের লীলা। আঘাত মানুষকে মহৎ করে, মহত্বের পথ চিনিয়ে দেয়।"[১৬]

সেই মহত্বের পথের সন্ধানেই শুরু হয় দ্বিতীয় অধ্যায় 'প্রেম নিত্য অনিত্য সংসার'। এই পর্যায়ে লেখক শ্রীচৈতন্যের জীবনের মধ্যলীলাপর্ব অঙ্কন করেছেন। লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর নিমাইয়ের ভাবান্তর, অন্তরের অস্থিরতা অথচ বাইরে ধীরতা-স্থিরতা, সর্বোপরি প্রিয়তমা পত্নীবিরহের শোকে সে যখন অবসন্ন, প্রায় উন্মত্ত তখন তার এই অবস্থাকে চরিতকারেরা 'বায়ুব্যাধি' বলে উল্লেখ করেছেন কিন্তু লেখক এক্ষেত্রে নিছক প্রিয়তমা পত্নীকে হারিয়ে মানবমনের কষ্টকেই উপলব্ধি করেছেন - "চরিতকারেরা সকলেই নিমাইকে এমন একটা চোখে দেখতেন, তার সব আচরণের মধ্যেই অপ্রাকৃত কিছু বলবার প্রবণতা তাঁদের মন জুড়ে থাকত। মানবমনের কষ্ট যে নিমাইয়েরও থাকতে পারে, এটা তাঁরা ভক্তির প্রাবল্যে হয়তো লক্ষ করতেন না। অথচ আমি দেখছি, নিমাইয়ের মুখচ্ছবির কী করুন রূপ"।[১৭] এখানেই চরিতকারের সঙ্গে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ। চরিতকার যেখানে একটি বিশেষ ভাবের (ভক্তি) বশবর্তী হয়ে নির্লিপ্তভাবে চরিত্র রচনা করেন ঔপন্যাসিক সেখানে মানবমনের অন্তঃসত্ত্বাকে উন্মোচনের চেষ্টা করেন, যেখানে নিমাই আর কেবল একজন ভক্তের ভগবান হয়েই থেকে যান না তিনি হয়ে ওঠেন একজন রক্তমাংসের মানুষ, একজন পত্নীপ্রেমিক, পত্নীবিরহে শোকাতুরা যুবা পুরুষ।

কালকূটের দৃষ্টিতে লক্ষ্মীর প্রতি নিমাইয়ের প্রেম কোন অপ্রাকৃত প্রেমলীলা নয়, নিছক ব্যক্তি মানুষের প্রাকৃত প্রেম। কালকূটের কথায় "ব্যাধি না, প্রাকৃতের বিরহ যাতনা এক অপ্রাকৃতের সন্ধানে রত। এক প্রেমকে ভুলতে হলে, আর এক প্রেম চাই। এটা মানুষের অবচেতনের বিষয়। সেখানেই মুক্তি।"[১৮] তাঁর শোকাচ্ছন্ন মন, মুক্তির উপায় হিসাবে যখন নতুন প্রেমের আশ্রয় খুঁজছিল, তখনই তা ভবিষ্যৎ আন্দোলনের প্রস্তুতির সঙ্গে এক হয়ে গেছে। এসবই ঘটেছে প্রথম পত্নী লক্ষ্মীকে ভুলতে পারছিলেন না বলে। নিমাইয়ের অন্তরের অবস্থার মধ্যেই একটা অলৌকিক শক্তি বিরাজ করছিল লক্ষ্মী মারা যাওয়ার পর। লেখক এই অলৌকিকত্বের ব্যাখ্যা বৈষ্ণবোচিত ভঙ্গিতে দেননি। তাঁর মতে – "এই অলৌকিকত্ব হৃদয়ের গভীর অনুভূতি। তীব্র আকাঙ্ক্ষা, প্রেমাস্পদকে পাবার প্রগাঢ় ইচ্ছা। যা আর সবই ভুলিয়ে দেয়। অন্তরের হাহাকার। এ অর্থে, একে অলৌকিক আখ্যা না দিয়ে, বাস্তবেই হৃদয়ের এক ধ্যানমগ্ন উচ্চ-ভাবদশা বলা যায়।"[১৯]

লক্ষ্মীর বিরহে তাঁর অবচেতনে যে ব্যাকুলতা তৈরি হয়েছিল তা ভোলাবার জন্য আর এক প্রেম প্রয়োজন হয়েছিল, যার বিস্তার ঘটাতে পারেন নি বিষ্ণুপ্রিয়া। বৈষ্ণব মহাজনেরা নিমাই বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমচিত্রণে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেও কালকূট ভিন্নপথে হেঁটেছেন। তিনি জানিয়েছেন, ১৫০৫ সালে বিষ্ণুপ্রিয়াকে নিমাই বিয়ে করলেও সুন্দরী উদ্ভিন্নযৌবনা পতিগতপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি নিমাই আদৌ মনোযোগী হন নি। শচীদেবী এ ব্যাপারে কোন চেষ্টা করলে ফল হয় বিপরীত। নিমাই হঠাৎ এমন হুংকার আর চিৎকার করে উঠতেন যে বিষ্ণুপ্রিয়ার তৎক্ষণাৎ ভয়ে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকত না। বৈষ্ণবচরিতকারগণ লিখেছেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য কৃষ্ণের প্রতি তাঁর আকুলতার জন্যই ঘটেছিল। চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলি লক্ষ্মী বিরহের কথা না লিখে লেখে কৃষ্ণবিরহ। কিন্তু প্রাকৃতে তা লক্ষ্মীর জন্যই বিরহ। তার থেকেই জন্ম নিয়েছে অপ্রাকৃতের কৃষ্ণবিরহ। কালকূট বলেছেন – "প্রাকৃতে ও অপ্রাকৃতে এ বিরহ যুবক নিমাইয়ের মন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। অন্য কোথা হইতে ইহা উদ্ভূত হয় নাই। ইহা এমন কিছু অলৌকিক নয়। মনোবিজ্ঞানসম্মত ইহার সঙ্গত ব্যাখ্যা আছে। প্রথম ভালোবাসার উপর অকস্মাৎ সর্পদশংনরূপে দুর্দৈবের আঘাত প্রসূত বিরহ নিমাইয়ের জাগ্রত সুষুপ্তি ও নিদ্রায় মনের গভীরতম প্রদেশে এমন নিবিড়ভাবে শিকড় গাড়িয়েছে যে, বিষ্ণুপ্রিয়া আর তাহার মূলোচ্ছেদ করিতে পারিলেন না।"[২০]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, কালকূটের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে। তিনিও দুজনকে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হিসেবে পেয়েছিলেন। তাঁর লেখক জীবনেও তাঁর দুই স্ত্রী ধরিত্রী এবং গৌরী দেবীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কালকূটের কালকূট হয়ে ওঠার এদের দুজনেরই গুরুত্ব অপরিসীম। তাঁর পুত্র উদিত বসুর বক্তব্য থেকে জানা যায় যে দ্বিতীয়া স্ত্রীর মত করে তাঁর প্রথম স্ত্রী তাঁকে সংসারজীবনে বেঁধে রাখতে পারেন নি। এক্ষেত্রে কারণ যাই হোক না স্বামীকে ঘর সংসারের মধ্যে বেঁধে রাখতে না পারার এই একই ব্যর্থতার যন্ত্রণা ছিল বিষ্ণুপ্রিয়ারও। উভয়ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে একটি সন্ধিক্ষণ এবং পরিবর্তন। শুধুমাত্র এই বিবাহের ফলস্বরূপ নিমাই হয়েছেন সংসার বিমুখ আর কালকূট হয়েছেন সংসারী। কালকূটের পুত্র উদিত বসু বলেছেন – "কালকূটের জীবনে এক অনিবার্য সন্ধিক্ষণ তাঁর জীবনের দ্বিতীয় বিবাহ। অর্থাৎ আমার মা'র আগমন, যা একপ্রকার অপরিহার্য ঘটনা ছিল তাঁর জীবনে। কালকূটের (বা সমরেশ)-এর অসংগঠিত বা কিছুটা সাংসারিকতাহীন জীবনকে যিনি বেঁধে রেখেছিলেন পরম মমতায়। বয়সজনিত কারণে বা দূরত্ব বেড়ে যাওয়ায় যা হয়তো ভানু-মার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না।"[২১]

যাইহোক, ভাবান্তরিত নিমাই দেখলেন বাস্তব চিত্রটা। কীভাবে নবদ্বীপে সমাজের একেবারে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ অত্যাচারিত হচ্ছে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা। পাষন্ডী হিন্দু ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে তথাকথিত নিম্নবর্ণ হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। হিন্দু-ব্রাহ্মণ সমাজ মদে

মাংসে যৌনাচারে ও সমস্ত নীতিবোধ হারিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতে থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে বৈষ্ণবদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এরকম একটা সময়ে সুকৌশল ও নীতির দ্বারা এক পতাকার তলে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করার চিন্তাধারাকেই লেখক বৈপ্লবিক আখ্যা দিয়েছেন। কালকূটের কথায় – "আমরা এ যুগের মানুষ কিছুটা অনুমান করতে পারি, অনাচার অত্যাচাররের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মানুষের এসব কথার মধ্যে যা প্রচ্ছন্ন, তা হল রাজনীতি।"[২২] শ্রীচৈতন্যের আচন্ডালকে মুক্ত করার যে বাণী চরিতকারেরা তাঁর আধ্যাত্মিক মহিমার প্রকাশ বলে ভেবেছেন, সেই একই কথাকে লেখকেরও অত্যন্ত বৈপ্লবিক বলে মনে হয়েছে। সমাজ পরিবর্তনের বৈপ্লবিক চিন্তা যে অস্ত্রধারণ না করেও করা যায় এটি তারই নমুনামাত্র। "নেতৃত্ব দিতে হলে, যে অসীম ক্ষমতা থাকা দরকার, মানুষ যাঁকে দেখামাত্র, যাঁর কাজকর্ম আচরণের মধ্যে নিজেরাই তাদের অবতারকে আবিষ্কার করবে, বৈষ্ণবদের কাজ কেবল সেই মানুষটিকে খুঁজে বের করা, তাকে যথাস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা।"[২৩] শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণবরা তাকে খুঁজে পেলেন নবদ্বীপের নিমাইয়ের মধ্যে।

নিমাইয়ের পান্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব, দিগ্বিদিকে পান্ডিত্যের প্রসার, খ্যাতি যেমন রয়েছে তেমনি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে মিশতে পারা, সকলকে আকর্ষণ করা, সকলকে একত্রিত করে সংগঠন তৈরি করে নেতৃত্বদানের অসম্ভব ক্ষমতাও তাঁর মধ্যে রয়েছে। এইভাবে ধীরে ধীরে নিমাই পন্ডিত হয়ে উঠলেন শ্রীচৈতন্য। তাঁর উপর আরোপিত হল অবতারত্ব। আমরা দেখলাম নিমাই কিন্তু প্রথম থেকেই অবতার রূপে অবতীর্ণ হন নি। তৎকালীন জনমানসের আকাঙ্খাই তাঁকে অবতার করে তুলেছে। লেখক প্রথম থেকে এটাই দেখাতে চেয়েছেন যে কীভাবে একটি সাধারণ বালক সময়ের প্রেক্ষিতে জনমানসের চাহিদায় অবতার হয়ে ওঠে। লেখকের মতে – "এইটি রাজীনতি। নেতা চাই অর্থাৎ অবতার চাই।" কারণ জনসাধারণ বিশ্বাস করে – "যিনি অবতার, তিনিই ত্রাতা। অর্থাৎ তিনি নেতা। কিন্তু অবতার তাঁকে হতেই হবে।"[২৪] এইভাবে লেখক অবতারত্বের আড়ালে শ্রীচৈতন্যেরে নেতৃত্ব গ্রহণকে একটি ইতিবাচক কৌশল হিসাবে দেখিয়েছেন। এই অংশে ঔপন্যাসিক একজন প্রতিবাদীর নেতৃত্বকেই বড়ো করে তুলেছেন।

মধ্যযুগে শ্রীচৈতন্য যেমন প্রেমের দ্বারা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ব্যবধান তুলে দিয়ে হরিনাম সংকীর্তনে একসঙ্গে মাতিয়ে ছিলেন, উপন্যাসে শ্রীচৈতন্য বাস্তবের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে হয়ে উঠেছেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'নিমাইচরিত' প্রবন্ধে নিমাইসাধন বসুর বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য "শ্রীচৈতন্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল তিনি 'আচন্ডাল' সকল শ্রেণির মানুষের ধর্মপালনের সমান অধিকার স্বীকার ও প্রচার করে ধর্মের গণতান্ত্রিকরণ (democratization of religion) শুরু করেছিলেন। মহাপ্রভু 'কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ' শ্রীচৈতন্যের আর এক কীর্তি, তিনি এক 'ধর্মনিরপেক্ষ ধর্ম'

(Secular religion) শিক্ষা দিয়েছিলেন - যে ধর্মের আবেদন ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল সর্বজনীন। সম্পূর্ণভাবে সকল সংকীর্ণতা মুক্ত।"[২৫]

জাতির জীবনে শক্তি ও বলিষ্ঠতা আসে তার সংঘ গঠন এবং একতাবিন্যাসের মধ্যে। এই সংঘবদ্ধ শক্তি গঠন করেই রাজশক্তিকে পরাভূত করলেন চৈতন্য। সংগঠনকে জোরদার করতে দলবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাম্বুলি, মালাকারদের পাড়ায় পাড়ায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বের বিশেষত্ব হল বিভিন্ন রুচির লোককে একত্রিত করে সংঘবদ্ধ করা। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত' অনুসরণ করলে দেখা যায় তিনি নগর ভ্রমণে বেরিয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে সহজেই মিশে যান। তন্তুবায়ের নগরে গিয়ে যেমন বস্ত্র কেনেন, তারপর যান গোয়ালা পাড়ায়, সেখানে হাস্য পরিহাস করে গন্ধবণিকের ঘরে গিয়ে ওঠেন। 'চৈতন্যভাগবতে'র আদিখণ্ডে রয়েছে : "নগর ভ্রমণ করে শচীর নন্দন।/দেবের দুর্লভ বস্তু দেখে সর্বজন।।/ উঠিলেন প্রভু তন্তুবায়ের নগরে।... তন্তুবায়ের প্রতি প্রভু শুভ দৃষ্টি করি।/ উঠিলেন গিয়া প্রভু গোয়ালের পুরী।" "গোয়ালাকূলেরে প্রভু প্রসন্ন হইয়া। / গন্ধবণিকের ঘর উঠিলেন গিয়া।" "বণিকের অনুগ্রহ করি বিশ্বম্ভর।/ উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকার ঘর।।/... মালাকার প্রতি প্রভু শুভদৃষ্টি করি। / উঠিলা তাম্বুলি ঘরে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।"[২৬]

এইভাবে সকলকে একত্রিত করে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে নিমাই রাজশক্তির অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে পড়েন। রাজপ্রতিনিধি কাজি কীর্তনীয়াদের লোক দিয়ে প্রহার করান, মৃদঙ্গ ভেঙে দেন এবং নবদ্বীপে কীর্তন নিষিদ্ধ করে দেন। এর প্রতিবাদে চৈতন্য এক বিশাল সংকীর্তন শোভাযাত্রার আয়োজন করেন। সন্ধ্যার পর সেই সংকীর্তন দল মশাল নিয়ে যাত্রা শুরু করে নবদ্বীপ পরিক্রমার পর সিমুলিয়ায় কাজির বাড়ি উপস্থিত হয়। মহাবিপ্লবী নিমাইকে এখানে সংহারমূর্তি ধরতে দেখা যায়। কাজীর বাড়ির সামনে গিয়ে হুংকার দিয়ে বলেন – "কোথায় সেই চাঁদ কাজী? ঝাঁটিতে ধরে নিয়ে এসো, ওর মাথা কাটব আমি।" এমনকি কাজির ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ারও আদেশ দেন। নিমাই হুংকার করে ওঠেন -

"ক্রোধাবেশে হুঙ্কার করয়ে বহুতর।।

ক্রোধে বোলে প্রভু আরে কাজি বেটা কোথা।

ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া পেলোঁ মাথা।।

প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।

ঘর ভাঙ্গ ঘর ভাঙ্গ বোলে বার বার।।"[২৭]

একালের বৈষ্ণব মহাজনেরা যা-ই বলুন না কেন, কালকূট জোর্তিময় শ্রীচৈতন্যের জীবনী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন। কালকূটের মতে এই ঘটনার মাধ্যমে চৈতন্যদেব প্রমাণ করে দিলেন যে বিপ্লবী নেতার হুংকারে প্রবলের অত্যাচার, অত্যাচারীর অন্তরের কাপুরুষতা নির্জীব হয়ে যায়। প্রাবন্ধিক তাপস বসু এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীচৈতন্যকে গণআন্দোলনের পুরোধা রূপে দেখিয়েছেন এইভাবে – "শ্রীচৈতন্য উদ্ভাবিত সমবেত উচ্চারণে যা আজকের পরিভাষায় 'স্লোগান'-এ ভীত চকিত শাসকেরা পরাভব মেনেছিল। জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা জনগণেরই আন্দোলনে অংশগ্রহণ সেদিন খুলে দিয়েছিল এক নতুন দিগন্ত যা আধুনিক গণতন্ত্রের বার্তাবাহী।"[২৮] সেই গণ আন্দোলন, গণধর্ম-এর নেতা ছিলেন শ্রীচৈতন্য –

"চৈতন্যের গণমত্ত কীর্তণ বিহরে।

সভার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।।"[২৯]

কালকূট দেখিয়েছেন যে রাজভীতি দূর করা ও পাষন্ডী দলনের জন্য অদ্বৈতাচার্য সহ নবদ্বীপবাসী সকলেই কৃষ্ণের আবির্ভাব চেয়েছিলেন। তবে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ নন মথুরা বা কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণকেই অদ্বৈতাচার্য 'অবতারিবারে' আশা করেছিলেন, সংকল্প করেছিলেন। আচার্য অদ্বৈত কৃষ্ণের অবতারকে কখনও রাধিকা রূপে দেখতে চান নি। "নবদ্বীপে ভক্তরা কৃষ্ণের অবতার সৃষ্টি করেছেন। যে উদ্দেশ্যে, তাও পরিষ্কার। সব থেকে বেশি পরিষ্কার, অবতারের পার্ষদগণ কেউ তাঁর মধ্যে শ্রীরাধিকার অবতারকে চান নি। চেয়েছিলেন পরবর্তীকালে নীলাচলের ভক্তবৃন্দ। ইতিহাস এখানেই বড় একটি রহস্য করে গেছে। নবদ্বীপের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেরণায় যিনি কৃষ্ণের অবতার, নীলাচলের প্রেরণায় তিনিই রাধিকার অবতার।"[৩০]

এই সমাজ সংগঠনের কাজেই যখন চৈতন্যদেব দেখেছেন যে অবতারত্বকে তাঁর সমবয়সীদের মধ্যে কাজে লাগিয়ে ঐক্যবদ্ধ করতে পারছেন না, তখনই সন্ন্যাসগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। চৈতন্যদেব নিত্যানন্দকে বলেছেন -

"ভাল লোক রাখিতে করিনু অবতার।

আপনে করিনু সব জীবের সংহার।।

দেখ কালি শিখা, সূত্র সব মুন্ডাইয়া।

ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া।।

যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।

ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে।।

তবে মোরে দেখি সেই ধরিব চরণ।

এইমতে উদ্ধারিমু সকল ভুবন।

সন্ন্যাসীরে সর্বলোকে করে নমস্কার।

সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার।।

সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি ঘরে ঘরে।

ভিক্ষা করি বুলোঁ দেখি কে কাহারে মারে।।"[৩১]

নিমাইয়ের 'জগৎ উদ্ধারের কারণে' সন্ন্যাসের সিদ্ধান্তের লেখক ঔপন্যাসিক কালকূট লক্ষ করেছেন এক আদর্শ নেতৃত্বের পদক্ষেপ। চৈতন্য বুঝেছিলেন "সন্ন্যাসীর মধ্যেই লোকে মহত্ব দেখতে পায়, সেজন্যই সন্ন্যাস নিতে হবে।"[৩২] এভাবেই চৈতন্য বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছিলেন। কালকূটের মতে "এই আন্দোলনের স্বরূপটি ছিল এরকম - স্ত্রী শূদ্র চন্ডালাদি সকলের মুক্তি। এ মুক্তি তো নিতান্ত কতকগুলি পূজাপাট্যের মধ্যে দিয়ে হতে পারে না। বৃহত্তর কিছু চাই। যেখানে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করা যাবে। নিমাইয়ের অবচেতনে আন্দোলনের স্বরূপটি ঘুমিয়ে আছে। তার আত্মপ্রকাশ অর্থাৎ নেতৃত্বের ভিতর দিয়েই, সেই আন্দোলনের স্বরূপটি ফুটে উঠবে।"[৩৩] আজকের আধুনিক চিন্তানায়কেরা যে সমাজতত্ত্ব ও সংহতির চিন্তাকে মৌলিক চিন্তা বলে আত্মশ্লাঘা বোধ করবেন, ভাবতে অবাক লাগে, বিগত পাঁচশ বছরেরও আগে সে চিন্তাকে রূপদান করেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। সমাজ ও ধর্মের মধ্যে যে ভয়ানক বিচ্ছিন্নতা মানুষকে খন্ডিত ও দুর্বল করে ফেলছিল তার ভয়াবহ পরিণাম চিন্তা করে তিনি আপামর জনসাধারণকে সংহত করার জন্য সাদরে কোলে টেনে নেন। তার মাধ্যম হিসাবে প্রবর্তন করেন নামসংকীর্তন। লেখক বলেছেন, সারা ভারতবর্ষ আজও সেই চাঁদকাজীর গৃহআক্রমণকারী মুক্তিদাতার পথ চেয়েই যেন বসে আছে। বর্তমান অরাজকতার যুগে সাধারণ মানুষের কলঙ্ক, মিথ্যাচার, ভীরুতা থেকে বাঁচতে হয়তো এই রূপেরই আবির্ভাব আশা করবে। অবতারত্বের আড়ালে যে সমাজ বদলের স্বপ্ন চৈতন্যদেব দেখেছিলেন তা প্রকৃত দেশনেতার স্বপ্ন। শচীমাতার হৃদয়কে শূন্য করে দেশমাতৃকার জন্য শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে হল। ইতিহাসের আশ্রয় নিয়ে ঔপন্যাসিক দেখান যে জনমনে তাঁর নেতৃত্ব, তাঁর জনপ্রিয়তা তাঁকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে গেছে। কিন্তু তিনি চিরকালের 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য' হয়ে বেঁচে থাকেন মানুষের মনে। কালকূটের কথায় – "শান্তি? নিমাই! তোমাকে হারিয়ে কোন্ শান্তির আরধনা করবো? বরং আজ তোমাকে

নতুন করে আহ্বান জানাই। ফিরে এসো, হে নিমাই। এই জগৎ উদ্ধারিতে ফিরে এসো নবরূপে। পাপ ও অবিচারের ভারে অসহনীয় পৃথিবী আজ তোমার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।"[৩৪] এইভাবে চৈতন্য চরিতকাব্য অবলম্বনে চৈতন্যজীবনী রচনা করলেও লেখক সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানেই ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব। ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু এভাবে ইতিহাসকে আশ্রয় করে মানবপ্রেমিক এবং জনসংঘের নেতৃত্ব হিসেবে তুলে ধরে চৈতন্যচর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখলেন।

তথ্যসূত্র

১। বসু নিতাই (সম্পা.), কালকূট রচনাসমগ্র, সপ্তম খণ্ড, জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য, মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ-৩২৪৯।

২। সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, আদিখন্ড, চতুর্থ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ. ১৩।

৩। বসু নিতাই (সম্পা.), কালকূট রচনাসমগ্র, সপ্তম খণ্ড, জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য, মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ-৩২৭১-৩২৭২।

৪। তদেব, পৃ. ৩২৭৫।

৫। সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, আদিখন্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ. ৫৯।

৬। তদেব, আদিখন্ড, নবম অধ্যায়, পৃ. ৪০।

৭। বসু নিতাই (সম্পা.), কালকূট রচনাসমগ্র, সপ্তম খণ্ড, জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮৫।

৮। সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, আদিখন্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ. ৫৯।

৯। বসু নিতাই (সম্পা.), কালকূট রচনাসমগ্র, সপ্তম খণ্ড, জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য,প্রাগুক্ত,পৃ. ৩২৮৯।

১০। সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, আদিখন্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ৫৯।

১১। তদেব।

১২। তদেব।

১৩। বসু নিতাই (সম্পা.), কালকূট রচনাসমগ্র, সপ্তম খণ্ড, জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য, মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ-৩২৯২।

১৪। তদেব।

১৫। তদেব, পৃ- ৩২৮৯।

১৬। তদেব, পৃ. ৩২৮৮।

১৭। তদেব, পৃ. ৩২৯৭।

১৮। তদেব।

১৯। তদেব, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ৩৩১২।

২০। তদেব, পৃ. ৩৩০৩।

২১। সাধনা রতুয়া (সম্পা.), শব্দ সাহিত্য পত্রিকা, কালকূট বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৩য়; সংখ্যা : ৩য় জানুয়ারী ২০১১, পৃ. ১৯১।

২২। বসু নিতাই (সম্পা.), কালকূট রচনাসমগ্র, অষ্টম খণ্ড, জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য, মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৩৩০১।

২৩। তদেব।

২৪। তদেব, পৃ. ৩৩০০।

২৫। মুখোপাধ্যায় শুভঙ্কর (সম্পা.), চৈতন্যচিন্তা, বসু, নিমাইসাধন, নিমাইচরিত, এম.পি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, জানুয়ারী, ২০০২, পৃ. ৩০।

২৬। সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, আদিখন্ড, দশম অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ. ৪৬।

২৭। তদেব, মধ্যখন্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, পৃ. ১৯২।

২৮। বসু তাপস (সম্পা.), শ্রীচৈতন্য একালের ভাবনা, বসু তাপস, ইতিহাস পুরুষ শ্রীচৈতন্য : গণ আন্দোলনের পুরোধা, ২০১৪, পৃ. ১৪।

২৯। সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, মধ্যখন্ড, ত্রয়োবিংশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ. ১৯১।

৩০। বসু নিতাই (সম্পা.), কালকূট রচনাসমগ্র, অষ্টম খণ্ড, জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য, মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৩৩০২।

৩১। সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, মধ্যখন্ড, পঞ্চবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২০৪।

৩২। বসু নিতাই (সম্পা.), কালকূট রচনাসমগ্র, অষ্টম খণ্ড, জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য, মৌসুমী প্রকাশনী, ২০০৯, পৃ. ৩৩৪২।

৩৩। তদেব, পৃ. ৩৩১২।

৩৪। তদেব, পৃ. ৩৩৭৮।

ষষ্ঠ অধ্যায়

একবিংশ শতকের উপন্যাসে নববীক্ষণে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব

চৈতন্যদেব তাঁর একক ব্যক্তিত্ব ও সাধনার মাধ্যমে বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন তুলেছিলেন তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব একবিংশ শতকেও অব্যাহত। বাংলা কথাসাহিত্যিকের হাত ধরে চৈতন্যদেবের প্রভাব ও চৈতন্যচর্চার ধারা নব নব রূপে নবতাৎপর্যে একবিংশ শতকেও বাংলা উপন্যাস শিল্পে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। একবিংশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আজও চৈতন্যদেবের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাঁকে নিয়ে রচিত হয়ে চলেছে একের পর এক উপন্যাস। কোথাওবা নায়করূপে চৈতন্যব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ ঘটেছে, যেমন ড. দীপক চন্দ্রের 'সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে' প্রতিবাদী গণ আন্দোলনের নায়করূপে চৈতন্যচরিত্র চিত্রিত হয়েছে,শৈবাল মিত্রের 'গোরা' উপন্যাসে লেখক তিন যুগের গোরার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রভাবের এক অনবদ্য ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন; আবার কোথাওবা তাঁর পদরেণুধন্য বিশিষ্ট স্থানগুলি নিয়ে উপন্যাস রচিত হয়েছে, যেমন চৈতন্যদেবের গৌড় পরিভ্রমণকে কেন্দ্র করে রচিত অভিজিৎ সেনের 'রাজপাট ধর্মপাট' যেখানে রাজপাটের সঙ্গে ধর্মপাটের মেলবন্ধনে এক ক্রান্তিকালের ছবি এঁকেছেন লেখক, আবার চৈতন্যদেবের পানিহাটি আগমন ও সেই সূত্রে সোদপুরের পানিহাটা জনপদের পাঁচশ বছরের ইতিহাসকে লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যরূপ দান করেছেন তাঁর 'পানিহাটা' উপন্যাসে। কখনও আবার তাঁর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে রচিত হয়েছে গবেষণাধর্মী উপন্যাস রূপক সাহার 'ক্ষমা কর হে প্রভু' যেখানে লেখক বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অতীতের রূপরেখা রচনা করে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ করেছেন। এছাড়া চৈতন্যদেবের সমসাময়িক গৌড়বঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়ের লীলা পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস 'চেনা পথ অচেনা পথিক' (২০০৯), অলখ মুখোপাধ্যায়ের 'এক জন্মেই জন্মান্তর'(২০১৪), মহাপ্রভুর আদিলীলা নিয়ে রচিত কিন্নর রায়ের 'শ্রীচৈতন্য কথা' (২০১৮) যেখানে চৈতন্যের জন্মের পূর্ববর্তী শচীর মৃত অষ্টকন্যার জন্ম রহস্য নিয়ে লেখকের কল্পনা আবর্তিত হয়েছে এবং হাল আমলে বসন্ত লস্করের 'মিথের মানুষ শ্রীচৈতন্য' (২০২০) যেখানে গ্রাম বাংলার পটভূমিতে বেড়ে ওঠা একটি নিতান্ত সাধারণ ছেলে নিমাইয়ের প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-যন্ত্রণা এবং পরিশেষে জননায়ক হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে একেবারে সহজ-সরল ভাষায় প্রভৃতি উপন্যাসগুলি কালানুক্রমে সাজিয়ে আমরা এই অধ্যায়ে একবিংশ শতকে নববীক্ষণে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রভাবের প্রতিফলন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (২০০১)

ড. দীপক চন্দ্র

শ্রীচৈতন্যদেবেরে পাঁচশত বৎসরের পূর্তি উৎসবকে উপলক্ষ করে ড. দীপক চন্দ্র শ্রীচৈতন্যদেবের জীবন অবলম্বনে রচনা করলেন একটি অনবদ্য উপন্যাস – 'সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। পাঁচশত বৎসর ধরে চৈতন্যদেব সম্পর্কে যে প্রচলিত সংস্কার, দার্শনিক চিন্তা ও অধ্যাত্মবিশ্বাস মনকে অভিভূত করে রাখে - এই উপন্যাসের স্বাদ তার থেকে ভিন্নতর। তার কারণ দেশকালের পার্থক্য। লেখকের মতে "চৈতন্যদেবের পূর্বস্বরূপ অন্বেষণ করতে গিয়ে সেই প্রথাগত বিশ্বাস ও সংস্কারের অতি পুরাতন ও জীর্ণ পাঁচিলটি যদি ভেঙে পড়ে, অপসংস্কৃতির অন্ধকার থেকে চৈতন্য মুক্তির কোন সুযোগ সৃষ্টি হয় তাহলে অতি সুন্দর সুন্দর কাব্যকথার দার্শনিকতার তলায় চাপা পড়া কথার চেয়ে কঠিন সত্য অনেক বেশি পবিত্র নয় কি?"[১] সেই কঠিন সত্য উন্মোচনের প্রচেষ্টাতেই লেখক কিছু কাহিনি, কিছু ঘটনা সংযোজন করে, চৈতন্য চরিতকারদের অলৌকিক বিসদৃশ ঘটনাগুলি বর্জন করে, সুন্দর করে সাজিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের একটি সত্য বাস্তবচিত্র রচনা করলেন উপন্যাসে।

উপন্যাসটির সূচনায় 'দৃষ্টিকোণ' অংশে লেখক বলেছেন – "চৈতন্য তিরোভাবের পর মূলত চৈতন্যকে নিয়ে এক দার্শনিক ভক্তিবাদের সৃষ্টি হয়। চৈতন্যচরিত কাব্যগুলি তার ফসল। ভক্ত কবির পুষ্পাঞ্জলি, ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ আর নবদ্বীপের নিমাই দুধে আমে এক হয়ে গেল। আর আঁটির মত পড়ে রইল রক্তমাংসের সজীব মানুষটি। ভক্ত কবির চোখে নিমাই মানুষী বৃত্তের বাইরে এক অন্য মানুষ : নররূপী কৃষ্ণ, সচল জগন্নাথ, যুগাবতার শ্রীচৈতন্য। সন্ন্যাস তাঁর কর্মজীবনকে ঢেকে দিল। বাস্তব হারিয়ে গেল এক রহস্যময় কুহেলিকায়। একজন ঐতিহাসিক মানুষের বিশালতা আনতে তাঁর চরিত্রকে বড় করে আঁকতে মাঝে মধ্যে এমন সব অদ্ভুত, অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ হল যা তাঁর ভেতর শ্রীচৈতন্যের চরিত্রের মহিমা ও গৌরব নষ্ট হয়ে গেল। তাঁকে অনেক ছোট করে ফেলা হল।"[২] তিনি আরও বলেছেন যে প্রচলিত চরিতগ্রন্থগুলি শ্রীচৈতন্যের জীবনের সামগ্রিক রূপটি ফুটিয়ে তুলতে পারে নি। প্রচলিত চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলি নানা দিক থেকে অসম্পূর্ণ। তাই নানা উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই অসম্পূর্ণতা যথাসাধ্য দূর করে একটি গ্রহণযোগ্য বাস্তব জীবনালেখ্য রচনা করার জন্যই তিনি এই উপন্যাসটি রচনা করেছেন। লেখক মনে করেন যে চৈতন্যচরিতকারেরা পরস্পরবিরোধী তথ্য পরিবেশন করেছেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্যের পরিবর্তন এবং বিলোপ করেছেন। একালের লেখক সত্যের তাগিদে চৈতন্যচরিতকারদের সে সমস্ত অলৌকিক এবং বিসদৃশ ঘটনাগুলো বর্জন করেছেন। অনেক ঘটনাই লেখক উপন্যাসের খাতিরে

সংযোজন করেছেন, সাজিয়েছেন। এই নিরিখেই ড. দীপকচন্দ্রের উপন্যাস 'সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' -এর বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ণ করা যেতে পারে।

চৈতন্যের সন্ন্যাস জীবনের পশ্চাতে যে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি আছে, তার সূত্রে চৈতন্যের মনন ও সাধনের স্বরূপ উন্মোচন করতে চেয়েছেন লেখক। চৈতন্যদেব নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন জনগণের মঙ্গল বিধানের ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণ হিন্দুদের সর্বজনীন দৃষ্টি ছিল না। এইজন্যে হিন্দুধর্মের উপর আঘাত এসেছে বারংবার। পারিপার্শ্বিক অবস্থাই মানুষকে পথের সন্ধান দেয়, অনেক সময় তাকে গড়েও তোলে। গৌরসুন্দরের সমসাময়িক অবস্থাই তাঁর আগমনের পটভূমি। জাতি-বর্ণে বিভক্ত সমাজে নানা প্রকার বঞ্চনা, ঘৃণা, অবহেলা, বেদনা, নিপীড়ন, তন্ত্রের বিকৃতি, অনাচার, ব্যভিচার সমাজকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছিল। হিন্দুদের সংকীর্নতা, অনুদারতা, পারস্পরিক ঘৃণা, বিদ্বেষ এবং ভীরুতা, কাপুরুষতা স্বার্থপরতার রন্ধ্রপথ ধরে বঙ্গের মুসলমান শাসকেরা হিন্দুদের ধর্মনাশ, জাতিনাশ এবং জোর করে ধর্মান্তকরণ করে হিন্দুদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল। এরকম একটা পরিবেশে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। বিপন্ন হিন্দুদের ধর্ম রক্ষা করতে নিমাই প্রতিবাদী শক্তিরূপে আবির্ভূত হলেন। নিমাইয়ের প্রতিবাদী সত্তার উন্মোচন, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি, নিমাইকে গনতন্ত্রের প্রধান সূত্রধর রূপেই এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদে শচীকে বলতে শোনা যায় – 'আমার পুত্রের সহায় বিপুল গণশক্তি'।[৩] তাই তো কোটি কোটি ভক্তের চোখে আজও 'তিনিই সচল জগন্নাথ'।

পনেরোটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত উপন্যাসের প্রধান অংশ আবর্তিত হয়েছে নবদ্বীপকে ঘিরে। পিতা জগন্নাথ, জননী শচী এবং দুই স্ত্রী যেমন গুরুত্ব পেয়েছে, তেমনি অদ্বৈতাচার্য, ঈশ্বরপুরী, কাজি, হরিদাস, মুরারী, শ্রীবাস, জগাই, মাধাই, তর্কবাগীশ সকলেই মধ্যযুগের চৈতন্যজীবনীকার তথা বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, লোচনদাস প্রমুখদের প্রবাহ ধরে উপন্যাসে হাজির হয়েছেন। সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপিত হয়েছে চৈতন্যের গয়া যাত্রা, দক্ষিণভারত ও উত্তর ভারত পর্যটন।

চৈতন্যের পরিব্রাজকরূপে এই ভারতদর্শনের একটি লক্ষ্য ছিল ধর্মের নামে বিকৃতি, ব্যভিচার ও অবিচারের সার্বিক ইতিহাসটি জেনে, নীলাচলে সচল জগন্নাথের গণআন্দোলনের ভিত নির্মাণ। এই জন্য তিনি নবদ্বীপে চাঁদকাজীর বিরুদ্ধে যেমন মোকাবিলা করেছেন, তেমনি ভক্ত প্রতাপরুদ্রের রাজত্বকালে উড়িষ্যার পুরীর জগন্নাথদেবের কাছে বঞ্চিত মানুষদের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য পান্ডাদের গুরু বিদ্যাধরের সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছেন। চৈতন্যদেবের এই প্রতিবাদী গণশক্তির জাগরুক সত্তারই পরিচয় বিবৃত করেছেন ঔপন্যাসিক তার রচনায়।

নবদ্বীপের সংকটের অবস্থা জানা যায় বিশ্বরূপ ও অদ্বৈতাচার্যের কথোপকথনে। নবদ্বীপে বিদ্যাগর্বী পন্ডিতেরা নিজ নিজ অহমিকা আর বেদ-বেদান্ত, ন্যায়ের কূট তর্কাতর্কি নিয়ে মগ্ন। দেশ থেকে যে হিন্দুধর্ম লোপ পেতে বসেছে তার কোন উপলব্ধি নেই তাদের। ধর্মহীন পাষন্ড মানুষদের বিবেকহীন অত্যাচারে, লোভে, শাসনে, পাপে শান্তিপ্রিয় নিরীহ ধর্মপ্রাণ মানুষদের যে দুর্দশা ভোগ করতে হচ্ছে তা কেউ চোখ খুলে দেখতে পেতেন না। ধর্মনাশের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির বিচূর্ণ হয়েছিল। সেখানে গড়ে উঠেছিল মসজিদ। তবু হিন্দুদের চৈতন্যোদয় হয় না। হিন্দুদের ঔদাসীন্যের সুযোগ নিয়ে সুলতানীরাজ বঙ্গের মাটিতে শিকড় গেড়ে বসে। শাসনকর্তা হুসেন শাহ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। সমাজে অবহেলিত, পতিত, উপেক্ষিত, দুর্বল, দুঃস্থ অসহায় মানুষেরা ছিল নামহীন, গোত্রহীন। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উপর তাদের ছিল প্রচন্ড ক্রোধ, ক্ষোভ। সুলতান তার সহজাত বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছিলেন যে ওইসব মানুষদের সহজেই মুসলমান ধর্মের অনুকূলে আনা সম্ভব। তারা মুসলমান হয়ে প্রচন্ড হিন্দুবিদ্বেষী হয়ে উঠল। নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ভীরু হিন্দুর দল এই ঘটনার নীরব দর্শক হয়ে থাকল। অপরদিকে সুলতানের আগ্রাসী নীতি হিন্দুর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠল।

উপন্যাস বর্ণনায় অদ্বৈতাচার্যকে বলতে শোনা যায় যে আজ বাঙালির বড় দুর্দশা। হিন্দুধর্মের দুর্দিন। সমাজ-সংসার ব্যভিচারে পূর্ণ। আমাদের সমাজে সংসারে, ধর্মে, কৃষ্টির উপর আঘাত এসে পড়েছে। ঘরে-বাইরে আমরা আক্রান্ত। সুলতানের হাতে হিন্দুর হিন্দুয়ানি বিপন্ন। পাষন্ডেরা নারীর সম্ভ্রম কেড়ে নিচ্ছে। হিন্দুকে জোর করে ধর্মচ্যুত করছে। এই অপসংস্কৃতির হাত থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার নিমিত্ত অদ্বৈত আচার্য কৃষ্ণের ন্যায় সমদৃষ্টিসম্পন্ন জাতীয় নেতার আবির্ভাব কামনা করতে থাকেন। হিন্দুর অন্তরে নামসংকীর্তনের সুধারস ঢেলে দিতে থাকেন। কৃষ্ণ নামেই সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি হয়। বৈষম্য দূর হয়। সেবাধর্মে দীক্ষিত হলে মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় হয়। তার ভেতরে সমদর্শীর ভাব জাগে। অদ্বৈতাচার্য দিনরাত্রি কৃষ্ণ নামে মানুষকে মাতিয়ে তুলতে চাইলেও তার সমস্ত প্রচেষ্টা, উদ্যম ব্যর্থ হয়। তিনি মানুষের হৃদয়কে নাড়া দিতে পারেন না। তখন তিনি নেতৃত্বদানের উপযোগী ব্যক্তিকে সন্ধান করতে থাকেন। হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার জন্য, নবদ্বীপের বিপন্ন মানুষকে উদ্ধারের জন্য বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিনি প্রথমে বিশ্বরূপকে প্রস্তুত করেছিলেন, তাই বিশ্বরূপ সংসার ছেড়ে চলে গেলে অদ্বৈতাচার্য আক্ষেপ করে বলেন "এই অপসংস্কৃতির হাত থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষার এক মহান সংকল্পের বীজ আমি তার মধ্যে বপন করেছিলাম কিন্তু আমার সব আশা আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ করে দিয়ে সে সন্ন্যাসী হয়ে গেল। তাই'ত বলছি জগন্নাথ, তুমি শুধু পুত্র হারিয়েছ, আমি হারিয়েছি একসঙ্গে সন্তান এবং মহানায়ককে।"[৪]

বিশ্বরূপ বৃহৎ মানব সমাজের অন্তরকে নাড়া দিতে ব্যর্থ হন। তিনি জানতেন অদ্বৈতাচার্য তাকে বিরাট দায়িত্ব দিতে চলেছেন। কিন্তু সংসারে থেকে বিশ্বরূপ তা বহন করতে পারছিলেন

না। ব্যর্থতার আত্মগ্লানিতে তার মন অহরহ পুড়তে থাকে। তাই তিনি মানব মুক্তির সেই পরম সত্যকে অন্বেষণের নিমিত্তই সন্ন্যাসের সিদ্ধান্ত নেন। নিমাইকে বিশ্বরূপ বলেন : "তথাগতকেই আমি অনুসরণ করব। সন্ন্যাসী হলেই মানুষের সীমানায় নেমে আসা সহজ হয়। সন্ন্যাসীর কোন অহং নেই, অভিমান নেই, রাগ বিদ্বেষ নেই, সকলের শুভ ও কল্যাণ কামনাই তার ধর্ম। তাই দুঃখী, দুর্গত, আতুর, সুখী, ভোগী সব মানুষই সন্ন্যাসীর কাছে নিজেকে উন্মোচিত করে। সন্ন্যাসীই পারে তার দুঃখ-কষ্ট ও বেদনার প্রতিকার করতে, তার শান্তি ও সুখের পথ দেখাতে। তাই সন্ন্যাসীর পক্ষেই সম্ভব সত্যের সন্ধান দেয়া। সন্ন্যাসী হয়ে আমি সেই পথের সন্ধান করব।"[৫]

বিশ্বরূপ অদ্বৈতাচার্যের অভিলাষ পূর্ণ করতে না পারলে তখন অদ্বৈতাচার্য জাতীয় নেতার খোঁজে জগন্নাথ মিশ্রের ছোট ছেলে নিমাই পন্ডিতকে আবিষ্কার করেন। জগন্নাথ মিশ্রকে তিনি বলেন "... বিশ্বম্ভরও শুভলক্ষণযুক্ত। ওর কপালে রাজটীকা আছে।"[৬] জগন্নাথ নিজেও জানেন নিমাই সাধারণ মানুষ নয়। অপাপবিদ্ধ দুর্মর সাহসী, তেজী, বিশ্বজয়ী এক অসাধারণ মানুষ। তাই অদ্বৈতাচার্য এতদিন ধরে কৃষ্ণের ন্যায় নেতৃত্বদানকারী যাঁকে খুঁজছিলেন নিমাইয়ের মধ্যে তাঁকে চিনতে পেরে খুশি হন। এইভাবে দেখা যায় সমসাময়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই, নিমাইয়ের আবির্ভাবকে তাৎপর্য মণ্ডিত করে তুলেছেন ঔপন্যাসিক দীপক চন্দ্র। কোনরকম অবতারত্ব লাভের কাব্যিক মহিমায় গৌরচন্দ্রের আবির্ভাবকে আচ্ছন্ন করেন নি।

আর এখান থেকেই নিমাইয়ের সন্ন্যাসগ্রহণেরও পটভূমি রচিত হয়ে যায়। অদ্বৈতাচার্যকে নিমাই বলেন : "আচার্য সব সময় দাদার কথা মনে পড়ে। দাদা বলত সুখী সুন্দর এক সমাজ উপহার দেবার জন্যে রামচন্দ্র মায়ের মমতা, পিতার স্নেহ, ভ্রাতার অনুরোধ, প্রজাদের প্রার্থনা, সিংহাসনের আকর্ষণ, ঐশ্বর্যের মোহ ত্যাগ করে বনবাসী হয়েছিল।... কোনকিছু তাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে নি। কর্তব্য বড় নিষ্ঠুর। দাদার কথা হল; সত্যের জন্য মানুষকে অনেক ব্যক্তিগত দুঃখ যন্ত্রণা কষ্ট ভোগ করতে হয়। ... রাজপুত্র সিদ্ধার্থও রাজার ঐশ্বর্য ত্যাগ করে, বহু সংযম ও ক্লেশ স্বীকার করে মানুষকে সত্যের আলো এবং মুক্তির পথ দেখিয়েছে। বড় ত্যাগ মহৎ চিন্তা মনটাকে প্রসারিত করে দেয় বহুদূর পর্যন্ত।"[৭] এইভাবে নিমাইয়ের মুখ থেকে দার্শনিক কথা শুনে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যায়।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগ্রহণে শচীদেবী কান্নায় ভেঙে পড়লে নিমাই তাকে প্রবোধ দিয়ে বলে : "মা আমরা যা যা করছি তার কোন মূল্য নেই। এই দুঃখ বেদনা; কষ্টে শুধু শক্তি ক্ষয়। এটা ভালবাসা নয়, স্নেহ নয়, এটা মায়েদের পাগলামি। দাদা বলে, মা হয়েছে বলেই সন্তানের উপর তার ষোল আনা অধিকার? তাকে দেশের দরকার নেই? দশের প্রয়োজন নেই? বুকে করে ছেলে আগলে থাকাটা মায়েদের রীতি। ছেলেকে তারা পুতুল ভাবে। স্নেহ মায়া মমতার নামে মায়েরা সন্তানের শত্রুতা করে। তাকে সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠতে দেয় না।"[৮] নিমাইয়ের কথার মধ্য দিয়ে আসলে ঔপন্যাসিক সমসময়ের একটি বাস্তব

সত্যচিত্রকেই তুলে ধরেন। তবে এটি একেবারে লেখকের নিজের মতাদর্শ। প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যচরিতকাব্যগুলি অনুসরণ করলে দেখা যাবে সেখানে কিন্তু নিমাই বরং মা-বাবাকে এই কথা বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল যে সে কখনও তাদের ছেড়ে যাবে না।

ঔপন্যাসিক তাঁর কল্পনার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন নিমাই-লক্ষ্মীর দাম্পত্য জীবনের সূচনা পর্বে। বিয়ের কথা শুনে এক অদ্ভুত অনুভূতি হয় নিমাইয়ের। লক্ষ্মীর শান্ত মূর্তি, চোখ ধাঁধান রূপ, দীর্ঘ দেহ, তুলি দিয়ে আঁকা চোখ বিস্ময়ে আনন্দে নিমাইয়ের জীবন ভরপুর করে তোলে। সবাইকে ফাঁকি দিয়ে নিমাইকে দেখার জন্য লক্ষ্মী উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। সখীরা মজা করতে লাগে। এখানে বিবাহ-পূর্ব বৈষ্ণীয় পূর্বরাগের প্রতিফলন ধরা পড়েছে নিমাই-লক্ষ্মীর এই প্রকৃত মিলনে। এই লক্ষ্মীর মৃত্যু তাঁকে নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে। কিন্তু এখানেও দেখা যায় নিমাই কখনোই লক্ষ্মীর সঙ্গে দাম্পত্যজীবনের, সংসার জীবনের ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে চান নি, যা আর পাঁচজন সাধারণ গৃহী করে থাকেন। বিভিন্ন মধুর দৃশ্যের ফাঁকে নিমাইয়ের সমাজ সচেতন মনটি যে কাজ করে চলেছিল, তা ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন। লক্ষ্মী যখন নিমাইকে বলে যে সে তো নিমাইকে ঘরে বেঁধে রাখে নি তখন নিমাই বলে : "এ তোমার অভিমানের কথা আমারও ভাল লাগে তোমার শরীরের সুগন্ধ নিতে, তোমাকে আদর করতে, তোমার চোখের অতল গভীরে ডুবে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু এক একজন মানুষকে জীবনের এই চৌহদ্দীতে আঁটে না। জীবন অনেক বড়। তোমার আমার দাম্পত্য প্রেমের মধ্যে সবটুকু ধরে না। এর বাইরেও জগৎ আছে, জীবন আছে। তার প্রতিও আমার ভালবাসা রয়েছে, সব মানুষই দেশকে দেশের মানুষজন, দেশের আকাশ, বাতাস, গাছপালা, নদী, পাহাড়, ধুলোর গন্ধ, প্রকৃতির রঙ, পাখির গান, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত সব ভালবাসে। পুরুষের ভালবাসা একটা মেয়ের মধ্যে আঁটে না। উপছে যায় অন্য মানুষের দিকে। যেমন তোমাকে পূর্ণ করে আমি উপছে যাচ্ছি আমার দেশের মানুষের ভেতর। আজ আমার যা কিছু উৎকণ্ঠা, দুঃখ, বেদনা, উত্তেজনা, আবেগ সব দেশের মন্দ থাকা মানুষদের ঘিরে। সে জন্যে তুমি যদি আমাকে নিষ্ঠুর ভাব, স্বার্থপর মনে কর তাহলে আমি নিরুপায়।"[৯] লক্ষ্মী নিজের দুঃখের কথা ব্যক্ত করলে নিমাই তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে : "দুঃখবোধ থাকে কেবল প্রকৃত মানুষের। তোমার নিজের দুঃখটাকে শুধু দেখলে লক্ষ্মী? - পৃথিবীতে দুঃখী নয় কে? সংসারে সকলে এক এক ধরণের দুঃখবোধ নিয়ে জন্মায়। কিন্তু দুঃখ বিলাসিতা ভাল নয়।"[১০]

লেখক খুব সন্দুরভাবে নিমাইয়ের জন্য লক্ষ্মীর অপেক্ষার মুহূর্তটিকে কল্পনার রসে জারিত করেছেন। এখানেই ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব। "সময়টা লক্ষ্মীর কাটছিল না। নানা কথা ভাবছিল, এলোমেলো। কত ঘটনা মুর্হূমুর্হূ তার চেতনাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা হলুদ পাখি উঠোনের নিম গাছের ডালে এসে বসল। লক্ষ্মী সেইদিকে চেয়ে রইল। গাছের ডালে পাখিটা একা বসে। তারই মতই একা। বৌ-কথা কও বলে কেঁদে কেঁদে কাতর স্বরে মিনতি জানাতে লাগল। লক্ষ্মীর সমস্ত শরীরে একটা অদ্ভুত অনুভূতির ঢেউ খেলে

গেল। এই অদ্ভুত অনুভূতিটা প্রশ্নে প্রশ্নে তাকে ভরিয়ে ফেলল। পাখির ঐ মিনতি কার কাছে? কে শুনছে তার ডাক? তবে কি নিমাইয়ের হয়ে তার কাছে মিনতি করছে? কথাটা লক্ষ্মীর মনের ভেতর ঘুরতে লাগল একটা দীর্ঘশ্বাসকে পাক দিয়ে দিয়ে যার নাম হাহাকার।"[১১] এইভাবে লেখকের কল্পনা আবর্তিত হয়ে লক্ষ্মী চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তোলে।

এই লক্ষ্মীর মৃত্যু নিমাই সহজে মেনে নিতে পারে নি। লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুই নিমাইয়ের জীনটাকে বদলে দেয়। এখানে ঔপন্যাসিক লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। উপন্যাসের কোথাও দংশনের উল্লেখ নেই। লক্ষ্মীর ঠোঁটের কোণা বেয়ে কষ গড়াতে দেখে শচী বিস্মিত হয়ে যান। শাশুড়ি বৌমার ঝগড়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল যেহেতু নিমাই ও লক্ষ্মীর বিয়েটা মন থেকে কোনদিনই শচীদেবী মেনে নেন নি। কিন্তু তার জন্য আত্মহত্যার মত ভুল পদক্ষেপ লক্ষ্মীপ্রিয়া কখনোই নেবেন না। এটা নিছকই লেখকের কল্পনা। এই ধরনের মতবাদ কখনই সমর্থনযোগ্য নয়, তাই উল্লেখমাত্র।

লক্ষ্মীর মৃত্যুঘটনা সম্পর্কে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন -

প্রভুর বিরহ লক্ষ্মীরে দংশিল।

বিরহ সর্প বিষে তার পরলোক হৈল।[১২]

কবি প্রতীকের রূপ দিয়ে বলেছেন যে, বিরহের বিষ, সর্পের আকার ধরে যেন তাকে ছোবল মারল। ঔপন্যাসিকের ব্যাখ্যার সংসারের প্রতি স্বামীর উদাসীনতা, অবহেলাই বোধহয় সাধারণ এক গৃহবধূ লক্ষ্মীপ্রিয়া মেনে নিতে পারেন নি।

চৈতন্যচরিতকাররা যদিও লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যু ঘটনাকে নিমাই বজ্রকঠিনভাবে সংসারের নিয়ম বলে নির্বিকার চিত্তে মেনে নিয়েছেন বলে দেখিয়েছেন -

"পত্নীর বিজয় শুনি গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।

ক্ষণেক রহিলা কিছু হেট মাথা করি।।

প্রিয়ার বিরহ দুঃখ করিয়া স্বীকার।

স্তব্ধ হই রহিলেন সর্ব বেদসার।।"[১৩]

লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু সংবাদ নিমাইয়ের কাছে বজ্রাঘাত তুল্য হলেও তিনি মাকে প্রবোধ দিয়ে বলেছেন -

"প্রভু বোলে মাতা দুঃখ ভাব কি কারণ।

ভবিতব্য যে আছে তা খন্ডিব কেমন।।

এইমত কাল গতি কেহ কারো নয়।

অতএব সংসার অনিত্য বেদে কয়।”[১৪]

এই সংসারের অনিত্যতার উপলব্ধিই নিমাইয়ের জীবনে সন্ন্যাসগ্রহণের পটভূমি রচনা করে। আসলে লক্ষ্মীর মৃত্যু নিমাইকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। তার মন অসীম শূন্যতায় ভরে যায়। সংসারের প্রতি তিনি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেন। শচীদেবীর কাছে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন : “মা লক্ষ্মীর মৃত্যুটা আমি কোনদিন ভুলব না। আমার জীবনে সবচেয়ে বড় বন্ধন ছিল সে। তাকে কথা দিয়েছিলাম কোনদিন ছেড়ে যাব না। কিন্তু সে আমাকে মুক্তি দিয়ে গেল। ছোট্ট সংসারের পরিবর্তে বিশ্ব সংসারের ভার দিয়ে গেল আমায়। বোধহয়, আমার অদৃষ্ট দেবতার ইচ্ছাও তাই।”[১৫] শোকার্ত হৃদয় থেকেই তার মধ্যে দার্শনিক উপলব্ধি জাগে। লক্ষ্মীদেবীর প্রেরণা তাকে বিশ্বমানবের সঙ্গে মিলিত হবার পথ প্রশস্ত করে দেয়। তিনি অনুভব করেন “জীবন স্রোতের নিয়মই হল এক প্রাণ থেকে আর এক প্রাণে প্রদীপ জ্বালিয়ে যাওয়া। সে রইল না, কিন্তু তার প্রাণের অম্লান শিখা রয়ে গেল অন্যের অন্তরে এরই নাম প্রগতি। জীবন থেমে থাকার নয়। জীবন ভরে ওঠার, পূর্ণ করার। সমস্ত ভাল-মন্দের, সুখ-দুঃখের মধ্য দিয়ে নিজেকে না নিয়ে এলে জীবন বোধ হয় পূর্ণ হয় না। লক্ষ্মীর মৃত্যু তাহলে কোন ঘটনাই নয়। বিশ্ব জুড়ে প্রাণের যে অবিরল প্রকাশ ঘটেছে লক্ষ্মী তার একটা ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। মহাজীবনের ইন্ধন।”[১৬]

স্বামীপ্রেমে বঞ্চিত বিষ্ণুপ্রিয়া আক্ষেপে জর্জরিত হয়েছে। বার বার তাঁর মনে হয়েছে যে কেন তাঁকে নিমাই বিয়ে করে তাঁর জীবনটা নষ্ট করলেন। বার বার প্রশ্ন করেছেন যে কার দোষে তাঁকে সারাজীবন ধরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। পরোক্ষভাবে নিমাই যেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিয়ে করে মায়ের ওপর লক্ষ্মীপ্রিয়ার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছেন। সন্ন্যাসী হয়ে জননীকে প্রিয়জন বিরহের কষ্ট দিয়েছেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়ঃসন্ধির কিশোরীপ্রাণ স্বামীর এই উদাসীনতাকে সহ্য করতে পারেনি। উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদে রয়েছে : “বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদে ফেলল। বলল : তবে এরকম বিয়ে করে আমার জীবনটা নষ্ট করলে কেন? আমি’ত কোন অপরাধ করিনি। তবে কার দোষে আমাকে সারাজীবন ধরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে? কেন?

ঠিক কথা। আমার মা চেয়েছিল সংসার দাঁড়ে বসানোর জন্যে তোমার মত এক সুন্দরী মেয়েকে। পাখিকে খাঁচায় ভরলে সে কি তার উড়ার আকাশকে ভুলে যায়?”[১৭]

নিমাই তাকে কৃষ্ণপ্রিয়া করে তুলতে চায়, কঠিন সংযম ও ব্রত পালনের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়াই। সে একজন অতিসাধারণ মেয়ে। স্বামী সংসারের সুখই তার প্রার্থনা। সে চায় স্বামীর সোহাগ, মমতা, ভালবাসা। কিন্তু “পুরুষের যে আচরণ যুবতী রমনীকে মুগ্ধতার ওপারে প্রত্যাশার ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে যায়, আশা জাগায়, তৃষ্ণা জাগিয়ে দেয় আকণ্ঠ - নিমাই তা কোনদিন পূর্ণ করেনি। তার কঠিন সংযম,

নিরাবেগ, বিরাগ, বিতৃষ্ণা তার কিশোরী প্রাণ অধিকতর কষ্টে ও দুঃখে স্পন্দিত হয়। অভিমানের সাগর উথলে ওঠে। নারী হয়ে পুরুষকে জয় ও বশ করতে না পারার ব্যর্থতা, অক্ষমতার একটা আত্মগ্লানি তার মনকে ছুঁয়ে থাকে সর্বক্ষণ।"[১৮] লজ্জায়, অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে, দুঃখে তার দু'চোখ শুধু কান্নায় ভরে ওঠে দিনের পর দিন নিমাইয়ের অনাদর অপমান তাকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। অপূর্ণতার যন্ত্রনায় পরাভবের বেদনায় তার বুক হাহাকার করে ওঠে। সত্তার গভীরে ঝংকার বেজে ওঠে। সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে বলে : "আমি কি করেছি আমার শরীরটাকে যদি ঘেন্না কর তাহলে বিয়ে করলে কেন? আমি ত তোমার কোন ক্ষতি করিনি, তবে এ সর্বনাশ কেন করলে? কে চেয়েছিল তোমার মত দামী লোকের অনুগ্রহ।"[১৯] বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তরের অন্তঃস্থলে পুঞ্জীভূত অভিমান যেন সংসারের সমগ্র বঞ্চিত স্ত্রীজাতির অভিমান। এভাবেই ঔপন্যাসিকের কলমে নারীহৃদয়ের নারীসত্তার উন্মোচন ঘটে। যে বঞ্চিত পীড়িত নারীসত্তা চৈতন্যচরিতকারদের হাতে ভক্তির প্রাবল্যের ধোঁয়াশায় ঢাকা পড়ে যায় তাই যেন ঔপন্যাসিকের কলমে সূর্যের কিরণের ন্যায় ঝক্‌ঝক্ করে ওঠে, যা পাঠকের হৃদয়কেও ছুঁয়ে যায়।

গীতার শ্রীকৃষ্ণের মত ষোড়শ শতকের নিমাই তথা শ্রীচৈতন্যের উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত মানবকুল এবং দেশমাতৃকাকে প্রবলের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা। একই সঙ্গে তাকে বলা যায় গণতন্ত্রের উদগাতা। মধ্যযুগের নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যে নবজাগরণ তাতে শ্রীচৈতন্যদেবই প্রথম গণ-আন্দোলনের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। গণতন্ত্র হল সেই রাষ্ট্রীয় সংগঠন যেখানে সর্বমানবের মৌলিক অধিকারগুলি সমান, যেখানে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষে কোন ভেদ নেই। অর্থাৎ দেশবাসীর মধ্যে এক মানবিক সাম্যবোধ বিরাজিত, এই রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মত ধরণাটি বিংশ শতাব্দীর হলেও দীর্ঘ পাঁচশো বছরেরও আগে এই গণতন্ত্র ও সাম্যবোধের চেতনাটি অখন্ড বঙ্গ থেকে সমগ্র পূর্বভারত এবং দক্ষিণভারতে স্ফুরিত হয়েছিল। তবে সেটি ছিল ভক্তিধর্মকে কেন্দ্র করে উন্নত ও পরিশীলিত মানব-মৈত্রীর চেতনা, যার উদ্‌গাতা স্বয়ং যুগপুরুষ শ্রীচৈতন্যদেব। বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদের আধ্যাত্মিক চেতনাকে ঘিরে এই গণতন্ত্র এবং স্বদেশভাবনার উদ্ভব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়।

গণআন্দোলনের একাধিক শর্ত থাকতে পারে। যেমন জনসংযোগ, সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণ, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে একত্রিত প্রতিবাদ, আকস্মিক চরম বিক্ষোভ, একজন দলনেতা থাকলেও মূলত সম্মিলিত মানুষের আন্দোলন, সকলের কণ্ঠে একই স্লোগান প্রভৃতি। গণ-আন্দোলনের আধুনিক তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা শ্রীচৈতন্যদেবের জানার কথা নয়। অথচ লক্ষ করলে দেখা যাবে গণআন্দোলনের সব কয়টি ধাপ তিনি অতিক্রম করেছেন। জনসংযোগের মাধ্যম হিসাবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ১) নামসংকীর্তন, ২) নগর পরিক্রমন, ৩) নাটক অভিনয় প্রভৃতি বিষয়গুলিকে। নবদ্বীপের সর্বস্তরের মানুষকে কাছে টানার

সবচেয়ে বড়ো ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ, আধ্যাত্মিক ভক্তিমার্গের কীর্তনকে শ্রীচৈতন্যদেবেরে গনসংগীতে রূপ দান। এই কীর্তনকে কেন্দ্র করেই চৈতন্যদেব সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে একত্রিত করতে চেয়েছিলেন সুপরিকল্পিতভাবে। জীবমাত্রই কৃষ্ণদাস। ফলে কৃষ্ণের সম্বন্ধসূত্রে সব মানুষই পরস্পরের আত্মার আত্মীয় এবং কৃষ্ণভজনার সহজতম উপায় হল সকলে মিলে বত্রিশ অক্ষরের 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' মহামন্ত্র গাওয়া।

'বিশ্বম্ভর' নামটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন লেখক এইভাবে - বিশ্বম্ভর অর্থাৎ বিশ্বের ভরণ কর্তা। লোকে যাকে বলে নারায়ণ। তিনি দেবতার ছেলে নন, দেব অংশেও তার জন্ম নয়। তবু দেবতার মত মানুষের ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি তিনি পেয়েছেন। মানুষের সমাদর, পূজা তাকে এক অন্য মানুষ করে গড়েছে। সেই মানুষ অসাধারণ, বিরাট। মহাবলী দেবতার মত সে অন্যায়, অধর্ম, উৎপীড়নকে ধ্বংস করতেই এসেছে। কিন্তু তার বাহুবল, ধনবল নেই, আছে জনবল আর প্রেম। মথুরার গোপপল্লীর কৃষ্ণের মত তিনি মানুষের হৃদয়ের রাজা। অন্তত নবদ্বীপের লোকের সেইরকম ধরণা। এখানে দেখা যায় লেখক ঔপন্যাসিক দীপক চন্দ্র চৈতন্যভাগবতকার বৃন্দাবন দাসের অনুসরণে মথুরার কৃষ্ণের সঙ্গে নবদ্বীপের গৌরচন্দ্রকে একাসনে বসিয়েছেন।

উপন্যাসে বর্ণনার সূত্রে দেখা যায় নিমাইয়ের চোখের তারায় ব্রাহ্মণ শাসিত হতশ্রী ভারতবর্ষের এক ছবি ভেসে ওঠে। হিন্দু সমাজে হিন্দু বড় পরাধীন। বর্ণবৈষম্য এবং জাতপাতের অভিশাপে হিন্দু সমাজ খন্ডিত বিচ্ছিন্ন। নিম্নবর্ণের হিন্দু নিজের সমাজেই পতিত, অস্পৃশ্য, লাঞ্ছিত এবং নির্বাসিত। বিধর্মী শাসকসমাজ হিন্দু-সমাজের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লোভ দেখিয়ে তাদের ধর্মান্তরিত করতে লাগল। তাই আসন্ন ধ্বংস থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষার প্রশ্ন বড় হয়ে উঠল। কিন্তু মুসলমান ধর্মকে বৈরী করে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন নয়। প্রেমের আদর্শে, সৌভ্রাত্রের বন্ধনে সমস্ত সামাজিক রীতিনীতির উর্দ্ধে, আচার বিচার প্রথা, কুসংস্কারের বাইরে মহান আদর্শে বড় হয়ে ওঠা। কৃষ্ণপ্রেমের ভাবাবেগের স্রোতে জীবনের সব কলঙ্ক, কালিমা, দুর্বলতা তখন কেটে যাবে। সবার সঙ্গে সবাকার মিলনের এক অপূর্ব সুযোগ হবে। এই আশাতেই নিমাই সন্ন্যাসগ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ হিসাবে অভক্ত জনগণকে ভক্ত করে তোলার ইচ্ছাকে প্রগাঢ় করে দেখিয়েছেন – "যত অধ্যাপক যত তার শিষ্যগণ।/ ধর্মী কর্মী তপোনিষ্ঠ নিন্দুক দুর্জন।।/এসব আমার নিন্দা অপরাধ হৈতে।/ আমি না লওালে ভক্তি না পারে লইতে।।/ নিস্তারিতে আইলাভ আমি হৈল বিপরীত। / এসব দুর্জনের কৈছে হইবেক হিত।। / আমাকে প্রণতি করে হয় পাপ ক্ষয়। / তবে সে ইহারে ভক্তি লওাইলে হএ ।। / মোরে নিন্দা করে যে নাকরে নমস্কার। / এসব জীবের আমি করিব উদ্ধার।।/ অতএব অবশ্য আমি সন্ন্যাস করিব। / সন্ন্যাসী দেখিঞা মোরে প্রণত হইব।।"[২৮]

উপন্যাসে দেখা যাচ্ছে, এই সন্ন্যাস গ্রহণের পরিকল্পনা শচীমাতার কাছে জানাতে এসে যে কৃষ্ণের সান্নিধ্যের কথা চৈতন্যদেব জানচ্ছেন, তিনি গনদেবতা কৃষ্ণ, যাকে শুধু নবদ্বীপ ধামে বসে, আরাধনার মাধ্যমে লাভ করা যাবে না। দেশদেশান্তরে খুঁজতে হবে। আর তাই সন্ন্যাসী হয়ে পথে পথে তাঁকে ঘুরতে হবে। এই কৃষ্ণ বিরহ তাঁর মধ্যে এসেছে বৃহত্তর এক স্বদেশচেতনা থেকে। সমসামরিক পরিস্থিতি চিন্তা করেই তাঁকে এই সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। বৈষম্যহীন, বিভেদ বিদ্বেষহীন হিন্দু রাজ্য গঠনের স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে বাস্তবায়িত করতে হলে তাকে অবশ্যই সন্ন্যাসের সিদ্ধান্তে অটল থাকতে হবে। প্রকৃত সন্ন্যাসের ব্যাখ্যাও তাঁর কাছে অন্যরকম – "যে সন্ন্যাসী শুধু আত্মমুক্তি সাধনে ব্যস্ত থাকে তাঁকে শুধু একজন ধার্মিক মহৎ মানব বলা যেতে পারে মাত্র। আর যে সন্ন্যাসী সৃষ্টিকে সুন্দর করতে চান, মানবমনে চৈতন্যোদয় ঘটিয়ে চিত্তের প্রসার ঘটাতে চান তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী, মহান ভক্ত।"[২৯]

চৈতন্যদেব হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃত সন্ন্যাসী। তিনি শচীমাতার মধ্যে দুঃখিনী স্বদেশমাতার প্রতিচ্ছবি দেখতে পান। অনুভব করেন জীবজগতের মহা দুরবস্থা। নৈতিক পতনে গোটা ভারতবর্ষের ভেঙে পড়া রূপকে অন্বেষণ করে সেই মহাসংকট থেকে অধঃপতিত মানুষকে উদ্ধার করতে চান তিনি। নেতৃত্ব দিতে চান মানবসমাজকে। নেতাকে হতে হয় সর্বত্যাগী। তিনি বলেছেন – "মানুষের সমাজ সংস্কারের বাইরে এসে তাকে দেশ ও জাতির কথা চিন্তা করতে হয়। নইলে সন্দেহ ঘোচে না। অবিশ্বাস যায় না। আমাকে ঘিরে একজন লোভী স্বার্থান্বেষী মানুষের মনে সন্দেহ জেগেছে। দেশের রাজা পর্যন্ত ভীত হয়ে পড়েছে। তিনিও বিশ্বাস করেন আমি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। সন্ন্যাসী হলে এ সন্দেহ আর থাকবে না। সকল সন্দেহের বাইরে থেকে আমি আরো বেশি করে মানুষকে আহ্বান করতে পারব। তাদের বিশ্বাসভজন হব। যারা আমাকে ভয় পাচ্ছে, সন্দেহ করছে তারাও নির্ভয়ে সাড়া দেবে।"[৩০] মানুষকে আহ্বান করার শক্তির জোরেই নিমাই ভারতকে নাড়া দিয়েছিলেন অন্তরের বাইরে। তবু মানুষের প্রেমের ঠাকুরের কথা শোনেনি স্বার্থান্বেষী বিভেদ সৃষ্টিকারী পুরোহিত, পান্ডা এবং ক্ষমতালোভী রাজ অমাত্যরা।

উপন্যাসের আখ্যান অনুযায়ী চৈতন্যদেবকে মন্দিরের ভিতর গুমখুন করলেন বিদ্যাধর এবং তার সঙ্গীরা। বাইরে উত্তেজিত জনতার চীৎকার শোনা যেতে লাগলে বিগ্রহের বেদীর নীচে শবদেহ লুকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। "ঠিক করা হয়, জনতা জানতে চাইলে বলা হবে, জগন্নাথের সচল বিগ্রহকে জগন্নাথ আত্মসাৎ করেছেন। অচল জগন্নাথের সঙ্গে সচল জগন্নাথ বিলীন হয়ে গেছেন। এভাবেই রাজনৈতিক সন্ন্যাসীকে গভীর ষড়যন্ত্রের মূল্য দিতে হয় শহীদ হয়ে। কিন্তু কোটি কোটি ভক্তের চোখে তিনিই সচল জগন্নাথ।"[৩১]

এভাবেই চৈতন্যচরিতকারদের রচিত কোন মহান পুরুষের অলৌকিক কাহিনি নয়, ‘সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ উপন্যাস হয়ে উঠেছে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিপ্লবী নায়কের আখ্যান। এখানেই উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা। আর এভাবেই আধুনিক কথাশিল্পীর হাতে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও চৈতন্যচর্চার ধারা নতুন মাত্রা পায়।

তথ্যসূত্র

১। চন্দ্র দীপক, জানুয়ারি, ২০০১, সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, দেজ, কলকাতা-৭৩, দৃষ্টিকোণ।

২। তদেব।

৩। তদেব, পৃ. ১০৪

৪। তদেব, পৃ. ১৫

৫। তদেব, পৃ. ৮

৬। তদেব, পৃ. ১৭

৭। তদেব, পৃ. ১৬

৮। তদেব, পৃ. ১২

৯। তদেব, পৃ. ৪৭

১০। তদেব, পৃ. ৭২

১১। তদেব।

১২। সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), ১৩৯২, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদ, আনন্দ, পৃ. ৯২।

১৩। সেন সুকুমার (সম্পা.), ১৯৮২, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, আদিখন্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ. ৫৯।

১৪। তদেব।

১৫। চন্দ্র দীপক, জানুয়ারি, ২০০১, সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, দেজ, পৃ. ৯২

১৬। তদেব, পৃ. ৯৪

১৭। তদেব, পৃ. ১০৯

১৮। তদেব, পৃ. ১০৮

১৯। তদেব, পৃ. ১০৯

২০। সেন সুকুমার (সম্পা.), ১৯৮২, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, মধ্যখন্ড, ষোড়শ পরিচ্ছেদ, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ. ২৪২।

২১। চন্দ্র দীপক, সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য , প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

২২। তদেব, পৃ. ১৫৪।

২৩। তদেব, পৃ. ১৫৪।

২৪। তদেব, পৃ. ১১১

২৫। ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, ১৯৮৪, যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ফার্মা, কে.এল. প্রাঃ লিঃ, কল-১২, পৃ. ১৮৮।

২৬। মুখোপাধ্যায় শুভঙ্কর (সম্পা.), জানুয়ারি ২০০২, বসু নিমাইসাধন, নিমাইচরিত, চৈতন্যচিন্তা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, পৃ. ২৪।

২৭। চন্দ্র দীপক, জানুয়ারি, ২০০১, সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, দেজ, পৃ. ১৪৩।

২৮। সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), ১৩৯২, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১০৭।

২৯। চন্দ্র দীপক, জানুয়ারি ২০০১, সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, দেজ, পৃ. ১৬০।

৩০। তদেব, পৃ. ১৬২।

৩১। তদেব, পৃ. ২১৯।

রাজপাট ধর্মপাট (২০০৮)

অভিজিৎ সেন

চৈতন্যদেবের গৌড় তথা রামকেলি পরিভ্রমণকে কেন্দ্র করে রচিত অভিজিৎ সেনের অন্যতম উপন্যাস ‘রাজপাট ধর্মপাট’ (২০০৮)। একদা চৈতন্যদেবের গৌড় তথা রামকেলি পরিদর্শন প্রসঙ্গে ‘গৌড়ে ব্রাহ্মণরাজা হব হেন আছে’ অথবা ‘নবদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা।/ গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ম্ময় প্রজা’[১] বা অনুরূপ বৈষ্ণবশাস্ত্রে আলোচিত এই ধরনের বক্তব্যে কিছু অনুমানের সুযোগ আছে বলে মনে করেন ঔপন্যাসিক। সেই অনুমানের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে এই উপন্যাসের পটভূমি। শ্রীচৈতন্যদেবের বেশ কিছু কার্যাবলী সম্পর্কে একসময় লেখকের মনে কিছু কৌতূহল জাগে, কিছু প্রশ্নের উদয় হয়। শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে রাজা হোসেন শাহের হিন্দু অমাত্যদের মধ্যে কি কোনো উচ্চাশা অঙ্কুরিত হয়েছিল? চৈতন্য উড়িষ্যা থেকে ফিরে সোজা শান্তিপুরে গিয়ে অদ্বৈতের সঙ্গে কী আলোচনা করলেন? সেখান থেকে কুলিয়া গ্রামে বিদ্যাবাচস্পতির বাড়িতে অজ্ঞাতবাসই বা করতে গেলেন কেন? সেখান থেকে রামকেলিতেই বা হঠাৎ এলেন কেন? রূপ, সনাতনই বা ছদ্মবেশ ধারণ করে মাঝরাত্তিরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন কেন? এই ধরনের বহু প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করতেই ঔপন্যাসিক লিখলেন ‘রাজপাট ধর্মপাট’।

তেইশটি অধ্যায়ে গ্রথিত এই উপন্যাসে রয়েছে শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্ব, তাঁর আদর্শ, রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা, আছে তার মহনীয়তা, জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রেমভক্তি দান, সর্বোপরি এতে রয়েছে চৈতন্যের বিরাট ব্যক্তিত্বের অতুলনীয় প্রভাব। সেইসঙ্গে এখানে আছে রাজনীতি, আছে চক্রান্ত, আছে মুক্তির কথা। রয়েছে হোসেন শাহের গৌড়ের সিংহাসন দখল, প্রতাপরুদ্রের উড়িষ্যার সিংহাসন আরোহন, উভয় রাজার শত্রুতা, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ ও নীলাচলে যাওয়া, আবার দেশে ফিরে রামকেলি গমন ও তারপরই শান্তিপুর হয়ে আবার উড়িষ্যায় প্রত্যাবর্তন এবং মাস দুয়েকের মধ্যে হোসেনশাহের উড়িষ্যা আক্রমণ। উপন্যাসের শুরুতেই গৌড়েশ্বর হোসেন শাহের কাছে সংবাদ যায় যে, হাজার লোক নিয়ে শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনের পথে অগ্রসারিত, মাঝপথে রামকেলিতে মন্দির সংলগ্ন ধর্মশালায় আশ্রয় নিয়েছেন। চৈতন্যের গৌড় অবস্থানের প্রতিটি দিন বিশদে বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে, তাকে কেন্দ্র করে হোসেন শাহ ও বাংলার রাজনীতিতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল রয়েছে তারও ইতিবৃত্ত। সর্বোপরি এতে রয়েছে চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের বন্যায় কাতারে কাতারে মানুষের ভেসে যাওয়ার গল্প, চৈতন্যদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে রূপ-সনাতন উদ্ধারের কাহিনি। একদিকে গৌড় উড়িষ্যার হিন্দু ও

মুসলিম রাজার সংঘাত রাজপাটের নিজস্ব নিয়মে, অন্যদিকে চৈতন্যের নেতৃত্বে ধর্মপাট, এই দুইয়ের মেলবন্ধনে এক ক্রান্তিকালের ছবি এঁকেছেন লেখক অভিজিৎ সেন এই উপন্যাসটিতে।

ইতিহাসের একটি বিশেষ সময় যেহেতু এই উপন্যাসের উপজীব্য, তাই ঔপন্যাসিক সন-তারিখ ও স্থান নামের উল্লেখে পাঠককে বারবার সচেতন করে দিয়েছেন। চৈতন্যদেবের জন্ম ১৪৮৬ খ্রীঃ, হোসেন শাহের সিংহাসন দখল – ১৪৯৩-৯৪খ্রীঃ, প্রতাপরুদ্রের সিংহাসন আরোহন ১৪৯৭, চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণ – ১৫১০, ঐ বছরই নীলাচলে যাওয়া, ১৫১৪ খ্রীঃ সেপটেম্বর দেশে ফিরে ১৫১৫ খ্রীঃ জুনের মধ্যে কোনো এক সময়ে রামকেলি গমন এবং এর কয়েকদিন পরে হোসেন শাহের উড়িষ্যা আক্রমণ।

শ্রীচৈতন্যদেবের রামকেলিতে আগমনের অন্যতম প্রধান কারণ রূপ ও সনাতনকে বৈষ্ণধর্ম ও আদর্শে দীক্ষিত করে তোলা। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের উক্তিতে একথা বর্ণনা করে লিখেছেন : "গৌড় নিকট আসিতে নাহি প্রয়োজন। / তোমা দোঁহা দেখিতে মোর ইহাঁ আগমন।। / এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে। / সবে বলে কেনে আইলা রামকেলি গ্রামে।"[২] কে এই রূপ-সনাতন, কি তাদের জাতি পরিচয়, কেনই বা চৈতন্য তাদের উদ্ধারের জন্য রামকেলিতে এলেন, কীভাবেই বা তারা গৌড়ের রাজপ্রসাদে গিয়ে পৌঁছাল – এসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যাবে এই উপন্যাসে। রাজা হোসেন শাহের দরবারের প্রধান দুই অমাত্য অমর এবং সন্তোষ, তাঁরা যথাক্রমে 'দবির খাস' অর্থাৎ 'একান্ত সচিব' এবং 'সাগর মালিক' যার শব্দার্থ ছোটো রাজা যিনি আসলে রাজকোষেরও আধিকারিক এই উপাধিতে গৌড় দরবারে ভূষিত। গৌড়ের রাজসভার এই দুই প্রধান মন্ত্রী ছাড়া হোসেনশাহের পক্ষে রাজ্য পরিচালনা প্রায় অসম্ভব। গৌড়ের প্রভাবশালী এই দুই ভাই কীভাবে চৈতন্যের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাদের যাবনিক নাম বা উপাধি বদলে হয়ে উঠলেন যথাক্রমে রূপ ও সনাতন, যাদের হাতে রচিত হল গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ভাষ্য, তাদের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ধরা পড়ে এই উপন্যাসে। শোনা যায়, তাদের পূর্বপুরুষ কর্ণাটক থেকে এসে নৈহাটিতে ছিলেন দু-তিন পুরুষ। পারিবারিক সম্পত্তি বিষয়ক বিরোধে দ্রোহবশত অমর এবং সন্তোষের পিতা কুমারদেব নৈহাটী ত্যাগ করে চন্দ্রদ্বীপ বাকলাতে গিয়ে বসতি করেছিলেন। এই দুই ভাই অল্পবয়সেই শিক্ষা ও উপার্জনের আশায় গৌড়ে তাদের মাতুলালয়ে চলে আসেন। তাদের শাস্ত্রজ্ঞান যেমন অগাধ তেমনি সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি এই তিন ভাষাতেই তারা সুপন্ডিত। এই পান্ডিত্যের অধিকারেই তারা গৌড়ের দরবারে রাজকার্যে নিযুক্ত হয়। তাদের সেই পান্ডিত্যকেই চৈতন্যদেব বৈষ্ণব আদর্শে পরিচালিত করলেন। চৈতন্যদেবের প্রভাবেই পরবর্তিতে রূপ ও সনাতনের হাত ধরে গড়ে উঠল গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও রসশাস্ত্রের অনুপম ভাষ্য। এ প্রসঙ্গে 'তিনিই সাহিত্য তাঁরই সাহিত্য' প্রবন্ধে ড. সত্যবতী গিরি লিখেছেন :-

"রামকেলি গ্রামেই মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল শ্রীরূপ ও সনাতনের। এর ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ও সাহিত্যের ইতিহাস অনন্যপূর্ব তাৎপর্য লাভ করতে সমর্থ হল। যতিজীবনের কঠোর সংযম ও নিয়মনিষ্ঠা মহাপ্রভুর দুকূলপ্লাবী রাগানুগা ভক্তিকে যেমন ধারণ করে রেখেছিল, তেমনি মহাপ্রভুর নির্দেশে এই ভক্ত-ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মধুর সাধনার তরল আবেগকে দর্শন ও সাহিত্যের সুসংবদ্ধ আধারে দীর্ঘকাল স্থায়িত্ব দান করার ব্যবস্থা করলেন।"[৩]

চৈতন্যদেব রামকেলিতে এলে দুই ভাই গোপনে ছদ্মবেশ ধারণ করে চৈতন্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। "ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিঞা। / প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইঞা।।/ অর্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভুস্থানে। / প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ হরিদাস সনে।"[৪] দন্তে তৃণ ধারণ করে গলবস্ত্র হয়ে দুই ভাই নিজেদের দৈন্যদশার কথা জানালেন। নানা দ্বন্দ্বে দীর্ন তাদের অস্তিত্ব। পীরালি বলে হিন্দু সমাজও ঘৃণা করে, যবন সমাজও যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে চায় না – "দুই গুচ্ছ তৃণ দু'হে দশনে ধরিয়া / গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে দন্তবৎ হঞা"।[৫] "নীচজাতি নীচ সঙ্গী করি নীচ কাজ / তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ।"[৬] যবনের হয়ে রাজকার্যে নিযুক্ত হওয়ার নিমিত্ত পাতিত্যদোষে তারা সমাজ থেকে পরিত্যক্ত। চৈতন্যদেব ভালোভাবেই ব্রাহ্মণ্যসমাজের কঠোরতা, সাধারণ হিন্দুদের উপর নিগ্রহ চালানোর কথা সবই জানতেন। তিনি জানতেন সেই সময় নবদ্বীপে ব্রাহ্মণদের দোর্দণ্ডপ্রতাপের কথা। সেই ব্রাহ্মণ্যসমাজের কঠোর অনুশাসনের স্বীকার তিনিও হয়েছিলেন। বহু মানুষকে সেই সময় ব্রাহ্মণ্য সমাজ পাতিত্যদোষে দুষ্ট করে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করেছিল। এই কারণে বহু হিন্দু সেই সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। উপন্যাসের তৃতীয় পরিচ্ছেদে সনাতন এই প্রসঙ্গ তুললে তার উত্তরে শ্রীচৈতন্য বলেন :- "আমি সেই কারণেই বেদবিরোধী এই নব্যপন্থার সন্ধান করেছি। ধর্ম ও সমাজকে আচার সর্বস্বতার পথ পরিবর্তন করে ভক্তি ও প্রেমের, শুধু ভক্তি ও প্রেমের সম্পর্ককেই গুরুত্ব দিতে হবে। জাতপাতের ক্ষুদ্র গন্ডিকে অতিক্রম করে যেতে হবে আমাদের। ধর্মেরও বিবর্তন আছে। ধর্মকেও সময়োপযোগী করে নিতে হবে।"[৭] তিনি আরও বলেন "পাতিত্যদোষ ব্রাহ্মণ্যসমাজের নিগ্রহ। ব্রাহ্মণ্য সমাজের নিজ স্বার্থের কারণেই সে সব তৈরি। শাস্ত্রে তার প্রশ্রয় নেই। নবদ্বীপের ভট্টাচার্যরা একারণে আমাকে নিগৃহীত কম করেন নি। আমি যা সত্য বলে জেনেছি তার সম্যক প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আমাকে সন্ন্যাসও নিতে হয়েছে।"[৮] রূপ ও সনাতনদের উদ্দেশ্য করে চৈতন্যদেব আরও বলেন "আপনারা উভয়েই শাস্ত্রবিদ পন্ডিত ব্যক্তি। ভয় পাবেন না। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কদাচার থেকে সমাজকে রক্ষা করতেই হবে। আপনারা আমার সহায় হলে আমরা সমগ্র দেশ জুড়ে একটা প্রবল আন্দোলন তৈরি করতে পারব, যা অবশেষে ধর্ম ও সমাজ উভয়ই বাঁচাবে।"[৯] এখানেই চৈতন্যদেবের রামকেলি যাত্রা এবং গৌড়ের 'দবির খাস' ও 'সাগর মালিক'কে রূপ ও সনাতন নামে দীক্ষিত করে বৈষ্ণবধর্ম ও আদর্শে আনয়নের পরিকল্পনা সুপরিস্ফূট হয়ে ওঠে।

এর পিছনে আরও একটি বিশেষ কারণ ছিল। চৈতন্যদেব ক্রমশ অনুভব করছিলেন তাঁর দলের মধ্যে মতানৈক্য এবং বৈষ্ণবধর্মের ভাঙন। তাই তিনি এমন ব্যক্তিদের অনুসন্ধান করছিলেন যাঁদের হাতে সনাতন বৈষ্ণবধর্মের যথার্থ স্বরূপটি ফুটে উঠবে যা ভবিষ্যতে বৈষ্ণবদের সঠিক পথে পরিচালিত করবে। চৈতন্যদেব অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভৃতি সকলকে নিয়ে যে বৈষ্ণব আদর্শ এবং সর্বজন গ্রাহ্য প্রেমধর্মের নব্যভূষণ গড়তে চেষ্টা করেছিলেন তার প্রবল সর্বপ্লাবী শক্তি অনুভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার ভিতরে ধ্বংসের কীটও যে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল তা ভালোভাবেই বুঝতে পারছিলেন চৈতন্যদেব। শান্তিপুরে এবং নবদ্বীপে চৈতন্যের প্রেমধর্মের প্লাবন যে দুটি জায়গাতে সব থেকে বেশি গতিপ্রাপ্ত হয়েছিল সেই দুটি জায়গাতেই বিরোধও সর্বাত্মক। অদ্বৈতাচার্যের বয়স হয়েছে। তাঁর অনেক ক-জন সন্তানের মধ্যেই তাঁর ধর্মীয় উত্তরাধিকার নিয়ে তীব্র বিরোধ দেখা দিয়েছে। নিত্যানন্দ যে পদ্ধতিতে ব্যাপক জাত-বৈষ্ণবের সমাজ গড়ে তুলেছেন, উচ্চবর্ণীয় ভক্তরা সে পদ্ধতিতে যে শুধু অস্বস্তি বোধ করছে তাই নয়, অনেক সময় প্রকাশ্যে এর বিরোধিতাও করছে। উপন্যাসের একবিংশ পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিক এই অবস্থার উল্লেখ করে লিখেছেন : "চৈতন্যদেব এসবের মধ্যে ভাঙন দেখতে পাচ্ছেন। এসব বুঝেই তাঁর রামকেলি যাত্রা। এসবের কারণেই তাঁর সনাতন ও রূপের প্রতি আহ্বান। এসবের কারণেই তাঁর বৃন্দাবন যাত্রা। তাঁর পরিকল্পনা বৃন্দাবনকে কেন্দ্র করে সনাতন এবং রূপের কর্তৃত্বে একটি দৃঢ়সংবদ্ধ সংগঠন তৈরি করা, যে সংগঠন সর্বার্থে অভিভাবকের দায়িত্ব নেবে।"[১০] এই প্রসঙ্গে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় রূপ-সনাতনের গুরুত্ব প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন "ইঁহারা সুলতানের কর্ম ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভুকে অনুসরণ করিতে চাহিলেন। বাস্তবিক রূপ-সনাতন ও তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীবের সাহায্য না পাইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম চৈতন্যের পর একটি নগণ্য উপসম্প্রদায় হইয়া পড়িত, এতটা প্রাধান্য ও গৌরব লাভ করিতে পারিত না।"[১১]

উপন্যাসের বেশ কিছু অংশ জুড়ে একদিকে যেমন চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের কথা বর্ণিত হয়েছে অপরদিকে সমান্তরালভাবে বর্ণিত হয়েছে গৌড় সিংহাসনের ইতিহাস ও রাজনীতির কথা। রাজপাট এবং ধর্মপাট; ক্ষমতা এবং আধার; সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই এই দুয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। একে অপরের পরিপূরক; একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর অক্ষয় সম্পর্ক এবং সম্পর্ক বৈরিতা। এই গ্রন্থটির মূল উপজীব্যও তাই। শ্রীচৈতন্যদেবের রামকেলিতে আগমন উপলক্ষ্যে বেশ কয়েকটি দিনের সময়সীমায় হোসেন শাহের রাজত্ব এবং উদ্বিগ্নতা। ধর্মবিস্তার এবং রাজ্যবিস্তারের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কীর্তিলাভের প্রতি অন্ধ আবেগ ও আতিশয্য, রাজপাট তথা ধর্মপাটের বিস্তারিত উপাখ্যান যেখানে ইতিহাসের পটচিত্রে স্থাপন করা হয়েছে ধর্ম এবং রাজনীতি। যার চিত্রায়ণে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা করেছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ। একদিকে যেমন রয়েছে রূপ-সনাতনের পাশাপাশি

গৌড়ের প্রশাসক সুবুদ্ধিরায়ের গৌড় রাজদরবারে ক্ষমতা লাভের ইতিহাস। সামান্য কর্মচারী থেকে হোসেন শাহের গৌড় সিংহাসন দখলের পিছনেও রয়েছে গৌড়ের শক্তিশালী প্রশাসক সুবুদ্ধি রায়ের সহায়তার কথা – "ক্ষমতার কেন্দ্রের সব থেকে কাছে দীর্ঘকাল থাকার ফলে সুবুদ্ধিরায় গৌড়রাজ্যের ভিতরে বাহিরের সবকিছু অন্য সব অমাত্য বা সেনানায়কদের থেকেও বেশি জানতেন।"[১২] সেই কারণে হোসেন শাহ অন্য সব অমাত্যের তুলনায় সুবুদ্ধিরায়ের উপরই নির্ভর করতেন বেশি। সেই কঠোর সুপ্রাশসক কর্তব্যপরায়ণ সুবুদ্ধি রায় যিনি একসময় গৌড় শাসন করে এসেছেন তিনি সব ছেড়ে একদিন চলে গেলেন কাশী। রয়েছে সুবুদ্ধি রায়ের সন্তান সুগতরও কাহিনী।

রয়েছে হোসেন শাহের বয়স্য, তার সিংহাসন দখল চক্রান্তের অন্যতম সঙ্গী কেশব খানের ইতিবৃত্ত। এই কেশবখানের পিতৃব্য মালাধর বসু গৌড়ের সুপ্রশাসক রাজা রুকনুদ্দিন বরবক শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তবে কেশবখান গৌড়ের পরিস্থিতি বুঝে যুদ্ধবিদ্যা ও রাজনীতির কূটকৌশল আয়ত্ত করে হয়ে উঠেছিলেন বাদশাহের অন্যতম প্রিয় পাত্র। এই কেশবকে রাজা হোসেনশাহ চৈতন্যের রামকেলি অভিযানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে কেশবখান শ্রীচৈতন্যের মহিমা উড়িয়ে দিয়ে বলেন : "কেশব ছত্রীকে রাজা বার্তা পুছিল। প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল।।/ ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্যটন। / তাঁহা দেখিবারে আইসে দুইচারিজন।। যবন তোমার ঠাঁই করয়ে লাগানি। / তাঁর হিংসার লাভ নাহি হয় আরও হানি।"[১৩]

কেশব ছত্রীর কাছে চৈতন্যের কথা শুনে হোসেন শাহ যা নির্দেশ দেন তা তাঁর মহানুভবতার পরিচয় বহন করে :

"রাজা বলে এই মুঞি বলিয়ে সবারে।

কেহ না জানি উপদ্রব করয়ে তাঁহারে।।

যেখানে তাহান ইচ্ছা থাকুক সেখানে।

আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে।।

সর্বলোক লই সুখে করুন কীর্তন।

বিরলে থাকুন কিবা যেন লয় মন।।

কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোন জন।

কিছু বলিলেই তার লইব জীবন।।”[১৪]

যে হোসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করে সমস্ত মন্দির ধ্বংস করেছে তার মুখে এ হেন কথা সত্যিই বিস্ময়কর।

“কাজী যবন ইহার না করিহ হিংসন।

আপন ইচ্ছায় বুলুন যাঁহা উহার মন।।”[১৫]

তাই মনে প্রশ্ন জাগে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র যাঁর পৃষ্ঠপোষক সেই সন্ন্যাসীকে দেখতে হাজার হাজার লোকের ভিড় দেখে, এমনকি গৌড় দরবারের প্রধান প্রধান মন্ত্রী, অমাত্য, পীর ফকিরদের পর্যন্ত সেই সন্ন্যাসীর আনুগত্য স্বীকার করতে দেখে রাজা হোসেন শাহ কি ভীত হয়েছিলেন? না কি তিনি ‘গরিব’ সন্ন্যাসীকে বিব্রত করতে চাননি? না কি এটি বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য আনুগত্যের প্রভাব? তবে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট যে চৈতন্য জীবনীকাব্যগুলি এবং ইতিহাসের কোথাও কিন্তু হোসেন শাহের সঙ্গে চৈতন্যদেবের বিরোধে কোনো কথা শোনা যায় না। চৈতন্যদেব রামকেলি এসে কোটালের মুখে গুপ্তচর মারফত তাঁর সমস্ত খবর নিতেন হোসেন শাহ। এমনকি কোটালের মুখে শ্রীচৈতন্যের রূপের বর্ণনা শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন :

“কোতোয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে।/ এক ন্যাসি আসিয়াছে রামকেলি গ্রামে।।/ ... সন্ন্যাসীর শরীরের সৌন্দর্য দেখিতে।/ কামদেব মোহে হেন না পারি বলিতে।। / জিনিয়া কনককান্তি প্রকান্ড শরীর। / আজানুলম্বিত ভুজ সুনাভি গভীর।।/ সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ কমলনয়ন। / কোটি চন্দ্রে সে মুখের নাহি করি সম।। / সুরঙ্গ অধর মুক্তা জিনিয়া দশন। / কাম শরাসন যেন ভ্রুভাঙ্গপত্তন।।...”[১৬] হোসেন শাহ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ রাজা ছিলেন। তাই তিনি সকলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কেউ যেন সন্ন্যাসী চৈতন্যকে কোনোভাবে উপদ্রব না করে। এটিও আসলে একপক্ষে শ্রীচৈতন্যের বিরাট ব্যক্তিত্বেরই অমোঘ প্রভাব বলা চলে।

হোসেন শাহ অত্যন্ত দরিদ্র এবং সাধারণ অবস্থা থেকে উঠে এসে একটি বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন গৌড়নগরের প্রশাসক সুবুদ্ধিরায়ের অধীন একজন সাধারণ কর্মচারী। ধৈর্য্য ধরে, পরিশ্রম করে, তিনি যে শুধু সুলতান মুজাফর শাহের বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছিলেন তাই নয়, তাঁর প্রধান উজিরদের একজনও হয়েছিলেন। প্রাসাদের রক্ষীবাহিনিকে ঘুষ দিয়ে স্বয়ং কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে অন্তঃপুরে ঢুকে মুজাফফর শাহকে খুন করেন তিনি। লক্ষ লক্ষ মানুষের অজস্র রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সৈয়দ হোসেন গৌড়ের সিংহাসনে হোসেন শাহ হয়ে বসেন। তার এই অসাধারণ উত্তরণে সহায়

ছিল পিতৃপ্রতিম সুবুদ্ধি রায়। এরকমই এক রাজনৈতিক আবাহাওয়ায় গৌড়ে হোসেনশাহের রাজত্বকালে রামকেলিতে চৈতন্যচন্দ্রোদয় হয়। শতশত লোক পদব্রজে হরিনাম করতে করতে এগিয়ে যায় তাঁর সাথে।

চৈতন্যদেব রামকেলিতে এলে রাজা হোসেন শাহ গুপ্তচর মারফত প্রতিদিন তাঁর খবরাখবর নিতে থাকেন। রাজা প্রতাপরুদ্র যাঁর পৃষ্ঠপোষক সেই সন্ন্যাসী হঠাৎ কেন রামকেলিতে এসে উপস্থিত হলেন, আর কেনই বা তাঁকে আপ্যায়ন করছে তারই দুই পরম প্রভাবশালী মন্ত্রী 'দবির খাস' ও 'সাকর মল্লিক' – এসব সন্দেহ ও সংশয় তো হোসেন শাহের মনে ছিলই। হোসেন শাহ ক্ষমতা গ্রহণ করার কিছু আগে নবদ্বীপে এবং তারপরে সেখান থেকে সারা গৌড়বঙ্গে এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হবেন। এই গুজব এমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে নবদ্বীপে মুসলমানদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের দাঙ্গা পর্যন্ত হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই রাজশক্তি ব্রাহ্মণদের দমন করার জন্য বাহিনী পাঠায়। তাদের উপদ্রবে সেই সন্ধ্যায় বহু ব্রাহ্মণ নবদ্বীপ ছেড়ে চলে যায়। মুসলমান শাসকের অত্যাচারের স্বীকার হয়ে সার্বভৌম বাসুদেব ভট্টাচার্য নবদ্বীপ ছেড়ে উড়িষ্যারাজের কাছে আশ্রয় নেন, আর তারই ভাই বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় দেশ ছাড়লেন না ঠিকই তবে নবদ্বীপ ছেড়ে অন্যত্র বাসা বাঁধলেন এবং যবনের প্রতিশোধস্পৃহায় দিন গুনতে থাকলেন। চৈতন্যকে দেখে তার মনে সেই গুজবের রেশ নতুন আশার সঞ্চার করেছিল।

চৈতন্যদেবের গৌড় অবস্থানের প্রতিটি দিন যেমন বিশদে বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে, তেমনি তাকে কেন্দ্র করে হোসেন শাহ ও বাংলার রাজনীতিতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, রয়েছে তারও ইতিবৃত্ত। একদিকে গৌড় উড়িষ্যার মুসলিম ও হিন্দু রাজার সংঘাত রাজপাটের নিজস্ব নিয়মে, অন্যদিকে চৈতন্যের নেতৃত্বে ধর্মপাট, এই দুয়ের মেলবন্ধনে এক ক্রান্তিকালের ছবি এঁকেছেন লেখক অভিজিৎ সেন এই উপন্যাসটিতে একদিকে যেমন হোসেন শাহের রাজত্বকাল, সিংহাসন লাভের ইতিহাস, গৌড়ের রাজনৈতিক ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, অপরদিকে বাংলার প্রাণের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তির আদর্শে হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধভিক্ষু, অবধূতান সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে একছাতার তলায় নিয়ে এসে সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষকে উদ্ধারের পরিকল্পনা। একদিকে রাজনীতির কূট অভিসন্ধি অন্যদিকে মানবাত্মার চিরন্তন প্রেম সাধনা। ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দুই-ই মিলেমিশে একাকার। মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলন রেঁনেসা, বৈষ্ণব ধর্ম, ধর্মের মূল তত্ত্ব, ষড় গোস্বামী, রূপ-সনাতন, অদ্বৈত নিত্যানন্দ, কেশবানন্দ, বৈষ্ণবদের বীজমন্ত্র 'হরেকৃষ্ণ', জগনানন্দ প্রসঙ্গ, যবন হরিদাস, সর্বোপরি নীলাচল বৃন্দাবন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। সার্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি, নিত্যানন্দ, ব্রাহ্মণ, হিন্দু-ইসলাম-বৌদ্ধ-বিহার শ্রমন সবকিছু মিলিয়ে ধর্মপাটের সুবিস্তৃত পরিসর। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শীর্ষ উদ্ধৃতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, রাধাবল্লভ দাসের শোচকগ্রন্থ, জগন্নাথ মন্দিরের

‘মাদলাপাঞ্জী’, ‘চর্যাপদ’, স্বর্গবেদ সংহিত ১০ মন্ডল, ১২৯ সুক্ত, হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনূদিত বাল্মীকি রামায়ণ থেকে উদ্ধৃত চরণগুলি একদিকে বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থগুলি সম্পর্কে কথাকারের সম্যক জ্ঞান তথা বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মকে সমন্বিত করার প্রয়াস এবং যে কাঠামোর ভিত্তিতে উপন্যাসটির আধার পাট বির্নিমিত সেই ঐতিহাসিক কালসিদ্ধ গৌড়ের সুবিশাল রাজপাটকে কেন্দ্র করে গৌড় বঙ্গের বিশেষ কাল অভিধায় ধর্মপাটটির অবতারণার যৌক্তিকতা সার্থক ও সিদ্ধ হয়েছে। ঐতিহাসিক একটি বিস্তীর্ণ কালাতিপাতে গৌড়বঙ্গের ধর্মচারণার মূল সুরটি অনায়াসে শিল্পরূপ দিয়েছেন লেখক এই উপন্যাসে।

‘গৌড়ে ব্রাহ্মণরাজা হব হেন আছে’ অথবা ‘নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ অবশ্য হব রাজা। গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্ম্ময় প্রজা।’[১৭] গৌড়ে প্রচলিত এই গুজব এবং চৈতন্যদেবের রামকেলিতে আগমন গৌড় দরবারে কর্মরত হিন্দু রাজকর্মচারীদের মনে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকেই যেন তরান্বিত করেছিল। উপন্যাসের ঘটনা পরম্পরা বজায় রেখেই ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন কীভাবে চৈতন্যকে কেন্দ্র করে হোসেন শাহের হিন্দু অমাত্যরা নিজেদের স্বাধীনতা ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যকে কেন্দ্র করে গৌড়ে হিন্দু শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয় নি। উপন্যাসের ষোড়শ পরিচ্ছেদে আমরা দেখতে পাই চৈতন্যকে নিয়ে হোসেন শাহের মনে ভীতির সঞ্চার হলেও চৈতন্যদেব নিজেই সকলের সন্দেহ সংশয় দূর করে দেন। উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই সুবুদ্ধি রায়ের পুত্র সুগত এবং তার সঙ্গী বিকর্ণ ধানুক উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে গৌড় অভিযানের পরিকল্পনা করেন এবং চৈতন্যের কাছে এই প্রস্তাব ব্যক্ত করলে তিনি তাদের নিবৃত্ত করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন। “ না তিনি গৌড়ে রাজা হতে আসেন নি। যদিও এ প্রস্তাব তিনি বহুবার অনেকের কাছেই পেয়েছেন কিন্তু তাতে তার বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই।”[১৮] রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিল চৈতন্যদেবের উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক; আর উড়িষ্যা ও গৌড়ের মধ্যে তখন ঘোরতর যুদ্ধের সম্ভাবনা চলছে। উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্রকেও গৌড় আক্রমণ থেকে নিবৃত্ত থাকার পরামর্শ চৈতন্যদেবই দিয়েছিলেন। চৈতন্যচরিত কাব্যগুলি থেকে এও জানা যায় যে চৈতন্যের প্রভাবেই উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র গৌড় আক্রমণ থেকে বিরত হয়েছিলেন “প্রতাপতরুদ্র গৌড় জিনিতে করে আশা।/শুনিঞা গৌড়েন্দ্র তারে করেন উপহাসা।।/ চৈতন্যদেবের রাজা আজ্ঞা মাগিলা।/প্রভু বলেন প্রতাপরুদ্র কুবুদ্ধি লাগিল।।”[১৯]

চৈতন্যদেব জানতেন যে গৌড়ের সিংহাসনে হিন্দুশাসন প্রবর্তন অত সহজ কাজ নয়। বিশেষত তখন হিন্দুসমাজের সর্বস্তরে ভাঙন ধরেছে, অনাচার দুরাচারে তা পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। তিনি জানতেন রাষ্ট্র ও সমাজ ঘোরতর ভেদবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন, হিন্দু সমাজের কী উচ্চ, কী নিম্নস্তর সর্বত্রই যৌনাতিশয্য এবং ভোগলালসা, পঙ্গুভঙ্গুর এক সামাজিক অবস্থা। দুর্বল, দৈন্য-পীড়িত এই জাতির আত্মিক উন্নতি, শুদ্ধিকরণ ছাড়া সমাজের সার্বিক উন্নয়ন যে সম্ভব নয় তা তিনি ভালোভাবেই জানতেন তাই তিনি

সমস্ত শিষ্টাচার ছেড়ে কেবল প্রেমভক্তির দ্বারা সমস্ত মানুষকে একত্রিক করতে চেয়েছিলেন। তাই উপন্যাসের বিকর্ণ ধানুক যখন মুসলমান শক্তিকে পর্যুদস্ত করার জন্য চৈতন্যদেবকে প্রস্তাব দেন 'বাদীসিংহ, সেইসব কারণেই আপনার মতো একজন মানুষের নেতৃত্ব আমাদের দরকার।'[২০] তখন চৈতন্যদেব তার প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, "এ কাজ আমার নয়। আমি যুদ্ধে বিশ্বাস করি না। যুদ্ধ তা যে কোনো যুদ্ধই হোক, তা শুধু ধ্বংসই করে এবং অগণিত মানুষের অশেষ দুঃখকষ্টের কারণ হয়। আমার কাজ পৃথক। আর আপনাদের সবার একথা মনে রাখা উচিত এদেশটা আর শুধু হিন্দুর দেশ নয় এবং এদেশের বেশিরভাগ মুসলমান জন্মসূত্রে এদেশের মানুষ।"[২১] তিনি সনাতনকে উদ্দেশ্য করে আরো বললেন : "আমি অন্যভাবে এদেশের মানুষকে জাগাতে চাই। প্রেমভক্তি সাধনাই যাবতীয় ভেদবুদ্ধি এবং বিদ্বেষকে নির্মূল করতে পারে।"[২২]

চৈতন্যদেব রামকেলিতে এলে দেশ-বিদেশ থেকে কাতারে কাতারে মানুষ এসে সেখানে ভিড় করতে থাকে। প্রায় দেড় থেকে দু-লক্ষ মানুষ নবীন সন্ন্যাসীকে দেখতে আসে। গৌড় রাজার হিন্দু মন্ত্রী, হিন্দু সেনাপতি, গৌড় রাজসভার সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী সকলেই এসে চৈতন্যের সঙ্গে দেখা করে যায়। গৌড় পান্ডুয়ার সুফি দরবেশরা পর্যন্ত তার সঙ্গে মিলিত হয়। বেশ কয়েকজন বিদেশীও আসেন সেখানে। চৈতন্যদেবের সঙ্গে তাদের ধর্ম সম্পর্কে, সমাজ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়। সকলের সঙ্গে একত্রিত হয়ে তিনি সৌভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের আদর্শ প্রচার করেন।

এর নিভৃতে হয়তো প্রচ্ছন্ন ছিল একটি রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা, তা সত্ত্বেও সে সময়ে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম, নামপ্রেম, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ভেদাভেদ ভুলে সাম্যবোধ প্রচার না হলে বঙ্গদেশে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব যে ভীষণ ভাবে বিপন্ন হতো তা উপন্যাসে সুন্দরভাবে পর্যালোচিত হয়েছে। তিনি বুঝেছিলেন শুষ্ক বুদ্ধি বা যুক্তিতর্ক নয়, একমাত্র আবেগের দ্বারাই বৃহৎ মানবসমাজকে পরিচালিত করা সম্ভব। এক বৃহত্তর রাজনৈতিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বলেই বিধর্মী শাসনকে, অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করে একমাত্র হরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের পথ তিনি দেখিয়ে গিয়েছিলেন।

"গৌড়ের নিকট গঙ্গাতীরে এক গ্রাম।/ব্রাহ্মণসমাজ তার রামকেলি নাম।।/দিন চারি পাঁচ প্রভু সেই পুণ্যাস্থানে/ আসিয়া রহিলা যেন কেহ নাহি জানে।।/ সূর্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়।/সর্বলোক শুনিলেন চৈতন্য-বিজয়।।/ সর্বলোক দেখিতে হর্ষমনে।/স্ত্রী বালক বৃদ্ধ আদি সজ্জন দুর্জনে।"[২৩] ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-শূদ্র, স্ত্রী-বালক-বৃদ্ধ, আউল-বাউল-সহযজানী ভক্ত-গুপ্তচর, ভালো ও দুষ্ট সবধরনের মানুষই এই সমাবেশে এসে উপস্থিত হয় আর তাদের সকলেরই একটি সাধারণ আকাঙ্ক্ষা হল চৈতন্যদেবের কৃপালাভ। নিপীড়িত মানুষ চেতনে হোক বা অবচেতনে সবসময়ই মুক্তির পথ খোঁজে। নিমাই পন্ডিতের অসাধারণত্বের মধ্যে

সাধারণ মানুষ সেই বহুকাঙ্ক্ষিত মুক্তির পথ খুঁজে পেয়েছিল। উপন্যাসিকের কথায় – "চৈতন্যদেবের পা যেখানে পড়ছে, সেই জায়গার মাটি নিমেষে খুবলে নিচ্ছে পুন্যকামী মানুষ... যেন আর কিছু নয়, ওই মাটিটুকুই হবে তাদের একমাত্র সম্বল।"[২৪] শুধু তাই নয় চৈতন্যদেবের সর্বধর্ম সমন্বয়বাদের মহান আদর্শ কীভাবে একটা সময়ের অস্থির জীবনার্দশের মাঝে লক্ষ লক্ষ মানুষকে গ্রন্থিবদ্ধ করলেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে কথাকার এই উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষের অত্যন্ত সংবেদনশীল একটা জায়গা তার ধর্ম যে ধর্মের বন্ধনে বাঁধতে গেলে একটা মানুষ নেতা নয় বরং অবতারত্বে উর্ত্তীন হয়েই গণদীক্ষার মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে সংঘবদ্ধ করতে পারেন সেই সত্যটিই উপন্যাসের পটে বিবৃত করছেন লেখক। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখি চৈতন্যের অবতারত্বের প্রসঙ্গে উপন্যাসের চরিত্র বিকর্ন ধানুক বলছেন : "মানুষ যেসব গুণ ও ধর্মকে মহত্তম মনে করে, সে সব যার ভিতরে থাকে তিনি পুরুষোত্তম। পুরুষোত্তম বলতে সাধারণ ভাবে আমরা ভগবান বিষ্ণুকেও বুঝি। চৈতন্যদেবের দেবনিন্দিত দৈহিক সৌন্দর্য, গভীর অর্ন্তদৃষ্টি, ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং সংবেদ, প্রগাঢ় প্রতিভাসম্পন্ন বোধি, যে কোনো মানুষের উপরে তাঁর দর্শনমাত্র ইন্দ্রজালিক প্রভাব ইত্যাদি যদি অবতারত্বের প্রমাণ হয়, তবে সুগত, তিনি যথার্থই অবতার।"[২৫]

লক্ষ লক্ষ মানুষকে নেতৃত্বদানের জন্য চৈতন্যদেবকে অবতার হয়ে উঠতে হয়েছিল। দেশ-কাল-রাজনীতির বিস্তীর্ণ সময়সীমায় এভাবেই মানুষ ভগবান হয়ে ওঠে। রাজপাটের সঙ্গে এভাবেই ধর্মপাট একাত্ম হয়ে যায়। ঈশ্বর ভক্তির পবনে, হরিনামের আবেগে অসংখ্য মানুষের যে ঢল চৈতন্যদেবের সঙ্গী হয়েছিল সেই হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষকে সঙ্গী করে সন্ন্যাসী কোন লক্ষ্যের পথে এগিয়ে চলেছেন তার অন্বেষণ আজও নিরন্তর। লেখক অভিজিৎ সেনের কথায় – "কত মানুষ হবে এই জমায়েতে। রূপ ঠিক হিসাব করতে পারে না। তবু তার মনে হল অন্তত পঁচিশ-ত্রিশ হাজার মানুষ, নাকি পঞ্চাশ হাজার মানুষ আজ এসেছে এই সন্ন্যাসীর দর্শন পেতে। কোনো রাজা, কোনো সম্রাট কি এমন শ্রদ্ধা, এমন ভালবাসা আশা করতে পারে? কী যাদু আছে চৈতন্যদেবের অবয়বে? কণ্ঠস্বরে? প্রেমে?"[২৬]

এই অসম্ভব ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষটি নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করে এক বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত 'কীর্তি পথের পথিক' হয়ে এগিয়ে যান। লেখকের কথায় – "আর একজন মানুষ ঝাড়িখন্ডের গহন অরণ্য পথে অগ্রসর হচ্ছেন বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে, তিনি চৈতন্যদেব। তিনিও কি কীর্তি পথের পথিক? প্রিয়তমা স্ত্রী, স্নেহশীল মা, সংসার, দেশ, পান্ডিত্য, খ্যাতি সব ছেড়ে অকীর্তিতান আচন্ডালান সমস্ত মানুষকে উদ্ধারের কীর্তির পথে তিনি চলেছেন।"[২৭]

আধুনিক উপন্যাস একটি নির্দিষ্ট কোন প্রবণতা নিয়ে গড়ে ওঠে না। এই উপন্যাসটিও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে মধ্যযুগের সর্বাপেক্ষা আলোচিত বিষয় নিয়ে রচিত। শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে আরো নানা উপন্যাস বর্তমান প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছে। কিন্তু রাজপাটের সঙ্গে ধর্মপাটের এমন সুবিস্তৃত বিশ্লেষণ বোধ হয় বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় এই প্রথম। বিষয় ভাবনার অভিনবত্ব তথা ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার প্রেক্ষাপটে আধুনিক মানুষের সমাজগত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সংকটকে তুলে ধরার প্রয়াস নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য। সর্বোপরি চৈতন্যদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব এই উপন্যাসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাতে উপন্যাসটি যেন হয়ে উঠেছে বর্তমানের প্রেক্ষিতে মধ্যযুগের নবনির্মাণ।

তথ্যসূত্র

১। মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা), ১৯৭১, জয়ানন্দ বিরচিত ‘চৈতন্যমঙ্গল’, নদীয়া খন্ড, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ.১৪।

২। সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), ১৩৯২, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১২০।

৩। মুখোপাধ্যায় শুভঙ্কর (সম্পা.), জানুয়ারী ২০০২, গিরি, সত্যবতী, তিনিই সাহিত্য তাঁরই সাহিত্য, চৈতন্যচিন্তা, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, পৃ. ১৭৪।

৪। সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), ১৩৯২, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, পৃ. ১১৯।

৫। তদেব।

৬। তদেব।

৭। সেন অভিজিৎ, ২০০৮, রাজপাট ধর্মপাট, দেজ পাবলিশিং, পৃ. ২১।

৮। তদেব।

৯। তদেব।

১০। তদেব, পৃ. ১৪৯।

১১। বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, ১৯৮৩, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড, মর্ডান বুক এজেন্সী, পৃ. ১৩৪।

১২। সেন অভিজিৎ, ২০০৮, রাজপাট ধর্মপাট, দেজ, পৃ.২৫।

১৩। সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), ১৩৯২, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রী শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, প্রথম পরিচ্ছেদ, আনন্দ, পৃ. ১১৯।

১৪। সেন সুকুমার (সম্পা.), ১৯৮২ বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, শেষ খন্ড, চতুর্থ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ. ২৪৫।

১৫। তদেব

১৬। তদেব, পৃ. ২৪৪।

১৭। মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা.), জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, নদীয়া-৪, পৃ. ১৪।

১৮। সেন অভিজিৎ, ২০০৮, রাজপাট ধর্মপাট, দেজ, পৃ. ১০৭।

১৯। মজুমদার বিমান বিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা.), ১৯৭১, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, বিজয়-২, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ.২১৮।

২০। সেন অভিজিৎ, ২০০৮, রাজপাট ধর্মপাট, দেজ, পৃ. ১০৭।

২১। তদেব।

২২। তদেব।

২৩। সেন সুকুমার (সম্পা.), ১৯৮২, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, শেষখন্ড, চতুর্থ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ. ২৪৪।

২৪। সেন অভিজিৎ, ২০০৮, রাজপাট ধর্মপাট, দেজ, পৃ. ১০।

২৫। তদেব, পৃ. ৫২।

২৬। তদেব।

২৭। তদেব, পৃ. ১৬০।

চেনা পথ অচেনা পথিক (২০০৯)

নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়

চৈতন্যযুগ ও সমকালীন ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়ের লীলা পুরস্কার প্রাপ্ত উপন্যাস ‘চেনা পথ অচেনা পথিক’। ২০০৯ সালের জানুয়ারী মাসে দেজ পাবলিশার্স থেকে উপন্যাসটি বই আকারে প্রকাশিত হয়। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক গৌড়বঙ্গের সমাজচিত্র ধরতে চাওয়া হয়েছে এ উপন্যাসে। পাঁচশো বছর আগেকার সমাজ ও মানুষ সমগ্র কাহিনীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্য ও গৌড়ের ইতিহাস ঘেঁটে তৈরি হয়েছে উপন্যাসের চরিত্ররা। গৌড়ের দুই অগ্রপুরুষ রূপ ও সনাতন , অন্তরঙ্গ চিকিৎসক মুকুন্দ সেন, বিখ্যাত কাব্যকার মালাধর বসু ও যশোরাজ খান, সেনাপতি গৌরাই মল্লিক, মহাপণ্ডিত গর্গদেব ও রামানন্দ রায়, ধর্মচ্যুত সুবুদ্ধি রায় ও আরও অনেকের জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে এ উপন্যাসের ক্ষুদ্র পরিসরে। বৃহত্তর জনজীবনে বহুবৃত্তিজীবী সাধারণ মানুষ ও কপট ধর্মাচারী ছুঁয়ে গেছেন এ উপন্যাসের ভাষাশরীর।

এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক গৌড়বঙ্গের ছবি। যুগন্ধর সমাজনায়ক চৈতন্যদেব বঙ্গের বিপথগামী আধমরা সমাজকে হরিনামের ঘা মেরে পুনর্জীবিত করতে চেয়েছিলেন এবং বহুলাংশে সফলও হয়েছিলেন। তাঁকে ঘিরেই পরিবর্তিত হচ্ছিল তৎকালীন সমাজ। সামাজিক বিধি-বিধান, জটিল সর্পিল রাজনীতি, ব্রাহ্মণদের আধিপত্য, অত্যাচার, সুলতান হুসেন শাহের ধর্মান্ধতা ও নানাবিধ সামাজিক বিকৃতির মধ্যে পঙ্কজের মতোই প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। সেই সময়ের সংঘাত ও বিদ্বেষ, প্রেম ও ভক্তি, আবেগ ও আকাঙ্খা, ধর্মসংকট ও অরাজকতা উঠে এসেছে এই উপন্যাসে। ধর্মান্ধতার বাতাবরণে কীভাবে জ্ঞান ও ভক্তির আধারে জাতিভেদ প্রথার উর্দ্ধে উঠে সর্বধর্ম ও জাতির সমন্বয়ের মূল সুরটিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য উপন্যাসটি যেন তারই ধারাবিবরণী।

মূলত তদানীন্তন গৌড়ের পথে পথে যেসব মানুষ হেঁটে বেরিয়েছিলেন তাঁদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা- আকাঙ্খা, প্রেম-অপ্রেমের কথামালাই এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয়। প্রেমাশ্রুস্নিগ্ধ চৈতন্যদেবের আধ্যাত্মিক ছায়াশ্রয়ে বসে এইসব মানুষ রচনা করেছেন শান্তির নীড়, প্রেমের অমরাবতী বা নিঃশব্দ বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট। ‘নিবেদন’ অংশে লেখিকার স্বীকারোক্তি “কিছু ইতিহাস ও যুক্তিনির্ভরতা ও কিছু যুক্তিসিদ্ধ কল্পনা, এই নিয়েই পথ চলেছে ‘চেনা পথ অচেনা পথিক’। তৎকালীন সমাজজীবন ও বিশেষত চরিত্রগুলিকে ছোট ছোট ডিটেলে ধরতে যথাসাধ্য প্রয়াস পেয়েছি যাতে পাঁচশো বছর আগেকার মানুষগুলি পাঠক পাঠিকার চোখের সামনে যথাসম্ভব জীবন্ত হয়ে ওঠেন।”[১]

লেখিকার এই স্বীকারোক্তি সত্যিই উপন্যাসটির ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। গৌড়ের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে যে মানুষগুলি, তাদের রাজকীয় পরিচয়ের অন্তরালে রয়েছে যে পারিবারিক পরিচয়, গৌড়দরবারের পদাধিকারীর অন্তরালে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দঃখ, আশা-আকাঙ্খা তা লেখিকার কল্পনার মায়াজালে এক অনবদ্য প্রাণোজ্জ্বল উপন্যাস শিল্পের আকার পেয়েছে। উপন্যাসটি পড়লে তাদের জীবনের একটি সুন্দর নিটোল ছবি কাহিনি আকারে আমাদের সামনে ফুটে ওঠে। এইখানে লেখিকার কৃতিত্ব সত্যিই অনবদ্য।

আমরা দেখতে পাই রাজবৈদ্য মুকুন্দ সেন গৌড়দরবারের চিকিৎসক রূপে সর্বদা রাজা হোসেন শাহ ও তার পরিবারের সেবা-শুশ্রুষার জন্য প্রস্তুত। মুকুন্দ চৈতন্যদেবের একজন বড় ভক্ত ছিলেন। "এঁর অনুজ নরহরি ও পুত্র রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট পার্ষদদের অন্যতম ছিলেন এবং তাঁরা পরবর্তীকালে বাংলার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নেতা ও গুরুরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।"[২] যাইহোক এই রাজবৈদ্য মুকুন্দ সেনের সঙ্গে তার স্ত্রী রমার সুখী দাম্পত্য জীবনের একটি মিষ্টি-মধুর ছবি এঁকেছেন লেখিকা, যেখানে ভক্ত বৈষ্ণব রূপে নয়, শুধুমাত্র এক ব্যক্তির দাম্পত্য প্রেম আজকের পাঠকের রসপিপাসা চরিতার্থ করে সহজেই। উপন্যাসের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি :

"মুকুন্দ সেন আবেগাপ্লুত হয়ে অশ্বশালার দিকে পা বাড়াতেই উত্তরীয়ে মৃদু টান অনুভব করলেন। গৃহিণী ডাকছেন।

কাল সকালে যাবে। এখন এসো খাবার তৈরি। এখনই না খেতে বসলে সব নষ্ট হয়ে যাবে।

গৃহিণীর তাড়নায় বাধ্য ছাত্রের মতী পত্নীর পিছু পিছু রন্ধনশালার ভিতরে প্রবেশ করলেন তিনি। দেখলেন ঝকঝকে পিতলের থালায় উৎকৃষ্ট চালের অন্ন, নালিতা শাকের ব্যঞ্জন ···মশলা সহযোগে মৎসের একটি পদ। ··· সব কাজ সেরে স্বামীর শয্যার একপাশে বসে কবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দ খানি তুলে ধরলেন। পড়তে পড়তে অপূর্ব রসাবেশে চোখ দুটি মুদে এল। ··· মন থেকে কান, কান থেকে সর্বাঙ্গে একি বিচিত্র অনুরণন ছড়িয়ে পড়ছে – পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে

শঙ্কিত ভবদুপযানম।

রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং

পশ্যতি তব পন্থানম।।

মুকুন্দ সেনের মনে হল তিন সন্তানের জননী রমা এখনো যেন এক অপার রহস্যের আধার···।তাঁর কর্মও জীবন সবই এই বধূটির অপার নিষ্ঠার ফল। মন ভরে উঠল কানায় কানায়। ··· বাতায়ন পথে ভেসে আসা চন্দ্রালোকের আভায় বিমুগ্ধ আনন্দে প্লাবিত হলেন মুকুন্দ সেন ও রমা।"[৩]

এইভাবে ব্যক্তি মানুষের প্রেম চিত্রিত হয়েছে ঔপন্যাসিকের কলমে যা আজকের পাঠকের মনকে সহজেই ছুঁয়ে যায়। বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে উপন্যাসে। এসেছে গৌড় নগরীর বাইরে শবর বাসীদের কথা। তাদের জীবনের পরিচয়। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক গৌড়বঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত এই উপন্যাসে তৎকালীন বেশ কিছু মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনে মুক্তিকামিতার এক নিরন্তর প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়েছে। এ বিষয়ে রূপ ও সনাতন, হোসেন শাহের দরবারের দুই প্রধান মন্ত্রী সাকর মল্লিক ও দবির খাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন যে দীর্ঘদিন হোসেন শাহের কর্মচারী রূপে তাঁর নির্দেশ পালন করতে করতে তাঁরা ক্লান্ত, অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে। যদিও এই দুই ভ্রাতা দীর্ঘদিন যাবৎ গৌড়ের প্রধান দুই রাষ্ট্র নায়কের পদ অলঙ্কৃত করে রয়েছেন এবং সুলতানের বিশিষ্ট অমাত্যদের মধ্যে তাঁরা দুজনই প্রধান। একজন 'দবির খাস' আর একজন 'সাকর মল্লিক' যারা পরবর্তীকালে 'চৈতন্যভাগবতে' চৈতন্যের কৃপা পাবার পর রূপ ও সনাতন নামে পরিচিত হয়েছিলেন।'চৈতন্যভাগবতে' রয়েছে :

"শেষ খণ্ডে শ্রীগৌরসুন্দর মহাশয়।
দবীর খাসেরে প্রভু দিলা পরিচয়।।
প্রভু চিনি দুই ভাইর বন্ধ বিমোচন।
শেষে নাম থুইলেন রূপ সনাতন।।"[৪]

বিভিন্ন দপ্তরের জন্য পৃথক পৃথক মন্ত্রী থাকলেও সাকর মল্লিক তাঁদের সবার উপরে বটবৃক্ষের মতো অবস্থান করেন। হুসেন শাহের সর্বময় কর্তৃত্বের পরেই তাঁর স্থান। তাদের ছাড়া সুলতানের রাজকার্য প্রায় অচল। আর একজন হলেন দবীর খাস। "··· দবীর খাস একটি রাজপদের নাম। ··· দবীর মানে লেখক; দবীর ও মুনশী সমার্থ বাচক শব্দ। 'খাস' শব্দের অর্থ প্রধান। সুতরাং 'দবীর খাস' বলতে রাজার প্রধান সেক্রেটারীকে বোঝাত।"[৫] এই দুই প্রধান মন্ত্রী ছাড়া হোসেন শাহের পক্ষে রাজকার্য পরিচালনা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। সুলতানের পরামর্শে রাজকার্য পরিচালনা, একের পর এক যুদ্ধের প্রস্তুতি, সিংহাসন, কোষাগার রক্ষা, তার উপর অনেকসময় সুলতানের অন্যায় কার্য সিদ্ধিতেও সঙ্গদান প্রভৃতি নানবিধ কার্যকলাপে তারা বিপর্যস্ত বোধ করে, মুক্তির অপেক্ষায় দিন গোনে। উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে রয়েছে : "অনেকদিন পর দুই ভ্রাতা মুখোমুখি বসে কথা বলছেন। রাজকার্যের উপরোধে প্রায়শই গৃহে ফেরা হয় না তাদের। ··· রূপ ধীরে ধীরে কথা বলতে শুরু করলেন, তাঁর প্রতিটি শব্দে যেন অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাচ্ছিল। বললেন, দাদা,

রাজকার্য, রাজকার্য আর রাজকার্য! এর বাইরে অন্য কোনো জীবন কি আমাদের কাম্য নয়? আজ সুলতান উড়িষ্যা অভিযান করবেন, কাল তিনি ত্রিপুরা অভিযান করবেন, পরশু তিনি আসামে দ্বিতীয়বার সৈন্য পাঠাবেন। যুদ্ধ জয়ের নেশা তাঁর সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। উগ্রধর্মের প্রতি স্পৃহা, ধ্বংসের বাসনা আর যুদ্ধলিপ্সা! নব নব রাজ্য জয়ের উদগ্রতায় তিনি শেষ হয়ে যেতে বসেছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী বালকের মতো জীবনযাপন করে চলেছি। এতে তো নিজের ওপরেই আস্থা হারিয়ে ফেলছি দাদা।"[৬]

সনাতন রূপের আবেগ সংযত করে তাকে আশার আলো দেখান। তিনি নিবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের কথা বলেন : " তুমি দেখে নিও ভাই, এই নিমাই পণ্ডিতই একদিন সর্বজন পূজ্য হবেন। হয়তো হবেন গৌড়ের ভাগ্যনিয়ন্তা"[৭] রূপের অসন্তোষ থেকে আমরা বুঝতে পারি সুলতানের অধীনে তারা আর থাকতে চাইছিলেন না। মুসলমান নবাবের খামখেয়ালিপনা, বিধর্মী উগ্রতা, মন্দির ধ্বংস, বিগ্রহ নষ্ট, তন্ত্রধর্মের বিচিত্রতা, ধর্মের নামে অবাধ যৌনাচার, বৌদ্ধধর্মের ভণ্ড চর্চা, সুফী দরবেশ, আউল-বাউলদের সঙ্গতিবিহীন সংস্কৃতি সব মিলিয়ে গৌড়ের অরাজকতা এমন পর্যায় পৌঁছে গিয়েছিল যে সেই সমাজের দ্রুত সংস্কার সাধনের জন্য একজন নেতা, একজন কাণ্ডারির প্রয়োজন আশু হয়ে পড়েছিল। আর সেই কাণ্ডারী রূপে গৌড়বঙ্গের সমাজ সংস্কার সাধনে ব্রতী হবেন নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত, যিনি অগণিত মানুষকে এই রুদ্ধশ্বাস অবস্থা থেকে মুক্তির পথ দেখাবেন, এই বিশ্বাস গৌড় বাসীর মনে জেগে উঠেছিল।

সনাতনের মুখে নিমাই পণ্ডিতের কথা শুনে রূপ বলে উঠলেন " আমাদের যেমনই হোক একটি কাণ্ডারির প্রয়োজন। তিনি যত শক্ত হাতে হাল ধরতে পারেন ততই মঙ্গল। তোমাকে আমাকে আমাদের এই গৌড়বঙ্গকে অধ্যাত্ম চেতনা দিয়ে এক সূত্রে গেঁথে দিতে হবে। প্রচার করতে হবে একমাত্র একটিই মন্ত্র। কিন্তু কে শোনাবে সে মন্ত্র? এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তোমার আশার কথা শুনে, আমারও ভরসা জাগছে দাদা। আমি গতরাতে সমস্তক্ষণ প্রার্থনা করেছি। প্রার্থনা করেছি জীবন দেবতার কাছে, সমর্পণ করতে চেয়েছি আমার সমস্ত জ্ঞান গরিমা, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি। আকাঙ্খা করেছি এক অমর্ত্য পাবনী ধারা, যা হবে আমাদের পরতৃপ্তির উৎসধারা, ঈশ্বর নিমাই পণ্ডিতের মধ্য দিয়েই হয়তো বা শান্তি দেবেন আমাদের। নিমাই পণ্ডিতই হবেন ধর্মাশ্রিত এক যুগনায়ক।"[৮] এই রূপ ও সনাতনকে মুসলমান শাসকের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্রের রূপকার হিসাবে গড়ে তুলতেই চৈতন্যের গৌড়যাত্রা। হুসেন শাহের রক্তচক্ষুতেই প্রকৃতপক্ষে সেদিন জন্মভূমি ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে। একসময় চৈতন্যের দ্বারা পরিচালিত সংকীর্তনের প্রবল মাতনে কেঁপে উঠেছিল সমগ্র গৌড়বঙ্গ। জগাই-মাধাইয়ের মতো দুর্বৃত্তও তাঁর প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার করেছিল। যে কোনো সামাজিক ভেদাভেদ অগ্রাহ্য করে তাঁর নেতৃত্বাধীন একত্রিত জনতা কাজীর শাসনকে উপেক্ষা করার সাহস দেখিয়েছিল। এ সবেতেই ভয় পেয়েছিলেন সুলতান। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের অত্যাচার, সুলতানের রাজরোষে পড়ে একদিন নবদ্বীপ ছেড়ে তিনি উড়িষ্যায় হিন্দু

রাজার রাজ্যে সমাদর ও আশ্রয় পেয়েছিলেন। এই হোসেন শাহের প্রধান দুই অমাত্য রূপ ও সনাতনকে যদি রাজানুগত্য থেকে মুক্ত করা যায়, তবে দুটি বড় কার্য সিদ্ধ হবে। এক, হোসেন শাহ দুর্বল হয়ে পড়বেন। দুই, বৈষ্ণব ধর্ম শাস্ত্র অনুশাসনে আবদ্ধ হবে। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায় : " ··· রূপ সনাতনের মনে যে ভক্তি শিখা আপনা হতেই প্রজ্বলিত হয়েছে তাতে ইন্ধন জুগিয়ে হুসেন শাহী জমানায় দ্বিতীয় আঘাত হানার লগ্নি সমাগত। রূপ সনাতনকে স্বীয় প্রভাবে যদি রাজপদের মোহমুক্ত করানো যায় তবে তা হবে ভক্তি ধর্ম প্রসারণের ক্ষেত্রে এক বিজয়।"[৯] এর কারণ স্বরূপ চৈতন্য অন্তরে অনুভব করে " ··· শাস্ত্রশাসিত দেশে শাস্ত্র শাসনের ঝাঁপিতে ভরে দিলেই সে বাণীর অনুলিপি দীর্ঘস্থায়ী হয়। তোমার মুখের বাণীগুলিকে শাস্ত্রের আকারে লিপিবদ্ধ কর। গৌড়ের বর্তমান ভাগ্যনিয়ন্তা যে দুই ভাই তাদের আশ্রয় দাও চৈতন্য। এদের সাত্ত্বিকভাব এদের গড়ে তুলবে অনবদ্য শাস্ত্রকার হিসাবে। সেই শাস্ত্রের বিধান মেনে যুগে যুগে বৈষ্ণব সমাজ পূজা করবে তোমায়। তুমি অবতার প্রাপ্ত হবে চৈতন্য।"[১০]

অবতার বা মহাপুরুষ যে যেভাবেই তাঁকে দেখুক না কেন তিনি শুধু এটুকুই চান শ্রীকৃষ্ণচর্চাকে কেন্দ্র করে যে বৈষ্ণব সমাজ গড়ে উঠেছে তাদের মুখের হরিনাম যেন চিরস্থায়ী হয়। যুগ যুগ ধরে অবক্ষয়ী মানুষের সর্বনাশ রুখতে এই হরিনাম ও বৈষ্ণব বীক্ষা যেন সামাজিক বর্মের কাজ করে চলে। এভাবেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়ে ওঠেন নবযুগের ভক্তিসিক্ত রূপকার, এক সমাজনায়ক। জাগ্রত চৈতন্যের আলোকে পথ খুঁজে চলে আধুনিক মানুষ, আর যুগে যুগে তাদের পথপ্রদর্শক রূপে চৈতন্যদেবের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব সমাজ ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলে।

তথ্যসূত্র

(১) চট্টোপাধ্যায় নন্দিনী, চেনা পথ অচেনা পথিক, দেজ পাবলিশিং, ২০০৯, নিবেদন।

(২) মুখোপাধ্যায় সুখময়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর স্বাধীন সুলতানদের আমল, ভারতী বুক স্টল, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৬০, পৃ-২৭৪।

(৩) চট্টোপাধ্যায় নন্দিনী, চেনা পথ অচেনা পথিক, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৫-১৬-১৭।

(৪) সেন সুকুমার (সম্পা), বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত, আদিখণ্ড, প্রথম অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১১, পৃ- ৪।

(৫) মুখোপাধ্যায় সুখময়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর স্বাধীন সুলতানদের আমল, প্রাগুক্ত, পৃ-২৬৭।

(৬) চট্টোপাধ্যায় নন্দিনী, চেনা পথ অচেনা পথিক, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৫।

(৭) তদেব।

(৪) তদেব, পৃ-৫৮।

(৯) তদেব, পৃ- ১৯৮।

(১০) তদেব।

গোরা (২০১২)

শৈবাল মিত্র

বাঙালি জাতির প্রথম নবজাগরণের অধিনেতা শ্রীচৈতন্য। পাঁচশো বছরের বেশি সময় ধরে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাঙালি ব্যক্তিত্ব। "আজ থেকে একশো বছর আগে উনিশ শতকে এদেশে যাদের নেতৃত্বে 'নবজাগরণ' ঘটেছিল, সেই রাজা রামমোহন রায়, পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দের মতো দশজন মনীষী বাঙালিকে এক শরীরে জুড়লেও বাঙালি জীবনে শ্রীচৈতন্যের তুলনায় তাদের প্রভাব এক দশমাংশেরও কম।"[১] হাজার বছরের বাঙলি জাতির ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ মানুষ শ্রীচৈতন্য। নবদ্বীপে তিনি গৌরাঙ্গ, গৌর, গোরা নামে পরিচিত ছিলেন।

এই গোরা তথা শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়েই শৈবাল মিত্র লিখলেন তাঁর সুদীর্ঘ সর্ববৃহৎ উপন্যাস 'গোরা'। শৈবাল মিত্রের অধিকাংশ উপন্যাসের বিষয় রাজনৈতিক। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় যোগ শুরু হয়। ১৯৬০-এর বছরগুলিতে তিনি ছিলেন তৎকালীন ছাত্র ফেডারেশনের উঠতি নেতা ১৯৬৭তে নক্শালবাড়ি আন্দোলনে যোগ দেন। বিশ শতকের ষাটের দশকে ঔপন্যাসিক শৈবাল মিত্র যে বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, সেখানে ছিল পূর্নায়ত এক মানবিক সমাজ গড়ার তাগিদ-স্বপ্ন। সেখানে শোষন থাকবে না, শাসকের রক্তচক্ষু থাকবে না। শ্রদ্ধা-প্রেম-মনুষ্যত্বই সেখানেই প্রধান। একটা সুন্দর সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন শৈবাল মিত্র। আর সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতেই তিনি প্রেমের ঠাকুর তথাকথিত ষোড়শ শতকে নবজাগরণের উদ্‌গাতা শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে রচনা করলেন তাঁর অমর উপন্যাস 'গোরা'।

উপন্যাসটির ঐতিহাসিক পরিধি বিশাল, কিন্তু এটি প্রথাগত ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। সমসাময়িক বিশ্বসাহিত্যের নব্যধারা অনুসরণ করে লেখক তার আখ্যানের ভেতর বুনে দিয়েছেন ঐতিহাসিক সময়ের এক জটিল স্তরভেদ। গল্প শুরু হচ্ছে অত্যাধুনিক কলকাতার এক নাইটক্লাবে। সেখানে আমাদের পরিচয় হয় এখনকার গোরার সঙ্গে। সে আধুনিক উচ্চবিত্ত ঘরে মানুষ হয়েছে। বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলে। স্কুলের অবশ্য পাঠ্য বইয়ের বাইরে বাংলা সাহিত্যের কিছুই জানে না। ঘটনাক্রমে সে পড়তে শুরু করল রবীন্দ্রনাথের গোরা। মনে হল, প্রায় তারই মতো এক অনির্দিষ্টপরিচয় আত্মবিস্মৃত যুবকের স্বদেশসন্ধানের কাহিনি পড়ছে সে। তার পর এক সময় সে জড়িয়ে পড়ল টেলিভিশনের জন্য নির্মীয়মান এক মেগাসিরিয়াল প্রযোজনার সঙ্গে, যার নাম গোরা, যার বিষয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জীবনকাহিনী।

এই সূত্রেই উপন্যাসে এসেছে চৈতন্যদেবের প্রচলিত জীবনবৃত্তান্তের আখ্যান। সেই আখ্যানে মিলে-মিশে রয়েছে ইতিহাস-অতিকথন-লোকিক ও অলৌকিক কাহিনি। পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বাংলার পটভূমি ও পরিবেশের মধ্যে যে গোরার জন্ম ও উত্থান; তার বিকাশ ও বিচরণ সে সম্পর্কে নিয়ত সচেতন থেকেও গোরাকে মানুষ হিসাবেই আমাদের মাঝখানে আনতে চেয়েছিলেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসে মানুষ নিমাই, ভক্তপ্রেমিক সন্ন্যাসী চৈতন্যের অসাধারণ উদঘাটন ঘটেছে। "ব্যক্তি মানুষ চৈতন্যদেবের আবেগ বিহ্বলতা মেধা-প্রজ্ঞার সঙ্গে সংশোধিত হয়েছে সন্ন্যাসীর জীবনবোধ ও বোধি।"[২] উপন্যাসের মধ্যে অন্য এক চৈতন্যকে অনুসন্ধান করেছেন লেখক – "ভক্তের চোখে চৈতন্য আর ইতিহাসের চৈতন্য, চৈতন্যজীবনের দু'রকম ব্যাখ্যার গভীরে যে অজানা চৈতন্য, যাকে বৈষ্ণব ভক্তরা দেখেনি, ঐতিহাসিকরা এড়িয়ে গেছে, দু'তরফের বিবরণের মাঝখানে যে অন্তর্লীন অচেনা চৈতন্য"[৩] তাঁকেই অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন লেখক। তাই শৈবাল মিত্রের গোরা কোনো আধ্যাত্মিক পুরুষের জীবনী নয়, তিনি প্রেমিক, সাধক, আপনজন; আমাদেরই বোধ-বিবেক-মন-মননের ঘরে তার বাস। আসলে 'চৈতন্য' তো চেতনা সমন্বিত বিষয়, সুচেতনার অধিকারী হলে শাসন-শোষণের অভিলাষে সংসক্ত থাকে না মানুষের মন। সেই 'চৈতন্য' সেই 'Consciousness' কাম্য ছিল চৈতন্য সমসাময়িককালে - আছে আজও। চৈতন্যের (Consciousness) সঙ্গে মুক্তি (emancipation) অমোঘ সংযোগ। চৈতন্য সেই মুক্তিরই দূত। আসলে চেতনা তো মানুষকে প্রমুক্তই করে। গোরা অনুধাবন করেছিল "আপনি আচরি ধর্ম শিখায় সর্বজনে" - বস্তুতপক্ষে গোরার জীবনটাই আচরণীয়। নিজেকে প্রাণবন্ত উদাহরণ রূপে তিনি মানুষের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। চৈতন্যদেবকে হয়তো রাজনৈতিক কারণে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল - কিন্তু চৈতন্য (Consciousness), প্রজ্ঞা - মেধা - মনন তো অবিনাশী : অনিঃশেষ। গোরাও রূপ, সনাতন, দুই রঘুনাথ সহ পার্ষদদের জানিয়ে গেছে, প্রেমভক্তির প্রচার আর্যাবর্ত থেকে আরও পশ্চিমে তক্ষশীলা, গান্ধার হয়ে মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পা নগরের ধ্বংসাবশেষের উপর দিয়ে আরো পশ্চিমে পারস্য উপসাগরের তীরে পৌঁছে যাবে। কারণ – 'পৃথিবী তাকে ডাকছে'।

এই উপন্যাসটি একদিক থেকে অবশ্যই ষোড়শ শতাব্দীর সামগ্রিক ইতিহাসের লিখিত প্রামাণিক দলিল বিশেষ। হোসেন শাহের আমলে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসেরও বিশদ বিবরণ রয়েছে উপন্যাসে। সুলতান আমলের রাজনৈতিক জটিলতা আর ফাঁক ফোকর সবই পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন লেখক। লক্ষ করেছিলেন চৈতন্য সম-সাময়িক কালে শাসকের রক্তচক্ষু শোষণ-শাসন, অত্যাচার। শ্রীচৈতন্যের ভক্তি আন্দোলন যার অবসান ঘটিয়েছিল। লেখক আরো দেখিয়েছেন মুসলিমরা কম-বেশি পাঁচশো বছর বাংলাদেশে রাজত্ব করলেও তাদের মনে সময়সময় একটা ভয় কাজ করত এই যে সন্ন্যাসী আর জাদুকরে বোঝাই প্রজাপুঞ্জ যে কোনও সময়ে মসনদ ছিনিয়ে নিতে পারে। তাই নানা ফতোয়া জারি করে তারা প্রজাদের বাগে রাখতে চাইত। বৈষ্ণবদের দল বেঁধে গান তারা কড়া হাতে দমন করে রাখত। সুলতানরা ভয় পেত এই ভেবে কৃষ্ণ নামের লোকটা যে কোনও মুহূর্তে তাদের মসনদ উল্টে

দিতে পারে। কৃষ্ণকে তারা ভাবত শূদ্রকুলজাত এক লম্পট, বলবান জাদুকর। সুলতানরা নানা পৌরানিক কাহিনি, মহাভারতে কৃষ্ণের কাহিনি শুনত। কিন্তু ইতিহাসবোধ তাদের প্রখর ছিল না বলেই তারা অনেকে বিশ্বাস করত, নিকট অতীতে দাক্ষিনাত্যে অপ্রতিহত প্রতাপশালী যে রাষ্ট্রকূট রাজবংশ, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনের হাত থেকে শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়, সেই রাজবংশের অধিপতি ইন্দ্রের ছেলে কৃষ্ণ, দক্ষিণ-মধ্য-পূর্ব ভারতের একাংশ জুড়ে যে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল, সেই সম্রাট কৃষ্ণ আর ভাগবত এবং মহাভারতের বর্ণিত, ঈশ্বরের দশ অবতারের একজন 'কৃষ্ণ' একই ব্যক্তি। এইভাবে ঔপন্যাসিক ইতিহাসের সঙ্গে কল্পনা, অতি-কথার মিশ্রণে উপন্যাসে তৎকালীন রাজনৈতিক জীবনের জটিল ঘূর্ণাবর্ত রচনা করেছেন। তিনি "চৈতন্যের জন্মের কিছু আগে থেকে গৌড়ের সুলতানদের সূত্রে সমতট, সূক্ষ্ম, বাঙ্গালার মানুষের কাছে বেশি করে কৃষ্ণ তখন পরিচিত হচ্ছিল। সুলতানদের কৃষ্ণ-ভীতি থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল কৃষ্ণের প্রচার। যে মানুষটা যবনদের ভয়ের কারন, স্বাভাবিকভাবে কাফেরদের কাছে সে প্রিয়জন হয়ে উঠছিল।"[৪] সত্যি-মিথ্যে জানার সুযোগ গৌড়ের বেশিরভাগ মানুষ তখনও পায়নি। তারা মজে ছিল মনসার ভাসান গানে, চন্ডীমাহাত্ম্য কথকতায়, পঞ্চ 'ম'-এর মৌতাতে, শিবের গাজনে, যথেচ্ছ ভোগসুখে। তাদের কাছে ধর্ম মানে সমৃদ্ধি। বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকার সহজ উপায়। ক্ষমতাসীনদের কাছাকাছি থেকে তাদের তোষামুদি করাই ধর্ম। ছেঁড়া গায়ের চাদরের মতো এক ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম গ্রহণে সাধারণ মানুষের অসুবিধে হয় না। স্বধর্ম আঁকড়ে যারা পড়ে থাকত, সেই ব্রাহ্মণরা শুধু ধর্মনাশের ভয় পায়। সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও তারাই ছিল সমাজরক্ষা আর রাষ্ট্রশাসনের পুরোভাগে। আর সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্র, তারা জানত না ধর্ম দিয়ে কী করতে হয়, ধর্ম খায়, না গায়ে মাখে! ধর্মরক্ষার তাগিদ তাদের নেই। যখন যা রাজধর্ম, তখন তার পেছনে পুরো গোষ্ঠী দাঁড়িয়ে যায়। জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, সংস্কারাচ্ছন্নতা হিন্দুধর্মের মূল শিকড়টিকে ঘূণ ধরিয়ে দিয়েছিল। চারিদিকে তখন সন্দেহ-সংশয় ও সংস্কার। তন্ত্রসাধনা, দেহসাধনা, আড়ম্বরসর্বস্ব ধর্মের গুপ্তবিদ্যা মানুষের মহতি সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। এইভাবে লেখক তৎকালীন সমাজজীবনের একটি রূপরেখা অঙ্কন করেছেন।

এই উপন্যাসের ভূমিকায় আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন "উত্তর-ঔপনিবেশিক, উত্তর-কাঠামো, উত্তর-আধুনিক ইতিহাসচর্চা ভারতে খানিকটা ষাটের দশকের আন্দোলন থেকেই গতি পায়। নিম্নবর্গীয় দৃষ্টি তারই অঙ্গ, আদি-আধুনিকতার প্রাক্‌ঔপনিবেশিক তত্ত্বতল্লাশেও সেই ভাবনার প্রভাব। শৈবালদার শেষ কাজকে এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা সঙ্গত হবে।"[৫] একসময় সকলেই ভাবত, ইংরেজের হাত ধরেই কলকাতায় আধুনিকতা এসেছিল। তার আগে শুধু মধ্যযুগের অন্ধকার। এখন নবীন ঐতিহাসিকরা ক্রমেই বেশি করে বলছেন যে, বহু অর্থে, ভারতীয় আদি আধুনিকতার জন্ম পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে। অন্তত বাংলাদেশে নাগরিক সংস্কৃতির বহু লক্ষণ চৈতন্য পর্বেই পরিস্ফূট। ঔপনিবেশিক চশমাটা সরিয়ে নিলে গৌড়বঙ্গের আদি-আধুনিক মাহাত্ম্য স্পষ্ট ধরা পড়ে। নগর চাঞ্চল্য, বণিক সজীবতা, ভ্রমণপিপাসা, প্রাদেশিকতা থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর ভারতে সংযুক্তি, মধ্য-নিম্ন বর্গের সামাজিক সচলতা,

কারিগরি পেশা ও বর্ণগুলির সগৌরব অবস্থান, সামাজিক আন্দোলন বৃহৎ সংখ্যক মানুষের স্তর-নিরপেক্ষ অংশগ্রহণ - এইসব অনেক কিছু মিলিয়েই চৈতন্যের সময়ে একধরণের প্রাক্-ঔপনিবেশিক আধুনিকতার উদ্বোধন ঘটেছিল। একুশ শতকে সেই কালপর্বের অর্গলমুক্তি ঘটালেন শৈবাল মিত্র। ইতিহাসের নতুন পাঠকে আর একটু এগিয়ে দেয় এই উপন্যাস। যা নিছক উপন্যাস নয়, চৈতন্যদেবের মতো এক মহাজীবন নিয়ে লেখা এক মহাগ্রন্থ।

বিংশ শতকের ষাটের দশকে যাঁরা নির্মীত হয়েছিলেন, তাঁদের কাছে বোধ হয় চৈতন্যের সমসময় একটা অন্য বিশেষ তাৎপর্যে দেখা দিতে পারে। ন্যায় ও স্মৃতিচর্চায় ব্যস্ত নবদ্বীপে যুগসংকট যত তীব্র হয়, মুক্তির আর্তি যেন তত বাড়ে। অদ্বৈত আচার্য কৃষ্ণের আর্বিভাব চেয়ে হুংকার দেন, শ্রীবাস পন্ডিতেরা আসর জমান, নিত্যানন্দ সাংগঠনিক প্রতিভা নিয়ে আসেন। যবন হরিদাসের মতো অন্তেবাসীরা পংক্তিকে ভেঙে দিতে থাকেন, বাসুদেব সার্বভৌমের মতো পন্ডিতেরা পাণ্ডিত্যকে ভক্তিতে মেলান, আর সেই বুধমন্ডলীর মালা গেঁথে গৌরাঙ্গ এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক শক্তিসমবায়ের জন্ম দেন। ভাবোন্মাদনার ঐক্যে এই সমবায়ের পুষ্টি, কিন্তু যুক্তফ্রন্টে বিরোধও থাকে। অদ্বৈত মহাপ্রভুকে ঘিরে একটি শিবির, আবার নিত্যানন্দ যেন অন্য একটি গোষ্ঠীর যূথপতি। ভঙ্গিতে ও পন্থায় প্রথমাবধি পার্থক্য, পরে ক্রমেই উত্তেজনা বাড়ে। শৈবাল মিত্রের কাছে এই ছবি অপরিচিত ছিল না। তাই তো ভূমিকায় আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় এই অবস্থার সঙ্গে বিংশ শতকের ষাটের দশকের তুলনা করে লিখেছেন – "চৈতন্যের নবদ্বীপ শান্তিপুরে যা ঘটেছিল, বিংশ শতকের ষাটের দশকে বাংলায় কি প্রায় সেই ঘটনাই ঘটে নি? অদ্বৈত-নিত্যানন্দ-বাসুদেব সার্বভৌম - যবন হরিদাসের মধ্যে কি সুশীতল রায়চৌধুরী কানু সান্যাল - সরোজ দত্ত - জঙ্গল সাঁওতালদের পূর্বজরাই ছিলেন না? চৈতন্য বা চারু মজুমদাররা তীব্র ভাবাবেগে অল্প সময়ের জন্য একটা সংযুক্ত শিবির তৈরি করলেও নেতার অকালমৃত্যুতে শিবির বহুধাবিভক্ত হয়ে যায় ভিন্ন ভিন্ন সন্তের বহুধাগামী স্মৃতিতে - এই কি বাংলার ইতিহাসের পুনরাবৃত্ত প্রকরণ?"[৬] উপন্যাসে আরো দেখা যায় ভক্তি আন্দোলনে নবদ্বীপের সঙ্গে বিজয়নগরের সংযুক্তির কথা যখন শৈবাল মিত্র লেখেন, তখন তাঁর অবচেতনে থেকে যায় নকশালবাড়ির সঙ্গে শ্রীকাকুলামের যোগ। জগাই-মাধাইয়ের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়ে যান সমসায়িক কুখ্যাত কোটালদের। তিনি যখন কৃষ্ণভক্তদের সর্বভারতীয় যুক্তমঞ্চ গড়ে ওঠার কাহিনি শোনান, তখন তাঁর মনে পড়ে যায় যে, ষাটের দশকে ভারতীয় রাজনীতিতে একই ভাবে অন্য এক গুরুমন্ত্রে দীক্ষিত বহু মানুষ হঠাৎ কাছাকাছি এসেছিলেন। কৃষ্ণ তো মুক্তিরই আরেক নাম, যে মুক্তি সত্তরের দশকে আসছে ধরে নিয়েছিলেন শৈবাল মিত্র। আর সেই মুক্তিরই জয়গাথা এই উপন্যাস। এইভাবে ষাট-সত্তর দশকের উত্তাল সময়েও চৈতন্য ব্যক্তিত্বের অমোঘ প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং শিল্পীর হাতে চৈতন্য চর্চা নব নব রূপে প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

কাহিনিতে বৈচিত্র্য আনার জন্য এবং কিছুটা বিস্তৃত করার জন্য উপন্যাসিক কাহিনিতে অনেক নতুন নতুন আখ্যান যুক্ত করেছেন। এরকমই একটি আখ্যান হল চৈতন্যের বড় ভাই বিশ্বরূপের রচিত

একটি পুথি যাতে লিখিত ছিল তাদের পারিবারিক ইতিহাস। বিশ্বরূপের পুঁথির সূত্রে আমরা জানতে পারি শ্রীহট্টে পীর বুরহানুদ্দিনের দরগায় এক অলৌকিক গর্ভধারনের কাহিনি। আট সন্তানের মৃত্যুর পর বিশ্বরূপের জন্ম হয়। তার মঙ্গল কামনায় জগন্নাথ সাত বছর আগে সদগুরুর কাছে মন্ত্র নিয়ে ব্রহ্মচর্য পালন করতে থাকেন। এদিকে পীরের কথা মতো প্রথম সন্তানকে বাঁচাতে হলে শচীকে আবার মা হতে হবে। মাজারের সামনে তিনদিন তিনরাত শুধু সিন্নি আর 'আবে জম্‌জম্‌' খেয়ে শচীকে ধর্না দিতে হবে। পুত্রের মঙ্গল কামনায় জগন্নাথ ব্রহ্মচর্য ছাড়তে প্রস্তুত। আবার শচী ও মাজারের গর্ভগৃহে তিনদিন তিনরাত ধর্ণায় থাকতে প্রস্তুত থাকলেনও বটে। তার দু'মাস পরে শচীর শরীরে অন্তঃসত্বার লক্ষণ দেখা দেয়। এই ধরণের কাল্পনিক অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক শৈবাল মিত্র বলেছেন – "রামায়ণ-মহাভরতে রয়েছে, যজ্ঞাগ্নি থেকে আবির্ভূত দেবতার পায়েস খেয়ে অযোধ্যার রাজা দশরথের তিন মহিষী গর্ভবতী হয়েছিলেন। মহাভারতে দ্রুপদ, দ্রৌপদীরও জন্ম হয়েছিল যজ্ঞবেদি থেকে। মাজারের গর্ভগৃহে দৈবপ্রেরিত সিন্নি খেয়ে শচী গর্ভবতী হতে পারে। গর্ভগৃহে জ্বলন্ত প্রদীপের আলো থেকে জীবনের বীজ শচীর গর্ভে নিক্ষিপ্ত হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালে আজও কত অলৌকিক ঘটনা ঘটে চলেছে.... ঈশ্বরের কৃপা থাকলে কি না হয়।"[৭] লেখকের মতে তাই, "... মাজারের মুজাভিরের দেওয়া আবে 'জম্‌জম্‌' আর সিন্নি খেয়ে শচীর গর্ভসঞ্চার হওয়া অসম্ভব নয়। বরং খুবই সম্ভব।"[৮] লেখক গোরার জন্মের যে কারণের কথা বলেছেন তাতে তত্ত্ব বা তথ্যগত কোনো প্রমাণ নেই। উপন্যাসের বর্ণনার মধ্যে লেখকের কল্পনা আসতেই পারে কিন্তু তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।

শৈবাল মিত্র ইতিহাস, মিথ, সমাজবাস্তবতা, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন এবং তার সঙ্গে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিকোণ এমনভাবে মিলিয়েছেন যা প্রতিমুহূর্তে আমাদের ভাবনার জগৎকে আলোড়িত করে। শৈবাল মিত্র তাঁর বিভিন্ন গল্পে ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার আখ্যানকৌশল ব্যবহার করেছেন। 'গোরা' উপন্যাসেও সেই কৌশল ব্যবহার করেছেন আরও নিপুণভাবে। জগন্নাথ মিশ্রের ছেলে প্রতিভাধর নিমাই পন্ডিত যখন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়ে অবতীর্ণ হলেন, তখন লেখকের আখ্যান আর বিশ্বরূপের রহস্যাবৃত পুথিতে আটকে নেই। তখন তা হয়ে গেছে টেলিভিশন মেগাসিরিয়ালের ডজন ডজন পর্বে বিভক্ত চিত্রনাট্য, যা ইতিহাস নয়, ঐতিহ্যবাহী পুরাকাহিনি নয়, ধর্মকথা নয়, তা আধুনিক গনসংস্কৃতির পণ্যবাহী বিনোদন। সেই আধুনিক গণ-আখ্যানের যুক্তিতে প্রাধান্য পেয়েছে বাঙালির জাতীয় পরিচয় নির্মাণে চৈতন্যের ভূমিকা।

চৈতন্যের প্রচেষ্টাতেই বাঙালি খুঁজে পায় তার আত্মপরিচয়। আর সেকথাই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন লেখক এইভাবে - " গৌড়ীয়দের ওপর আমাদের রাজ্যের মানুষের রাগ, ঘৃণা বাড়তে থাকায় তাদের নতুন পরিচয় গড়ে তুলতে পরামর্শ দিয়েছে চৈতন্য। বলেছে, তোমরা গৌড়ীয় নয়, তার চেয়ে আরও বড়ো পরিচয় রয়েছে তোমাদের। গৌড় থেকে রাঢ়, সমতট, মল্লভূম, বরেন্দ্রভূম, সূক্ষ্ম, প্রাগজ্যোতিষ, শ্রীহট্ট, বঙ্গাল নিয়ে যে বাঙ্গালা জনপদ, সেখানে বাঙ্গালরা বাস করে, তোমরা সেখানকার

মানুষ, তোমরা বাঙ্গালী। বঙ্গালের একটা অংশ গৌড়। ... তোমরা যেমন বাঙ্গালী, গৌড়ের মানুষও তেমনি বাঙ্গালী।"[৯]।

ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে চৈতন্য 'গ্লোবালাইজড ম্যান'। সত্যিকার বিশ্বনাগরিক। নেচে গেয়ে, প্রেম ভালবাসা দিয়ে পৃথিবীতে ধর্ম-বর্ণ, জাতপাতহীন যাবতীয় হিংসা-দ্বেষহীন কলুষমুক্ত এক ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি, সেই প্রক্রিয়াতে কিছুটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল বাঙালি জাতি। জীবনের চব্বিশটা বছর নবদ্বীপে কাটিয়ে এমন কিছু মূল্যবোধের বীজ সেখানে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যা পরবর্তীতে পাতা, ফুল, ফলে মহীরুহের চেহারা নিয়েছিল। বদলে দিয়েছিল নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কুলিয়া, ফুলিয়া আর গঙ্গার দুপাশের জনচরিত্র। নবদ্বীপের বৈষ্ণব সমাজে ভদ্রতা, শিষ্টাচারের নতুন বিধি চালু হয়েছিল। সংকীর্তনের জোয়ারে আগেই আলগা হয়ে গিয়েছিল বর্ণ, জাতপাতের গোঁড়ামি। সমবেত লোকজীবনে ফুটে উঠেছিল জাতিচেতনার প্রাথমিক যত লক্ষণ। ঘরের ছেলে প্রিয় নিমাইকেই দেবতার আসনে বসিয়েছিল তারা। গোরাকে স্বয়ং কৃষ্ণ ভেবে নিতে নবদ্বীপের মানুষের তাই অসুবিধা হয় নি। আর তিনি নিজে যে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়েছিলেন, যে প্রেমভক্তির দ্বারা তিনি বিশ্বচরাচরের সমস্ত জীব-জগতকে উদ্ধারে ব্রতী হয়েছিলেন সেই প্রেমভক্তিও গ্লোবালাইজড হয়ে আছে। ঔপন্যাসিকের কথায় "পাঁচশ বছর আগের সেই মানুষটার 'ইডিওলজি' অথবা কৃষ্ণপ্রেম, ... সেই প্রেমধর্মকে রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের নায়কের বিশ্বমানবতা তত্ত্ব, এমনকি রবীন্দ্রনাথের ... গীতাঞ্জলি'র ঔপনিষদিক দর্শনের চেয়ে পৃথিবীর নানা দেশের মানুষ অনেক বেশি আদর করে নিজেদের ব্যক্তি জীবনে আত্মসাৎ করেছে। 'গ্লোবালাইজড' হয়ে আছে চৈতন্যের প্রেমভক্তির তত্ত্ব, সংকীর্তন। ...জাতি হিসাবে বাঙালিকে গড়ে তোলা আর বিশ্বমানবিক মতাদর্শ নির্মাণে বিশেষ ফারাক নেই। দুটোরই জন্ম মানুষের সত্তার উপকরণ প্রেমভক্তি থেকে।"[১০] আসলে বাঙালি জাতি জন্ম থেকেই প্রেমিক আর বিশ্বমানবিক।

আর এই সূত্রেই গোরার ত্রিস্তরের বর্ণনায় লেখকের বক্তব্যকে আর একবার যাচাই করে নেওয়া যায় : "এ যুগের গোরা, রবীন্দ্রনাথের গোরা আর মধ্যযুগের গোরা-ত্রিস্তরের এক বিন্যাসে এ উপন্যাসের ধারাবাহিক কাহিনি বা সিরিয়াল"[১১]। তিন যুগের তিন গোরার মধ্যে এক আশ্চর্য সমন্বয় সাধন করেছেন লেখক। এ যুগের আধুনিক শিক্ষাদীক্ষা ও জীবনযাপনে অভ্যস্ত উপন্যাসের নায়ক গোরা একটি মেগা সিরিয়ালের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে মধ্যযুগের গোরা চৈতন্যের জীবন, আদর্শ ও সেই সময় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে। আবার রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস পড়তে পড়তে সে রবীন্দ্রনাথের গোরার সঙ্গে মধ্যযুগের গোরার মিল খুঁজে পায়। উভয়ের চেহারার, জন্মপরিচয়ের ও কার্যধারার মিল লক্ষ করে। চৈতন্যদেবের 'হরিভক্তিতে নাহি জাত কুলাদি বিচার';'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ'প্রভৃতি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে প্রেমভক্তিদানের আদর্শের সঙ্গে অনায়াসে মিল খুঁজে পাওয়া যায় বিশ শতকের গোরার বিশ্বমানবতাবাদের "আমি আজ ভারতবর্ষীয়, আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার

জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন। ⋯ আজ আমি এমন শুচি হয়ে উঠেছি যে চণ্ডালের ঘরেও আমার অপবিত্রতার ভয় রইল না।"[১২] আর, আমরা দেখতে পাই শৈবাল মিত্রের গোরাও শেষ পর্যন্ত জীবনে বৃহতের সন্ধান পেয়েছে। সে বুঝেছে এই হই-হুল্লোড়, আমোদ-আহ্লাদ আসলে জীবনের একটা Slice বা অংশমাত্র। জীবন অনেক বড় ব্যাপ্ত। 'আপন' থেকে, 'ছোট আমি' থেকে নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে বেরিয়ে আসতে হবে। 'বহু'-র সঙ্গে নিজের অভেদ, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারলেই 'ছোট আমি'-র অহং মুক্তি ঘটে। একালের গোরা বুঝেছে "মানুষকে ভাল না বাসলে গায়ের জোরে তাকে প্রেমভক্তি দেখানো যায় না, প্রেম যেখানে নেই, সেখানে ভক্তি নেই।"[১৩] তাই বন্ধু ঐশী-র সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ায় দুর্গত মানুষদের ত্রাণের কাজে যেতে চায় সে। সেও স্বেচ্ছাসেবী হতে চায়। পৃথিবী জুড়ে যে লন্ডভন্ড চলছে কোটি কোটি দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে চায়। আর গোরার মুখে এ কথা শুনে তার কাকা ত্রিদিবনাথ যেন মনশ্চক্ষে দেখেন – "পাঁচশো বছরের আগের গোরার সঙ্গে কাল থেকে কালান্তরে হেঁটে চলেছে অনেক অনেক গোরা, গোরার মিছিল।"[১৪] ড. সত্যবতী গিরির মতে, " উপন্যাসের এই শেষ কথায় কি আমাদের মনে পড়ছে না গোর্কির কথা। যিনি সাহিত্যে Socialist Realism-এর কথা বলেছেন। সম্পূর্ণ অন্য জগতের একজন অভিজাত উন্নাসিক গোরার এই যে উত্তরণ ঘটল এই উত্তরণই আজকের সমাজে আমাদের কাম্য। যুব সমাজের কাছে কাম্য। এখানে ঔপন্যাসিক তাঁর গোরাকে কিংবা নিজেকেই Socialist Realist করে ফেলেছেন।"[১৫] এইভাবে ঔপন্যাসিকের হাতে চৈতন্যব্যক্তিত্বের নবনির্মাণ ঘটতে থাকে এবং আধুনিককালে চৈতন্যচর্চার ধারা অব্যাহত থাকে।

তথ্যসূত্র

১। মিত্র শৈবাল, ২০১২, গোরা, দেজ পাবলিশিং, পৃ. ৩৫

২। বসু তাপস (সম্পা.), ২০১৪, শ্রীচৈতন্য একালের ভাবনা, বসু, দেবশ্রী, চৈতন্যজীবন ও সাম্প্রতিক দুই উপন্যাস, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৪৯৭

৩। মিত্র শৈবাল, ২০১২, গোরা, দেজ পাবলশিং, পৃ. ৪১

৪। তদেব, পৃ. ৭০

৫। তদেব, পৃ. ১১

৬। তদেব, পৃ. ১২

৭। তদেব, পৃ. ৫১

৮। তদেব

৯। তদেব, পৃ. ৬০৫

১০। তদেব, পৃ. ৪৮৭

১১। তদেব, পৃ. ১৭

১২। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, গোরা, বিশ্বভারতী, পৃ- ৬৬৪

১৩। তদেব, পৃ. ৬২২

১৪। তদেব. পৃ. ৬২৩

১৫। সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর সম্পাদিত, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, গিরি সত্যবতী, আধুনিক বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যজীবনের উপাদান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১, পৃ- ১০৯

ক্ষমা কর হে প্রভু (২০১৩)

রূপক সাহা

শ্রীচৈতন্যদেব যুগসম্ভব মহাপুরষ। একটি বিশেষ যুগের মানসপদ্মে, সমগ্র দেশ ও জাতির হৃৎসমুদ্র মন্থন করে তাঁর আর্বিভাব। তবে তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের প্রভাব কেবল একটি বিশেষ যুগে সীমাবদ্ধ না থেকে তা যুগ-যুগান্তর ধরে প্রবহমান। তাঁর ব্যক্তিত্বের, মহনীয়তার প্রভাব বাংলা কথাসাহিত্যেও সদূরপ্রসারী। তাই তো আজও চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বাংলা কথাসাহিত্যে একের পর এক উপন্যাস, ছোটগল্প রচিত হয়ে চলেছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পাঁচশো পঁচিশ বছর স্মরণে রেখেই তাঁর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে রূপক সাহা লিখলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ক্ষমা কর হে প্রভু'। শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুরহস্য বর্তমানে একটি বহু আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়। অনেকেই এই বিষয় নিয়ে লিখেছেন ঠিকই তবে এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রূপক সাহা যেভাবে উপন্যাস রচনা করেছেন, ঘটনাগুলিকে যেভাবে সাজিয়েছেন তাতে তার যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগের চৈতন্যচরিত কাব্য গুলি যেমন তিনি অনুসরণ করেছেন তেমিন সাম্প্রতিককালের চৈতন্যচর্চার ধারাকেও তিনি উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য উপন্যাসের মধ্যেই তিনি দলিত সম্প্রদায়, মতুয়া সম্প্রদায়, পুরীর দেবদাসী প্রথা, চৈতন্যদেবের মৃত্যু রহস্য নিয়ে গবেষণা যেমন করেছেন তেমনি আবার জয়দেব মুখোপাধ্যায়ের 'কাঁহা গেলে তোমা পাই' রচনা এবং তাঁরও মৃত্যু নিয়ে সরব হয়েছেন। উপন্যাসের চরিত্রগুলি তিনি যেভাবে নির্মাণ করেছেন তাতে তার অসম্ভব শিল্পদক্ষতার পরিচয়ই পরিস্ফূট হয়ে ওঠে।

'ভূমিকা' অংশে লেখক বলেছেন যে হিটলারের জীবনের শেষ সাতটি দিন অবলম্বনে রচিত 'লাস্ট সেভেন ডে'জ অফ হিটলার' বইটি মহাপ্রভুর জীবনের শেষ কয়েকদিনের ঘটনাবলী নিয়ে তাকে উপন্যাস রচনায় প্রাণিত করেছিল। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র গোরা। দলিত পরিবারে ভুবনেশ্বরে বড়ো হয়েছে। পড়াশুনা সূত্রে কলকাতায় এসে দলিত পার্টির আন্দোলনের সঙ্গে সে জড়িয়ে পড়ে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সে কৃতি ছাত্রও বটে। গোরা বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে বলেই চৈতন্যদেবকে নিয়ে সে খুবই কৌতূহলী। চৈতন্যের জীবনকথার সঙ্গে নানা পুরান কাহিনী তার শোনা, এসব বিষয়ে কিছু পড়াশুনাও সে করেছে। আর উপলব্ধি করেছে চৈতন্যের সমকালে উচ্চবর্ণের মানুষের দ্বারা নিম্নবর্গের মানুষেরা নির্যাতিত হত। সেই বর্ণবৈষম্য যে আজও অব্যাহত তা উপলব্ধি করেই গোরা দলিত নিপীড়িত মানুষকে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার জন্যই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করে। উপন্যাসে গোরা সর্বভারতীয় দলিত পার্টির যুবদলের প্রধান সম্পাদক। দলিত সম্প্রদায়ের অধিকার নিয়েই তার আন্দোলন। শ্রীচৈতন্যদেব যেমন দরিদ্র বঞ্চিত অত্যাচরিত দলিত মানুষদের একত্রিত করার চেষ্টা

করেছিলেন উপন্যাসের গোরাও ঠিক তাই। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন "শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন পিছিয়ে পড়া মানুসদের সেভিওর।"[১] গোরাও তেমনি অনগ্রসর দলিত সম্প্রদায়ের জন্যই কাজ করে চলে, আন্দোলনে সামিল হয়। এইভাবে ঔপন্যাসিক চৈত্যদেবের আদলে গোরা চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। এমনকি তাঁর চেহারার সঙ্গেও শ্রীচৈতন্যের চেহারার হুবহু মিল রয়েছে। দেবাংশুবাবুর কথায় "শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি যেভাবে ভিজুয়ালাইজ করেছি, আপনি একজ্যাক্টলি তাই।"[২]

সে নিজে একজন দলিত শ্রেণির মানুষ হয়ে উপলব্ধি করেছে বর্তমান সময়ে উড়িষ্যার সমাজজীবনের কথা। উচ্চবর্ণের মানুষেরাই অন্ত্যজ গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বিভেদ রেখা তৈরি করে এবং তপশিলী জাতির তক্‌মা থাকলেই যে সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়, তা অবলম্বন করেই চাকরী এবং পড়াশুনার ক্ষেত্রে তারা অনেকটাই এগিয়ে গেছে দলিত আদিবাসীদের থেকে। দলিত শ্রেনির মানুষ এ বিষয়টা মেনে নিতে পারছে না। রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়ে গোরা বুঝেছে এসব বিরোধের অবসান দরকার। এ প্রসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় পত্রিকায় 'আধুনিক বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যজীবনের উপাদান' প্রবন্ধে ড. সত্যবতী গিরির বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য :

" আমরা বলতে পারি রূপক সাহার 'ক্ষমা কর হে প্রভু' উপন্যাসে একদিকে মেলানো হয়েছে দলিত আন্দোলন, শ্রীচৈতন্যের সমাজের নিম্নবর্গের মানুষকে মেলানোর আন্দোলন। ... উপন্যাসের গোরা যে দলিত আন্দোলন করেছেন তার মধ্যে কিন্তু অনেক ধরনের সীমাবদ্ধতা আছে, যেভাবে আমরা দলিত আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর যে আন্দোলন তাতে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের উত্থানের জন্য এই যে সংকীর্তন ভিত্তিক সম্মেলনের আয়োজন সেই বিষয় অনেক ব্যাপক ও ব্যাপ্ত ছিল। ... ওই সময়কার মানুষকে মূল্য দেওয়ার, তাঁকে আত্মশক্তিতে শক্তিশালী করে তোলার ও নিম্নবর্গের মানুষকে নিজেদের সম্পর্কে সচেতন করার, উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা শ্রীচৈতন্যদেব যেভাবে করেছিলেন তার ব্যাপকতা অনেক বেশি।"[৩]

ওড়িশার বর্তমান সময়পর্বের রাজনীতি এবং চৈতন্য সমসাময়িক কালের রাজনীতির মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য নেই তা ঔপন্যাসিক দেখাতে সমর্থ হয়েছেন। গোরা লক্ষ করেছে "আশ্চর্য পাঁচশো বছর পরও ঠিক একই ঘটনা ঘটতে চলেছে। একটা নয় একাধিক ঘটনা। জগন্নাথ মন্দিরের পান্ডারা কোনওদিনই মহাপ্রভুকে পছন্দ করেন নি। এখন ওকেও পছন্দ করছেন না কিছু পান্ডা। মহাপ্রভুর বিরোধিতা করেছিলেন ব্রাহ্মণ পন্ডিত ও স্মার্তরা। এখন টিভি চ্যানেলে বসে ওরও নিন্দা করছেন একদল বুদ্ধিজীবী, ও যে ভক্ত সাধু, তা প্রমাণ করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।... গোরা জানতে পেরেছে হোটেল মালিকদের উসকে যাচ্ছে গোবিন্দ সাহু।"[৪]

এইভাবে চৈতন্যদেবের জীবনে যে ঘটনা ঘটেছিল, গোরা নিজের জীবনেও সেইসব সংঘটিত হতে দেখতে পায় আধুনিক জীবন-সমসাময়িক পরিমন্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে। উড়িষ্যার

রাজনীতিতে যেভাবে মহাপ্রভু ঢুকে পড়েছিলেন গোরাও সেই বর্তমান সময়ে উড়িষ্যার রাজনীতিতে ঢুকে পড়ে। "গোরার মনে পড়ল, মহাপ্রভুও রাজনীতির বাইরে থাকতে পারেন নি। ভগবদ্ভজনের মাঝেও তিনি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন।"[৫] রাজা প্রতাপরুদ্র গৌড় আক্রমনের মনস্থ করলে চৈতন্যদেবেরে পরামর্শেই তা থেকে নিরস্ত হন। কারণ চৈতন্যদেব নিজে তাঁর ভক্তদের মারফত গৌড়ের খবরাখবর পেতেন। তিনি হোসেন শাহ এবং রাজার প্রধান অমাত্য গোবিন্দ বিদ্যাধরের চক্রান্তের কথা জানতে পেরেছিলেন। তাই তিনি প্রতাপরুদ্রকে হোসেন শাহের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে বরং রাজা প্রতাপরুদ্রের শক্তিবৃদ্ধির জন্য বিজয়নগর জয়ের দিকে যাত্রায় পরামর্শ দেন। এখানে অবশ্যই চৈতন্যদেবের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় ধরা পড়ে। চৈতন্যদেবের মতো গোরাও উড়িষ্যার রাজনীতিতে ঢুকে পড়ে – "ওড়িশার রাজনীতিতে যে একটা বড়ো পরিবর্তন আসছে, সেটা গোরা বুঝতে পারছে। মোট জনসংখ্যার ছেষট্টি পার্সেন্ট হয় দলিত, না হয় তফসিলি জাতি। এদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলতে পারলে উঁচুজাতের লোকদের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু উঁচুজাতের লোকেরা এদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে রেখেছে।"[৬] তাই গোরা বুঝেছে দলিত মুভমেন্টকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সর্বাগ্রে এদের বিরোধ মেটাতে হবে। না হলে কিছুই করা যাবে না। বিরোধ মেটাতে হলে ওকে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে। অর্থাৎ উড়িষ্যায় গোরাকে থাকতেই হবে।

এই উপন্যাসের আর একটি মাত্রা আছে। যেখানে শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে গবেষণা করতে দেখা যায়। আর একাজে যারা এগিয়ে এসেছে তাদের উপর জগন্নাথ মন্দির ও প্রধান সেবায়েতদের পক্ষ থেকে এসেছে নানা আঘাত, কখনও বা খুন বা খুনের চেষ্টা, কখনও বা দুর্লভ ছবি লোপাট ইত্যাদি নানা ঘটনা উপন্যাসে যুক্ত হয়েছে। উপন্যাসে দেখা যায় জয়দেব এবং উপাসনা দুজনেরই গবেষণার বিষয় চৈতন্যদেব। জয়দেব কলেজ স্ট্রিটের এক প্রকাশনা সংস্থার মালিক। চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে সে রিসার্চে ব্যস্ত গত কয়েকবছর ধরে। পুরীতে সে নিয়মিত যাতায়াত করে তার রিসার্চের কারনে। আর নবদ্বীপের মেয়ে উপাসনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষ করে গবেষণায় আগ্রহী। বৈষ্ণব সাহিত্য নিয়ে তার প্রচুর আগ্রহ। নবদ্বীপের এক আচার্যের উৎসাহে সেও চৈতন্যদেবকে নিয়ে গবেষণা করতে এসেছে কলকাতায়। সে শ্রীচৈতন্যের পুনরাবির্ভাব নিয়ে গবেষণায় উৎসাহী।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ড. সত্যবতী গিরি 'আধুনিক বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যজীবনের উপাদান' প্রবন্ধে বলেছেন : " ... এই যে দ্বিতীয় বিষয় এটা নিয়ে সত্যি সত্যি কোনো গবেষণা হতে পারে? একজন জন্ম নেবেন সে ব্যাপারে পুথি থাকতে পারে। কিন্তু সত্যি জন্ম নিয়েছেন এটা কি হতে পারে? কিন্তু এখানেও কোনো সংশয় নেই। আমারা সবাই 'সোনার কেল্লা' পড়েছি। সেখানে প্যারাসাইকোলজিস্ট গবেষণা করেছেন জন্মান্তর নিয়ে। সুতরাং এ ধরণের গবেষণার চর্চা আছে। বিদেশেও আছে। এদেশেও আছে। এদিক থেকে উপাসনার গবেষণাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।"[৭] সে বিশ্বাস করে পাঁচশো বছর পর মহাপ্রভু পুনরায় মর্ত্যধামে জন্মগ্রহণ করেছেন। জন্মান্তরে বিশ্বাসী উপাসনা তাঁকেই খুঁজে বের করতে চায়।

অন্তর্ধানের পর চৈতন্যদেব যে আবার জন্ম নেবেন সে কথা লিখে গেছেন শ্রীচৈতন্যেরই এক শিষ্য মালিকা গ্রন্থে। ড.সত্যবতী গিরির মতে "এখানে উল্লেখ্য মালিকা সাহিত্যের কবি অচ্যুতানন্দ ওড়িয়া ভাষার কবি। তিনি চৈতন্য সমসাময়িক কবি। অচ্যুতানন্দের কাব্যের নাম হল 'শূন্য সংহিতা'। কিন্তু অচ্যুতানন্দের মালিকা সাহিত্য বলে কোনো পুথি সেই অর্থে পাই না। ... ... মালিকা সাহিত্য কিংবদন্তী। এবং মালিকা সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হল এই যে এর মধ্যে শ্রীচৈতন্যের তিরোধান নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং বলা হচ্ছে শ্রীচৈতন্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।"[৮]

যাইহোক কিংবদন্তী, সাহিত্য, আর কিছুটা ইতিহাসের মেলবন্ধনেই ঔপন্যাসিক এখানে কাহিনী নির্মাণ করেছেন। উপন্যাসে কাহিনী বর্ণনার সূত্রেই আমরা দেখতে পাই ওড়িশার যাজপুর অথবা কেন্দ্রপাড়া (কটকের কাছে) - এই দুটি জায়গা নির্দিষ্ট এই যুগপুরষের পুনরাবির্ভাবের ক্ষেত্রে। উপাসনা সেই জায়গাগুলি নিয়ে যথেষ্ট উৎসাহী। সেই জায়গাগুলি ঘুরে দেখার জন্য সে পুরীগামী ট্রেনে ওঠে। জয়দেবের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিতান্তই আকস্মিকভাবে। জয়দেবও রিসার্চের কারনে, রিসার্চ শেষ করার তাগিদে পুরীর ট্রেনে ওঠে। আর তাকে খুন করার জন্য পিছু নেয় পুরন্দর এবং সেও একই কামরায় ওঠে। আর গোরা ভুবনেশ্বর যায় মায়ের ডাকে। পুরী যাওয়ার ট্রেনে একই কামরায় এই চারজনকে নিয়েই উপন্যাসের ঘটনা ক্রমশ এগিয়ে চলে।

সেই সঙ্গে উপন্যাসে যুক্ত হয়েছে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডা এবং সেবায়েতদের নানা দুর্নীতি, নারী লোলুপতা, অন্যায়, অবিচার, দেবদাসীদের জীবনযাপন, পূজ্যপাদ মোহান্তদের প্রভাব ইত্যাদি - আর এই সব কিছুর উপর ভগবৎভক্তির বাতাবরণ টেনে দেওয়ার মতো ভন্ডামির মুখোশটিকে খুলে দিয়েছেন লেখক। দেখা যায় পুরীতে পাঁচশো বছর আগে চৈতন্যবিরোধী একটা দল সক্রিয় ছিল, এখনও সেই দল বংশপরম্পরায় চৈতন্যবিরোধী কার্যকলাপ করে যায়। লেখক দেখিয়েছেন সেই গোবিন্দ ভোইয়ের চর এখনও পুরীতে চৈতন্যদেবের বিরোধিতা করে চলে।

চৈতন্য অনুগামীদর এই জগৎ থেকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরন্দরদের মতো মানুষদের কাজে লাগায়। পুরীর মন্দিরের পাণ্ডা এবং সেবায়েতরা - মোহান্ত বলে যারা সর্বসাধারণের ভয় ভক্তির উদ্রেক ঘটায় তাদের কাছে চৈতন্যদেবের ভক্ত অনুগামীরা শত্রু বলেই বিবেচ্য। চৈতন্যাদর্শের প্রচার বহুযুগ আগে এইসব ধর্ম ব্যবসায়ীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছিল - আজও করে। চৈতন্যদেবের জনপ্রিয়তায় তারা চিরদিনই রুষ্ট-কুপিত। তাই তো পুরন্দরের মতো মাহেরিদের অবৈধ সন্তানদের তারা ছোটবেলা থেকেই চৈতন্যদেবের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে এবং চৈতন্য বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত করে। এই পুরন্দর বড় হয়ে ওঠে জগন্নাথ মন্দিরের কাছাকাছি ভূগর্ভস্থ এক আশ্রমে, যেখানে দিনের আলো পৌঁছায় না, দিন আর রাতের পার্থক্য বোঝা যায় না। এর উপরে ছিল মাহেরি অর্থাৎ দেবদাসীদের বাসগৃহ যারা সন্ধ্যেবেলায় জগন্নাথ মন্দিরে নৃত্য পরিবেশন করত। পুরন্দরের মতো ছেলেদের আর পাঁচটা ছেলের মতো সুস্থ সামাজিক জীবন অতিবাহিত করার কোনো অধিকার ছিল না। তাদের জীবন পরিচালিত হত

পদ্মনাভদের মতো সুবিধাবাদী ভক্ত প্রতারকদের তত্ত্বাবধানে। হেড কোয়ার্টার্সের নির্দেশে সে খুন করে বেড়ায় চৈতন্যপ্রেমী ভক্তদের। জয়দেবকে খুন করার অভিপ্রায়ে সে কলকাতায় আসে এবং তাকে অনুসরণ করেই পুরীগামী ট্রেনে ওঠে। পুরন্দরের কাছে শেষপর্যন্ত পূজ্যপাদ পদ্মনাভের আসল রূপটি ধরা পড়ে যায়, সে বুঝতে পারে ভক্তির আড়ালে ভণ্ডামির মুখোশ পরে সেই লোকটি তাকে দিয়ে অনেক অন্যায় কাজ করিয়ে নিয়েছে। সে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনায় দগ্ধ হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ধর্মের নামে অধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

উপন্যাসে পর পর আরও কতকগুলি ঘটনা এসেছে মূল কাহিনীকে বিচিত্র, কিছুটা বিস্তৃত করার প্রয়োজনেও। এর মধ্যে উল্লেখ্য চৈতন্যদেবের জীবন নিয়ে ছবি এবং তাতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে গোরাকে অভিনয়ের প্রস্তাব। টুকাই গোরার ছোটবেলার বন্ধু - তার কাছেই সে প্রথম জানায় তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা এবং বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে মানসনেত্রে ভেসে ওঠা ঘটনাবলী কোনও এক জায়গায় গিয়ে সমবিন্দুস্থ হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকে নিজের জীবনে এই অদ্ভুত বিষয় সে লক্ষ করতে থাকে। চৈতন্যদেবের জীবনে যে ঘটনা ঘটেছিল, নিজের জীবনেও সেইসব ঘটনা সংঘটিত হতে দেখতে পায় আধুনিক জীবন সমসাময়িক পরিমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক প্রতিযোগিতা থেকে বিপ্লব যখন গোরাকে সরে যেতে অনুরোধ করে তখন গোরার চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিমাই এবং রঘুনাথের ছবি "শ্রোতা ছেলেটা অনুরোধ করছে ভাই নিমাই, তোমার এই পুঁথি যেন ছাত্রদের কাছে না যায়। তা হলে আমার লেখা পুঁথি কেউ পড়বে না।"[৯]

এইভাবে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অতীতের রূপরেখা রচনা করে লেখক একইসঙ্গে যেমন ষোড়শ শতাব্দীর চৈতন্যজীবন বৃত্তান্তের পুনর্নির্মাণ করেছেন তেমনি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে চৈতন্যদেবের আদলে গোরা চরিত্র নির্মাণ করে সমসময়কে রূপদান করেছেন। বিশেষত চৈতন্যের আদলে এইভাবে গোরা চরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে লেখকের চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা ও রোমাঞ্চপ্রিয়তার অসামান্য পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঁচশো বছর পূর্বে চৈতন্যদেব সমাজের বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করতে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের মধ্যে, উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করতে সকলকে একাসনে প্রতিষ্ঠিত করার যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন পাঁচশো বছর পরে গোরা যেন সেই আন্দোলনকে নতুন মাত্রা দিয়ে আরও এগিয়ে দিয়ে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্ত তথা দলিত বঞ্চিত মানুষদের মধ্যে বিভেদ-বৈষম্য দূর করে তাদের মধ্যে 'রুটি-বেটি'র সম্পর্ক সুদৃঢ় করার চেষ্টা করে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ছেলে চন্দন আর দলিত সমাজের মেয়ে মন্দিরার মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক দেখে গোরা খুশি হয়, আর ভাবে "সমাজে এইসব ছেলের সংখ্যা আরও বাড়ুক। ঝুটা ব্রাহ্মণ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিক। একটা সময় অন্য সম্প্রদায়র সঙ্গে রুটি-বেটির সম্পর্ক ছিল না ব্রাহ্মণদের। তাঁরা অন্য সম্প্রদায়ের গৃহে রুটি স্পর্শ করতেন না। বেটি অর্থাৎ কন্যাদান করতেন না।"[১০] গোরার আরও মনে হয় "জাতপাতের লড়াই ভারতকে শেষ করে দিল। বামপন্থীরা শুধু

কাস্ট স্ট্রাগল অর্থাৎ শ্রেণি সংগ্রামের কথা বলে। মনে করে, শ্রেণি সংগ্রামে জিতলেই জাতপাতের লড়াই বলে আর কিছু থাকবে না। কিন্তু ধারণাটা ভুল। দু'টো লড়াই একসঙ্গে চালাতে হবে। না হলে নৈরাজ্যের অন্ধকারেই ডুবে থাকতে হবে।"[১১]

"পাঁচশো বছর আগে শ্রীচৈতন্যদেব একটা পাঁচিল ভেঙে দিয়েছিলেন। রুটি বেটির রুটির পাঁচিল।"[১২] শূদ্র অশূদ্র সবাই মিলে অষ্টপ্রহর হরিণাম সংকীর্তন করো, তারপর একসঙ্গে পঙ্‌ক্তি ভোজন। গোঁড়া ব্রাহ্মণরা অবশ্যই এসব পছন্দ করেন নি। নানাভাবে বিরোধিতা করে গেছেন। "কিন্তু বৈষ্ণব পরিবারের ছেলে বলেই গোরা জানে, একটা সময় চৈতন্যদেবের এই দর্শন সামাজিক বুনিয়াদকে একটা শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।"[১৩]

গোরা শ্রীচৈতন্যদেবের এই সাম্যের আদর্শই গ্রহণ করেছিল মনে প্রাণে। নবেন্দুবাবুকে গোরা বলেছে "আমাদের প্রজন্মের কাছে শ্রীচৈতন্যদেব গ্রেট। ভাবতে পারো, একটা মানুষ পাঁচশো বছর আগে সাম্যের কথা বলেছেন। পাঁচশো বছর আগে! ... উনিই বিশ্বে প্রথম ... যিনি সাম্যবাদের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।"[১৪] সাম্যবাদ হল সমাজের সকল শ্রেণির একাসনে প্রতিষ্ঠিত করার তথা একই ভাবাদর্শে ভাবিত করার চেষ্টা। আর সত্যাগ্রহ বলতে বোঝায় ন্যায্য অধিকার আদায়ের প্রতিজ্ঞা। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সেই অর্থে বাংলার প্রথম সাম্যবাদী ও সত্যাগ্রহী নেতা হলেন চৈতন্য। কেবল তাই নয়, বাংলার তিনিই প্রথম গণআন্দোলনের রূপকারও বটে। গোরার কথায় – "উনিই প্রথম গণশোভাযাত্রা, গণবিক্ষোভ, গণনাট্য, গণসত্যাগ্রহ, গণসংগীত আর গণসংকীর্তনের প্রবর্তন করেছিলেন। অশিক্ষিত হরিজনদের কোল পেতে দিয়েছিলেন।"[১৫] এ প্রসঙ্গে 'নিমাইচরিত' প্রবন্ধে নিমাইসাধন বসুর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য "শ্রীচৈতন্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল তিনি 'আচণ্ডাল' সকল শ্রেণির মানুষের ধর্ম পালনের সমান অধিকার স্বীকার ও প্রচার করে ধর্মের 'গণতান্ত্রিকরণ' শুরু করেছিলেন।"[১৬]

রূপক সাহার এই উপন্যাসে গোরাও শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় তাঁর আদর্শ অনুসরণে দলিতদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যায় এবং তাদের নিয়ে একটি 'গণসংগঠন' গড়ে তুলতে চায়। নবেন্দুবাবুর কাছে গোরা দলিতদের নিয়ে তার পরিকল্পনার কথা জানায় "আপাতত গণসংগঠন গড়ে তুলতে চাই। দলিতরা যাতে সমাজে সবদিক থেকে সম মর্যাদা পায়, সেটাও আমরা চাই।"[১৭] গোরার মনে হয় সব মানুষের মধ্যে যে একই পরমাত্মা রয়েছে, সেটা উপলব্ধি করাই প্রকৃত সাম্যবাদ। এ কথাই চৈতন্যদেব প্রচার করে গেছেন। তাই গোরার মনে হয় "ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় রেণেসাঁ হয় নি। আসল রেণেসাঁ হয়ে গেছিল ষোড়শ শতাব্দীতেই। চৈতন্যের সময়ে।"[১৮] ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যখন সমাজে চলমানতার গতি রুদ্ধ, বুদ্ধি একান্তই শুষ্ক, বিচ্ছিন্নতা ও উদ্দেশ্যহীনতায় সমাজদেহ যখন পীড়াগ্রস্ত, বৃন্দাবন দাসের কথায় যখন

"সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।

কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে।

বাশুলী পূজায়ে কেহো নানা উপহারে।

মদ্য মাংস দিয়া কেহো যক্ষ পূজা করে।।

নিরবধি নৃত্য-গীত-বাদ্য কোলাহল।

না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল।।"[১৯]

তখন চৈতন্যদেবের উদার প্রেমধর্ম তথা বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলন সমাজদর্শন ও জীবন দর্শনে নতুন মুক্তির পথ দেখায়। আর সেই উদারতায় বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি গতিশীল হয়ে ওঠে। তাই এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে অবশ্যই 'চৈতন্য রেণেসাঁস' বলে অভিহিত করা যায়।

রাজনীতি করতে নেমে গোরা একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝে গেছে, কলকাতায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে বাস করে দলিত মুভমেন্ট করা যাবে না, ওকে বেড়িয়ে আসতে হবে। চৈতন্যদেব স্মার্ত-ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে একসময় নবদ্বীপ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্যের বিরুদ্ধে নবদ্বীপের ব্রাহ্মণরা নানাবিধ অভিযোগ তোলে – "কেহ বলে ভাল ত বৈষ্ণব বলে লোকে।/ব্রাহ্মণ লংঘিতে আইসেন মহা কোপে।।/ কেহ বলে বৈষ্ণব বা বলিব কেমনে।/কৃষ্ণ হেন নামত না বলয়ে বদনে।।/... আমরাও তাঁহারে মারিব সর্বজনে।।/যদি তেঁহো মারিতে ধায়েন পুনর্বার!/ আমরা সকল তবে না সহিব আর।।... এইমত যুক্তি করিলেন পাপীগণ / জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশচীনন্দন।।"[২০] ব্রাহ্মণদের অত্যাচার, দিনের পর দিন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার, রাজার কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ, এমনকি অভিযোগ যে নামসংকীর্তন করে নিমাই রাতের অন্ধকারে মুসলিমদের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করছে ও হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনছে - এইসবের দ্বারা অতিষ্ঠ হয়ে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং নবদ্বীপ ত্যাগ করেন। নিত্যানন্দকে জানান – "দেখ কালি শিখা-সূত্র সব মুণ্ডাইয়া।/ ভিক্ষা করি বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া।। / যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে।/ ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে।।/... এইমতে উদ্ধারিমু সকল ভুবন।।/ সন্ন্যাসীরে সর্বলোকে করে নমস্কার। / সন্ন্যাসীরে কেহ আর না করে প্রহার।/ .... তোমরে কহিনু এই আপন হৃদয়।/ গারিহস্ত সব মুঞি ছাড়িব নিশ্চয়।"[২১] তবে মহাপ্রভু সর্বজীবে প্রেমদান, দীন-দুঃখি-দরিদ্র-বঞ্চিত অবহেলিত মানুষকে উদ্ধারের বৃহৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থতার জন্যও সন্ন্যাসের সিদ্ধান্ত নেন।

নিমাই-এর নগরসঙ্কীর্তন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের কারণ ঘটাতে পারে এই আশঙ্কায় সুলতান হুসেন শাহ তাঁকে অভিযুক্ত করতে পারেন এবং রাজরোষে নিমাইয়ের সুকঠিন শাস্তিও হতে পারে এই ভয়ে অদ্বৈতাচার্য নিমাইকে দ্রুত নবদ্বীপ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন – "ওকে এখানে থেকে দ্রুত সরিয়ে দেওয়া দরকার। নবদ্বীপ... শুধু নবদ্বীপই বা কেন... সমস্ত গৌড় এখন ওর পক্ষে নিরাপদ নয়। এমন কোনও জায়গায় ওকে পাঠিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যেখানে সুলতান হুসেন শাহর হাত পৌঁছবে না।"[২২]

তিনি আরও বলেন "ওকে আমি উৎকলে পাঠিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছি। ওখানে হিন্দু রাজত্ব। গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্রদেব অত্যন্ত বিক্রমশালী। তাঁকে ঘাটানোর সাহস নেই সুলতান হোসেন শাহর।"[২৩] অপরদিকে দেখা যায় রাজনীতির কারণে কলকাতা যখন গোরার কাছে নিরাপদ নয়, দলিত পার্টির প্রধান অদ্বৈতবাবু ফোন করে গোরাকে নিষেধ করেন কলকাতায় ফিরতে। "তারপর অদ্বৈতবাবু বললেন, তোমার এখন কলকাতায় আসার দরকার নেই গোরা। আপাতত তুমি ভুবনেশ্বরেই থাকো। তোমার পক্ষে কলকাতা আর নিরাপদ নয়।"[২৪] এভাবেই অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সাদৃশ্য রচনা করা হয়েছে। চৈতন্যের পুনর্জন্ম স্বরূপ গোরা চরিত্র রচনা করে লেখক উভয় চরিত্রের মধ্যে এক আশ্চর্য সমাপতন রচনা করেছেন।

আবার অন্যদিকে এই উপন্যাসের যে আরেকটি মাত্রা রয়েছে যেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে গবেষণা করতে দেখা যায় জয়দেবকে যেখানে জয়দেবের হাতে শ্রীচৈতন্যদেবের এমন একটি ছবি এসে পড়ে যা সকলের মধ্যে আলোড়ন ফেলে দেয়। লেখক তাই উপন্যাসে গোকুলানন্দের আঁকা চারটি ছবির উল্লেখ করেছেন। গোকুলানন্দ দাস ওরফে জামিল ফেরদৌস ছিলেন মোগল দরবারের একজন নামি চিত্রকর। তারই সন্ন্যাসোত্তর জীবনের নাম গোকুলানন্দ দাস। তিনি পরপর মহাপ্রভুর চারটে ছবি এঁকেছিলেন। দুটো ছবি মহাপ্রভুর জীবিত অবস্থায়, বাকি দুটো তারপরে। মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের পর তিনি গোপনে বৃন্দাবনে চলে যান। সেখানেই বাকি দুটি ছবি আঁকেন। মহাপ্রভুর গৌড়ীয় শিষ্যদের কাছে ঐ ছবি দুটি নাকি মহাপ্রভুর হত্যাকাণ্ডের প্রামান্য দলিল। কলকাতার মিউজিয়াম থেকে বের করে সুশোভনদা জয়দেবকে যে ছবিটি দেয় সেটি গোকুলানন্দের আঁকা চারটে ছবির সিরিজে দ্বিতীয় ছবি। ছবির বিষয়বস্তু হল, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব শুয়ে আছেন। তাঁর পায়ের সামনে হাত জোড় করে বসে আছেন রাজবেশে একজন। ইনি নিশ্চয়ই গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র। মহাপ্রভুর আশেপাশে তাঁর কয়েকজন শিষ্য। ছবিটা দেখে জয়দেবের মনে হয়, রথযাত্রার সময় মহাপ্রভু রাস্তায় ইঁটের টুকরোর আঘাত পেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এটা জানতে পেরেই হয়তো রাজা প্রতাপরুদ্র তাকে দেখতে এসেছিলেন। যাইহোক, জামিল ফেরদৌসের আঁকা শেষ দুটো ছবি পাওয়া গেলে এই রহস্যের কিনারা সম্ভব বলে মনে করেন সুশোভনদা এবং জয়দেব। সেই ছবি দুটি উড়িষ্যাতেই পাওয়া যাবে বলে তাদের ধারণা।তবে এই ধরনের কোনো ছবির উল্লেখ চৈতন্যচরিত কাব্যগুলিতে পাওয়া যায় না। মহাপ্রভুর তিরোধানের পর প্রায় একশো বছর, ওড়িশায় তাঁর সম্পর্কে কেউ কোনও উচ্চবাচ্য করেননি। বৈষ্ণব সম্প্রদায় এত আতঙ্কিত হয়েছিলেন যে, ওড়িশার সর্বত্র হরিনাম সংকীর্তন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

ঔপন্যাসিক এখানে জয়দেবের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যদেবের মৃত্যুর কারনও বর্ণনা করেছেন নিপুণভাবে। এক্ষেত্রে তিনি কেবল বাংলা চৈতন্যচরিতকাব্যই নয় ওড়িয়া ভাষায় রচিত চৈতন্যচরিত কাব্যগুলিও অনুসরণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন মহাপ্রভুর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে জীবনীকাররা কেউ একমত হতে পারেন নি। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন কারণ বর্ননা করেছেন। লেখক প্রথম ওড়িয়া কবি মাধব পট্টনায়কের কথা উল্লেখ করেন। এই মাধব পট্টনায়ক ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ওড়িয়া

চৈতন্যভক্ত। তিনি চৈতন্যদেবকে নিয়ে দু'খানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন – 'চৈতন্যবিলাস' এবং 'বৈষ্ণবলীলামৃত'। 'চৈতন্যবিলাস' এর নবম অধ্যায়ে কবি মাধব পট্টনায়ক কীভাবে চৈতন্যদেবের তিরোধান ঘটে এবং তাঁর মরদেহ কোথায় সমাধিস্থ করা হয় তার বিশদ তথ্য দিয়েছেন। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্ষয় তৃতীয়ার দু'দিন আগে শ্রীচৈতন্য কীর্তনের সময় নৃত্যরত অবস্থায় বাম পায়ের বড় আঙ্গুলে রাস্তায় পড়ে থাকা ইঁটের টুকরোয় বেশ আঘাত পান এবং পথের ওপরেই মূর্ছিত হয়ে পড়েন। কীর্তনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন জগন্নাথ দাস, কাশীশ্বর মিশ্র, যশোবন্ত দাস, শ্রীবৎস আর অনন্ত দাস। তাঁরাই কাঁধে করে মহাপ্রভুকে জগন্নাথ মন্দিরের উত্তর মন্ডপে নিয়ে যান। ঐখানে সারাক্ষণ তাঁর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন জগন্নাথ দাস। পরের দিন তাপ আসে আর অসুস্থতা বৃদ্ধি পায়। মন্দিরের মধ্যেই তাঁর সেবা-শুশ্রুষা চলে। তারপর দিন অর্থাৎ অক্ষয়তৃতীয়ার দিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীচৈতন্য দেহত্যাগ করেন।

মাধব পট্টনায়কের অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন বাঙালি চৈতন্যচরিতকার জয়ানন্দ। জয়ানন্দের মতেও রথযাত্রার সময় ইঁটের আঘাতে মহাপ্রভুর পায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ক্ষত বিষাক্ত রূপ নেয়। সম্ভবত রক্তে মাত্রাতিরিক্ত শর্করার কারণে গ্যাংরিন থেকে নিমাই মারা যায় – "আষাঢ় বঞ্চিতা রথ বিজয় নাচিতে।/ ইটাল বাজিল বাম পায় আচম্বিতে।।... / চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠী দিবসে। / সেই লক্ষে টোটায় শয়ন অবশেষে।।/ পণ্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব্বকথা। / কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা।।"[২৫]

আবার, লোচনদাস, দিবাকর দাস, অচ্যুতানন্দ প্রমুখ জগন্নাথ মূর্তিতে চৈতন্যদেবের বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন। বৃন্দাবন দাস বলেছেন কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হয়ে মহাপ্রভু জগন্নাথকে স্পর্শ করতে মন্দিরে প্রবেশ করেন এবং তারপরই 'জগন্নাথ পরশিয়া হৈলা অন্তর্ধান'। 'চৈতন্যচরিতামৃত' প্রণেতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব। আবার কর্তাভজা সম্প্রদায় ঘোষনা করেছে স্বয়ং চৈতন্যদেবই তাঁদের আউলিয়া চাঁদ। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোধানের কারণ সম্পর্কে প্রত্যেক চৈতন্যচরিতকারই ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। তবে আধুনিক ব্যাখ্যাকারদের মতে মাধব পট্টনায়ক শ্রীচৈতন্যের তিরোধান সম্পর্কে যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তা কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। কারণ মাধব পট্টনায়ক স্বয়ং এই নিদারুণ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। শ্রীরায় রামানন্দের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করার স্বার্থেই মাধব পট্টনায়ক শ্রীচৈতন্য তিরোধান রহস্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের কারণ সম্পর্কে যেমন কেউ একমত নন, তেমনি তিরোধানের স্থান ও সময় নিয়েও মতভেদ রয়েছে। ঔপন্যাসিক রূপক সাহা সংক্ষেপে অথচ নিপুণভাবে সেগুলি উল্লেখ করেছেন। লেখক যে সূত্রগুলি উল্লেখ করেছেন আমরা সেগুলিই চৈতন্যচরিতকাব্যগুলি অনুসরনে বিশদে আলোচনা করছি। বিমানবিহারী মজুমদার তাঁর 'শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান' গ্রন্থের এক জায়গায় বলেছেন যে ওড়িয়া ভক্তদের মতো শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব ঘটেছিল বৈশাখ মাসেই। মাধব পট্টনায়ক অক্ষয় তৃতীয়ার কথা বলেছেন অর্থাৎ বৈশাখ মাস। ঈশ্বর দাস তাঁর 'চৈতন্যভাগবত'-এ অক্ষয় তৃতীয়ায় মহাপ্রভুর তিরোধান বলেছেন। বঙ্গীয় চৈতন্যচরিতকার জয়ানন্দ এবং লোচন দাস আবার শ্রীচৈতন্য তিরোধানের সময়

হিসাবে আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী বলে খ্যাত চৈতন্যচরিতকার বৈষ্ণব দাস তাঁর কড়চায় সপ্তমী তিথির পরিবর্তে পূর্ণিমা তিথির উল্লেখ করেছেন। লোচনদাস লিখেছেন –

"আষাঢ় মাসের তিথি সপ্তমী দিবসে।

নিবেদন করে প্রভু ছাড়িয়া নিশ্বাসে।।"[২৬]

আবার জয়ানন্দ বলেছেন –

"আষাঢ় বঞ্চিতা রথ বিজয় নাচিতে।

ইটাল বাজিল বাম পায় আচম্বিতে।।"[২৭]

বঞ্চিত অর্থাৎ পঞ্চমী। আষাঢ় মাসের পঞ্চমী তিথিতে রথযাত্রার সময় নাচতে নাচতে ইঁটের আঘাতে জখম হয়েছিল শ্রীগৌরাঙ্গের বাম পা। এই ক্ষতস্থান বিষিয়ে উঠে ভয়ানক যন্ত্রনা আরম্ভ হয় ষষ্ঠী তিথিতে, তখন জ্বরের ঘোরে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন টোটা গোপীনাথে।

"চরণে বেদনা বড় ষষ্ঠী দিবসে।

সেই লক্ষে টোটায় শয়ন অবশেষে।।

পন্ডিত গোসাঞিকে কহিল সর্ব্বকথা।

কালি দশ দণ্ড রাত্রে চলিব সর্ব্বথা।"[২৮]

'কালি দশ দণ্ড রাত্রে' অর্থাৎ সপ্তমী তিথিতে টোটা গোপীনাথেই শায়িত অবস্থায় চৈতন্যদেব চলে গেলেন বৈকুন্ঠে। তাঁর মায়ার শরীর পড়ে রইল।

"মায়ার শরীর থাকিল ভূমে পড়ি।

চৈতন্য বৈকুন্ঠ গেলা জম্বুদ্বীপ ছাড়ি।।"[২৯]

সুতরাং শ্রীচৈতন্য যে লীন হননি জগন্নাথের মধ্যে, তাঁর সে সেপটিক্ ফিভারে বা ধনুষ্টঙ্কার জাতীয় রোগে মৃত্যু হয়েছিল এবং মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহ পড়েছিল টোটা গোপীনাথে সেটুকু স্পষ্টভাবেই এবং তখনকার দিনেও বেশ সাহসিকতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে গেছেন কবি জয়ানন্দ। অবশ্য এই কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ কর্তৃক আবার তিনি নিন্দিত। জয়ানন্দ ও মাধব পট্টনায়ক উভয়েই চৈতন্যদেবের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে একমত। তবে চৈতন্যের মৃত্যুর সময় ও স্থান সম্পর্কে দুই কবি ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। মাধব পট্টনায়ক বলেছেন শ্রীচৈতন্যের মৃত্যু হয়েছিল অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অর্থাৎ বৈশাখ মাসে; আর জয়ানন্দের মতে আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে শ্রীচৈতন্য দেহত্যাগ করেন। মাধব পট্টনায়কের মতে অসুস্থ অবস্থায় জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যেই প্রভুর সেবা - শুশ্রুষা চলে। আর জয়ানন্দ বলেছেন প্রভু অসুস্থ অবস্থায় আশ্রয়

নেন টোটা গোপীনাথে এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় – 'সেই লক্ষে টোটায় শয়ন অবশেষে'।[৩০] লোচন দাস বলছেন গুন্ডিচায় তিনি জগন্নাথের সঙ্গে মিশে গেলেন – 'গুঞ্জাবাড়ির মধ্যে প্রভুর হৈল অদর্শন'।[৩১] বৈষ্ণব দাস জগন্নাথ মন্দিরে চৈতন্যের মৃত্যু ঘটার কথা বলেছেন। নরহরি দাস লিখেছেন টোটা গোপীনাথ মন্দিরের কাছাকাছি এক বাড়িতে। ঈশান নাগর আবার লিখেছেন, মহাপ্রভু একদিন জগন্নাথ মন্দিরের ভেতর ঢোকার পরই মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়।

একই ঘটনার উল্লেখ করে বৃন্দাবন দাসও লিখেছেন যে একদিন দ্বিপ্রহরে মহাপ্রভু ভাবে উন্মাদ হয়ে জগন্নাথ বিগ্রহকে আলিঙ্গন করতে গিয়েছিল। আর তা ছিল অমার্জনীয় অপরাধ। তাই লাঠি হাতে পান্ডারা তাঁকে প্রতিহত করার চেষট্টা করেন। কিন্তু প্রভু পান্ডাদের নিষেধ অমান্য করে মন্দিরের ভেতর প্রবেশ করেন। চৈতন্যভাগবতে রয়েছে -

"এত বলি শ্রীদেউলে প্রবেশ কৈল নাথে।

পরিছাবোলে - কোথা যাহ বলহ সন্ন্যাসী।।

প্রভু কহে জগন্নাথ পরিশয়া আসি।।

রহ রহ - বোলে সভে বেত্র লয় করে।

নিষেধ না শুনি প্রভু চলিলা ভিতরে।।"[৩২]

এই পর্যন্ত বলেই থেমে গেলেন বৃন্দাবন দাস। তারপর বললেন যে দারুময় জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করেই জগন্নাথে বিলীন হয়ে যান শ্রীচৈতন্য -

"জগন্নাথ পরশিয়া হৈলা অন্তর্ধান।

দেখিতে না পায় প্রভু গেলা নিজ স্থান।"[৩৩]

বৃন্দাবন দাসের মতো লোচন দাসও মহাপ্রভুর জগন্নাথে বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা বলেছেন -

"তৃতীয় প্রহরে বেরা রবিবার দিনে।

জগন্নাথ লীন প্রভু হইলা আপনে।।"[৩৪]

তৃতীয় প্রহর বেলা মানে তিনটে/চারটে, ওই সময় মহাপ্রভু জগন্নাথের মূর্তিতে বিলীন হলেন। জয়ানন্দ বললেন দশ দন্ডের কথা। বৈষ্ণবচরণ দাসও অনুরূপ সময় নির্ধারণ করেছেন। অর্থাৎ তৃতীয় প্রহর থেকে দশদণ্ড - বেলা ৩/৪ টা থেকে রাত ১০/১১ টা - এই সময়ের মধ্যে যা কিছু ঘটার ঘটে গেল এবং সম্ভবত এই দীর্ঘ সাত ঘন্টা ধরে মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। লক্ষ করার বিষয় যে, পুরীর মন্দিরের দরজা বন্ধ হওয়ার ঘটনা ওই প্রথম। এ প্রসঙ্গে ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'চৈতন্য এ্যান্ড হিজ এজ' গ্রন্থে সন্দেহ প্রকাশ

করেছেন – " If he left the world at about 4 p.m. the doors, we know, were kept closed till 11PM - this time was taken for burying him and repairing the floor after burial. The priests at 11PM opened the gate and gave out that Chaitanya was incorporated with the image of Jagannath. So accordingly to one account he passed away at 11p.m but better informed people know that he passed away at 4p.m. when the doors were closed."[৩৫]

যদিও ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ড. নীহাররঞ্জন রায় এবং ড. জয়দেব মুখোপাধ্যায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে চৈতন্যদেবকে পুরীতেই গুম খুন করা হয়েছিল তবে এ বিষয়ের তথ্য প্রমাণগুলি অনুমানমাত্র। লেখক ঔপন্যাসিক রূপক সাহা একদিকে যেমন এই বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন অপরদিকে এটি যে বৈষ্ণব সমাজের অপপ্রচারও হতে পারে সেই বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। তিনি চৈতন্যচরিতকার অচ্যুতানন্দের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে লিখেছেন "উনি কোথাও লিখে যান নি, চৈতন্যদেবকে খুন করা হয়েছিল। এটা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের অপপ্রচার। আসলে চৈতন্য দেবের জীবনের শেষদিকে.... তাঁকে ঘিরে ছিল ওড়িয়া শিষ্যরাই। সেটা নবদ্বীপের বৈষ্ণবরা সহ্য করতে পারতেন না। ওঁরা সেই সময় মহাপ্রভুকে পরামর্শও দিয়েছিলেন, পুরী থেকে নবদ্বীপে ফিরে যেতে। মহাপ্রভু ওঁদের কথা শোনেন নি। সম্ভবত সেই বিরাগ থেকেই অপপ্রচারের জন্ম।"[৩৬]

এইভাবে লেখক রূপক সাহা খুবই দক্ষতার সঙ্গে চৈতন্যদেবেরে মৃত্যু রহস্য সম্বন্ধে একটি গবেষণাধর্মী উপন্যাস রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি একদিকে যেমন বাংলা ও ওড়িয়া ভাষায় রচিত সমস্ত চৈতন্যচরিতকাব্যগুলি অনুসরণ করেছেন তেমনি সাহিত্য সমালোচক, ঐতিহাসিক প্রমুখদের মতাদর্শও অনুসরণ করে বিষয়টিকে উপন্যাসের আকারে একটি শিল্পিত রূপ দিয়েছেন। আবার চৈতন্যদেবেরে আদলে গোরা চরিত্র নির্মাণ করে লেখক বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে চৈতন্যজীবন বৃত্তান্তেরই পুনর্নির্মান করেছেন। এইভাবে 'ক্ষমা কর হে প্রভু' উপন্যাসটিতে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের নবনিরীক্ষণ সার্থকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। সাহা রূপক, ক্ষমা কর হে প্রভু, দীপ প্রকাশন, ২০১৩, পৃ. ৫১

২। তদেব

৩। সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর সম্পাদিত, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, গিরি সত্যবতী, আধুনিক বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যজীবনের উপাদান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১, পৃ- ১০৫

৪। সাহা রূপক, ক্ষমা কর হে প্রভু, দীপ প্রকাশন, ২০১৩,পৃ. ৪৬২

৫। তদেব

৬। তদেব, পৃ. ১৮৪

৭। সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর সম্পাদিত, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, গিরি সত্যবতী, আধুনিক বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যজীবনের উপাদান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১, পৃ- ১০১

৮। তদেব, পৃ-১০২

৯। সাহা রূপক, ক্ষমা কর হে প্রভু, দীপ প্রকাশন, ২০১৩, পৃ. ৩৭

১০। তদেব, পৃ. ১০৭

১১। তদেব

১২। তদেব

১৩। তদেব, পৃ. ১০৮

১৪। তদেব, পৃ. ২০৪

১৫। তদেব,

১৬। মুখোপাধ্যায় শুভঙ্কর (সম্পা.), চৈতন্যচিন্তা, বসু নিমাইসাধন, নিমাইচরিত, জানুয়ারী ২০০২ , পৃ. ৩০।

১৭। সাহা রূপক, ক্ষমা কর হে প্রভু, দীপ প্রকাশন, ২০১৩, পৃ. ২০৪

১৮। তদেব

১৯। সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, আদিখন্ড, দ্বিতীয় অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ. ৬।

২০। তদেব, মধ্যখন্ড, পঞ্চবিংশ অধ্যায়, পৃ. ২০৩

২১। তদেব, পৃ. ২০৪

২২। সাহা রূপক, ক্ষমা কর হে প্রভু, দীপ প্রকাশন, ২০১৩, পৃ. ১৮৭

২৩। তদেব।

২৪। তদেব, পৃ. ১৮৮।

২৫। মজুমদার বিমান বিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা.), ১৯৭১, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, উত্তরখন্ড, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ২৩৪।

২৬। ঘোড়ই বিশ্বরঞ্জন (সম্পা.), লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, অতিরিক্ত পাঠ, ২০০০, সাহিত্যলোক।

২৭। মজুমদার বিমান বিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা.), ১৯৭১, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, উত্তরখন্ড, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, পৃ. ২৩৪।

২৮। তদেব

২৯। তদেব

৩০। তদেব

৩১। ঘোড়ই বিশ্বরঞ্জন (সম্পা.), লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, অতিরিক্ত পাঠ, ২০০০, সাহিত্যলোক

৩২। সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, অন্ত্যখন্ড, দ্বাদশ অধ্যায়, পৃ. ৩০৭

৩৩। তদেব

৩৪। ঘোড়ই বিশ্বরঞ্জন (সম্পা.), লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, অতিরিক্ত পাঠ, ২০০০, সাহিত্যলোক

৩৫। Sen Dinseh Chandra, Chaitanya and His Age, University of Calcutta, 1922, p. 264.

৩৬। সাহা রূপক, ক্ষমা কর হে প্রভু, দীপ প্রকাশন, ২০১৩, পৃ- ২১৩।

পানিহাটা (২০১৪)

সাধন চট্টোপাধ্যায়

যুগস্রষ্টা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই মহামানবের পুন্য আবির্ভাব ও ধর্মীয় আদর্শ প্রচারের ফলে বঙ্গদেশে ধর্মীয় ও সামাজিক আচার আচরণে গোঁড়ামি, সমাজচেতনা, মানবতার মূল্যবোধ, বঙ্গসাহিত্যে সরসতা, ভক্তিবাদের প্রাবল্য, সামাজিক সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রয়াস দেখা যায়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই বাঙালি মহামানব শ্রীচৈতন্যদেব পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী নবদ্বীপে আবির্ভূতহয়েছিলেন। কেবল নবদ্বীপ নয় দেশের বৃহত্তম অংশে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসার এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে উদ্ধারের বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত চৈতন্যদেব ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। জননীর অনুরোধ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনে না থেকে নীলাচলে থাকলেন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মাতার অনুমতি নিয়ে পুরী গমন করেন। ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন। দীর্ঘ চার বছর পর ১৫১৪ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে বিজয়া দশমী তিথিতে জননী, জাহ্নবী দর্শন ও বৃন্দাবন গমনের উদ্দেশ্যে বঙ্গদেশে যাত্রা করেন। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা অনুযায়ী মহাপ্রভু প্রথমে বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতি মিশ্রের ঘরে উপস্থিত হলেন। বিদ্যাবাচস্পতির বাড়িতে বিপুল জনসমাগম হতে থাকায় চৈতন্য কুলিয়ায় মাধব দাসের বাড়িতে আত্মগোপন করেন, কিন্তু খবর রটে যাওয়ায় নবদ্বীপ থেকে আসা দর্শকদের ভিড় সেখানেও বাড়তে থাকে। চৈতন্যদেব গঙ্গার তীর ধরে মথুরা গমনের উদ্দেশ্যে গৌড়ের অভিমুখে চললেন। এইভাবে তিনি ও তার সঙ্গীরা এসে পৌঁছান গৌড়ের নিকট রামকেলি গ্রামে। সেখানে তিনি বেশ কয়েকদিন থাকেন এবং রূপ-সনাতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর সনাতনের অনুরোধে তিনি বৃন্দাবন যাত্রা না করে পুরীতে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। নীলাচলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে মহাপ্রভু শান্তিপুরে এলেন অদ্বৈত আচার্যের গৃহে। যেখানে শচীমাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখানে কিছুদিন কাটানোর পর তিনি কুমারহট্টে শ্রীবাসের বাড়িতে উপস্থিত হন। সেখানে সকলের সঙ্গে কীর্তনানন্দে কাটিয়ে তিনি পানিহাটিতে রাঘব পন্ডিতের গৃহে উপস্থিত হয়ে কয়েকদিন থাকেন। সেখান থেকে বরাহনগরে যান। বরাহনগরে এক পন্ডিতের গৃহে তিনদিন ভাগবত পাঠ শুনে ব্রাহ্মণকে ভাগবতাচর্য উপাধি প্রদান করে প্রভু নীলাচলে প্রস্থান করেছিলেন। জয়ানন্দ বলেন, শান্তিপুরে শচী ঠাকুরাণী এসে পুত্রকে রান্না করে খাইয়েছিলেন। সেখান থেকে মহাপ্রভু আসেন কুমারহট্টে শিবানন্দের গৃহে, তারপরে

পানিহাটিতে রাঘব পন্ডিতের গৃহে এসে তিনি শাকান্ন ভোজন করেছিলেন। তারপর বরাহনগর ঘুরে তিনি নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের পদরেণু ধন্য এই পানিহাটি গ্রামটিকে কেন্দ্র করে ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয় সাধন চট্টোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'পানিহাটা'। উপন্যাসটির রচনাকাল - ২.২.২০০৮ - ১৩.৪.২০১৩। অভিজিৎ সেন যেমন রামকেলি গ্রামকে কেন্দ্র করে 'রাজপাট ধর্মপাট' উপন্যাসটি লিখেছেন, তেমনি সাধন চট্টোপাধ্যায়ও শ্রীচৈতন্যদেবের চরণচিহ্নিত পানিহাটি গ্রামটিকে কেন্দ্র করে রচনা করেছেন 'পানিহাটা'।

পানিহাটি গ্রাম উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় খড়দহের কাছে হুগলী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। পানিহাটি গ্রামে রাঘব পন্ডিতের বাস। তিনি ধনবান ব্যক্তি, প্রভুর একান্ত ভক্ত। একদা তিনি নিমাই পন্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করতেন। রাঘব পন্ডিতের বাড়ির ব্যঞ্জন ছিল মহাপ্রভুর সবচেয়ে প্রিয়। নিমাইয়ের প্রিয় শিষ্য হিসেবে রাঘব নিমাই পন্ডিতের বাড়ি থেকে পড়তেন। রাঘবের বংশ ছিল বেড়াচাপা জমিদারের কুলপুরোহিত। জমিদার মশাইয়ের উৎসাহেই গঙ্গার নির্জন তীরে দেবোত্তর জমি পান তাঁরা। সে-কালে নানা তিথিতে পুণ্যস্নানের জন্য মানুষ যাতে সহজে, পায়ে হাঁটা পরিশ্রম লাঘব করে নৌকোয় আসতে পারে, বেড়াচাঁপা থেকে খাল কাটিয়ে দিয়েছিলেন গঙ্গা অবধি। পুকুর, দীঘি, খাল জলাভূমির ধান্যচাষের প্রাচুর্যে নৌকাভ্রমণে তীর্থস্থানসম অঞ্চলটিতে রাঘবের পূর্বপুরুষ যে গৃহনির্মাণ করেছিলেন, ক্রমে রাধামাধব প্রতিষ্ঠা করে, নিত্যসেবায় কৃষ্ণভক্তদের আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে। এখানে ভক্তদের ভিড় ক্রমশ বাড়তে থাকে। "তারা বলাবলি করে সুধা পানি, ভক্তির পানি, চাক্ষুষ পানি - নানা পানির হাট মেলে এখানে এলে। তাইতো পানির হাট - পানিহাটা।"[১] লেখক এভাবেই 'পানিহাটা' নামটির উৎস নির্ণয় করেছেন।

এই পানিহাটা গ্রামটি গঞ্জত্ব হারিয়ে মফফসল থেকে ধীরে ধীরে শহর হয়ে উঠলেও তা আজও শ্রীচৈতন্যদেবের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। উপন্যাসে দধীচি গাঙ্গুলির স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে পানিহাটার শহর-মফফ্সলের আলো-আঁধারির চিত্রটি ফুটে ওঠে – "যে গঙ্গা কাশীর তলা দিয়ে বয়ে এসে, ভাগীরথী বা জাহ্নবী নামে শত শত বছর ধরে পানিহাটার কুল ঘেঁষে বয়ে চলেছে। গঞ্জত্ব হারিয়ে পানিহাটা সবে মফসস্লের মালিন্য ঘুচিয়ে একটু একটু আড়মোড়া ভাঙছে নদীর তীরে, একটি ছায়াছন্ন বিশাল ঐতিহাসিক শ্যাওলাধরা শ্বেত পাথরের ফলক দেখিয়েছিলেন। ... বোঝা যায় লেখা আছে - এই সেই ঘাট, নীলাচল হতে ১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দের .... তিথিতে... বুধবার চৈতন্য মহাপ্রভু অবতরণ করেছিলেন।"[২] এইভাবে দধীচি গাঙ্গুলির অতীত স্মৃতিচারণার মধ্যে দিয়ে স্বভাবতই উঠে এসেছে চৈতন্যদেবের বিভিন্ন প্রসঙ্গ। সেইসঙ্গে মফস্বল পানিহাটার নগর হয়ে ওঠার কাহিনিও উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। ফোনে কথা হতে হতেই দধীচি গাঙ্গুলির মন পাঁচশ বছর আগে ও পরের অতীত বর্তমানে ঘোরাফেরা করে। তাঁর মনে পড়ে, পাঁচশ

বছর আগে একই দিনে ১৫১৪ খ্রীঃ কী এক গোপন অস্থির টানে রামকেলির উদ্দেশ্যে চৈতন্যদেব হাজির হয়েছিলেন গঙ্গাতীরস্থ বটবৃক্ষের তলায় যেখানে পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেবও এসেছিলেন। এইভাবে উপন্যাসে অতীত বনাম বর্তমানের বিভিন্ন দ্বন্দ্ব নতুন রূপে নতুন আঙ্গিকে দধীচি গাঙ্গুলির মগ্নচৈতন্যের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি সমাজজীবনের বিভিন্ন প্রান্তকে ছুঁয়ে গেছেন : "উল্কা ছাই হয়ে গেলে উল্কা থাকে না পাথরে পরিণত হয় যেমন, মফস্বল তাপাঙ্ক ছাড়িয়ে শহর হলে আর মফস্বলের চরিত্রে ফিরতে পারে না।"[৩] বাঙালি সমাজ জীবনের বিভিন্ন পরিবর্তন ঔপন্যাসিকের তীব্র পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে। কেমন করে পানিহাটা তার সমস্ত ইতিহাসকে মুছে ফেলে একটি আধুনিক শহর হয়ে উঠেছে তাই দেখাতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক। পানিহাটার প্রাথমিক ইতিহাস শুরু করেছেন তিনি ষোড়শ শতকের সময় ধরে চৈতন্য-সংস্কৃতি আর নিত্যানন্দের শ্রীপাটের ইতিহাসকে ঘিরে। উপন্যাসের শেষে এসে দধীচি মৃত আত্মীয়ের ভস্ম বিসর্জন দিতে এসেছেন চৈতন্য ঘাটে। যে ঘাটে পাঁচশ বছর আগে চৈতন্য উঠেছিলেন পানিহাটায় এবং পাঁচশ বছর পরেও এই ইতিহাস বেঁচে আছে এই রিচুয়ালের মধ্যে দিয়ে।

কবিকর্ণপূরের নাটকে রাজা প্রতাপরুদ্রের অভিলাষানুসারে রায় রামানন্দ কিছু সংখ্যক উৎকলীয় ব্যক্তিকে মহাপ্রভুর সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে কিছু লোক উৎকলরাজের অধিকার সীমা পর্যন্ত গিয়ে প্রত্যাবর্তন করেছিল, কিছু গিয়েছিল গৌড়রাজ্য পর্যন্ত। সে সময়ে গৌড়দেশে প্রবেশের তিনটি পথের মধ্যে দুটি স্থলপথ রুদ্ধ ছিল। তৃতীয় পথটি জলপথ। গৌড় রাজ্যের সীমায় হোসেন শাহের অধীনস্থ এক মদ্যপ দুর্বৃত্ত তুরস্কদেশীয় শাসনকর্তা ছিল। কিন্তু সেই সীমাধিকারী মহাপ্রভুর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে পৃথক নৌকায় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রেশ্বর নদ উত্তীর্ন হয়ে পিচ্ছলদা গ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। নাবিকগণ হরিনাম কীর্তন করতে করতে দ্রুত নৌকা চালনা করে একদিনেই পানীয়হাটিতে উপনীত হয়েছিল। পানীয়হাটিতে রাঘব পন্ডিতের গৃহে রাত্রিবাস করে মহাপ্রভু গঙ্গাপথে কুমারহট্টে শ্রীবাস পন্ডিতের গৃহে উপনীত হন। চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজও মোটামুটি কবিকর্ণপূরকে অনুসরণ করে একইভাবে নৌকাযোগে পানিহাটিতে রাঘব পন্ডিতের গৃহে আগমনের কথা বর্ণনা করেছেন।

"সেই নৌকা চড়ি প্রভু আইলা পানিহাটি।

নাবিকেরে পরাইলা নিজ কৃপা সাটি।।

প্রভু আইলা শুনি লোকের হৈল কোলাহল।

মনুষ্যে ভরিল সব জল আর স্থল।।

রাঘব পন্ডিত আসি প্রভু নৌঞা গোলা।

পথে যাইতে লোক ভিড়ে কষ্ট সৃষ্টে আইলা।।"[৪]

চৈতন্যচরিতকাব্যগুলি অনুসরণ করেই লেখকের কল্পনার বৃত্ত আবর্তিত হতে থাকে। চরিতকারের বর্ণনার সূত্র গুলি ঔপন্যাসিকের হাতে বিশ্লেষিত হয়ে ঘটনাগুলি আমাদের সামনে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। চৈতন্যদেবের পানিহাটি আগমন ও সেখানকার ঘটনাবলি ঔপন্যাসিক বর্ণনা করছেন এইভাবে – "পিছলদায় পৌঁছে, বজরা - নৌকোখানা চলল উত্তরমুখীন। বিশাল চওড়া গঙ্গা - ভরা কূলে জল থইথই। বজরার ছোটখাট দলচি মৃদঙ্গ-করতাল-সংকীর্তনে মগ্ন। মধ্যমণি হিসেবে চৈতন্য বসে আছেন। মুন্ডিত মস্তক, গৌরবর্ণ, কপালে চন্দনতিলক, গলায় মালা, শ্বেত উত্তরীয়।... মাঝে মাঝে তীরে নেমে রান্নাবান্না, খাওয়া হয়েছে; সাগ্রহে গয়লা, তাঁতি, ব্যাধ, হাড়ি, ডোম, জোলা বা বাগ্‌দীদের কেউ কেউ ছুটে এলে, প্রভু তাদের দিয়েছেন আলিঙ্গন। মুহূর্তের জন্য তাদের জীবনে মিলেছে পাথরচাপা মুক্তির স্বাদ।"[৫]

পানিহাটায় সেই বটের তলায় নৌকার নোঙর হল। চৈতন্যদেব তীরে পা রাখতেই দেখলেন রাঘবের নেতৃত্বে খোল করতাল সংকীর্তনে বড়ো কলেবরের একটা দল নেচে নেচে গাইতে গাইতে সটান পদচুম্বন শুরু করল। প্রভুর চোখ মুখ শরীর দিয়ে জ্যোতি বেরোচ্ছে। দলের অন্যান্য সকলে নৌকায় রয়ে গেলেও "কেবল মাধব তার কোলের কুকুরবাচ্চাটি সহ প্রভুর ইঙ্গিতে রাঘবের কুটিরের দিকে দলগত সংকীর্তনে এগোতে থাকল।"[৬] এটি, ঔপন্যাসিকের সংযোজন। শ্রীচৈতন্যের আগমন উপলক্ষে নদীতীরে তাঁর সংবর্ধনায় মকরধ্বজ কর না এলেও, এলেন পুরন্দর মিশ্র, বনমালী নন্দী, ক্ষেতু কুন্ডুদের পাশে মথুর আচার্যরা, আরও এলেন গয়রাপাড়া, তাঁতিপাড়া, ঘট্টজীবী, বাগদীদের কিছু লোকজন। এইখানে লক্ষনীয় নিমাই যেমন অদ্বৈত আচার্যের বাড়ি যেতেন তেমনি আবার নবদ্বীপে তন্তুবায়, মালাকার, গোয়ালা ,বণিক প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মানুষদের সঙ্গেও অবাধে মেলামেশা করে তাদের সকলকে নিয়ে ভক্তি আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ড. সত্যবতী গিরির মতে "চৈতন্যজীবনী পাঠের সূত্রে ঔপন্যাসিক এখানে বিষয়টিকে লক্ষ করেছেন এবং রাঘবের শ্রীপাটে শ্রীচৈতন্যের আগমনের পর এই বিষয়টির প্রতিফলন ঘটেছে ঔপন্যাসিক একথা আমাদের জানিয়েছেন।"[৭]

এই বিপুল জনসমাগম নিয়ে বর্ষা, কাদা ও সংকীর্তনের উন্মাদনার মধ্যে চৈতন্য রাঘবের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা অনুযায়ী – "প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘব পন্ডিত।/ দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা পৃথিবীত।।/ দৃঢ় করি ধরি রমাবল্লভচরণ।/ আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন।।"[৮] রাঘবের ভক্তি দেখে মহাপ্রভু আনন্দসাগরে ভাসতে থাকেন, পরম প্রিয় ভক্ত শিষ্য রাঘবের উদ্দেশ্যে বলেন – "প্রভু বলে রাঘবের আলয়ে আসিয়া।/পসারিনু সব দুঃখ রাঘব দেখিয়া।।/ গঙ্গায় সজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয়। / সেই সুখ পাইলাম রাঘব - আলয়।।"[৯] রাঘব পন্ডিতের বাড়িতে চৈতন্য এতটাই সুখবোধ করতেন।

তাছাড়া রন্ধন নিপুণতায় রাঘব পন্ডিত অনবদ্য। রাঘবের বাড়িতে খেয়ে শ্রীচৈতন্য খুবই তৃপ্ত হতেন। আর রাঘব পন্ডিতও জানতেন চৈতন্য কী কী খেতে ভালবাসেন। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন : "ভোজন করেন

গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত।/ সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে একান্ত।। / প্রভু বলে রাঘবের কি সুন্দর পাক। / এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক।। / শাকেতে প্রভুর প্রীত রাঘব জানিয়া। / রান্ধিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া।।"[১০] চৈতন্যচরিতকারের তুলনায় ঔপন্যাসিকের বর্ণনা আরও একটু এগিয়ে যায়। ঔপন্যাসিক দেখান রাঘবের বাড়িতে তার ষোড়শ বর্ষীয় বিধবা বোন গঙ্গাদেবী আসলে চৈতন্যদেবের প্রিয় খাবারগুলি রান্না করেন – "গঙ্গাদেবী জানালেন, আজ সারাদিন ধরেই পাকমালা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। থোড়, মোচা, অম্বল - নলিতে শাকের ঝোল..."।[১১] শুধু তাই নয় চৈতন্যদেব গঙ্গাদেবীর রন্ধন নিপুণতার কথা শুনেছেন কয়েক বছর ধরেই। চৈতন্যদেব নবদ্বীপ ছেড়ে নীলাচলে চলে যাওয়ার পর থেকেই, দক্ষিণ বাংলার কৃষ্ণভক্তের নানা দল ও গোষ্ঠী ফি-বছর রথে ঝালি নিয়ে পুরীতে উপস্থিত হত। সারা বছর ধরে প্রভুর প্রিয় খাদ্যবস্তু ভক্তিভরে কুটে পিষে সযত্নে বানিয়ে পাত্র ভরে দলবল চলে যেত নীলাচল। একে বলে ঝালি। কুমারহট্ট, বরাহনগর মঠ, কাঞ্চনপুর, ছত্রভোগ বিভিন্ন জায়গা থেকে ঝালি আসত। তার মধ্যে স্বাদে, গন্ধে, অনুভবে "প্রভুর কাছে পেনেটির ঝালি - রাঘবের নেতৃত্বে যা আসত - ছিল সবচেয়ে প্রিয়। গঙ্গাদেবী সারা বছর ধরে টুকটুক করে মুগের ছাতু, আমসি, চিড়ের মোয়া, পোস্তর নাড়ু, আচার, ডালতক্তি থেকে নানা ধরনের টুকিটাকি বানিয়ে রাখতেন।... সেই থেকে কৃষ্ণভক্তদের মহলে পানিহাটার ঝালির অনন্য বৈশিষ্ট্য।"[১২] এই গঙ্গাদেবী সম্পর্কে ড. সত্যবতী গিরি 'আধুনিক বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যজীবনের উপাদান' প্রবন্ধে বলেছেন "গঙ্গাদেবী নিত্যানন্দের কন্যা। তিনি দীক্ষাও দিতেন। কিন্তু রাঘব পণ্ডিতের কাছে যদি গঙ্গাদেবী এসে থাকেন সেটা আলাদা ব্যাপার। শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে কি গঙ্গাদেবীর সাক্ষাৎ হয়েছিল? ... কিন্তু আমারা 'চৈতন্যচরিতামৃতে' পাচ্ছি রাঘব পণ্ডিতের বোন দময়ন্তী। ... দময়ন্তীর রান্নার বিশেষ ভক্ত ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। ঔপন্যাসিক কেন গঙ্গাদেবী নামটা এখানে বলেছেন তা আমরা বুঝতে পারলাম না। 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বা অন্য কোথাও আমরা এই নামটা পাই না। ... এক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক কল্পনা দিয়েই ইতিহাসের ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন।"[১৩]

পানিহাটিতে রাঘবের বাড়িতে চৈতন্য বেশ কিছুদিন ছিলেন। চৈতন্যভাগবতানুসারে "হেন মতে পাণীহাটিতে গ্রাম ধন্য করি।/ আছিলেন কতদিন শ্রীগৌরাঙ্গ হরি।।"[১৪] সেখানে একে একে গদাধর দাস, পুরন্দর পন্ডিত, রঘুনাথ বৈদ্য, মকরধ্বজকর সকলে এসে চৈতন্যদেবের সঙ্গে মিলিত হন। প্রভুর দর্শন, তার কৃপালাভের নিমিত্ত বহু লোকের সমাগম ঘটে পানিহাটিতে। বৃন্দাবনদাসের বর্ণনানুযায়ী – "এইমত যথা যত বৈষ্ণব আছিলা সবেই প্রভুর স্থানে আসিয়া মিলিলা।/ পাণীহাটি গ্রামে হৈল পরম আনন্দ।/ আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র।"[১৫]

এরপর চৈতন্যদেব রাঘবের কাছে নিভৃতে চৈতন্যনিত্যানন্দ তত্ত্বকথা বর্ণনা করেন এবং রাঘবের উপর নিত্যানন্দের সেবার ভার দেন। রাঘবের আলয়ে অবস্থান করেই নিত্যানন্দ পানিহাটি থেকেই

বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করবেন স্থির হয়। চৈতন্যভাগবতানুসারে "রাঘব পন্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর / নিভৃতে করিলা কিছু রহস্য উত্তর।।/ রাঘব তোমারে আমি নিজ গোপ্য কহি। / আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বহি।। / এই নিত্যানন্দ যেই করয়ে আমারে।/ সেই করি আমি এই বলিল তোমারে।।"[১৬] রাঘব সব ছেড়ে নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সেবা-সংস্রবে বাকি জীবন কাটানোর অভিপ্রায় জানালে চৈতন্যদেব তাকে পানিহাটাতেই কৃষ্ণভক্তি প্রচারের জন্য থাকতে বলেন। এখানে ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিতে তার বর্ণনায় চৈতন্যদেবকে দেখে রাঘব পণ্ডিতের মনে রাশি রাশি বিস্ময় জাগে। এ কোন প্রভুকে দেখছেন? ছাত্রাবস্থায় নবদ্বীপের টোলে যে নিমাই পন্ডিতের কাছে কলাপ-ব্যাকরনের পাঠ নিয়েছিলেন, বন্ধুসম প্রানোচ্ছল কথাবার্তা, দম্ভ, জ্ঞানের বড়াই - যাকে তাকে মুখোমুখি পেয়ে ব্রাহ্মনত্বের কৌলিন্য ভেঙে দেয়া, সব কিছু আচার-বিচারে বিদ্রোহ ভাব - লেশমাত্র চিহ্ন নেই ভিতরে। আর আজ সেই নিমাইপন্ডিতের মধ্যে রাঘব কী দেখতে পাচ্ছেন "স্বয়ং কৃষ্ণ যেন মর্ত্যরূপে ফিরে এসেছেন। ভক্তি ও রাগানুগায় গৌর বর্ণের মনোরম রূপে প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে সর্বদা বুঁদ।"[১৭] রাঘব পন্ডিত আরও খুশি হতে থাকলেন এই ভেবে যে চৈতন্যদেবের পদরজ পাওয়ার পর এই তীর্থে পাট নির্মিত হবে। এইভাবে শ্রীচৈতন্যের কৃপায় পানিহাটায় রাঘবের শ্রীপাট নির্মিত হল।

প্রায় তিনমাস নিত্যানন্দ পানিহাটায় রাঘবপন্ডিতের বড়িতে থাকেন এবং কৃষ্ণনাম প্রচার করেন। সপ্তগ্রামের বণিকদের ঘরে ঘরে গিয়েও তিনি হরিভক্তি প্রচার করেন। যখন শ্রীনিত্যানন্দ পানিহাটিতে হরিনাম প্রচার করেন তখন একদিন রঘুনাথ দাস তার কাছে আসেন। রঘুনাথকে নিত্যানন্দ তার সকল ভক্তগণকে উদর পূর্তি করে খাওয়াতে বলেন। তখন দেশময় একথা প্রচার হল যে সবারই নিমন্ত্রণ, যিনি আসবেন, তিনিই প্রসাদ পাবেন। যিনি যা আনবেন তা সবই কিনে নেওয়া হবে। একথা প্রচার হওয়ার সাথে সাথে চিড়া, দই, খই, মিষ্টান্ন, আম, কাঁঠাল, চাঁপাকলা, চিনি, ঘি ইত্যাদি ভারে ভারে আসতে লাগল। অগণিত লোকের সমাগম হল। তারপর চিড়া, দই, কলা, চিনি, ঘি, কর্পূরাদি সহ কুন্ডিত ভিজিয়ে প্রত্যেককে দেওয়া হল। নিত্যানন্দ ধ্যানযোগে শ্রীচৈতন্যদেবকে স্মরণ করলেন। এটিই 'চিড়ামহোৎসব' বা 'দন্ডমহোৎসব' নামে পানিহাটিতে বিখ্যাত। উপন্যাসের বর্ণনানুসারেও দেখা যায় পানিহাটিতে এখনও এই উৎসব হয় – "যেমন এখন চৈতন্যঘাটের হাজারো গ্যাঞ্জামের মধ্যে জ্যেষ্ঠের চিড়ারমেলায় লক্ষাধিক ভক্ত বৈষ্ণবরা আসে।"[১৮] এ প্রসঙ্গে 'চৈতন্যদেবের চরণ চিহ্নিত তিনটি স্থান' প্রবন্ধে সমালোচকের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য – "রাঘবের গৃহে প্রভুদেবের লীলা ও রাঘবের সেবা পরিপাটির ঐতিহ্য বৈষ্ণব জগতে চিরস্মরনীয় বিষয়। যে বটগাছের নীচে প্রভু নিত্যানন্দের প্রেমলীলার প্রকাশ ঘটেছিল, সেই বটগাছ আজও পানিহাটি গ্রামে বিদ্যমান। বর্তামনে সেই স্থান – 'বৈষ্ণবতলা' নামে প্রসিদ্ধ। এখনও এখানে জৈষ্ঠ্য মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে পূর্বলীলার স্মরণে চিড়াদধি দিয়ে 'দণ্ড উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়।"[১৯]

দধীচি গাঙ্গুলির পরিবারের সূত্রপাত ধরে পানিহাটার পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণালাভ করা যায় এই উপন্যাসে। প্রাচীনকালে পানিহাটায় প্রবাদ ছিল 'রাস-তাস-লাঠিলাঠা তিন নিয়ে পানিহাটা'। তাঁর বাবা রমনীমোহন গাঙ্গুলিদের সময়কাল বিপ্লব ও বিপ্লবীদের প্রসঙ্গ যেমন এসেছে তেমনি এসেছে ৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনের কথাও। কমিউনিস্টদের মার্ক্সীয় ভাবধারার পাশাপাশি চিটফান্ড প্রসঙ্গও ধরা পড়েছে। ঔপন্যাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে। এখানে যে 'পুরনো কলকাতার রাস্তা' আছে সেই রাস্তা ধরেই নাকি বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা কলকাতা গিয়েছিলেন ইংরেজদের দুর্গ ভেঙ্গে দিতে। গান্ধিজি কলকাতা এলে এই পানিহাটাতেই থাকতেন। সে সব দিনের সংগ্রাম ও ইতিহাস আজ লুপ্ত। পানিহাটায় বিভিন্ন পাড়ার মাঝে ফাঁকা জায়গায় নির্জন এলাকায় ঘর ও শনের চালের আখড়া থাকত, যা বৈষ্ণব নেড়ানেড়িদের সাধনার স্থান। গুহ্য সাধনার নামে তারা নানাবিধ যৌনাচার করত। কৃষ্ণনাম কানে দিয়ে শ্রীচৈতন্য তাদের উদ্ধার করেন। উপন্যাসে এসেছে আধ্যাত্মিক ভাবনা। সেই সূত্রে কয়েকটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে। বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য, মধুর রসের ভজনা, সখিভাবে ভজনা, গৌর নাগরী ভাবে ভজন পূজন প্রমুখ এসেছে। উপন্যাসের শেষ অংশে এসেছে চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ, প্রিয় শিষ্য রাঘবের বাড়িতে দু'দিন পানিহাটায় থাকার বিস্তারিত কাহিনি ও মাহাত্ম্য বর্নিত হয়েছে অতীত ও বর্তমানের মেলবন্ধনে উপন্যাসটি অনন্য মাত্রা লাভ করেছে।

শ্রীচৈতন্যদেব পানিহাটায় কীভাবে প্রকাশ্য সংকীর্তন করলেন তাও দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এতদিন পানিহাটায় কৃষ্ণ নাম হত গোপনে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের চোখে ছোট জাত যারা গোপনে তারা কৃষ্ণ নাম করত। চৈতন্যদেবের পানিহাটি আগমনের পর প্রথম প্রকাশ্যে সংকীর্তন বের হয়। পানিহাটার সাংস্কৃতিক পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক দেখিয়েছেন এখানে নানা ধর্মভাবের বৈচিত্র্য। বৈষ্ণবরাও এখানে নানাভাগে বিভক্ত। সবাই গৌরসেবা করেন। মহোৎসবে যান। কিন্তু এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও আছে নানা বৈচিত্র্য। ঔপন্যাসিক দেখিয়েছেন পানিহাটায় গৌরনাগরীভাবের ভক্ত সাধক উপাসক যাঁরা, একবিংশ শতকেও তাঁরা আছেন। সমাজ পাল্টে যায়, সভ্যতার বহিরঙ্গে পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু কিছু কিছু মৌল বিষয় সেই পুরনো সংস্কৃতিকে ধারণ করে এখনও থেকে গেছে। সময়ের ব্যবধানে পানিহাটা গ্রাম থেকে শহর হয়ে উঠেছে ঠিকই তবে তা যে আজও চৈতন্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহন করে চলে সেই চিত্রই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। ড. সত্যবতী গিরির মতে, " পানিহাটা উপন্যাসে সাধন চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিষয় লক্ষণীয়, তিনি প্রাক-ঔপনিবেশিক পর্বের বাংলার যে জনপদ এক একটি সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রভাবে গড়ে উঠেছিল সেটাই এখানে বলতে চেয়েছেন। যে কারণে রবীন্দ্রনাথের পেনেটির বাগানবাড়িতে থাকার প্রসঙ্গগুলি খুব লোভনীয় হওয়া সত্ত্বেও ঔপন্যাসিক বাদ দিয়েছেন। তার মানে ঔপন্যাসিক পানিহাটায় চৈতন্য-সংস্কৃতি কতটা গভীর সেটাকেই তিনি দেখাতে চেয়েছেন।"[২০]

জীবনকে অস্বীকার করে নয়, স্বীকার করেই সাধন চট্টোপাধ্যায় 'পানিহাটা'র বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন, তার মাঝে স্থাপন করেছেন দধীচির জীবনপ্রবাহ ও অতীতচারণার স্মৃতি। চৈতন্যদেবের জীবনকে উপাদান রূপে গ্রহণ করে উপন্যাস রচনা বাংলা সাহিত্যে স্বল্প মাত্রায় হয়েছে। সেইদিক থেকে ঔপন্যাসিক চৈতন্যদেবের সঙ্গে পানিহাটার পাঁচশ বছরের ইতিহাসকে অপূর্ব মুন্সিয়ানার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে বিশিষ্ট ভাবদৃষ্টি ও মনোবিশ্লেষণী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। মননশীল এই উপন্যাস সাহিত্যের সর্বস্তরের পাঠকের হৃদয় ছুঁয়ে যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের চরণধন্য পানিহাটি গ্রামটি উপন্যাস আকারে শহরে পরিণত হয়। উপন্যাসটি শেষ হয় শ্রীচৈতন্যদেবের কীর্তন শুরুর মধ্য দিয়ে – "প্রভু নামতেই কীর্তন শুরু হয় গেল। উনি দু-হাত ঢেউয়ের মতো দুলিয়ে, ঊর্ধ্বে উত্থিত মুদ্রা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পানিহাটার পুরনো নতুন একতলা, দোতলা সকল কিছু ধ্যাক্ ধ্যাক্ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভূমি থেকে দশ-বিশ-তিরিশ তলা উঁচু হয়ে গেল। সুসজ্জিত সরলবর্গীয় অরণ্যের মতো। ভক্তের দল প্রভুকে নিয়ে কীর্তনের তালে তালে সূর্যের আলোহীন ছায়ান্ধকারে পথ ধরে ধরে এগিয়ে চলল। নতুন কোনো দণ্ডমহোৎসবের আয়োজনে।"[২১] এইভাবে আধুনিক কথাসাহিত্যিকের হাত ধরে চৈতন্যসংস্কৃতি ও চৈতন্যচর্চার ধারা অব্যাহত থাকে।

তথ্যসূত্র

১। চট্টোপাধ্যায় সাধন, পানিহাটা, করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১৪, পৃ. ২০৩।

২। তদেব, পৃ. ৯-১১।

৩। তদেব।

৪। সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৩৯২, পৃ. ২৬৭।

৫। চট্টোপাধ্যায় সাধন, পানিহাটা, করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১৪, পৃ- ২০২।

৬। তদেব, পৃ. ২০৬।

৭। সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর সম্পাদিত, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, গিরি সত্যবতী, আধুনিক বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যজীবনের উপাদান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১, পৃ- ৯৬।

৮। সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, শেষখন্ড, পঞ্চম অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ. ২৫৭।

৯। তদেব।

১০। তদেব, পৃ. ২৫৮।

১১। চট্টোপাধ্যায় সাধন, পানিহাটা, করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১৪, পৃ. ২০৮।

১২। তদেব, পৃ.২০৬।

১৩। সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর সম্পাদিত, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, গিরি সত্যবতী, আধুনিক বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যজীবনের উপাদান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১, পৃ- ৯৪।

১৪। সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, শেষখন্ড, পঞ্চম অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ. ২৫৮।

১৫। তদেব।

১৬। তদেব।

১৭। চট্টোপাধ্যায় সাধন, পানিহাটা, করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১৪, পৃ. ১০৯।

১৮। তদেব, পৃ. ২৩২।

১৯। বসু তাপস (সম্পা.), শ্রীচৈতন্য একালের ভাবনা, মন্ডল বিপুল, ‘চৈতন্যদেবের চরণচিহ্নিত তিনটি স্থান’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০১৪, পৃ. ১২৮।

২০। সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর সম্পাদিত, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, গিরি সত্যবতী, আধুনিক বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যজীবনের উপাদান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১, পৃ- ৯৯।

২১। চট্টোপাধ্যায় সাধন, পানিহাটা, করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১৪, পৃ. ২৪০।

এক জন্মেই জন্মান্তর (২০১৪)

অলখ মুখোপাধ্যায়

২০১৪ সালেই চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে রচিত আর একটি উপন্যাসের সন্ধান আমরা পাই, অলখ মুখোপাধ্যায়ের 'এক জন্মেই জন্মান্তর'। এই উপন্যাসে একদিকে নিমাইয়ের জীবন দর্শন, জীবন সম্পর্কে অনুভব, উপলব্ধিকে লেখক যেমন সম্পূর্ণ নতুন ভাবে উপস্থাপন করেছেন অপরদিকে ষোড়শ শতাব্দীর পটভূমিতে নবদ্বীপের সামাজিক অর্থনৈতিক চিত্রকে উপন্যাসে শিল্প রূপ দিয়েছেন 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গলে'র পটভূমিকে অবলম্বন করে। সেইসঙ্গে সমাজে রঘুনন্দনের স্মৃতিশাস্ত্রের প্রভাব, আগমবাগীশের তন্ত্রচর্চা, নবদ্বীপের প্রাচুর্য, বাণিজ্য যাত্রা, অর্থনৈতিক লেনদেন এবং নবদ্বীপের বিদ্যাচর্চা প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের সমন্বয় সাধন করেছেন লেখক এই উপন্যাসে।

এই উপন্যাসে জন্মান্তর হয় এক জনপদেরই। ভাগীরথি তীরের নবদ্বীপ। ষোড়শ শতকের প্রথম দশকের শেষে তখন বাঙালির জীবনে একাধিক পরিবর্তন এসেছিল। পরিবর্তন এসেছিল বিদ্যাভাবনা ও পুণ্যচর্চার ক্ষেত্রেও। পরিবর্তিত হচ্ছিল বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি। সংস্কৃত ভাষা ও শাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গেই গুরুত্ব পাচ্ছিল বাংলা রচনাও। সাহিত্য ভাবনা ও শাস্ত্র চিন্তার সঙ্গে সংঘাত তৈরি হয়েছিল প্রভাবশালী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির। সেই সংঘাতের পর্বে বিদ্যা ভাবনা ও সমাজের এককগুলিও পরিবর্তিত হচ্ছিল। যেন নবজন্মই হচ্ছিল বাঙালি সমাজের – তখনই জন্ম নিমাই ও তাঁর নতুন 'ধর্ম'র। সেই কালের কথাই এই উপন্যাসে ধরার চেষ্টা হয়েছে।

উপন্যাসে ষোড়শ শতাব্দীর ব্যবসা-বাণিজ্য বিশেষ স্থান লাভ করেছে। এসেছে বেশ কিছু বণিক চরিত্র। যেমন নারায়ণ বণিকের চরিত্রটি লেখক নির্মাণ করেছেন চাঁদ সদাগর চরিত্রের আদলে। নানা দেশের নানা বণিকের সঙ্গে যোগাযোগ তার। সুপুরি, নারকেল, ধান, কাঠ, বস্ত্র, সুতা প্রভৃতি নানা পণ্যের আদান-প্রদান চলে। তার নিযুক্ত নাবিকেরাই যদিও সাগর পাড়ে গিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে তবু এবার নারায়ণ স্থির করে এ দেশের প্রতিনিধি হয়ে সে নিজে এবার সমুদ্র অভিযান করবে চাঁদ সদাগরের মতো। এবারে তিনি বোনালেন নতুন বস্ত্রসম্ভার। আর তার পাড়ে বুনে দিতে বললেন সাগরপাড়ের কাহিনি, সে কাহিনি চাঁদ সওদাগরকে নিয়ে গাঁথা কোনো নতুন কাহিনী যেখানে চাঁদ-মনসার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভিন্ন মাত্রা পায়। যেখানে মনসা কেবল কোনো সর্পদেবী নন, তিনি একজন লাবণ্যমণ্ডিত সুন্দরী নারী প্রতিমা। সাগর পাড় থেকে বণিক নারায়ণ এবারে যত বস্ত্র সম্ভার ও অলংকার সংগ্রহ করেছেন তার জন্য তাঁর দরকার উপযুক্ত একটি নারী প্রতিমা। আর এইসময়ই তাঁর মনে পড়ে দেবী মনসার কথা। "নিজের মনেই আশ্চর্য

এক দ্বিধার সন্ধান পান নারায়ণ। এক দিকে দেবীর প্রতি সাধারণভাবে যে ভয় ভক্তি কাজ করে, তা তাঁকে আপ্লুত করে রাখছে, সর্পভীতি তো তাঁরও রয়েছে যথেষ্ট। অন্যদিকে তিনি এই দেবী প্রতিমাকে খুবই আকর্ষণীয় এক মহিলার আদর্শ রূপ হিসাবেও দেখতে চাইছেন, যিনি তাঁর তৈরি পোশাক ও অলংকার পরিধান করে, তা পরা বিধেয় বলে প্রতিষ্ঠা করবেন।"[১]। নারায়ণ মনে মনে বিস্ময় বোধ করেন। তাঁকে আকর্ষণ করেছিল চাঁদ সওদাগর। সেখান থেকে তিনি কী করে এইভাবে মনসাকে গড়ে তুললেন? " তিনি কি কোনো অপমানের প্রতিশোধ তুলছেন? মনে মনে পক্ষ নিয়েছেন চাঁদের? অথবা এ শুধুই এক বণিকের কুশলী মন? যে বণিক চাইছেন এক দেবী বিগ্রহকে সেই নারী দেহের আদর্শ করে তুলতে, যে শরীর তাঁর পোশাক ও অলংকার পরিধান বিধেয় করে তুলবে? তিনি কি তাহলে মনসা যেভাবে চাঁদ সওদাগরকে ব্যবহার করেছিল, সেইভাবে ব্যবহার করতে চাইছেন মনসাকে?"[২] এইভাবে লেখকের নিপুণ বর্ণনা কৌশলে মনসামঙ্গল কাহিনীর বিনির্মাণ ঘটেছে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারিত হয় যে এককগুলির দ্বারা যথা- লিঙ্গ, ধর্ম,বর্ণ, সম্পদ বা শিক্ষা; নিমাইয়ের মতে এই এককগুলি যথেষ্ট নয়। রঘুনন্দন যদিও সুপ্রাচীন চতুর্বর্ণ প্রথা লোপ করে তিনটি বর্ণকে একটি বর্ণে নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন তবুও নিমাইয়ের মতে "রঘুনন্দনের নিয়মজনিত ভাবে কোনো ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যদি নিম্ন বর্ণের ছাত্র গ্রহণও করেন, সেক্ষেত্রেও শিক্ষা একক হিসেবে সেই মর্যাদা পায় নি যে, অর্জিত বিদ্যা নিজে ছেলেকে পাশে বসিয়ে না শিখিয়ে কোনো কারিগর পিতা তাঁর পুত্রকে টোলে পাঠাবেন।"[৩] তাই নিমাইয়ের বক্তব্য এ বার এমন একটি একক চাই, যা শিক্ষা নয়। 'বরং যা শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠা ভেঙে দিতে পারে।' তাঁর মতে "শিক্ষা একটি প্রচণ্ড শক্তি। কিন্তু শিক্ষার সীমাবদ্ধতা হল, তা সকলের কাছে পৌঁছায় না, তদুপরি সে সহজসাধ্যও নয়। ... শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ভর। কোনো না কোনো গুরুর আশ্রয়ে, বিদ্যালয়ের কোলে তার অধিষ্ঠান। ... কাজের সময় নষ্ট করে শিক্ষা অর্জন করতে পারেন ক'জন?"[৪] উদাহরণস্বরূপ নিমাই বলেন, "শিল্পী যে প্রতিমা গড়েন, তাতে বিদ্যার উপরে রয়েছে শিক্ষার ছায়া। ... সেই শিক্ষা তিনি প্রতিষ্ঠান থেকে পাচ্ছেন না। ... সমাজে ছড়িয়ে গিয়েছে কিছু প্রতিষ্ঠান জারিত ভাবনা। সেই ভাবনা আর পুরোপুরি আনন্দদায়ক নেই। তা সমাজের পক্ষে সামগ্রিকভাবে উপকারীও নেই।"[৫] তাছাড়া মুদ্রা নির্ভর অর্থনীতি অনেক বেশি গুরুত্ব দেয় কোনো বিশেষ বিষয়ে বিদ্যার প্রতি। তাই নিমাই এমন কোনো একটি নতুন এককের সন্ধান করেন যা ধর্ম-বর্ণ-সম্পদ-শিক্ষা –এসবের অতিরিক্ত এমন একটি একক যা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করবে, প্রতিষ্ঠা দেবে; আর এক্ষেত্রে তিনি কৃষ্ণনামকেই মানদণ্ডরূপে গ্রহণ করেন কেননা তা যেমন একদিকে মানুষের চেতনার উদ্বোধন ঘটাবে, তার অন্তরাত্মাকে জাগিয়ে তুলে তার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করবে; অপরদিকে সামাজিক বৈষম্য দূর করে

সকলকে এক অখণ্ড ভাবৈক্যসূত্রে গ্রথিত করবে। এইভাবে লেখক সমাজ গঠনে নিমাইয়ের ভূমিকাকে উপস্থাপন করেন একেবারে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে উপন্যাসের অন্তিমে লেখক দেখান 'এক জন্মেই জন্মান্তর হয় নিমাইয়ের। প্রেমে ও বিরহে।' লক্ষ্মীর প্রতি তাঁর প্রেম এবং লক্ষ্মীর মৃত্যুতে তাঁর যন্ত্রণা নিমাইয়ের জীবনকে আমূল বদলে দেয়। যেন জন্মান্তর ঘটে নিমাইয়ের। যে কৃষ্ণপ্রেম তাঁর মনে দীর্ঘদিন ধরে অনুরণিত হচ্ছিল, সেই কৃষ্ণপ্রেম লাভের আশায় ব্যাকুল হয়ে সে এবার রাধারূপে নিজেকে কল্পনা করে এবং কৃষ্ণ বিরহ যন্ত্রণা অনুভব করে। কৃষ্ণপ্রেমে, অনুরাগে, বিরহে নিমাই যেন নবজন্ম লাভ করে। সে সংসার ত্যাগ করে। সন্ন্যাস গ্রহণ করে এবং নতুন নামধারণ করে নিমাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়ে ওঠে। এইভাবে ঔপন্যাসিকের কলমে চৈতন্যচর্চা নতুন মাত্রা লাভ করে।

তথ্যসূত্র

১। মুখোপাধ্যায় অলখ, এক জন্মেই জন্মান্তর, কৃতি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০১৪, পৃ- ১৬।

২। তদেব।

৩। তদেব, পৃ-৬৮।

৪। তদেব,পৃ-৬৯।

৫। তদেব।

শ্রীচৈতন্যকথা (২০১৮)

কিন্নর রায়

কথাসাহিত্যিক কিন্নর রায় ২০১৩-র ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে শ্রীচৈতন্যদেবকে নিয়ে লিখতে শুরু করেছিলেন 'শ্রীচৈতন্যের পথ ধরে'। ২০১৩-র নভেম্বর সংখ্যা থেকে এই ধারাবাহিকটি 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় বেরোতে থাকে। প্রায় চার বছর ধরে একচল্লিশটি সংখ্যা ছাপা হয়। ২০১৮ সালে 'শ্রীচৈতন্যকথা' নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। এখানে চৈতন্যদেবের 'আদিলীলা' রূপে তাঁর জন্মগ্রহণ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। শ্রীচৈতন্যকথার আদিপর্ব এটি।

এই আখ্যানে রয়েছে নদীয়ার নিমাইয়ের পিতৃদেব, পিতামহ, গর্ভধারিণী ও তাঁর অতি অকালমৃতা সহোদরাদের কথা। সাত-সাতটি বোন কেমন করে অতি কম বয়সে জন্মাবার পর পরই মারা গেল সেও তো এক রহস্য। কি সেই প্রয়াণ রহস্য, তা নিয়ে কোনো কড়চাকার বা তাঁর চরিতকথা লেখক মুখ খোলেন নি। অখণ্ড বঙ্গভূমি, তথা ভারতীয় নবজাগরণের অন্যতম প্রাণ শচীরানি ও জগন্নাথ মিশ্রী যৌথ জীবনপটে শ্রীচৈতন্যের জন্মটুকু আঁকা হয়ে গেল। সেই পর্যন্ত এসেই এই আখ্যান পর্বের আপাত ছেদ পড়েছে। শ্রীচৈতন্য, তাঁর পরিবার, পূর্বপুরুষ-পূর্বনারীদের আবাসভূমি অখণ্ড বঙ্গের শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণের কথা, কুশিয়াড়া নদীর বিবরণ সুনিপুণভাবে চিত্রিত হয়েছে এখানে : "কুশিয়ারা বা কৌশিক নদী – তার প্রবাহ, তরঙ্গ বৈভব, সেই সঙ্গে সুরমা নামের আর এক সরসী – সরসীস্রোত – নদী। কৌশিকা আর সুরমা নদীর মধ্যবর্তী ঢাকা দক্ষিণ জগন্নাথের অতি প্রিয় জন্মভূমি।"[১] বহুদিন পরে নবদ্বীপ থেকে ঢাকা দক্ষিণে এসে জগন্নাথ নতুন করে তার শৈশব বালকবেলা আবিষ্কার করেন। পুরনো স্মৃতি আবার নতুন করে জেগে ওঠে : "কুশিয়ারা, সুরমার ওপর মেঘের ছায়াপাত তৈরি করে নতুন নতুন রূপগাথা। সেই রূপে বিভোর হয়ে থাকেন উপেন্দ্রপুত্র। শৈশব বালকবেলার সহধ্যায়ী, সঙ্গীরা কখনও কখনও তাঁর সামনে ধূমকেতুসদৃশ দ্রুতগামিতা নিয়ে উপস্থিত হয়।"[২] শচীদেবী ও নবদ্বীপ থেকে শ্রীহট্টে এসে নতুন করে ঢাকা দক্ষিণকে আবিষ্কার করেন : "এই অঞ্চলের নীলাভ সবুজ ছোটো ছোটো পাহাড়, সুরমা আর কৌশিকা-কুশিয়ারা নামের দুই নদী, ঢাকা বিল – সব মিলিয়ে নগর চঞ্চলতা, কোলাহলের বাইরে এক জটিলতামুক্ত পৃথিবী।"[৩]

এই শ্রীহট্টের ঢাকা দক্ষিণে কুশিয়ারা নদীর কাছাকাছি নিমাইয়ের পিতৃনিবাস। লেখক চৈতন্যের পিতৃভিটা বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীবাণীপ্রসন্ন মিশ্রের লেখা 'উন্মোচিত ঢাকা দক্ষিন-শ্রীহট্ট, ঠাকুরবাড়ির খণ্ডচিত্র' গ্রন্থটি থেকে। উপন্যাস সূত্রে জানা যায়, জগন্নাথ মিশ্রের পিতামহ মধুকর মিশ্র কৌশিকা নদীর তীরে বরগঙ্গায় বৈবাহিক সূত্রে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর চার-

চারটি সন্তানের মধ্যে একজন হলেন জগন্নাথ মিশ্রের পিতৃদেব উপেন্দ্র। প্রসঙ্গক্রমে আমরা ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর রচিত 'যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় 'বংশ পরিচয়' অংশে চৈতন্যদেবের পিতৃপুরুষের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা এই অংশে উল্লেখ করছি। শ্রীহট্টদেশ মধ্যে মধুকর নামে জিতেন্দ্রীয় পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণিভুক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বারণাতে কিছু পরিমান ভূমি লাভ করে বসবাস করেন। সজ্জনগণ ঐ স্থানকে বরগঙ্গা (বরুঙ্গা) বলে থাকে। মধুকরের চার পুত্র ও এক কন্যা ছিল, তাদের নাম কীর্তিদ, রঙ্গদ, উপেন্দ্র, কীর্তিবাস ও ফণী। তন্মধ্যে উপেন্দ্র মিশ্র কৈলাসের নিকটবর্তী গুপ্ত বৃন্দাবনে ভার্যা শোভার সঙ্গে তপস্যা করেছিলেন। উপেন্দ্র মিশ্রের সাতটি গুনবান পুত্র জন্মেছিল : কংসারি, পরমানন্দ, জগন্নাথ, সর্বেশ্বর, পদ্মনাভ, জনার্দন, ত্রিলোকনাথ।"[৪] উপন্যাসের বর্ণনা অনুযায়ী এসেছে জগন্নাথ মিশ্রের পিতা উপেন্দ্র মিশ্র ও গর্ভধারিণী শোভা দেবীর কথা। বহুদিন পর পিতা-পুত্র, মাতা-পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে মিলিত হওয়ার মুহূর্তটি প্রাণোজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে উপন্যাসে। এখানে জগন্নাথ ও শচীদেবী বেশ কয়েকদিন কাটিয়ে যান।

শচী দেবীর মনে মাঝে মাঝেই ভেসে ওঠে তাঁর অকাল প্রয়াত কন্যাসন্তানদের কথা। সাতটি বা আটটি কন্যা সন্তান – শচীদেবী নিজেও হয়তো ঠিক স্মরণ করতে পারেন না। কিন্তু সেই সাতটি বা আটটি অকালপ্রয়াত কন্যা সন্তানের কথা ভাবলেই শচীদেবী দুঃখে-শোকে ভেঙে পড়েন, অশ্রু জলে তার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যায় - "এই সাত বা আটজনের একজনও আজ আর জীবিত নেই। কেন, নেই? কেন, কেন সাত, নাকি আট আটটি মেয়ে সন্তান – তাঁর গর্ভফুল কীভাবে কীভাবে যেন চলে গেল, চলে যেতে বাধ্য হল কালের করাল গ্রাসে। মেয়েরা – একটি মেয়েও এখন আর বেঁচে নেই। জীবিত না থাকা – অকালে একেবারে কুসুম কুসুম আয়ুষ্কালেই, অতি অতি ছোটো রক্ত-মাংস পুত্তলি তারা, সবে দেখেছে পৃথিবীর আলো, তখনই তো তাদের পরপর যাত্রা। সেই সব অকালপ্রয়াত কন্যাদের কথা ভাবলেই অশ্রু ঘনায় শচীমাতার দুচোখে। সেই সব অকালপ্রয়াতরা তাঁকে ঘিরে মাঝে মাঝেই ক্রন্দন রোলে ভেঙে পড়ে। এক সঙ্গে এত এত শিশুকণ্ঠের কানা! এতজন নারী কণ্ঠ, যারা কেবল কেঁদেই চলে আর বলতে থাকে, মা, আমরা কেন এই পৃথিবীতে থাকার অধিকার পেলাম না! কেন? কেন?"[৫] কিন্তু আপাতভাবে এর কোনো উত্তর নেই জগন্নাথ জায়ার কাছে। এর কোনো সঠিক উত্তর ঔপন্যাসিকও দিতে পারেন নি। তবে ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব এখানেই যে চৈতন্যচরিতকারেরা যেখানে শচীর অষ্টকন্যার মৃত্যু বিষয়টিকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে গেছেন, অন্তরালে রেখেছেন, সেখানে ঔপন্যাসিক তাঁর মানব দরদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বিষয়টি উত্থাপন করে আমাদের একটি নতুন দিকের সন্ধান দিয়েছেন।

জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর নানা অনুভূতি, উপলব্ধি, জীবন দর্শন বিবিধ অনুষঙ্গে ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন। মূলত প্রাচীন নানা আচার-আচরণ, সংস্কার, বিধি নিষেধ, পারিবারিক,

সামাজিক খুঁটিনাটি ইতিবৃত্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। একদিকে যেমন অষ্টকন্যার মৃত্যু রহস্য, তাদের জন্য শচীর মাতৃ হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণা, গর্ভধারণ, গর্ভপাত, শারীরিক উথাল-পাতাল অনুভব, মনঃপীড়া বর্ণিত হয়েছে – "··· রুদ্রতেজে বজ্রপাত হলে তার মনে হয় গর্ভস্থ পুত্তলিটিও বুঝি লাফ দেয় গর্ভ গভীরে। ··· একই সঙ্গে··· তখনই তো তার আট আটটি মরে যাওয়া মেয়ের মুখ ··· ফুটে ওঠে।"[৬] আর সেখানেই উপ্ত হয় লেখকের মনে সন্দেহের বীজ " ··· এই সব মেয়েরা কি আঁতুড় ঘরেই মারা গেল? মারা কি গেল, নাকি মারা হল তাদের? অথবা গর্ভসলিলে ভ্রূণ কলা হয়ে ভেসে থাকা, বেঁচে থাকার কালেই হত্যা করা হল তাদের? এই যে হওয়া-না হওয়া, বাস্তব অতিবাস্তব, পরাবাস্তবের মধ্যেই কল্পনা আর স্বপ্নের নানা পাখা মেলে তার কাছাকাছি উড়ে আসতে থাকে কোনো জীবন প্রস্তাব।"[৭]

শচীর সেই মেয়েরা সে অষ্টকন্যা অতি অকালে প্রায় কুঁড়ি দশায় মরে যাওয়া আট-আটটি মেয়ে তারা যেন অবেলার বকুলবাসর হয়েই জেগে থাকে। এই আটটি মৃত কন্যার পর শচীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে বিশ্বরূপ। শচী জগন্নাথের প্রথম বড় জীবিত সন্তান। অসম্ভব ধীমান, স্মৃতি শক্তি সম্পন্ন, তার্কিক ও অতি নিবিড় পাঠ্যাধ্যায়ী, বিবিধ বিষয়ে আগ্রহী বিশ্বরূপ প্রথম থেকেই স্বভাবে স্থির অন্তর্মুখী। এই বিশ্বরূপকে মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্তী ও মাতামহীর কাছে রেখে শচী ও জগন্নাথ যায় পিতৃভিটা শ্রীহট্ট ঢাকা দক্ষিণে। দীর্ঘদিন পিতা-মাতার অনুপস্থিতি বিশ্বরূপকে একাকী করে তোলে। ধীরে ধীরে তার অন্তর্জগৎ তৈরি হয়। যদিও মাতামহ ও মাতামহীর অধিকতর স্নেহছায়া তাকে ঘিরে থাকে তবুও বিশ্বরূপ নিঃসঙ্গতা অনুভব করে। তার মন-প্রাণ বিষাদে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন পর শচী জগন্নাথ যখন নবদ্বীপে ফিরে আসে তখন গর্ভভারে স্ফীত ক্লান্ত অবসন্ন জননীকে বিশ্বরূপ যেন চিনতে পারে না, আর সেই সঙ্গে তার মনে জমে ওঠে একধরণের আত্মাভিমান : " শচীরাণী দীর্ঘ প্রবাসের পর নবদ্বীপে তার পুত্র সন্তানটিকে খোঁজেন। জগন্নাথ মিশ্রও শ্বশুর নীলাম্বরের কাছে খবর নেন বিশ্বরূপের। গঙ্গাতীরে নিজের বিষাদ-সম্পৃক্ত মন ও শরীর নিয়ে খেলে বেড়ান বিশ্বরূপ। বাড়ি বসে দূর থেকে শচী ও জগন্নাথ দেখেন। অতি স্ফীত গর্ভা এই জননী যেন তার অচেনা। কোনো এক অজানিত কারণে বিশ্বরূপের দুচোখে জল জমে। তারপর পরই অভিমান, অভিমান ও ক্রোধের বাষ্প এবং অগ্নি।"[৮]

তারপর ফাল্গুনী পূর্ণিমা রাতে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের দিন যখন চারদিকে দেবালয়ে বেজে ওঠে ঘড়ি-ঘন্টা-কাঁসর তখন চারিদিক আলোকিত করে সমস্ত বিশ্বলোককে জাগিয়ে নবজাতক নবদ্বীপ চন্দ্র নিমাই জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি। এভাবেই একবিংশ শতকেও বাংলা কথাসাহিত্যে চৈতন্যচর্চার ধারা অব্যাহত থাকে।

তথ্যসূত্র

(১) রায় কিন্নর, শ্রীচৈতন্যকথা (আদিপর্ব), দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০১৮, পৃ- ৩৩৪।

(২) তদেব, পৃ- ৩৩৩।

(৩) তদেব, পৃ- ৩৩৬।

(৪) ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৪, পৃ- ৪২।

(৫) রায় কিন্নর, শ্রীচৈতন্যকথা (আদিপর্ব), দেজ পাবলিশিং, জানুয়ারী ২০১৮, পৃ- ৩৩৫।

(৬) তদেব, পৃ - ২৪৫-২৪৬।

(৭) তদেব।

(৮) তদেব, পৃ- ৪৩০।

মিথের মানুষ শ্রীচৈতন্য (২০২০)

বসন্ত লস্কর

বসন্ত লস্করের 'মিথের মানুষ শ্রীচৈতন্য' চৈতন্যকে কেন্দ্র করে রচিত একেবারে ভিন্নধর্মী একটি উপন্যাস। উপন্যাসটির দুটি খণ্ড। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০২০ সালের জানুয়ারী মাসে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ২০২১ সালের জানুয়ারী মাসে। এখানে ভক্তের ভগবান রূপে চৈতন্যদেবের কোনো অলৌকিক মহিমার প্রকাশ নেই। আবার ইতিহাসের শ্রীচৈতন্যও এখানে অনুপস্থিত। এখানে চৈতন্য কোনো গণ আন্দোলনের নায়ক বা বিপ্লবী নয়, চৈতন্যের কোনো মহান আদর্শের প্রতিফলন নয়, নব্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক রূপেও নয়, একেবারেই গ্রাম বাংলার পটভূমিতে গ্রাম্য একটি বালকের বেড়ে ওঠা, তার শিক্ষা, তার প্রেম, বিবাহ, বিরহ, বিরহী প্রেমিক সত্তা, সেই সঙ্গে তার প্রচণ্ড জেদ, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মারকাটারি প্রতিবাদ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সম্বলিত যেন একটি সাধারণ ছেলের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গ্রাম বাংলার এই সাধারণ ছেলেটি কীভাবে ধীরে ধীরে অবতার হয়ে উঠল, ধর্মনায়ক হয়ে উঠল, আপামর দেশবাসীর উদ্ধারের নিমিত্ত জননায়ক হয়ে উঠল, এমনকি রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, অযথা প্রাণহানি, যুদ্ধ নিবারণের জন্য না চাইলেও সন্ন্যাসী হয়ে রাজনীতির সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিল সেই ব্যক্তি চৈতন্যের কাহিনীই এখানে বর্ণিত হয়েছে একেবারে সহজ-সরল প্রাণোজ্জ্বল চলতি ভাষায়।

অদ্বৈতাচার্য তাঁকে অবতার করে তুলতে চায়। কিন্তু এই আরোপিত অবতারত্বকে নিমাই এক লহমায় নস্যাৎ করে দিয়ে অদ্বৈতাচার্যকে বলে : " দাদু তুমি সবার কাছে আমাকে অবতার বলে চালাতে চাইছ কেন বল তো? মতলবটা কী খুলে বলো! কেন আমি অবতার? ⋯ আমি ওসব অবতার টবতার কিছু নই, অবতারের শোক থাকে? অবতার তো শোক-তাপের উর্ধ্বে।⋯ নিমাই মিশ্র আর দশটা মানুষের মতো মানুষ। ⋯ কুলীন বামুনের ছেলে আমি – মরছি বউয়ের শোকে – আমি এখন যাব হেতের কাঁধে যবন তাড়াতে।"[১] গ্রাম্য ছেলের ভাষায়ও গ্রাম্যতা লক্ষনীয়। এই উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রের মুখে একেবারে চলতি ভাষা, যে ভাষায় গ্রামের লোক পরস্পর কথা বলে ঠিক সেই একেবারে কথ্য ভাষাই লেখক ব্যবহার করেছেন। এখানে ভাষার কোনো পরিমার্জিত সংস্করণ নেই। উপন্যাসটি পড়লে মনে হবে প্রতিটি চরিত্র যেন একেবারে জীবন্ত, আর তারা জীবন্ত হয়ে ওঠে মূলত তাদের মুখের ভাষায়। তবে কোথাও কোথাও সেই ভাষা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট হলেও উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে একেবারে মানানসই।

গ্রামের একটি উদ্ধত দুর্বিনীত বালক যে বৈষ্ণবদের দেখলেই ঠাট্টা করত , মশকরা করত, গ্রাম্য বয়োঃজেষ্ঠ বৈষ্ণবদের ভুলগুলি চোখে আঙুল দিয়ে ধরিয়ে দিত, পূজা-পার্বন, কীর্তনকে

ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছিল, পাড়ার স্ত্রী-বউদেরও পুজা-পাঠ-কীর্তনে সকলের সামনে টেনে এনেছিল, যবনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো, যার কাছে বাগদী-ডোম-চাঁড়াল-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবে কোনো ভেদ নেই; সেই গ্রামের চপল বালক স্ত্রী লক্ষ্মীর বিরহে উন্মাদপ্রায় হয়ে যায়। কোনোভাবেই সে স্ত্রীর মৃত্যুটাকে মেনে নিতে পারে না। তাকে শান্ত করার জন্য শচী দ্বিতীয়বার বিয়ের আয়োজন করে। কিন্তু নিমাই কোনোভাবেই এই বিয়েতে সম্মত হয় না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মায়ের কথা রাখতে সে বাধ্য হয়ে বিয়ে করে ঠিকই কিন্তু মন থেকে সে কখনওই এই বিয়েটা মেনে নিতে পারে না। শচীকে সে বলেছে – " তুমিই তো বউ চেয়েছিলে। তোমার ফাঁকা ঘর আমি ভরে দিয়েছি আর আমার কাছে কিছু চেয়ো না মা।"[২] নিমাই লক্ষ্মীর জায়গায় কখনোই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বসাতে পারে নি।

নিমাই নগর সংকীর্তন করে। মেয়ে-পুরুষ সকলকে একত্রিত করে কেবল ঘরেই নাম কীর্তন না করে নগরে নগরে কীর্তন করে বেড়ায়। লেখকের বর্ণনায় : "শ্রীবাস নিমাইয়ের মুখের দিকে চান, নিমাই বলে··· কিন্তু খুড়োমশায় আমার এখানে কীর্তন হলে তো জাতবেজাতের কোনো ভেদরেখা থাকবে না।

সেই হয়েছে মুশকিল বাবা! অতবড়ো পণ্ডিত বংশের ছেলে হয়ে কেন যে মন্ত্রের গুণ নষ্ট হতে দাও। যে নাম গোপনে জপ করার জিনিস, তুমি তাকে হাটে নামালে নিমাই?

এই পৃথিবীটা যাঁর তাঁর নাম করার অধিকার তাঁর সৃষ্ট সব জীবেরই আছে।"[৩]

এমনকি চাঁদ কাজীর বিরুদ্ধে বিরাট দল নিয়ে উপস্থিত হয়, আর সে কথা হোসেন শাহের কানে গিয়ে পৌঁছায়। সুলতানের বিরুদ্ধে লোক জুটিয়ে দাঙ্গা করার জন্য নিমাইকে সুলতানের রোষানল থেকে বাঁচাতে অদ্বৈত তাঁকে গয়া যাত্রার নির্দেশ দেয়। যদিও নিমাইয়ের গয়া যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল পিতার পিণ্ডদান। এই গয়াতেই ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় এবং তার কাছ থেকেই নিমাই গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা নেয়, তবে তা তাঁর জীবনের দীক্ষাও বটে। জননায়ক রূপে তাঁর ভূমিকা এবং তার পথ নির্দিষ্ট করে দেন ঈশ্বরপুরী : "নিজেকে জননায়ক হিসেবে তুমি কি প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে? পারনি, কারণ তোমার পথ ভুল। যুদ্ধ বিগ্রহ অথবা রাজ্যশাসকের ভূমিকা তোমার নয় – তোমার পথ ধর্মনায়কের পথ, যে পথে হাঁটতে হলে বহু অপেক্ষা মনের জোর বেশি প্রয়োজন হয়। আমি তোমাকে সেই পথের সন্ধান দিতে চাই বিশ্বম্ভর। যে কাজ তুমি আরম্ভ করেছ, যিনি সেই কাজ সুষ্ঠুভাবে করাতে পারেন তুমি তাঁর ভজনা কর। বৈষ্ণবের বৈষ্ণব হও তুমি। দেখবে তাঁকে পেলেই তোমার আর কোনো কিছুর জন্যই খেদ থাকবে না। ··· একমাত্র তুমিই পারবে অপধর্মের বিনাশ করে সত্যধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে। সেই ধর্মযুদ্ধে তুমিই হবে আমাদের সেনাপতি।"[৪] এরপরই নবদ্বীপে ফিরে নিমাই সন্ন্যাস নেয়।

উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র একেবারে রক্তমাংসে গড়া। তাদের আচার-আচরণ, কথা-বার্তা, সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ, প্রেম-ভালবাসা নিছক সাধারণ, অতি সাধারণ মানুষের মত। পাড়াঁগায়ে শচীর দাপট, তার জেদ, বধূর প্রতি ঈর্ষা, সন্তানকে সুখী করতে একটি মায়ের চরম স্নেহোৎকর্ষই শচীর চরিত্রে লক্ষ করা যায়। লক্ষ্মীকে ভালবেসে নিমাই বিয়ে করেছিল। বউয়ের প্রতি ছেলের অধিক ভালবাসা তার মনে ঈর্ষার সঞ্চার করেছে। লক্ষ্মীকে শচী কোনোদিনই মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি।আবার এই মা-ই পত্নীশোকে সন্তান বিবাগী হয়ে যাচ্ছে দেখে সংসারে তার মন বসাতে জোর করে আবার বিয়ে দিয়েছে। যখন সে দেখেছে যে নববধূর প্রতি ছেলের কোনো আকর্ষণ নেই তখনও নানাভাবে ছেলে-বউকে সে এক করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয় নি। নিমাই সন্ন্যাস নিলে ছেলেকে ঘরে ধরে রাখতে না পারার জন্য এক মায়ের মন নববধূকেই দোষারোপ করেছে, আর মৃত লক্ষ্মীর প্রতি কটূক্তি করেছে। এখানে একেবারে একটি অতি সাধারণ পুত্রবৎসল, পুত্রস্নেহে অন্ধ মায়ের মনোভাবই লেখক তুলে ধরেছেন গ্রাম্য ভাষায়। বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিযোগে ঝাঁঝিয়ে উঠে শচী উত্তর দেয় : " তোর দুটি পায়ে পড়ি বউ তুই এবার ক্ষ্যামা দে। শিঙি মাছের মতো আমাকে অষ্টপ্রহর আর বিঁধিস না। আমি মানছি তোমাকে ঘরে আনা আমার ঘাট হয়েছে। মায়ের বুক, বউ মরা ছেলের শুকনো মুখ আমি সইতে পারি নি। এ-দেশে কি আর কারও বউ কোনোদিন মরে না? তারা কি সবাই সন্ন্যাসী হয়ে যায়? ... ভেবেছিলাম সে হতভাগী গেছে যাক, তোর রূপ দিয়ে, গুণ দিয়ে তার মনটা তুই আবার ঘরমুখো করতে পারবি। পারলি না। ⋯ কীরকম বউ তুই?

বিষ্ণুপ্রিয়া চোখে আঁচল দেয়, উনি তো কোনোদিন আমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকান নি মা।

শচী রেগে যান, সে তো তোমার দোষ মা! একজন মন ভাঙা মানুষকে তুমি যদি তার মনটাকে নিজের দিকে ঘোরাতে না পারো সে দোষ তো তোমারই। তুমি যে শুধুই রাঙা মুলো তা আমি যদি আগে জানতাম!"[৫] – এইভাবে এক মায়ের স্নেহ-ভালোবাসা, সন্ন্যাসী পুত্রের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছেন লেখক।

বিষ্ণুপ্রিয়ার ধৈর্য্য, স্থৈর্যের নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। স্বামীর জন্য তাঁর নিরন্তর উদ্বিগ্নতা, স্ত্রীসুখ থেকে বঞ্চনা, শাশুড়ীর কটাক্ষ, দেবতাপ্রতিম স্বামীর প্রতি একান্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা, একাকী সধবা জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা সব কিছু মিলিয়ে চরিত্রটি একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

লেখকের চরিত্র সৃষ্টির দক্ষতা অসাধারণ। নিত্যানন্দ চরিত্রটি নির্মাণে লেখকের বর্ণনা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখক তাঁকে রাঢ়ী রূপে অঙ্কণ করেছেন এবং তার মুখে রাঢ়ী ভাষার ব্যবহার উপন্যাসটিকে অনেকাংশে আঞ্চলিকতা দান করেছে। তার ভাষা ব্যবহার, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র

সবদিক থেকে নিত্যানন্দকে লেখক একেবারে লাগামছাড়া অবধূত চরিত্র রূপে অঙ্কণ করেছেন। এইভাবে প্রতিটি চরিত্র লেখকের নিপুণ বর্ণনা কৌশলে একেবারে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

সন্ন্যাস নিয়ে নিমাই পুরুষোত্তম যাত্রা করে। শ্রীক্ষেত্রে পৌঁছে প্রথমেই জগন্নাথ দর্শনের অভিলাষে সে দ্বাররক্ষীদের নিষেধ উপেক্ষা করে গরুড়স্তম্ভ পার হয়ে জগন্নাথের রত্নবেদীর নিকটে গিয়ে দু'নয়ন ভরে জগন্নাথ দর্শন করে ভাবে বিভোর হয়ে যখন জগন্নাথকে স্পর্শ করতে যাচ্ছে এমন সময় মন্দিরের প্রতিহারীদের বেত্রাঘাতে চৈতন্য মন্দিরের সম্মুখেই অচৈতন্য হয়ে পড়ে। সংবাদ পেয়ে প্রথম ছুটে আসেন রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। তিনি এই মুণ্ডিত মস্তক গৈরিক বসনধারী দেবপ্রতিম বাঙালি সন্ন্যাসীকে নিয়ে যান এবং বেদান্ত শিক্ষা দান করেন। কিন্তু দুর্গম এই বেদান্তের জ্ঞান ছাড়াই কিভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের মুক্তি লাভ সম্ভব চৈতন্য সেই পথের সন্ধান করেন : নিমাই বলে, দাদামশাই আমি অর্বাচীন, শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, কিন্তু সর্বজনের কাছে দুর্গম তোমার বেদান্ত ছাড়াও বোধহয় মোক্ষের সহজ পথ আমি খুঁজে পেয়েছি। ··· অজ্ঞানী ভক্ত যদি বলে আমি তুমি হতে চাই না, প্রভু, তুমি আমার হও?"[৬] তাই তিনি সর্বমানবের উদ্ধারের নিমিত্ত প্রেমভক্তির পথ অবলম্বন করেন।

অন্যদিকে সেই সময় উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র ঘরে বাইরে শত্রুর দ্বারা জর্জরিত। প্রাসাদে অবিশ্বাসিনী স্ত্রী এবং বিদ্যাধর, প্রাসাদের বাইরে পঁয়ত্রিশশ'র অধিক পাণ্ডা এবং গোচ্ছিকা বাহিনী, উত্তরে হোসেন শাহ, দক্ষিণে রাজা কৃষ্ণদেব। ধর্ম এবং রাজনীতি পরস্পরবিরোধী মনে করেই হয়তো প্রতাপরুদ্র চেয়েছিলেন ধর্ম থাক মন্দিরের চার দেওয়ালের মধ্যে আর রাজনীতি বালিশাহির প্রাসাদে। ফলে কোনো গুরুতর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি পাণ্ডাদের ভূমিকা স্বীকার করতে চান নি। কিন্তু পরম্পরার এই উল্লঙ্ঘন পাণ্ডারা মেনে নিতে পারে নি। আবার আরেকদিকে বিশ্বাসঘাতক গোবিন্দ বিদ্যাধর, একদিন যাকে তিনি পথ থেকে তুলে এনে প্রাসাদে ঠাঁই দিয়েছিলেন, দেশের সৈন্যদলের সর্বাধিনায়ক করেছিলেন, সর্বোপরি যে তার নিকট আত্মীয়, সে যে একদিন তাঁর ভয়ংকর বৈরী হয়ে উঠবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। অপরদিকে কৃষ্ণদেব রায় উদয়গিরি দখল করে নেয়। তা পুনরুদ্ধার করতে রাজা দক্ষিণে যুদ্ধ যাত্রা করে। ফিরে এসে রাজা দেখেন উড়িষ্যা তখন ছন্নছাড়া। এইরকম পরিস্থিতে পড়ে রাজা কোনো মহামানবের অপেক্ষা করেন, স্ত্রী পদ্মাবতীকে বলেন "আচ্ছা পদ্মা, এমন তো কত হয়, শুনেছি কোনো তীর্থে এমন কোনো মহামানবের সঙ্গে যদি দেখা হয়, যিনি আমাকে সত্য পথের সন্ধান দেবেন ···"[৭]। এমন সময় উড়িষ্যায় আগত নবীন সন্ন্যাসী চৈতন্যদেবের কথা তিনি শোনেন এবং তাঁর দর্শনপ্রার্থী হয়ে কৃপা লাভের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর রাজদর্শন নারীদর্শের ন্যায় বিষতুল্য : "সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদর্শন।/ স্ত্রী দরশন সম বিষের ভক্ষণ।"[৮] তাই কোনো ভাবেই তিনি রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান না। উপরন্তু বলেন " ··· সন্ন্যাসী হলেও আমার কোনো দৈবশক্তি আয়ত্তে নেই, যা

দিয়ে আমি রাজার বিপত্তারণ করতে পারি।”[৯] কিন্তু অনেক চেষ্টা করলেও চৈতন্য রাজনীতি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। তিনি ধর্ম ও রাজনীতিকে পরস্পরবিরোধী মনে করলেও ধর্মেও রাজনীতি মিশে থাকে। চৈতন্য দক্ষিণদেশ ভ্রমণে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বাসুদেব সার্বভৌম তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুমান করেন “ কৃষ্ণের খোঁজে লোকে সাধারণত মথুরা কী শ্রীবৃন্দাবন যায়, তুমি এখানে কেন এসেছ তা অনুমান হলেও একটি সিদ্ধান্তে আমি পৌঁছেছি – ওড্রদেশে এখনও হিন্দু রাজত্ব, দক্ষিণেও কোনো কোনো দেশে তাই। তুমি কি বেছে বেছে হিন্দু রাজুত্বেই তোমার হরিনাম প্রচার করতে চাও? ⋯ রাজারা রাজ্য জয় করে তরবারির সাহায্যে, তুমি কি তোমার ধর্মকেই রাজ্য জয়ের হাতিয়ার করতে আগ্রহী?”[১০]। হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধার ও বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা তাঁর লক্ষ্য ঠিকই, তবে তাঁর উদ্দেশ্য আরও বৃহৎ সর্বধর্মসমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য। জাতি-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ দূর করে সকলকে সমমর্যাদা দান ও অখণ্ড ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করাই তাঁর বৃহৎ লক্ষ্য ছিল। তাই তিনি একই সঙ্গে ধর্মনায়ক, জননায়ক ও সমাজনায়ক। এমনকি সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহকও বটে। এইভাবে সাম্প্রতিককালেও নায়ক রূপে চৈতন্যদেব ও তাঁর গভীর প্রভাব বাংলা কথাসাহিত্য জগতে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। সমসাময়িক যুগের প্রেক্ষিতে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে রচিত এই ধরণের একটি উপন্যাস সত্যিই আধুনিক পাঠককে সম্পূর্ণ ভিন্ন আস্বাদ দান করে।

তথ্যসূত্র

(১) লস্কর বসন্ত, মিথের মানুষ শ্রীচৈতন্য, প্রথম খণ্ড, অভিযান পাবলিশার্স, জানুয়ারী ২০২০, পৃ- ১৭৫-১৭৭।

(২) তদেব, পৃ- ২১৭।

(৩) তদেব, পৃ- ১৮৪।

(৪) তদেব,পৃ- ২৩০।

(৫) তদেব, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ-১৩।

(৬) তদেব, পৃ-৫৪।

(৭) তদেব, পৃ-৩৪।

(৮) সেন সুকুমার ও মুখ্যোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, একাদশ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৩৯২, পৃ-২১১।

(৯) লস্কর বসন্ত, মিথের মানুষ শ্রীচৈতন্য, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৩।

(১০) তদেব, পৃ-৬৪।

সপ্তম অধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পে চৈতন্যপ্রসঙ্গ ও বৈষ্ণব অনুষঙ্গ

সাহিত্য তথা শিল্প মাত্রই জীবন-সম্ভব; আর প্রতিকূলতার পটভূমিতে মানুষের আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসারের চেষ্টাতেই জীবনের বিকাশ এবং পরিণতি। মানুষের চেতন বা অবচেতন এই আকাঙ্খার আলোকে শিল্পী সাহিত্যিক নিজ নিজ সৃষ্টির মধ্যে সমসাময়িক জীবন সংগ্রামের পরিণাম ব্যঞ্জনা রচনা করেন। অতএব জীবন চেতনা তথা জীবন সংগ্রামের পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর জীবন সৃষ্টির প্রকৃতিও পরিবর্তিত হয়। নূতন সংগ্রামের পরিচয় দিয়ে নূতন রূপ সৃষ্টির প্রেরণা থেকে জন্ম নেয় সাহিত্যের বিচিত্র কলাঙ্গিক।

পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে কথাসাহিত্যের আধুনিকতার অঙ্গণে ছোটগল্পের আবির্ভাব। প্রাচীন ও মধ্যযুগের তথা নবজাগরণ পর্বের সমূহ সাহিত্য কলার মধ্যেই যে ছোটগল্পের রূপাবয়ব প্রচ্ছন্ন ছিল, জারিত হচ্ছিল যার প্রকরণ প্রযুক্তি, সেই ছোটগল্প আত্মপ্রকাশ করল তাঁর স্বরূপে। সারা বিশ্ব সাহিত্যে কথাসাহিত্যের ধারায় ছোটগল্প বস্তুত নতুন এক শিল্পশাখা। নতুনত্ব তাঁর অন্তঃস্বভাবে যেমন, তেমনি তাঁর পোশাক পরিচ্ছেদেও। উপন্যাসের চেয়ে ছোটগল্পের জীবনভূমি আরও এক ধাপ প্রাগ্রসর। লক্ষ করলে দেখা যাবে একটি জীবনকে অনন্ত জটিলতার মধ্যে পরিকীর্ণ করে শাশ্বত জীবনের মূর্তি রচনা করে উপন্যাস। আর অনন্তে প্রসৃত জীবনের রূপকে একটি মুহূর্তের গভীর অতলে একান্ত করে বিম্বিত-সীমা ব্যঞ্জিত করে ছোটগল্প। বিন্দুতে সিন্ধুর আস্বাদ দানই ছোটগল্পের লক্ষ্য। ভূদেব চৌধুরীর মতে "উপন্যাস একটি আদ্যন্ত জীবনের মধ্যে অতলান্ত অন্তহীন জীবনকে প্রতিফলিত করেছে;- ছোটগল্প একটি মানব জীবনের যে কোনো একটি মাত্র মুহূর্তের অভিভবতার গহনে অখণ্ড সম্পূর্ণ জীবনকে বিম্বিত করেছে।"[১] ছোটগল্পের রচনায় থাকে ব্যঞ্জনাধর্মিতা। যেন একটি জীবনের বিশেষ মুহূর্তের অবস্থান, অভিঘাত বা আবেগ সর্বদেশকালের জীবনভূমিতে উৎক্রমণ করতে পারে। সীমায়িত জীবনের ক্ষণবৃন্তে অনন্ত জীবনের ব্যঞ্জনা রচনাতেই ছোটগল্পের রূপশৈলীর বিশিষ্টতা যেখানে মুহূর্তের বিন্দুমূলে জীবনসিন্ধুর পূর্ণচেতনা ব্যঞ্জিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের প্রথম অসচেতন বিকাশ সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজনের পথ বেয়ে। সংক্ষিপ্ত পরিসরের সীমায় সাহিত্যের সকল শাখারই একটি পূর্ণাঙ্গ আস্বাদন পরিবেশন করা সাময়িক সাহিত্য পত্রের উদ্দেশ্য। উপন্যাসের আধারে গল্প রস পূর্ণাঙ্গ হলেও সাময়িক পত্রিকার বহু রুচি চারণের পক্ষে তার পরিধি অতিমাত্রিক। অতএব সীমিত পরিসরে অনুবৃত্তিহীন সম্পূর্ণ গল্প পরিবেশনের আকাঙ্খাতেই ছোট আকৃতির উপন্যাস বা বড়গল্প (Novelet) জাতীয় রচনা বাংলা সাহিত্যে

বহুল প্রচলিত হয়ে পড়ে। এই সব ছোট আকারের গল্পের বাহুল্য থেকেই শিল্পীর অবচেতনার মধ্যে অজ্ঞাত মুহূর্তে বাংলা ছোটগল্প প্রথম জন্ম লাভ করে। অতএব সাময়িক পত্রিকাই বাংলা ছোটগল্পের যথার্থ ধাত্রী বলা যায়।

ছোটগল্প লেখার প্রয়োজন ও প্রেরণা প্রথম যুগিয়েছে 'বঙ্গদর্শন'। বাংলা ছোটগল্পের প্রথম যথার্থ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ। তাঁর ছোটগল্পে অণুবিশ্বের সঙ্গে মহাবিশ্বের সম্মিলন সার্থকতা লাভ করেছে। ব্যক্তিগত ভাবে কবি যখন গ্রামের প্রাণের কাছে এসে পৌঁছালেন, তখন সেই অন্তর্লীন সহজ জীবনানুরাগই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সিঞ্চিত হয়ে নবীন শিল্পরূপ ধারণ করল ছোটগল্পে। পল্লীজীবনের হৃদয়ের দ্বার তিনি উন্মোচিত করলেন ছোটগল্পে । প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বিশেষত বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি কবিগুরুর গভীর অনুরাগের কথা আমরা সকলেই জানি। কেবল বৈষ্ণব পদাবলীই নয় বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য এবং বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রাণপুরুষ চৈতন্যদেবের প্রভাবও তাঁর সাহিত্যে লক্ষ করা যায়।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ষোড়শ শতকে বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতি, চিন্তা-চেতনায় যে নবজাগরণ ঘটেছিল তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব আজও প্রবহমান। চৈতন্যদেব যে নব্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন তার মূল কথাই ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে সমস্ত মানুষকে প্রেমভক্তি বিতরণ। মহাপ্রভুর এই উদার প্রেমধর্মই গ্রাম বাংলার জনজীবনকে বিশেষত নিম্নশ্রেণির মানুষকে আলোড়িত করেছিল। গৌরাঙ্গের বর্ণভেদ বিরোধী মানবিক উদারনীতির আহ্বানে অনুপ্রানিত, ভক্তির অর্ন্তনিহিত সাম্য ও মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ সংখ্যা গরিষ্ঠ নিম্নবর্ণ ও বর্ণহীন পল্লীবাংলার মানুষের জীবনের সত্য চিত্রই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বাংলা ছোটগল্পগুলিতে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই সবুজপত্র পত্রিকায় প্রকাশিত 'বোষ্টমী' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ আনন্দি বোষ্টমীর মধ্য দিয়ে যথার্থ বৈষ্ণবের এক স্বতন্ত্র রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। বোষ্টমীর সহজ সরল জীবনধারণ, কথাবার্তা, ব্যবহার, ঈশ্বরের প্রতি অকুণ্ঠ ভক্তি, যে কোনো সুন্দরের মধ্যে ভগবানের প্রকাশ উপলব্ধি – তাকে যথার্থ বৈষ্ণবীয় প্রমের মূর্তিস্বরূপিনী করে তুলেছে। লেখক তাঁর মধ্য দিয়ে এক নৈব্যক্তিক সর্বজনীন প্রেমভক্তির রূপ উপলব্ধি করেছিলেন। বোষ্টমীকে দেখে বৈষ্ণব ধর্ম সম্পর্কে লেখকের যে সত্য-উপলব্ধি হয়েছিল, হেমন্তবালা দেবীকে লেখা একটি চিঠিতে সে স্বীকারোক্তি রয়েছে " মানুষের সেবাতেই ঈশ্বরের সেবা। শিলাইদহের বৈষ্ণবীর আচরনে এই সত্যের আভাস পেয়েছিলাম।"[২] গল্পে বোষ্টমীর কথাতেও তারই উল্লেখ রয়েছে--- " তাহার কথাটা এই যে , শুধু মত লইয়া কী হইবে- সত্য যে চাই। ভগবান সর্বব্যাপী। এটা একটা কথা, কিন্তু যেখানে আমি তাহাকে দেখি সেখানেই তিনি আমার সত্য। ..... এতদিন পরে নিজের দৃষ্টির অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া এই শাস্ত্রহীনা

স্ত্রীলোকের দুই চক্ষুর ভিতর দিয়া সত্যকে দেখিলাম। ভক্তি করিবার ছলে শিক্ষা দিবার এ কী আশ্চর্য প্রণালী।।"[৩] জীবের মধ্য দিয়েই যে রসস্বরূপ ঈশ্বরের প্রকাশ বৈষ্ণবীর ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথের কাছে তা আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কোনো ধর্মনীতি প্রবুদ্ধ বৈষ্ণব ভাবাদর্শের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন নি, নিজস্ব ভাবকল্পনায় এক বিশ্বজনীন মূল্যমানে তাকে গ্রহণ করেছিলেন। হেমন্তবালাদেবীকে তিনি লিখেছিলেন –"আমার মধ্যে বৈষ্ণবকে তুমি খোঁজো। সে পালায় নি। কিন্তু তার সঙ্গেই আছে শৈব ভিখারী এবং সন্ন্যাসী। রসরাজের বাঁশিও বাজে নটরাজের নৃত্যও হয়।"[৪]

এ থেকে বোঝা যায় কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মচেতনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আবদ্ধ নয়। তাঁর কাছে ধর্ম মানেই মনুষ্যত্ব যেখানে মানুষের পরিপূর্ণতার বিকাশ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য চৈতন্যদেবও কিন্তু প্রচলিত বৈষ্ণবধর্মের তত্ত্বকে বড় করে দেখেন নি। শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিনিষেধকে তিনি কখনও গুরুত্ব দেন নি। তিনি তত্ত্ব নিরপেক্ষ কেবল প্রেমভক্তির দ্বারাই সকল জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষকে একত্র সম্মিলিত করতে চেয়েছিলেন। চৈতন্যদেবের এই আদর্শের প্রতিফলনই আমরা বৈষ্ণবী চরিত্রে লক্ষ করে থাকি।

এই বোষ্টমীর বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর 'শিলাইদহ ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে বোষ্টমীর নাম সর্বখেপি। শিলাইদহের একটি বিশাল তমাল গাছের তলায় তাঁর কুটির। গেরুয়া শাড়ি পরে, এক আঁচল ফুল নিয়ে তিনি মাঠের আলপথে খঞ্জনি বাজিয়ে 'গৌর গৌর' গান গেয়ে যেতেন। এই অঞ্চলের নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বারো চোদ্দ জন শিষ্য। গ্রামের ভদ্র পাড়ায় বোষ্টমী কারোর সঙ্গে মিশতে পারতেন না, কারণ তাঁর 'সহজিয়া ধর্মমত ও ক্রিয়াকাণ্ড' ভদ্র সমাজের অসহ্য ছিল। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকলে বোষ্টমী দুবেলা কুঠি বাড়িতে গিয়ে তাঁর পাতের প্রসাদ পেতেন। তিনি নিজেই শুধু ফুল ভালবাসতেন না, ফুলের মালা গেঁথে রবীন্দ্রনাথকে দিতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি ভক্তিতে 'গৌর গৌর' বলে মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন আর গুনগুনিয়ে গেয়ে উঠতেন 'গৌরসুন্দর মোর'। 'চোখে দেখা বাস্তবে জানা' এই ঘটনাকেই 'আপন মনের মাধুরী মিশায়ে' কবি রচনা করেছেন 'বোষ্টমী' গল্পটি।

'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি' তে রবীন্দ্রনাথ সর্বখেপিকে স্মরণ করে লিখেছেন : " বৈষ্ণবী আমাকে বলেছিল, 'কার বাড়িতে বৈরাগীর কখন অন্ন জোটে তার ঠিকানা নেই; সে অন্নে নিজের জোর দাবি খাটে না, তাই তো বুঝি এ অন্ন তিনিই জুগিয়ে দিলেন।"[৫] আবার জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩ এ 'বিশ্বভারতী' প্রবন্ধে সংকলিত ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে তিনি অনুরূপ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে লিখেছেন : "বাংলাদেশের পল্লীগ্রামে যখন ছিলাম, সেখানে এক সন্ন্যাসী আমাকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কুটির নির্মানের জন্য আমার কাছে ভূমি ভিক্ষা নিয়েছিলেন - ··· তিনি আমাকে বলেছিলেন, নিজের ঘরে অন্নে আত্মাভিমান জন্মে –

মন থেকে এই ভ্রম কিছুতে ঘুচতে চায় না যে, এই অন্নের মালিক আমিই, আমাকে আমিই খাওয়াচ্ছি। কিন্তু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে যে অন্ন পাই সে অন্ন ভগবানের – তিনি সকল মানুষের হাত দিয়ে সেই অন্ন আমাকে দেন, তার উপরে আমার নিজের দাবি নেই, তাঁর দয়ার উপর ভরসা।”[৬]

একই প্রসঙ্গ বোষ্টমী গল্পে বর্ণিত হয়েছে এইভাবে : বোষ্টমী কবিকে বলেছিল : “ … ‘আমার মাগিয়া খাওয়া অন্নই অমৃত।’ ‘তাহার কথার ভাবখানা আমি বুঝিলাম। প্রতিদিনই যিনি নিজে অন্ন জোগাইয়া দেন ভিক্ষার অন্নে তাঁহাকেই মনে পড়ে। আর, ঘরে মনে হয়, আমারই অন্ন আমি নিজের শক্তিতে ভোগ করিতেছি।’… ”[৭] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য চৈতন্যদেবও সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভিক্ষালব্ধ অন্নেই জীবন কাটাতেন। এই ভিক্ষাবৃত্তি বা মাধুকরী বৈষ্ণবদের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন।

আনন্দী বোষ্টমীর বৈষ্ণবতা শাস্ত্রীয় নয়, প্রাকৃত। সে তার গুরুকে দেখেছে গৌরের মূর্তিতে, আর তাই রবীন্দ্রনাথের সামনে গুরুর কথা বলতে গিয়ে সে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গেয়ে উঠেছে গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ --

“অরুণ কিরণখানি তরুণ অমৃতে ছানি

কোন বিধি নিরমিল দেহা।”[৮]

গল্পে দেখা যায় যে গুরুঠাকুরের প্রতি আনন্দী বোষ্টমী তার হৃদয়ের ভক্তি-ভালবাসা উৎসর্গ করেছিলেন সেই গুরু কিন্তু তার ভক্তির মান রক্ষা করতে পারেন নি। উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে ধর্মাধিকারি গুরু ঠাকুরের গোপন লালসাবৃত্তি। পরিণামে সংসার ত্যাগ করতে হয়েছে আনন্দী বোষ্টমীকে।

রবীন্দ্রনাথ বার বার সচেতন করে দিয়েছেন যে রসসম্ভোগের মাত্রাতিরিক্ততা পরিণামে বিকারের রূপ নেয়। এর দৃষ্টান্ত আমরা ‘চতুরঙ্গ’ উপন্যাসে নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার মধ্যে পেয়েছি। তাছাড়া জীবনবিচ্ছিন্ন রসচর্চার দুর্বলতার দিকটি ‘উদ্ধার’ গল্পের পরমানন্দস্বামীর চরিত্রেও দেখতে পাই। স্বামীসুখ বঞ্চিতা পুত্রহীনা গৌরী সংসারের দুঃখ-কষ্ট, স্বামীর সন্দেহভাজন অন্যায় অত্যাচারে বিতিক্ত হয়ে গুরুর সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছিল কিন্তু অচিরেই তার সামনে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে ভক্তির আড়ালে গুরুদেবের কামনার চৌর্যবৃত্তি, নিঃশেষিত হয়ে যায় গৌরীর সমস্ত ভক্তি, বিষপান করে তাকে সহমৃতা হতে হয়।

বৈষ্ণবধর্মের এই দুর্বলতার দিকটি সম্পর্কে চৈতন্যদেবও ওয়াকিবহাল ছিলেন। এজন্য তিনি নিজে যেমন কঠোর সংযম রক্ষা করে চলতেন, তেমনি শিষ্যদেরও সংযমী জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত

করতেন। কোনোরকম দুর্বলতা প্রকাশ পেলে তিনি তিরস্কার করতে ছাড়তেন না। হরিদাসকে তাঁর অসংযমী আচরণের জন্য শাস্তি দানের কথা আমরা সকলেই জানি। আবার, একদা জগদানন্দ তাঁর জন্য সুগন্ধি তেল নিয়ে এলে তিনি জগদানন্দকেও যারপরনাই তিরস্কার করেন। 'চৈতন্যচরিতামৃতের' অন্ত্যলীলায় রয়েছে : "প্রভু কহে সন্ন্যাসীর তৈলে নাহি অধিকার।/ তাহাতে সুগন্ধি তৈল পরম ধিক্কার।।/ জগন্নাথে দেহ তৈল দীপ যেন জ্বলে।/ তাঁর পরিশ্রম হৈব পরম সফলে।।"[৯]

চৈতন্যদেব যে কীর্তন গানের মাধ্যমে সমগ্র বাংলা তথা ভারতবর্ষে বিরাট প্লাবন নিয়ে এসেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সানন্দে সেই কীর্তনকে গ্রহন করে তাকে আরও ব্যাপ্তি দিলেন সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ; কখনো চরিত্রের মনঃবিশ্লেষণে, কখনো পরিস্থিতি পরিস্ফুটনে, কখনো বা প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনায়। কখনো মহেন্দ্রের মনের প্রসন্নতা বোঝাতে লেখক বৈষ্ণব ভিক্ষুকের খোল করতাল বাজিয়ে কীর্তন গানের কথা উল্লেখ করেন (২৯ পরিচ্ছেদ, 'চোখের বালি'), কখনো বিনয়ের মনোভাব প্রকাশে বাউল সঙ্গীতের প্রসঙ্গ আনেন : "আলখাল্লা পরা একটা বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল _ 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়,/ ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতাম পাখির পায়'।"[১০] (গোরা,প্রথম পরিচ্ছেদ)। আবার 'পোস্টমাস্টার' গল্পে পল্লীপ্রকৃতির নিপুণ বর্ণনায় উঠে আসে বাউলদের কীর্তন গানের প্রসঙ্গ : "সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিত, দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত ⋯ ।"[১১] আবার 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে নিবারণের নিরুদ্বিগ্ন জীবন যাত্রার পারিপার্শ্বিকে এসেছে 'বৈষ্ণব ভিখারির গানে'র প্রসঙ্গ।

সর্বোপরি কীর্তন গানের সার্থক ব্যবহারে 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের পরিণতিতে যে ট্র্যাজেডি তা করুণ মধুর হয়ে ওঠে। জেলফেরত শশিভূষণকে তার প্রিয়জনই যে আহ্বান করে নিয়ে যাচ্ছে তারই গীতিমধুর ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয় এই পদটিতে –

''এসো এসো ফিরে এসো – নাথ হে, ফিরে এসো

আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত,

বঁধু হে ফিরে এসো।''[১২]

বৈষ্ণব ভিখারির এই গানের ছন্দে শশিভূষণের হৃদয় আন্দোলিত হয়ে ওঠে এবং সে আপন মনে পদের পর পদ রচনা করতে থাকে। কাহিনির পরিণতিতে বিধবা গিরিবালার সঙ্গে তাঁর মিলন, উভয়ের চোখের জলে প্রেমানুরাগের করুণ রাগিণী যেন গীতিমূর্চ্ছনায় রূপান্তরিত। গল্পের শেষ বাক্যটিতে রবীন্দ্রনাথ

লিখেছেন – "সেই কীর্তনের দল ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে করিতে অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে লাগিল – 'এসো এসো হে'।"[১৩] শশিভূষণের জীবননাট্যের কঠিন বাস্তবতার শেষে এই ভাবোল্লাস এক বিশেষ মাত্রায় পাঠকের মনকে দুলিয়ে দেয়। আর এভাবেই চৈতন্য প্রবর্তিত কীর্তন রবীন্দ্রনাথের হাতে নব তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

আবার 'জয়- পরাজয়' গল্পে অমরাপুরের রাজা উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর রাধা-কৃষ্ণের বিরহ-মিলনের পদ রচনা করতেন। তিনি যে গানগুলি গাইতেন সেগুলি ছিল ভক্তহৃদয়ে সত্য ও সম্পূর্ণ। " গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ। ··· অমরাপুরের রাজা হইতে দীনদুঃখী প্রজা পর্যন্ত সকলেই আপনার হৃদয়ে হৃদয়ে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার গান সকলেরই মুখে মুখে।"[১৪] গল্পটি বৈষ্ণব ভাবাবহে পরিমণ্ডিত। গল্পের নায়ক রাজসভা কবি শেখর আদ্যন্ত বৈষ্ণব ভাবরসে পরিস্নাত। শেখরের আচার-আচরণ, বিনম্রভাব, অনুচ্চকণ্ঠ, কোমল দৃষ্টি, মুখের মাধুর্য ভাব সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা বৈষ্ণবীয় বিনয় নম্রতা প্রকাশিত। পুণ্ডরীকের সঙ্গে কাব্যযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সময় শেখরের আচরণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য : "শেখরও ভক্তি, প্রণয়, অভিমান এবং একপ্রকার সকরুণ সংকোচপূর্ণ দৃষ্টি রাজার দিকে প্রেরণ করিল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।"[১৫] তারপর ধীরে ধীরে সে তার সাধ্যানুযায়ী পাণ্ডিত্য দিয়ে রাজার যুদ্ধ বিগ্রহ, শৌর্যবীর্য, মহৎ অনুষ্ঠান, দানের মাহাত্ম্য সব কিছু মিলিয়ে রাজকাহিনীকে সুরে ছন্দে মিলিয়ে বর্তমান কালে যেভাবে উপস্থিত করে তাতে রাজা থেকে প্রজা সকলে মুগ্ধ হয়ে যায়। অবশেষে রাজার প্রতি ভক্তি বিনম্র চিত্তে সে নিবেদন করে "মহারাজ, বাক্যেতে হার মানিতে পারি, কিন্তু ভক্তিতে কে হারাইবে।"[১৬]

রবীন্দ্রনাথ শেখরকে শুধুমাত্র একজন ভক্ত বৈষ্ণব কবি করেই আঁকেন নি, তার গানেও বৈষ্ণব পদাবলীর আবেষ্টনী রচনা করেছেন। পুণ্ডরীকের সঙ্গে কাব্যযুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে শেখর যে গান ধরেছেন তা বৃন্দাবনের গান, বৃন্দাবনের চিরকালীন বংশীধ্বনি – " বৃন্দাবনে প্রথম বাঁশি বাজিয়াছে, তখনো গোপিনীরা জানে না কে বাজাইল, জানে না কোথায় বাজিতেছে, ··· একবার মনে হইল কে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে; মনে হইল অস্তাচলের প্রান্তে বসিয়া কে বিরহ শোকে কাঁদিতেছে; মনে হইল যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল; ··· অন্তরে বাহিরে বাঁশি সর্বত্র বাজিতে লাগিল- বাঁশি কী বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না ··· কেবল দুটি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুজল জাগিয়া উঠিল···।"[১৭] শেখর নিজের কাব্যরচনার ভাবজগতে এতই নিমগ্ন যে বাইরের চাতুর্যের প্রতি তাঁর কোনো লক্ষই ছিল না। রাজার বন্ধুত্ব, রাজকন্যা অপরাজিতার অন্তরালবর্তী প্রেম, তাঁর কাব্যরচনার প্রেরণা। কাব্যযুদ্ধে শেখরের ভক্তিবিনম্র ভাবুক হৃদয় তাই দাক্ষিনাত্যের দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কবি পুণ্ডরীকের দাম্ভিকতার সামনে দাঁড়াতেই পারে নি। দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শেখরের গানের প্রত্যুত্তর হিসাবে শুষ্ক বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শনকে বেছে নিয়েছিলেন,

বৈষ্ণবপদাবলীর রসমাধুর্যের ধারে কাছেও তিনি ঘেঁষেন নি। রাধাকৃষ্ণের নীরস তত্ত্বব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন।

দ্বিগীজ্বয়ী পুণ্ডরিকের এ হেন পাণ্ডিত্য দেখে আমাদের মনে পড়ে যায় নবদ্বীপে চৈতন্যের সমকালে এক দ্বিগিজয়ী পণ্ডিত এসেছিলেন। পরম অহংকারী এই ব্যক্তি নিজেকে সরস্বতীর বরপুত্র বলে মনে করতেন। 'চৈতন্যভাগবতে' আছে : "হেনকালে তথা এক মহা দ্বিগ্বিজয়ী।/ আইল পরম অহঙ্কার যুক্ত হই।/ সরস্বতী মন্ত্রের একান্ত উপাসক···।"[১৮] এই অহঙ্কারী দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয় করেছিলেন নবদ্বীপের বিদ্যারত্ন নিমাই পণ্ডিত। তিনি দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের ব্যাখ্যা খণ্ডন করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন – " তোমার যে শব্দের গ্রন্থন অভিপ্রায়।/ তুমি বিনা বুঝাইলে বুঝন না যায়।/ এতেক আপন কিছু করহ ব্যাখ্যান।/ যে শব্দে যে বল তুমি সেই সুপ্রমান।।"[১৯] তবে চৈতন্যদেব কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে পণ্ডিতের দর্পচূর্ণ করেছিলেন – " বিপ্র প্রতি বলিলেন মধুর বচন।/ আজি চল তুমি শুভ কর বাসা প্রতি।/ কালি বিচারিব তোমার সংহতি ···। এই মত প্রভুর কোমল ব্যবসায়।/ যাহারে জিনেন সেহ দুঃখ নাহি পায়।।"[২০]

'জয়-পরাজয়' গল্পে পুণ্ডরীকের রাধাকৃষ্ণের তত্ত্ব ব্যাখ্যা শুনে পণ্ডিতদের বিস্ময়ের সীমা রইল না ঠিকই রসিক ভক্ত বৈষ্ণবের পক্ষে এই বিশুষ্ক ব্যাখ্যা যে কতখানি নিদারুণ হয়ে দেখা দিল তা লেখকের এই তির্যক উক্তিতেই স্বতঃপ্রকাশিত – "কৃষ্ণ রাধার নব নব ব্যাখ্যায় বাঁশির গান, যমুনার কল্লোল, প্রেমের মোহ একেবারে দূর হইয়া গেল; যেন পৃথিবীর উপর হইতে কে একজন বসন্তের সবুজ রঙটুকু মুছিয়া লইয়া আগাগোড়া পবিত্র গোময় লেপন করিয়া গেল।"[২১] এই গল্পে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের দুটি দিকের দুটি রূপ দেখিয়েছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের একদিকে যেমন আছে রাধা কৃষ্ণের অন্তহীন প্রেমকে অবলম্বন করে হাসি অশ্রুময় চিরকালীন বিরহ-মিলন গাথা, যা শুধু রসিক ভক্ত বৈষ্ণবের কাছেই নিয়, নিখিল বিশ্বের তাবৎ রসিক পাঠকের কাছেই অমর প্রেম সংগীত, অনন্ত রসের অসীম আনন্দের আকর। আলোচ্য গল্পে রাজসভা কবি শেখর যার প্রতিনিধিত্ব করেছে, অন্যদিকে আছে বৈষ্ণব ধর্মের তাত্ত্বিক দার্শনিক দিক। কাব্যরস হীন এই তত্ত্ব দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন দ্বিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পুণ্ডরীক। রসিক ভক্ত কবির সঙ্গে তাত্ত্বিক দার্শনিকের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাক যুদ্ধে জয় হয়েছে পুণ্ডরীকের। সে তার বাক্ চাতুর্যে সকলকে বিস্মিত করে কাব্যযুদ্ধে জয়ী হয়ে রাজার কাছ থেকে মুক্তামালা লাভ করেছে ঠিকই কিন্তু প্রকৃত জয় হয়েছে ভক্ত কবি শেখরেরই, তাই অন্তিম শয্যায় তিনি লাভ করেছেন তাঁর মানসী প্রতিমা রাজকন্যা অপরাজিতার স্বহস্ত রচিত পুষ্পমালা।– " রাজকন্যা কহিলেন, "রাজা তোমার সুবিচার করেন নাই। তোমারই জয় হইয়াছে, কবি তাই আমি আজ তোমাকে জয়মাল্য দিতে আসিয়াছি।"[২২] এ যেন কাব্যসুন্দরী নিজে এসেই ভক্ত কবির গলায় পরিয়ে দিয়েছেন বিজয়মাল্য। এভাবেই রবীন্দ্র ছোটগল্পে চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ছোটগল্পে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ ও অশ্রুবেদনাকে সহানুভূতির রসে ডুবিয়ে স্নিগ্ধমধুর ও বেদনাবিধুর কাহিনী আকারে প্রকাশ করেছেন। রেঙ্গুনে থাকাকালীন তিনি 'চৈতন্যচরিতামৃত' এবং অন্যান্য বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠ করতেন, সঙ্গীত-কীর্তনের চর্চা করতেন, বৈষ্ণব পদাবলী ও ভজন গান গাইতেন। বস্তুত তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষত বৈষ্ণব পদাবলীর একান্ত অনুরাগী ছিলেন। বিশিষ্ট সমালোচকের মতে : " বৈষ্ণবধর্ম হিন্দুধর্মের একটি বিশিষ্ট অংশ বা ধারা। ··· শরৎচন্দ্র এই ধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিলেন। মনে হয় বৈষ্ণব ধর্মের উদারতা ও নান্দনিক আবেদন তাঁর ভালো লেগেছিল। কিন্তু তথাকথিত 'গোঁসাই-গোবিন্দ'দের সম্বন্ধে বা সামগ্রিকভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল ছিল বলে মনে হয় না। অথচ পদাবলী কীর্তনের মাধুর্য তিনি অনুভব করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে অপাংক্তেয় সাধারণ বৈরাগী বৈষ্ণবী তাঁর দৃষ্টি আকর্ষন করেছে।"[২৩] তাঁর ছোটগল্পগুলিতে বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের প্রভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। কোনো কোনো ছোটগল্পে সরাসরি চৈতন্যদেব তথা বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবও দেখা যায়।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই শরৎচন্দ্রের 'স্বামী' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গল্পের অন্যতম চরিত্র ঘনশ্যাম একজন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব। তিনি সৎ, কর্তব্যপরায়ন ,সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল, উদারহৃদয়, নিরহঙ্কার মানুষ। যথার্থ বৈষ্ণবের গুনাবলি তাঁর চরিত্রে উপস্থিত। বৈষ্ণব ধর্মের আচার পরায়ণতার উর্ধ্বে এই ধর্মের মূল সত্যটিকে তিনি অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন ও আপন জীবনে তা পালন করেছেন। সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাঁর কাঁধে ন্যস্ত। অথচ তাঁর সৎ মা তাঁর প্রতি উদাসীন। এ সমস্ত কিছুই ঘনশ্যামের চোখে ও উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে, তা সত্ত্বেও তিনি নির্বিকার; বৃহৎ বনস্পতির মতোই আপন মহিমায় অবিচল , স্থির, অচঞ্চল। ক্রমশ স্বামীর প্রতি মমতাশীল হয়ে স্ত্রী সৌদামিনী যখন তার প্রতি সংসারের এই অবহেলার প্রতিবাদ করে তার সৎ শাশুড়ীর সঙ্গে বিবাদ করেছে, তখন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ ঘনশ্যামের উক্তি লক্ষনীয় : " আমি বোষ্টম, আমার তো নিজের উপর অত্যাচারে রাগ করতে নেই। মহাপ্রভু আমাদের গাছের মত সহিষ্ণু হতে বলেছেন।"[২৪]

'চৈতন্যচরিতামৃতে' উল্লিখিত 'শিক্ষাষ্টক' এর তৃতীয় শ্লোকে রয়েছে :

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ।।"[২৫]

(অর্থাৎ তৃণ অপেক্ষা নীচু হয়ে, তরুর মতো সহিষ্ণু হয়ে, নিজে নিরভিমান হয়ে এবং সর্বজীবে সম্মান দিয়ে হরিনাম কীর্তন করবে।) সে কথাই ঘনশ্যাম আন্তরিক নিষ্ঠায় পালন করেছেন নিজের জীবনাচরণে। স্ত্রী সৌদামিনিকেও তিনি মহাপ্রভুর আদেশ মতো সহিষ্ণু হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন কারণ সে বৈষ্ণবের স্ত্রী। ঘনশ্যাম আচারনিষ্ঠ ভক্ত বৈষ্ণব। তিনি নিরামিষ আহার করেন, বাড়িতে জীবহত্যা করতে দেন না, বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন, গৌরাঙ্গ বিগ্রহ ধ্যান করেন। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এই যে, বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ ও বিশ্বাসকে তিনি অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম মূল কথা হল উদার ক্ষমাশীলতা। ঘনশ্যাম এই বৈষ্ণব ধর্মাদর্শ মেনে চলেছেন। স্ত্রী সৌদামিনীকে তিনি বলেছেন " যে সত্যি ক্ষমা চায় তাকে করতেই হবে, এ যে আমাদের মহাপ্রভুর আদেশ গো।"[২৬] তাই তো রাতের অন্ধকারে নরেনের সঙ্গে পালিয়ে গেলেও স্ত্রীর এত বড় অন্যায় অপরাধ তিনি ক্ষমা করতে পেরেছেন হৃদয়ের সহজাত ঔদার্য্যে। তাকে দেখে সৌদামিনির মনে হয় "মহাপ্রভুর শাসন কি অক্ষয় কবচের মতই যে তার মনটিকে অহর্নিশ ঘিরে রক্ষা করতো, আমার তীক্ষ্ণ শূলও খান খান হয়ে পড়ে গেল।"[২৭] এইখানে মহাপ্রভুর আদর্শের গভীর প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ঘনশ্যাম চরিত্রে।

চৈতন্যদেব ছিলেন প্রকৃতই পতিতপাবন। তাঁর সামাজিক সংস্কার স্বভাবতই সমাজ বিচ্যুত পতিত মানুষকে বৈষ্ণব ধর্মে স্থান দিয়েছিল। হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতায় নিপীড়িত মানুষ, কথায় কথায় যাদের জাত যায়, তারা বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে পুনরায় সমাজে তাদের প্রাপ্য সন্মান ফিরে পায়। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'একাদশী বৈরাগী' গল্পটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গল্পে দেখা যায় একটি অসহায় বিধবা মেয়েকে তার প্রথম জীবনের পদস্খলনের জন্য সমাজ অচ্ছুত করে রাখে, আর তাকে সাহায্য করার জন্য তার পরমাত্মীয়কে পর্যন্ত সমাজবিচ্যুত করা হয়। " একাদশী সদ্ গোপের ছেলে, জাত বৈষ্ণব নহে। তাহার একমাত্র বৈমাত্রেয় ভগিনী প্রলোভনে পড়িয়া কুলের বাহির হইয়া গেলে, একাদশী অনেক দুঃখে অনেক অনুসন্ধানে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনে। কিন্তু এই কদাচারে গ্রামের লোক বিস্মিত ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ওঠে। তথাপি একাদশী মা-বাপ মরা এই বৈমাত্রেয় ছোট বোনটিকে কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। ··· গ্রামের লোকের নিষ্ঠুর অনুশাসন মাথায় তুলিয়া লইয়া, তাহার এই লজ্জিতা, একান্ত অনুতপ্তা দুর্ভাগিনী বোনটিকে আবার গৃহের বাহির করিয়া দিয়া নিজে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে একাদশী কোনমতেই রাজী হইতে পারিল না। অতঃপর গ্রামে তাহার ধোপা-নাপিত-মুদি প্রভৃতি বন্ধ হইয়া গেল। একাদশী নিরুপায় হইয়া ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়া এই বারুইপুরে পলাইয়া আসিল।"[২৮] হিন্দু সমাজের নির্মমতার প্রতিবাদে বৈষ্ণব সমাজ এই অসহায়দের স্থান দিয়ে মানবিকতার পরিচয় বহন করে। এখানেই শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত নব্য বৈষ্ণবধর্মে পতিতদের উদ্ধারের বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করে।

এই গল্পগুলিতে উঠে আসে রক্তমাংসে গড়া বাস্তব মানুষের কথা। আর এগুলি থেকেই বোঝা যায় চৈতন্যদেবের মৃত্যুর শত শত বৎসর পরেও বৈষ্ণবধর্ম তথা বৈষ্ণব সমাজ আজও হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতা থেকে অত্যাচার থেকে সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করে চলেছে। চৈতন্যদেবের এই উদার ধর্মনীতি সাম্যবাদী প্রচেষ্টা যে সুদূরপ্রসারী ফল লাভ করেছিল বাংলা ছোটগল্পগুলি তার সার্থক নিদর্শন।

আর এই সূত্রে বৈষ্ণব পদাবলীর পদগুলিও শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে। কখনো নায়ক-নায়িকার চিত্ত উদ্ঘাটনে, কখনো তাদের বিরহ-যন্ত্রণা প্রকাশে বৈষ্ণব পদগুলি অনন্য ভূমিকা পালন করে। শরৎচন্দ্রের 'আঁধারে আলো' গল্পটিতে সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি বারাঙ্গনা বিজলী তার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করেছে বৈষ্ণব পদাবলী গেয়ে : "··· জোর করিয়া সত্যকে টানিয়া আনিয়া, একটা চৌকির উপর বসাইয়া দিয়া , পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, হাত জোড় করিয়া শুরু করিয়া দিল –

"আজু রজনী হাম, ভাগে পোহায়নু

পেখনু পিয়া মুখ চন্দা

জীবন যৌবন সফল করি মননু

দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা।

আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু

আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।

আজু বিহি মোহে, অনুকূল হোয়েল

টুটল সরহু সন্দেহা।

পাঁচবান অব লাখবাণ হউ

মলয় পবন বহু মন্দা।

আওব সো না যবহু মরি পরিহোয়ত –

তবহুঁ মানব নিজ দেহা – "[২৯]

বিদ্যাপতির ভাবোল্লাস পর্যায়ের "আজু রজনী হাম/ ভাগে পোহায়লুঁ/ পেখলুঁ পিয়া মুখ চন্দা' এই পদটি সামান্য পাঠ্যান্তরে শরৎচন্দ্র এখানে ব্যবহার করে বারাঙ্গনার প্রণয়কে ব্যক্ত করেছেন।

আবার 'পথনির্দেশ' গল্পের শেষাংশে হেমনলিনীর প্রতি গুণেন্দ্রের আদেশে ফুটে উঠেছে রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহের ছবি - "যখন বুঝবে, সংসারে ভালোবাসাকে মহিমান্বিত করার জন্য বিচ্ছেদ শুধু তোমার মত অতুল ঐশ্বর্যশালিনীর দ্বারে এসেই চিরদিন হাত পেতেছে, সে অল্পপ্রাণ ক্ষুদ্র কুটীরে অবজ্ঞায় যায় নি – তখনই সহ্য করতে পারবে। যখন জানবে, অতৃপ্ত বাসনাই মহৎ প্রেমের প্রাণ, এর দ্বারাই সে অমরত্ব লাভ করে যুগে যুগে কত কাব্য, কত মধু, কত অমূল্য অশ্রু সঞ্চিত করে রেখে যায়, যখন নিঃসংশয়ে উপলব্ধি হবে, কেন রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহ বৈষ্ণবের প্রাণ, কেন সে প্রেম মিলনের অভাবেই সুসম্পূর্ণ, ব্যথাতেই মধুর, তখনই সইতে পারবে হেম।"[৩০] এইভাবে শরৎচন্দ্রের ছোটগল্পে চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণবধর্ম ও বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

এই প্রসঙ্গে আমরা শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের চতুর্থ পর্বে কমললতা বৈষ্ণবী ও মুরারিপুরের আখড়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে পারি। বন্ধু গহরের সন্ধানে শ্রীকান্ত এই আখড়ায় পৌঁছায় ।এই আখড়া তাঁর পূর্বপরিচিত। শ্রীকান্তকে বলতে শোনা যায় : " ছেলেবেলায় এই আখড়ার কথা শুনিয়াছিলাম, আমার মনে পড়িল। পুরাকালে মহাপ্রভুর কোন্ এক ভক্ত শিষ্য এই আখড়ার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তদবধি শিষ্য পরম্পরায় বৈষ্ণবেরা ইহাতে বাস করিয়া আসিতেছে।"[৩১] মুরারীপুরের আখড়ার অন্যতম আকর্ষণ কমললতা। কমললতা একজন প্রকৃত বৈষ্ণবী। তার সাজ-সজ্জা, আচার-আচরণ, কথাবার্তা সর্বত্র বৈষ্ণবীয় ছাপ স্পষ্ট। লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে : "বয়স ত্রিশের বেশি নয়, শ্যামবর্ণ, আঁটসাট ছিপছিপে গড়ন, হাতে কয়েকগাছা চুড়ি – হয়ত পিতলের, সোনার হইতেও পারে, চুল ছোট নয়, গেরো দেওয়া পিঠের উপর ঝুলিতেছে, গলায় তুলসীর মালা, হাতে থলির মধ্যেও তুলসীর জপমালা। ছাপ-ছোপের খুব বেশি আড়ম্বর নাই, ⋯ ।"[৩২] সকাল-সন্ধ্যা দুবেলাই সে মন্দিরে কীর্তন গায়। তার গানের কথাগুলি যেমন মধুর তেমনি সুস্পষ্ট : "কানু গলে বনমালা বিরাজে, রাই গলে মোতি সাজে। অরুণিত চরণে মঞ্জীর –রঞ্জিত খঞ্জন গঞ্জন লাজে।"[৩৩] শ্রীকান্তর সম্মুখে আনন্দে-বিরহে নিজের মনের ভাব পরিস্ফুট করতে কমললতা বৈষ্ণবীর কণ্ঠে পাঠান্তরে বৈষ্ণব পদাবলীই গুঞ্জরিত হতে শোনা যায় :

"কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী সুখ দুখ দুটি ভাই –
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি দুখ যায় তারই ঠাঁই।"[৩৪]

কখনো আবার সে মৃদুকণ্ঠে গেয়ে ওঠে :

"চণ্ডীদাস বাণী শুনে বিনোদিনী পীরিতি না কহে কথা,
পীরিতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে পীরিতি মিলায় তথা।"[৩৫]

আবার গহরের কাছে শ্রীকান্তর নাম শুনেই কমললতা তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তার আগমনের অপেক্ষায় অধীর হয়ে ওঠে। সে শ্রীকান্তকে বলেছে : " তুমি ভাববে এমন মানুষ তো দেখিনি – এরা নাম শুনেই যে পাগল হয়! কিন্তু নাম শুনেই মেয়েমানুষ পাগল হয় গোঁসাই, - এ সত্যি?"[৩৬] এইখানে আমাদের মনে পড়ে যায় চণ্ডীদাসের রাধার কথা –

"সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

আকুল করিল মোর প্রাণ।।"[৩৭]

যদিও শ্রীকান্ত নামের কোনো এক ব্যক্তি কমললতার প্রথম জীবনের স্বামী ছিল, সেই সূত্রেই হয়ত শ্রীকান্ত নামটি শুনে তার মধ্যে আলোড়ন জাগে , হয়ত নতুন আশার সঞ্চার হয়। তবে তার কথার ধরণে বৈষ্ণবীয় ভাবই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সে যে প্রকৃতই বৈষ্ণবী তা বোঝা যায় বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণবদের প্রতি তার ভক্তি-শ্রদ্ধা-অনুরাগে। শ্রীকান্তের প্রতি তাকে বলতে শোনা যায় "বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে তামাশা করতে নেই গোঁসাই, অপরাধ হয়।"[৩৮] এমনকি তার মধ্যে বৈষ্ণবীয় সাধন ভক্তির রূপটিও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শ্রীকান্ত যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল "… তোমরা সাধন-ভজন কর কখন? সে উত্তরে বলিয়াছিল – এই ত সাধন ভজন। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, এই রাঁধা-বাড়া, ফুলতোলা, মালা-গাঁথা, দুধ জ্বাল দেওয়া একেই বলো সাধনা? সে মাথা নাড়িয়া তখনই জবাব দিয়া বলিয়াছিল, হাঁ আমরা একেই বলি সাধনা – আমাদের আর কোন সাধন ভজন নেই।"[৩৯] "দাসদাসীর এর চেয়ে বর সাধনা আমরা পাব কোথায় গোঁসাই? বলিতে বলিতে তাহার সজল চোখ দুটি যেন অনির্বচনীয় মাধুর্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।"[৪০] নিত্য বিগ্রহের সেবা, মঙ্গল আরতি, ঠাকুরকে স্নান করানো, ভোগ নিবেদন, প্রসাদ বিতরণ, ফুল তোলা, মালা গাঁথা এইসব প্রাত্যহিক কাজগুলির মধ্যে দিয়েই কমললতা ও অন্যান্য বৈষ্ণবীরা ভগবানের আরাধনা করে। দাসানুদাস রূপে নিত্য ঠাকুরের সেবাই তাদের সাধন ভজন। বৈষ্ণবধর্মের একেবারে সহজ-সরল রূপটি এখানে ফুটে ওঠে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তীর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য : "কমললতা বৈষ্ণবী। বিশুদ্ধ রাগানুগামার্গের সাধিকা। সে বৃন্দাবন বিলাসিনীদের অনুগতা কৃষ্ণদাসী। এই বৈষ্ণবীয় সংস্কারেই তার কথাবার্তা ও ব্যবহার। … শরৎচন্দ্র অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সহজধারার সংকেত সৃষ্টি করে বৈষ্ণবী কমললতার ভিতর দিয়ে শুদ্ধ রাগানুগ ভজনের আদর্শটি তুলে ধরেছেন। … গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসসাধনার ধারায় কমললতার ভিতর খাঁটি বৈষ্ণবীয় আকুতিটিই প্রকাশ করেছেন। বৈষ্ণবী কমললতা শুদ্ধ রাগমার্গের সাধিকা – বাহ্যে পরিচর্যাময়ী, অন্তরে ব্রজরসভাবনাময়ী।"[৪১]

শ্রীকান্ত এই আখড়ায় এসে প্রত্যক্ষ করে : "বৈষ্ণবীরা নানা বয়সের ও নানা চেহারার এবং নানা কাজে ব্যাপৃত। কেহ দুধ জ্বাল দিতেছে, কেহ ক্ষীর তৈরি করিতেছে, কেহ নাড়ু পাকাইতেছে, কেহ ময়দা মাখিতেছে, কেহ ফল-মূল বানাইতেছে – এসকল ঠাকুরের রাত্রের ভোগের ব্যাপার। ··· কেহই বসিয়া নাই। তাহাদের কাজের আগ্রহ ও একাগ্রতা দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়··· ওষ্ঠাধর সকলেরই নড়িতেছে, বোধহয় মনে মনে জপ চলিতেছে ··· ঠাকুর ঘরে কালো পাথর ও পিতলের রাধাকৃষ্ণ মূর্তি।"[৪২] এই আশ্রমের পরিপাটির, বৈষ্ণবীয় ভাব পরিমণ্ডলের এক অদ্ভুত আকর্ষণে শ্রীকান্ত বেশ কয়েকদিন এই আশ্রমে থেকে যায়। তাকে বলতে শোনা যায় " বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি, বাঙ্গালা দেশের আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ় রহস্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই সুগুপ্ত আছে এবং সেইটাই নাকি বাঙ্গালার নিজস্ব খাঁটি জিনিস। ইতিপূর্বে সন্ন্যাসী- সাধুসঙ্গ কিছু কিছু করিয়াছি – ফল লাভের বিবরণ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু এবার দৈবাৎ খাঁটি বস্তু কপালে জুটিয়া থাকে ত এ সুযোগ ব্যর্থ হইতে দিব না, সংকল্প করিলাম।"[৪৩] এইখানে শরৎচন্দ্রের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও কীর্তন সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহের পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাই মন্দিরের আবহ ও কীর্তন গানের মধুর ধ্বনি শ্রীকান্তকে মোহাবিষ্ট করে : " মন্দিরা সহযোগে কীর্তন গান কানে গেল, ···মন্দিরে ঢুকিয়া নিঃশব্দে একধারে গিয়া বসিলাম, ··· সকলের দৃষ্টিই রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তির প্রতি নিবদ্ধ। মাঝখানে দাঁড়াইয়া কমললতা কীর্তন করিতেছে – মদন গোপাল জয় জয় নন্দ দুলাল, জয় জয় গিরিধারী লাল কি, গিরিধারী লাল, জয় জয় গোবিন্দ-গোপাল কি - ····· এই সহজ ও সাধারণ গুটিকয়েক কথার আলোড়নে ভক্তের গভীর বক্ষঃস্থল মন্থিত করিয়া কি সুধা তরঙ্গিত হইয়া উঠে তাহা আমার পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন; কিন্তু দেখিতে পাইলাম উপস্থিত কাহারও চক্ষুই শুষ্ক নয়। ··· এই সকল রসের রসিক আমি নই, কিন্তু আমারও মনের ভিতরটা হঠাৎ যেন কেমন ধারা করিয়া উঠিল। ··· আমারও যেন মনে হইতে লাগিল, অদূরবর্তী ঐ পাথরের মূর্তি সত্যই চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে এবং কান পাতিয়া কীর্তনের সমস্ত মাধুর্য উপভোগ করিতেছে।"[৪৪] এইভাবে শরৎচন্দ্রের বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রের বৈষ্ণব ভাবনা এই চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে রসমধুর হয়ে উঠেছে। আধুনিক যুগের পটভূমিতে স্থাপন করে লেখক কমললতার মধ্যে দিয়ে বৈষ্ণব সমাজের চিত্র অঙ্কণ করেছেন এবং নিজে বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্য আস্বাদন করেছেন।

রাঢ় বাংলার বিখ্যাত ছোটগল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে গ্রামবাংলার বাউল-বোষ্টম-বৈরাগীদের জীবন ও জীবিকার এবং চৈতন্যের প্রেমধর্মের বাস্তব সত্য চিত্রই প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। শ্রীচৈতন্যের উদার প্রেমধর্ম রাঢ় বাংলার জনজীবনে বিশেষত নিম্নশ্রেণীর মানুষের মধ্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এদের মধ্যে বাউল-বোষ্টম শ্রেণীর নরনারীর জীবন চর্যা তারাশঙ্করের সাহিত্যে বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে। দুধরণের বোষ্টমের কথা আমরা তারাশঙ্করের ছোটগল্পে পাই – (১) আখড়াধারী গৃহী জাত বোষ্টম, (২) ভেকধারী বোষ্টম। জাত বোষ্টমরা তাদের গৃহকেই আখড়া করে তোলে; তাই তারা গৃহী বোষ্টম। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ড. সত্যবতী গিরি 'তারাশঙ্কর: বৈষ্ণবীয় জীবন ও আখড়া' প্রবন্ধে লিখেছেন " 'আখড়া' শব্দের আভিধানিক অর্থ – সাম্প্রদায়িক ও সাধু সন্ন্যাসীর সাধন ভজনের স্থান। কিন্তু তারাশঙ্করের ছোটগল্পে আখড়া একেবারেই বৈষ্ণব গৃহস্থের বাড়ি। বীরভূম-বাঁকুড়া অঞ্চলের প্রায় সমস্ত আখড়ারই এই বৈশিষ্ট্য।"[৪৫] এই আখড়াধারী গৃহী বৈষ্ণবরা যদিও সমাজের নিম্নবর্গের মানুষ তবুও তাদের আচার-আচরণে, কথা-বার্তায়, স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে জীবনের সর্বত্র প্রতিফলিত হয় বৈষ্ণবীয় ধর্ম-সংস্কৃতি, বৈষ্ণবীয় সাধন-ভজন। এরা মালা তিলক ধারণ করে, রসকলি কাটে, একতারা খঞ্জনী বাজিয়ে বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী গান গেয়ে মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে জীবন নির্বাহ করে । তাদের গৃহে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ এবং রাধা কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ কিংবা চিত্রপট পূজিত হয়। বৈষ্ণব উৎসব রাস দোল ঝুলনে মেতে ওঠে। সম্পন্নরা তীর্থাভিলাষে চৈতন্য লীলাক্ষেত্র নবদ্বীপ, বৃন্দাবন, নীলাচলে যায়। স্বজাতির মধ্যে হলে বিগ্রহ সাক্ষী রেখে মালা চন্দন পরে এদের বিয়ে হয়, আর ভিন্ন জাতির হলে তাকে ভেক নিয়ে বোষ্টম হতে হয়। সঙ্গে থাকে খোল করতাল যোগে মধুর কীর্তন গান। সুখে-দুঃখে, মিলন-বিরহে, আশা-নিরাশায় তাদের কণ্ঠে গুঞ্জরিত হয় মহাজন পদাবলী। এদের মধ্যেকার বিবাহ বন্ধন বেশ শিথিল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হলে একে অন্যকে ছেড়ে অবলীলায় দ্বিতীয় কারো সঙ্গে মালা-চন্দন বা কণ্ঠি বদল করতে পারে। বৈষ্ণব সমাজে তা স্বীকৃত; দোষাবহ নয়। ভেকধারী ও জাত বোষ্টমদের মধ্যে সম্প্রদায়গত বিরোধ আছে। জাত বোষ্টমরা ভেকধারীদের চেয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠতর ও উচ্চতর মনে করে। এই জাত্যাভিমান তাদের মধ্যে বেশ প্রবল। আখড়াধারী বৈষ্ণবেরা আখড়া বেঁধে থাকে। নিজেদের 'মোহান্ত' বলে পরিচয় দেয়। মানুষকে অবলম্বন করে মানবীয় প্রেমের মধ্যেই ঈশ্বর প্রেমের সাধনা আখড়াধারী বৈষ্ণবের। অন্যদিকে যারা বাউল বোষ্টম তারা নির্দিষ্ট আখড়ায় বেশিদিন থাকে না। তারা ঘরের মায়া-মোহ-বন্ধন ছিন্ন করে ঘুরে ফেরে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের সন্ধানে। তারাশঙ্করের 'রসকলি', 'মালাচন্দন', 'প্রসাদমালা', 'হারানো সুর', 'বাঞ্ছাপূরণ', 'রাধারাণী', 'পৌষলক্ষী' প্রভৃতি ছোটগল্পে রাঢ় বাংলার লোকায়ত জীবনে বৈষ্ণবীয় সাধ-ভজন, বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ বিবিধ রূপে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘রসকলি’ গল্পটি। এই গল্পটি ‘কল্লোল’ পত্রিকায় বাংলা ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয় । এই গল্পের মধ্যে দিয়েই তারাশঙ্করের সাহিত্য জীবনের সূচনা। এই গল্পের পটভূমি রাঢ় দেশ এবং এখানে মাটির সঙ্গে যুক্ত, বলা যায় মাটি থেকেই উদ্ভূত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নর-নারীর সামাজিক সমস্ত রকম শাসন বহির্ভূত হৃদয় দেওয়া নেওয়ার এক অতিন্দ্রীয় রহস্যময় সম্পর্ক চিত্রণই গল্পকারের লক্ষ্য। গল্পের নায়িকা মঞ্জরীর বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, ব্যক্তিত্ব, অন্তরের গভীর প্রেমবোধ এবং সেই বৃহত্তর প্রেমের জন্য আত্মত্যাগ ও এক রহস্যময় নিরুদ্দেশ যাত্রার মধ্যে দিয়েই গল্পের কাহিনী আবর্তিত হয়েছে, তবে গল্পটির আদ্যপান্ত ফুটে উঠেছে বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডল।

গল্পে দেখা যায় রামদাস ছিলেন জাত বৈষ্ণব। তাই তিনি তার ভাইপো পুলিনকে সৌরভীর মেয়ে কমলিনীর সাথে বিয়ে দিতে রাজি হয় নি। কারণ সৌরভী ছিল ধোপার মেয়ে। ভেক নিয়ে সে হয়েছে বৈষ্ণব। তাই জাত বৈষ্ণব সামাজের রামদাস ভেক বৈষ্ণবের সঙ্গে সম্বন্ধ পাততে রাজী হয় নি : “রামদাস কহিল – রাধে রাধে তা যে হয় না সৌরভী, আমরা হলাম জাত –বোষ্টম, আর তোমরা ভেকধারী। সৌরভী ছিল ধোপার মেয়ে, ভেক লইয়া বৈষ্ণব হইয়াছে। তাহার মেয়ের সঙ্গে ভাইপোর বিবাহ দিতে রুচি হইল না।”[৪৬] বৈষ্ণব সমাজের এই ভেদাভেদের ছবি আমরা তারাশঙ্করের ‘রাধারাণী’ গল্পেও দেখতে পাই। যাত্রা দলের অধিকারীর কাছে গৌরহরির আসল পরিচয় পেয়ে রাধারাণীর পিতা বলে – “না না সে হয় না। আমরা জাত বৈষ্ণব। ভেকধারী নই।”[৪৭] তারপর জাতিচ্যুতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি অধিকারীর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। বারাঙ্গণার সন্তান হওয়ায় গৌরদাসের সঙ্গে জাত বৈষ্ণব সমাজের রাধারাণীর বিবাহ কোনোভাবেই সম্পন্ন হয় না। এইখানে বৈষ্ণব সমাজের ভিতরের বিভেদের চিত্রই যে শুধু নির্মম ভাবে চিত্রিত হয়েছে তাই নয়, সেই জাত্যাভিমান মিলনপিপাসু দুটি নরনারীর জীবনে চিরকালীন বিচ্ছেদ রচনা করেছে। বৈষ্ণব সমাজের উপসম্প্রদায়গুলির জীবনযাত্রার বাস্তব সত্য চিত্র তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর তাঁর ছোটগল্পে। বৈষ্ণব সমাজের এই ভেদাভেদের ছবিই আমাদের চিনিয়ে দেয় ক্ষয়িষ্ণু বৈষ্ণব সমাজকে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ননীগোপাল গোস্বামী তাঁর ‘চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব’ গ্রন্থে লিখেছেন : “ শ্রীচৈতন্য যতদিন বর্তমান ছিলেন, ততদিন বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে কোনও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নাই। কিন্তু তাঁহার তিরোধানের পর নেতৃত্বের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং দেখিতে দেখিতে কয়েক বছরের মধ্যেই নিজেদের মধ্যে দলাদলির সৃষ্টি হইয়া পরস্পর বিবদমান কতকগুলি উপশাখার সৃষ্টি হইল – গৌরনাগরবাদীগণ, অদ্বৈত সম্প্রদায়, গদাধর সম্প্রদায়, ও নিত্যানন্দ বিদ্বেষী সম্প্রদায়। ⋯ যিনি যেভাবে পারিলেন নেতা হইয়া বসিলেন। এইভাবে

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ যখন বিপর্যস্ত তখন সেখানে আরও বিশৃঙ্খল দেখা দিল 'গুরুবাদের' প্রবর্তনে।"[৪৮] বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীর প্রয়াণের পর সপ্তদশ শতকে বাংলায় বৈষ্ণবদের নেতৃত্ব দেন নরোত্তম দাস, শ্রীনিবাস আচার্য ও শ্যামানন্দ। রাজশাহীর খেতুরীতে একটি বৈষ্ণব মহাসম্মেলন আহুত হয়। সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারের এক বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়। কিন্তু অচিরে যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে বৈষ্ণব ধর্মের বাড়বাড়ন্তে ভাঁটা পড়ে যায়। চৈতন্যদেবের পরবর্তীকালে বাংলায় বৈষ্ণব সমাজ ব্রাহ্মণ্যবাদের দ্বারা গ্রস্ত হয়ে পড়ে। বৈষ্ণব ধর্ম যত রক্ষণশীল হতে থাকে ততই উচ্চ আদর্শ থেকে তার অবনমন ঘটতে থাকে। চণ্ডালকেও দ্বিজশ্রেষ্ঠ উচ্চারণের যে বলিষ্ঠতা চৈতন্যদেবের আন্দোলনকে মানবিক বিপ্লবের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল পরবর্তীতে বৈষ্ণব ধর্ম চৈতন্যের সেই উচ্চ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। চৈতন্য যে জাত-পাতের গণ্ডীকে ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন পরবর্তীতে বৈষ্ণব ধর্মে সেই জাতপাতের সীমারেখা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বৈষ্ণবরা হয়ে পড়েন নৈষ্ঠিক উপবীতধারী। অভিজাত বৃন্দাবনমুখী 'ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব' অংশ তৈরি করেন স্মার্ত হিন্দুধর্মের আদলে কঠিন অনুশাসন। আর বৈষ্ণব দের অবহেলিত ও নিম্নবর্গীয় অংশের নাম হয় 'জাত-বৈষ্ণব'। সপ্তদশ শতকের শেষাশেষি বৈষ্ণব সমাজে পালাবদলের হাওয়া লাগে। বৈষ্ণব সমাজের মধ্যে গুরুবাদের প্রাধান্য ক্রমশ বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতির ভাঙনকে সূচিত করল। অন্যদিকে বৈষ্ণব ধর্মে পরকীয়া সাধনার অনুপ্রবেশের ফলে অনেকগুলি উপসম্প্রদায় গড়ে উঠল। এই উপসম্প্রদায়গুলির বৈষ্ণব-মুসলমান সমন্বয়বাদ, পরকীয়া সাধন ও যথেচ্ছ ব্যবহার এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল এবং এতটাই ছিল জনাদর যে ক্ষুব্ধ ও বিপন্ন তোতারাম ঘোষণা করেন:

"আউল বাউল কর্তাভজা নেড়া দরবেশ সাঁই।

সহজিয়া সখীভাবকী স্মার্ত জাত-গোঁসাই।।

অতিবড়ী চূড়াধারী গৌরাঙ্গনাগরী।

তোতা কহে এই তেরোর সঙ্গ নাহি করি।।"[৪৯]

'জাত গোঁসাই' বলতে এখানে জাত বৈষ্ণবদের কথা বলা হয়েছে। ননীগোপাল গোস্বামী সেই যুগে দুই শ্রেণীর বৈষ্ণবদের কথা বলেছেন – "একদল হইল 'বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তর্গত বৈষ্ণব', আর একদল হইল 'জাত বৈষ্ণব'।"[৫০] নিম্নবর্গীয়, নিম্নজাতের যারা এসে বৈষ্ণব হয়েছিলেন, সেই সব অজ্ঞ, সরল পতিত শূদ্ররাই 'জাত বোষ্টম' নামে পরিচিত। লালন শাহ ফকির চৈতন্যকে শ্রদ্ধা জানিয়াছিলেন এই বলে যে,

গোরা এনেছে এক নবীন আইন দুনিয়াতে –

বেদ পুরাণ সব দিচ্ছে দুষে সেই আইনের হিসেব মতে।

এইখানে শাস্ত্র-পুরাণের প্রতিবাদী চরিত্র হিসাবে শ্রীচৈতন্যকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ ও বেদবিরোধী অনেক মানুষ ও সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের ছত্রছায়ায় স্থান নিতে পেরেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মূলত এই সব অমানী জাতপাতকে মান দেবার জন্যই তাঁর বৈষ্ণবধর্মের পরিকল্পনা করেছিলেন। ত্রান করেছিলেন তাঁদের, দিয়েছিলেন আশ্রয়, বাঁচিয়েছিলেন উচ্চবর্ণের অত্যাচারের হাত থেকে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাত-বৈষ্ণবরাই ব্রাত্য হয়ে গেলেন উচ্চতর বৈষ্ণব সমাজের বিচারে। শুদ্ধ বৈষ্ণবদের ছুৎমার্গ আর জাত বৈষ্ণবদের শিথিলতা সমাজে আবার ভেদাভেদ সৃষ্টি করে। আরও পরবর্তীতে ভেক নিয়ে কিছুজন হয়ে ওঠে ভেকধারী বোষ্টম। বৈষ্ণব সমাজের এই ভেদাভেদের ছবিই তারাশঙ্করের গল্পে ফুটে ওঠে।

আবার, তারাশঙ্করের 'রসকলি' গল্পের রসকলি চরিত্রটির নির্মাণের মধ্য দিয়ে নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিচয়ও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই রসকলি কোনো বন্ধনেই ধরা দেয় নি, সে সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছে, সমাজের কলঙ্ককে উপেক্ষা করে যথার্থ বৈষ্ণবীয় আচরণ পালন করেছে এবং স্বভাবে ও ধর্মে বৈষ্ণবীয় প্রেমের আদর্শ রক্ষা করেছে। ধোপার মেয়ে সৌরভী ভেক নিয়ে বৈষ্ণবী হলেও তার মেয়ে মঞ্জরী যথার্থ বৈষ্ণবের মতোই " নাকে রসকলি কাটে, চূড়া বেঁধে চুল বাঁধে, কথার ধরণটাও তাহার কেমন বাঁকা।"[৫১] এই মঞ্জরী বৈষ্ণব আখড়ার কন্যা। তার প্রকৃত নাম কমলিনী। এই মঞ্জরীর ঘরের বর্ণনায় চৈতন্যদেবের মূর্তির উল্লেখে তার মধ্যে বৈষ্ণবীয় স্বরূপ আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে: " তকতকে ঘরখানি লাল মাটি দিয়া নিকানো,আলপনার বিচিত্র ছাদে চিহ্নিত; জগন্নাথ, যুগলমিলন; সবগুলির পায়ে চন্দনের চিহ্ন।"[৫২] সে যখন পুলিনকে লক্ষ করে গান ধরে ----

" লোকে কয় আমি কৃষ্ণকলঙ্কিনী,

সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো,

আমি গরবিনী "[৫৩]

ঠিক তখনই আমাদের মনে পড়ে যায় চণ্ডীদাসের রাধার কথা ---

"কলঙ্কি বলিয়া ডাকে সব লোকে

তাহাতে নাহিকো দুখ।

তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার

গলায় পরিতে সুখ।।”[৫৪]

এই রসকলি তার জীবন পরিচালনা করেছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে। তারাশঙ্করের বর্ণনায় --- “ দশ বছর বয়সেই মঞ্জরীর একবার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু পাত্রটিকে মঞ্জরীর পছন্দ হয় নাই, তাই তাহাকে সে নাকচ করিয়া দিয়াছে।”[৫৫] আবার মঞ্জরীর দৃঢ় চিত্ততার পরিচয় পাওয়া যায় যখন তাকে বলতে শোনা যায় : “আমরা জাতে বোষ্টম, ছিঁড়লে মালা আমরা নতুন গাঁথি।”[৫৬] এর মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন মঞ্জরীর স্বাধীনসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়, অপরদিকে জাত বৈষ্ণব সমাজের নিজস্ব বৈবাহিক রীতি-নীতির পরিচয় ধরা পড়ে। ড. সত্যবতী গিরির মতে “ শ্রীচৈতন্যের নির্দেশে ষড়গোস্বামী ও অভিজাত বৈষ্ণব মহাজনেরা যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন গড়ে তুলেছিলেন, তারাশঙ্করের বিভিন্ন গল্পে ছড়িয়ে থাকা লোকায়ত বৈষ্ণব ধর্মে তার প্রভাব নেই।”[৫৭] রাঢ় বাংলার সাধারণ মানুষ তাদের জীবন ধারণের বিভিন্ন স্তরে বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতিকে সহজভাবেই তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। বৈষ্ণবদের একশ্রেণির রমনীরা সহজেই স্বামী ত্যাগ করতে পারে, আবার সংসারে থেকেও সংসার বিরাগী হতে পারে রাঙানো বসনে-মনে। এইসব বৈশিষ্টের মধ্যেই ‘রসকলি’ গল্পের মঞ্জরী সব ছেড়ে রসোচ্ছলা যৌবনেই বৃহত্তর এক প্রেমের শান্তিতে বাউল মনে অনির্দিষ্টের পথে বেরিয়ে পড়ে। এ সম্পর্কে সমালোচক বীরেন্দ্র দত্ত লিখেছেন “ তাঁর স্বভাবে আছে সত্যিকারের এক বৈষ্ণবীয় তত্ত্বহীন রোমান্টিক প্রেমের আকুতি। ····· রাধা বৈষ্ণবের তার ধর্মের কিন্তু রাধার মধ্যে আর একটা দিক থাকে, তার ব্যক্তিক প্রেম-যন্ত্রনার, তা এক নিঃসঙ্গ আধ্যাত্মিকতার। গল্পকারের এই নিজস্ব ব্যাখ্যা মঞ্জরীর নিজস্ব রসকলি সত্তায় একমাত্র সত্য হয়েছে।”[৫৮] রসকলি চিরকালীন প্রেমের প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রকৃতপক্ষে সে আপন গর্বে গর্বান্বিত, কোন কলঙ্ক লোকলজ্জাই তার চারিত্রিক দৃঢ়তা, স্বাধীন সত্তাকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। সে যেমন তার আকর্ষণীয় উপস্থিতি দিয়ে বাস্তব সংসারের সব কিছু তছনছ করে দিতে পারে অবলীলায় : “ মঞ্জরী বেশ সুশ্রী, নজরে ধরা মেয়ে। তবে একটু রসচ্ছলা, যাকে বলে ডগমগ ভাব , সেই ভাবে সে চঞ্চল, চলিতে তাহার দেহে হিল্লোল খেলিয়া যায়, কথা বলিতে হাসি উপচিয়া পড়ে। ····· লোকে কত কি বলে, কিন্তু তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না। নদীর বুকে লোহার চিরেও দাগ আঁকে না, স্রোতও বন্ধ হয় না।”[৫৯] আবার, তেমনি সহজেই ভাঙা সংসার নিঃস্বার্থভাবে গড়েও দিতে পারে। গোপিনী পুলিনের সংসার বন্ধন দৃঢ় করে দিয়ে সে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে : “ উত্তর না দিয়া মঞ্জরী হাসিয়া পুঁটলিটা তুলিয়া লইয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল। বিচিত্র সে হাসি , রহস্যের মায়া মাধুরীতে ভরা, কে জানে তার অর্থ! চলিতে চলিতে গান ধরিল :

“ লোকে কয় আমি কৃষ্ণকলঙ্কিনী,

সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী গো,

আমি গরবিনী ”[৬০]

এই বিদায় চিত্রে মঞ্জরীর গানের মাধ্যমে একদিকে যেমন বৈষ্ণবীয় প্রেমের গূঢ়তা আনে অপরদিকে এক মানবীর হৃদয়ার্তিও গুরুত্ব পায়। রসকলির এই যে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা সে যাত্রা চিত্রে বিষাদ নেই, বরং এক রহস্যময় যৌবন মাধুরীর প্রকাশ ঘটিয়ে সে তার স্বভাবসিদ্ধ স্বেচ্ছাধীন ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় রেখেছে। প্রখ্যাত সমালোচকের মতে “ মঞ্জরীর যে উদাসীন বাউলের স্বভাবে চলে যাওয়া, তাতেই আছে ‘রসকলি’ গল্পের এক বৈষ্ণবী চরিত্র-নির্ভর সর্বনির্মুক্ত অনন্ত প্রেমের অন্তর্গূঢ় ব্যঞ্জনা।”[৬১] সর্বোপরি এর মধ্য দিয়ে আসলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময়ী নারীর স্বাধীন সত্তারই সার্বিক পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

আবার বাউল-বৈষ্ণবের নিয়মকানুনও সাধারণের চেয়ে ভিন্ন। তাদের চালচলন, রীতিনীতি, রসকলি, মালাচন্দন, মাধুকরী, সমাধি সবই যেন ভিন্ন সুরে বাঁধা। তারাশঙ্কর কিন্তু অত্যন্ত নিপুণ হাতেই তার রূপচিত্র অঙ্কণ করেছেন ‘রসকলি’ গল্পটিতে। তাই ‘রসকলি’ গল্পটি হয়ে উঠেছে চৈতন্যোত্তর রাঢ় বাংলার পটভূমিতে বৈষ্ণব সমাজ ও সংস্কৃতির একটি অনবদ্য দলিল। এ প্রসঙ্গে তারাশঙ্করের ‘মালাচন্দন’ গল্পটিও উল্লেখযোগ্য। গল্পের নায়িকা বৈষ্ণবী তুলসী। প্রাক-যৌবনে মাত্র চোদ্দ বছরে বিধবা হয় । কিন্তু জাত বোষ্টমের ঘরের মেয়ে তুলসী পত্যন্তর গ্রহণ করে নি, যথার্থ বিধবার ন্যায় বৈষ্ণবীয় আচার আচরণ পালন করেছে এবং কীর্তনগানকেই অবলম্বন করেছে। “বাউল ভেকধারী বৈষ্ণবেরা ‘ছিঁড়লে মালা, নতুন গাঁথে’। অর্থাৎ বৈষ্ণব থাকিতেই মনান্তরে বা যে কোনো কারণে বৈষ্ণবী বৈষ্ণবের গলায় মালা, ললাটে চন্দন পরাইয়া মালাচন্দন করে। কিন্তু এরা এই জাত বোষ্টমেরা সৎজাতি গৃহস্থের অনুকরণে বৈষ্ণব থাকিতে মালাচন্দন তো দূরের কথা , বিধবা হইয়াও নুতন আশ্রয় গ্রহণ করে না; এ শুধু লজ্জায় নয়, বহুদিন হইতে পালন করিয়া এ আচার তাহাদের সংস্কার; ধর্মের বিধান সত্ত্বেও সংস্কার তাহারা লঙ্ঘন করিতে পারে না।”[৬২] তিন বছর বয়সে তুলসীর পিতৃবিয়োগ হলে তুলসীর মাও গৃহস্থ বিধবার মত জীবনযাপন করেছে। বহু কষ্টে বড় করে তুলেছে তুলসীকে, তবু দ্বিতীয়বার কাউকে মালাচন্দন করে নি। কিন্তু তুলসীর এই বৈধব্য তার মা সহ্য করতে পারে না, তুলসীকে পুনরায় বিবাহের জন্য রাজী করানোর চেষ্টা করে – “ ··· এ আমাদের আছে – আমরা জাতে বোষ্টম – আমরা ছিঁড়লে মালা নতুন গাঁথি; এ আমাদের ধম্মে আছে শাস্ত্রে আছে – শুধু কথার কথা নয়; তবে আমরা সে করি না – গেরস্ত সমাজে নিন্দে হয় বলে। তা না হয় আমরা ভেকধারী সমাজেই থাকব।”[৬৩] কিন্তু মায়ের শত অনুরোধ সত্ত্বেও বিবাহে সম্মত হয় না তুলসী। পরদিন থেকেই সে মায়ের সঙ্গে ভিক্ষায় বের হয়। মায়ের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গান শিখতে শুরু করে। কীর্তন গানের নৈপুণ্যই

তার সবচেয়ে বড় সম্পদ। তুলসীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, কমনীয় রূপ, মার্জিত ব্যবহার, বৈষ্ণবোচিত বিনয়, শান্ত-সংযত শালীনতা, স্মিত হাস্য তাকে সকলের কাছে আদরের করে তুলেছিল।

তুলসীর জীবনের একটা স্বপ্ন ছিল যে তার দেহরূপের উপচারে সে শ্যামসুন্দরের পূজো করবে। তাই সে পরম যত্নে নিজেকে সাজিয়ে নিষ্ঠাভরে শ্যামসুন্দরের পূজা করে, সন্ধ্যায় ঘৃতদীপ ধরে আরতি করে। আর এই সব কিছুর মধ্যে বৈষ্ণবের আচরণীয় ধর্মের প্রতিফলন ঘটে। কিন্তু তার বড়দুঃখ যে সে ছবি মূক, সে হাসে না, তাকে অভয় দেয় না, এমনকি স্বপ্নেও তাকে দেখা দেয় না। তুলসীর মনে হয় পট না হাসলেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা দেবতার বিগ্রহ নিশ্চয়ই তার মনবাসনা পূর্ণ করবে। তাই সে ছোটে বিগ্রহ মন্দিরে, গ্রামে গ্রামান্তরে, তীর্থস্থলে বিগ্রহমূর্তির সামনে সে তার হৃদয়ের আর্তিটুকু ঢেলে দিয়ে গান গায়। কিন্তু ক্রমশ তুলসী পাষাণ ঠাকুরের প্রতি তার আস্থা হারাতে থাকে, হয়ত সে এবার সজীব মানুষের কথা ভাবতে চায়। ঘটনাক্রমে লোকায়ত বৈষ্ণব ধর্মের উল্লেখযোগ্য তীর্থ জয়দেবের মেলাতে তার সঙ্গে দেখা হয় মোহনদাস মোহান্ত নামে এক জয়দেব যাত্রীর। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। তাই জয়দেব থেকে ফিরে আসে অন্য এক তুলসী। সখি কাদুকে সে জানায় – " শ্যামের হাসি ঠাকুরের মুখে দেখা যায় না কাদু, সে হাসি দেখা যায় মানুষের মুখে। ···ঠাকুরকে ভক্তি করা যায়, কিন্তু ভালবাসা যায় নাভাই, এ আমি বেশ বুঝেছি। কাদু, রূপ যে ভোগ করতে পারে না, রূপের পূজো তার পাওনা নয়।"[৬৪]

তুলসী পাষাণ বিগ্রহ ছেড়ে তার ভালবাসার অর্ঘ্য নিবেদন করতে চায় রক্তমাংসের মানুষের প্রতি। তাই মোহন দাসকে সে মালাচন্দন করে। কিন্তু পরদিন অপরাহ্নে মোহন দাসের সঙ্গে তার আখড়ায় এসেই তুলসীকে মুখোমুখি হতে হয় জীবনের এক নির্মম সত্য রূপের। সেখানে প্রবেশ করে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহকে প্রণাম করতে গিয়ে সে টের পায় জীর্ণ মৃতপ্রায় মোহন দাসের স্ত্রী গৌরভামিনীর বুভুক্ষু দৃষ্টি যেন তার রূপ-যৌবনকে গ্রাস করছে। রোগে জর্জরিত মৃত্যু পথযাত্রী অথচ তীব্র জীবনাসক্ত সেই নারী তুলসীকে সহ্য করতে না পারলেও তুলসী তার প্রতি মমতা অনুভব করেছে ও তার জীবনের শেষ আকাঙ্খাটুকু মেটাবার চেষ্টা করেছে। তার প্রতি মোহন দাসের বিরূপতা কটূক্তির তীব্র প্রতিবাদ করেছে তুলসী। এইখানে তুলসী চরিত্রটির দৃঢ় চিত্ততা এবং মানুষের প্রতি সহানুভুতি, সহমর্মিতার পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

ভামিনীর মৃত্যুর পর মোহন দাস তুলসীর জীবনে আসে অবিচ্ছিন্ন অবাধ মিলনের আনন্দ। আর বৈষ্ণবী তুলসী তাদের দাম্পত্য জীবনের আনন্দকেও রাধা-কৃষ্ণ লীলার বিবিধ অনুষঙ্গে গড়ে তুলতে চেয়েছে। দোলের দিন সে রঙের খেলা খেলতে চায় – রাসের দিন সারা রাত জেগে গান

করতে চায় – জীবনে সে লীলা চায়। শ্রাবণ মাসে আসন্ন ঝুলন পূর্ণিমায় এক বর্ষণমুখরিত জ্যোৎস্না রাতের সুখক্ষণে পুলকিত হয় তুলসী – দেব মন্দিরে ঝুলনা ঝুলানো হয়েছে, যুগল বিগ্রহ ঝুলনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, এই শয়ন মন্দিরে তারাও তেমনি ঝুলনা ঝুলিয়ে দোল খাবে। এই সুখ কল্পনায় বিভোর তুলসী গৌরাঙ্গ প্রভুর দরবারে গান ধরে – 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূণ্য মন্দির মোর'। কিন্তু তুলসীর এই সুখের সাধ মোহনদাসের রুক্ষ্ণ পৌরুষের আঘাতে খান খান হয়ে যায়। বেদনায় লজ্জায় , হতাশায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তুলসী।

তুলসীর হৃদয় মন্দির শূণ্য করে দিয়ে মোহন দাস আর একটি তরুণী শ্যামাঙ্গীকে সেবাদাসী করে ঘরে নিয়ে আসে। তুলসী অসামান্য ব্যক্তিত্বে তাদের বরণ করে নেয় ঠিকই কিন্তু নারীত্বের এই অপমান সে কোনভাবেই মেনে নেয় না। আত্মমর্যাদা অক্ষুণ্ন রেখে এক বিচিত্র নিরাসক্ত মনে সে আবার পথে বেরিয়ে পড়ে। একদিন যে পথে তুলসী তার ভালবাসা দেবতা থেকে মানুষকে অর্পণ করেছিল, সেই পথ ধরেই সে আজ চলেছে নিরুদ্দেশের অভিমুখে। খঞ্জনি বাজিয়ে সে গান ধরেছে –

"সখী বলিতে বিদরে হিয়া

আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমার আঙিনা দিয়া।।"[৬৫]

ড. সত্যবতী গিরির মতে, এর মধ্যে দিয়ে "শ্রীরাধার জবানীতে তার অপমানিত প্রেমিকা সত্তার যন্ত্রণাই তাতে ফুটে উঠেছে, প্রতিবাদী নারী ব্যক্তিত্বের পরিচয় প্রকাশিত হয় নি। তুলসীর অতলস্পর্শী ব্যক্তিগত বেদনাও এইভাবে ভাষা খুঁজে পেয়েছে পদাবলীর গানের মধ্যে।"[৬৬] বাংলার লোকজীবনে বিশেষত রাঢ় অঞ্চলে বহু মানুষের জীবনযাপনে, জীবনবিশ্বাসে এইভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর সুর মিশে গিয়ে যেন লোকসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে।

এই পদাবলী কীর্তনের অনুষঙ্গ সার্থকভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায় 'প্রসাদমালা' গল্পটিতে। ললিতার বিরহে গোপাল ঘর ছেড়ে প্রেমসুন্দর বাবাজীর কীর্তনের দলে যোগ দিয়ে গান গেয়ে বেড়ায়। কৈশোরের সতেজ মধুর কণ্ঠ, স্বভাব সুন্দর হিল্লোলিত কম্পন, একটি শ্যম কিশোরের মুখে নায়ক-নায়িকার আবেদন নিবেদন লোকে খুবই পছন্দ করত। ললিতার বিচ্ছেদ যন্ত্রনায় কাতর গোপাল প্রেমসুন্দর বাবাজীর নিকট ভাবরদ্ধ কণ্ঠে গেয়ে ওঠে –'এ মাহ ভাদর – এ ভরা বাদর, শূন্য মন্দির মোর'।[৬৭] বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর – মাহ ভাদর, শূণ্য মন্দির মোর' এই পদটি ভিন্ন রূপে গোপালের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। ললিতাকে ভুলতে না পারা গোপালের মনের অবস্থা জানতে পেরে প্রেমসুন্দর বাবাজী আপন মনে গুনগুন করে গেয়েছে 'পীরিতি বলিয়া তিনটি আখর ভুবনে সৃজিল কে।' ঐ একই

প্রসঙ্গে বাবাজী গোপালকে দিয়ে গাইয়েছেন - 'বঁধু কি আর কহিব আমি।/ জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণ-বঁধু হয়ো তুমি।"[৬৮] ললিতাহীন গোপাল শুধু বিরহের গানই গাইতে পারে। সুরের উপচারে শ্যাম-সুন্দরের উপাসনায় সে নিজেকে নিমজ্জিত করে। ভক্ত সুরসাধক, বিশেষত বিরহের অসামান্য কীর্তনীয়া হিসেবে গোপাল দাসের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। নবদ্বীপে বৈষ্ণব মণ্ডলীর আয়োজিত কীর্তনের আসরে গোপালের নিমন্ত্রণ আসে, প্রতি বছর সেখানে বিরহের গান গেয়ে সে মালা জেতে , তাই এবার বৈষ্ণব মণ্ডলী স্থির করেছে বিরহের নয় গোপালকে গাইতে হবে মিলনের গান। গোপাল তাদের অনুরোধ করে " ··· বিরহের গানে আমার প্রাণ সাড়া দেয়, আর ঐ গানই আমি আলোচনা করেছি বেশি। আর দেবতাকে মানুষ তার প্রিয় দ্রব্যই দিয়ে থাকে , সুতরাং আমাকে অন্য অনুমতি দেবেন না।"[৬৯] কিন্তু তার কথায় কেউ রাজী হয় না। অগত্যা গোপালকে সম্মত হতে হয়। গোবিন্দই তার ভরসা। সন্ধ্যার মুখে আসরে শুরু হল বিরহের গান : " ওদিকে গৌরাঙ্গ মন্দিরে বিরাট আসর পড়িয়াছে – দলের পর দল পর্যায়ের পর পর্যায়ে ব্রজলীলা গাহিয়া চলিয়াছে। ··· সন্ধ্যার মুখে বিরহের গান চলিতেছিল। শতবর্ষব্যাপী বিরহ; নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার ··· শুক সারি আর ডাকে না, রাধাশ্যাম লইয়া তাহারা আর দ্বন্দ্ব করে না, কাঁদে। কোকিল-কোকিলা মূক, ময়ূর-ময়ূরী ঘনকৃষ্ণ মেঘমালা দেখিয়া আর নাচে না, ধেনুপাল বেণুরবের অপেক্ষায় মুখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, মূক পশুর চক্ষে অজস্র ধারা। তরুলতায় আর ফুল ফোটে না, ··· যমুনার কলকল্লোলে ক্রন্দনের সুর, অভিমানিনী রাধার আজ আর অভিমান নাই। শীর্ণ তনু, প্রাণ আর থাকে না। তবু চিন্তা – 'কানু হেন গুননিধি কারে দিয়ে যাবো'। ··· সখীবৃন্দের প্রতি মর্মানিক অনুরোধ – প্রিয়তমের জন্য তাহার দেহখানি যেন রাখা হয়, আর যেন রাখা হয় কৃষ্ণবর্ণ তমালের ডালে। গায়ক গায় –

'না পুড়িয়ে রাধা অঙ্গ, না ভাসায়ে জলে।

মরিলে তুলিয়া রেখো তমালেরই ডালে।।"[৭০]

এভাবেই কীর্তনীয়ার গানে মূর্ত হয়ে উঠেছে কৃষ্ণবিরহিনী বৃন্দাবনের বেদনা। আর এ থেকেই বোঝা যায় পদাবলী কীর্তন বাংলার সাধারণ বৈষ্ণব সমাজে আর সাধারণ মানুষের মনে কী গভীর প্রভাব ফেলেছিল। হৃদয় বিদারী এই বিরহের গানে আসরে অশ্রুপ্লাবন বয়ে যায়। এরপর মিলনের গান গেয়ে মালা জেতা গোপালের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। গোপাল গোবিন্দের শরণ নিয়েও মনে বল পায় না; ব্যক্তিগত জীবনে মিলনের আনন্দহীন গোপালের কণ্ঠে মিলনের গান আসে না। দীর্ঘ বিরহের পর বিরহী দুটি প্রাণীর মিলন সে যে কল্পনাও করতে পারে না। বিভ্রান্ত চিত্তে আসর ছেড়ে সে গঙ্গাতীরের দিকে

যেতে পথিমধ্যে অনাথা পতিতাদের আশ্রম থেকে নারীকণ্ঠের সংকীর্তন শুনতে পায়। সেই ললিতা গাইছে –

"বড় দুঃখ দিয়েছি হে ধরায়েছি পায় –

ক্ষমা কর পায়ে রাখ দুঃখিনী রাধায়।"[৭১]

এইভাবে রাধার বেদনার সঙ্গে ললিতার ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণাও যেন মিলে-মিশে যায়। ললিতা তার নিজের হাতে বিগ্রহের জন্য গাঁথা মালা গোপালের গলায় পরিয়ে দিলে, গোপাল সেই মিলন মালা নিয়ে কীর্তনের আসরে উপস্থিত হয়ে মিলনের গান গেয়ে গৌরাঙ্গের গলার প্রসাদী মালা জিতে নেয়। গল্পের একেবারে শেষে ললিতার সঙ্গে পুনরায় মিলন হলে গোপালের কণ্ঠে গুনগুনিয়ে ওঠে বৈষ্ণবীয় মহাজনের ভাব সম্মিলনের গান –

"বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে –

দেখা না হইত পরাণ গেলে।"[৭২]

এইভাবে রাঢ় বাংলার গ্রাম-জনপদে সাধারণ গৃহস্থ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহে তাদের সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে সহজভাবে মিশে রয়েছে যে বৈষ্ণবতা, বৈষ্ণব পদাবলীর সুর তার পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

আবার তারাশঙ্করের বেশ কিছু গল্পে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর মহান আদর্শের প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। সমাজের তথাকথিত অসহায়, পতিত, বঞ্চিত, নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্ণের মানুষেরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের শাস্ত্র অনুশাসনের তুলনায় চৈতন্যের আচণ্ডালে প্রেমদানের নীতি তথা মানবধর্মের আদর্শকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল। 'রাধারানী' গল্পে দেখা যায় একটি দশ-বারো বছরের ছেলে গৌরদাস কৃষ্ণযাত্রা পালায় শ্রীমতি রাধার ভূমিকায় অভিনয় করে। এই গৌরদাস জাত বৈষ্ণব নয়, সে এক কুলহারা বারাঙ্গনার সন্তান। তার সম্পর্কে যাত্রা দলের অধিকারীকে বলতে শোনা যায় "রাধাকৃষ্ণের লীলায় ওকে রাধা সাজাই; সেই পুন্যে ওর পাপ ধুয়ে মুছে যাবে বলেই আশা করি। ভাল করে একটু অধিকার হলেই আমি ওকে বৈষ্ণব করে দোব। মহাপ্রভুর মহাধর্মে তো জাতি-কুলের বিচার বড় নয় - সে বাধাও নাই;"[৭৩] এইখানে সামাজিক সাম্প্রদায়িক বিভেদ বৈষমের উর্ধ্বে শ্রীচৈতন্যের উদার মানবধর্মেরই জয়ধ্বনি শোনা যায় অধিকারীর কণ্ঠে। 'হরিভক্তিতে নাহি জাত কুলাদি বিচার' - চৈতন্যদেবের এই আদর্শেরই প্রতিফলন ঘটেছে এখানে।

শ্রীচৈতন্যের মহাধর্ম সাম্যের আদর্শ কেবল ষোড়শ-সপ্তদশ শতকেই মানুষকে উদ্ধার করেছিল তাই নয়, এই ধর্মনীতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহু পিছিয়ে পড়া অন্ত্যজ শ্রেনির মানুষকে উদ্ধারের পথ দেখিয়েছে, তাদের আত্মমর্যাদা বোধে উদ্দীপিত করেছে। অষ্টাদশ শতকে মেছুয়াবাজারের কুব্জীবাঈ, উনিশ শতকে সোনাগাছির গোলোকমণি রায়ের মত সমাজের প্রান্তবাসিনী রমণীদের কথা উল্লেখ করে রমাকান্ত চক্রবর্তী লিখেছেন " এই মেয়েরা তাদের জীবনে বৈষ্ণব ধর্মকেই অবলম্বন করে পবিত্রতার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন।"[৭৪] চৈতন্যদেবের পতিতোদ্ধারের সমাজ সংস্কারের আদর্শে পরবর্তীতে পতিতা বারাঙ্গনা নারী ও তাদের সন্তানেরাও যে শ্রীচৈতন্যের মহাধর্মের ছত্রছায়ায় এসে বৈষ্ণব সমাজে স্থান লাভ করতে পারে তারই সার্থক দৃষ্টান্ত 'রাধারানী' গল্পের গৌরদাস চরিত্রটি।

'পৌষলক্ষী' গল্পে আমরা দেখতে পাই তৃতীয় স্ত্রী মারা যাওয়ার পর 'অজগর পুরুষ' মুকুন্দ জ্যোতিষে বিশ্বাসী হয়ে আর বিয়ে না করে জলচল জাতের একটি বিধবা ঝিকে ঘরে এনেছিল এবং বৈষ্ণবদের আখড়ায় কণ্ঠী পরিয়ে বৈষ্ণবী করে ঘরে তুলেছিল। এখানে দেখা যায় জাতবৈষ্ণব সমাজ কিন্তু বিধবার পুনর্বিবাহের স্বীকৃতি দিয়ে তাকে জীবনের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল। এ প্রসঙ্গে রমাকান্ত চক্রবর্তী 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম' গ্রন্থে লিখেছেন, "বরকন্যার পারস্পরিক কণ্ঠীবদল করে বিবাহ নিষ্পন্ন হত। জাতবৈষ্ণবদের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহের বিধান ছিল। কিন্তু বিধবার ক্ষেত্রে কন্যাদান হত না। পতি-পত্নীর বৈবাহিক সম্পর্ক ভাল হলে পুনর্বিবাহ অনুমোদিত হত"।[৭৫]

রক্ষনশীল হিন্দু সমাজে যেখানে বিধবাদের অপরিসীম শারীরিক, মানসিক দুঃখ কষ্ট যন্ত্রনা ভোগ করতে হত, যেখানে সংসারের গলগ্রহ মনে করে তাদের ঠেলে দেওয়া হত সহমরণের নৃশংস হত্যালীলায়; সেখানে জাতবৈষ্ণব সমাজ পুনর্বিবাহের স্বীকৃতি দিয়ে বিধবাদের জন্য অন্তত একটি পথ খোলা রেখেছিল, যে পথে লাঘব হতে পারে তাদের অকাল বৈধ্যবের দুঃখ-যন্ত্রনা এবং পূর্ন হতে পারে সংসার রচনার এবং জীবন সৃজনের বাসনা। তাই দেখা যায় বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ' প্রচলনের অনেক আগে থেকেই কিন্তু জাতবৈষ্ণব সমাজে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলিত ছিল। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের যে সমতার আদর্শে এ সমাজ প্রাণ পেয়েছিল , সেই সমদর্শিতার চেতনাই বিধবা নারীকেও এ সমাজে স্থান করে দিয়েছিল, নতুন করে বেঁচে থাকার পথ দেখিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য-" ঠিক যাহাকে সমাজ সংস্কার বলে বা য়ুরোপীয় আদর্শে যাহা 'humanism' নামে পরিচিত, চৈতন্যদেব সজ্ঞানে তাহার প্রবক্তা বা প্রচারক ছিলেন না ঠিকই; কিন্তু চৈতন্য প্রভাবে সমাজের নিম্নবর্ণেরাও যে উত্তর চৈতন্য যুগে বিশেষ মর্যাদা লাভ করিয়াছিল, তাহা অবশ্য স্বীকার্য।"[৭৬]

তাই তো বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চলের তথাকথিত নিম্নবর্গের মানুষকেও বৈষ্ণবতার আশ্রয় নিতে দেখা যায়, তাদের কণ্ঠেও বৈষ্ণব পদাবলীর সুর গুঞ্জরিত হতে শোনা যায়। 'যাদুকরী' গল্পে রাঢ় বাংলার এক বিচিত্র জাতি যাদুকর সম্প্রদায়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন - "বাজিকর একটি বিচিত্র জাতি। ..... ধর্মে হিন্দু, কিন্তু নির্দিষ্ট কোন জাতি বা সম্প্রদায়, জাতিকুল পঞ্জিকা ঘাটিয়াও নির্ণয় করা যায় না। ..... নিরীহ শান্ত প্রকৃতি, গলায় তুলসীর মালা, পরনে মোটা তাঁতের কাপড়, দুই কাঁধে দুইটা ঝোলা ও ঢোলক, মুখে এক অদ্ভুত টানের মিষ্ট ভাষা।"[৭৭] এই বাজিকরদের আচার-আচরণে, বেশ-ভূষায়, স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে স্বভাবতই বৈষ্ণবীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনকি যাদুকরীর কণ্ঠে শোনা যায় বৈষ্ণবীয় গানের কলি-

"কুল ত্যজিলাম মন সঁপিলাম

কলঙ্কেরই কাজল নিলাম···।"[৭৮]

আবার 'বেদেনী' গল্পে রাধা কৃষ্ণের নামের সাদৃশ্যে যুবতী রমণী বেদেনীর রাধিকা ও তার প্রেমিকের কিষ্টো নামকরণ এবং তাদের পারস্পরিক কথোপকথনের মধ্যে যাযাবর বৃত্তিসুলভ আদিম জীবনযাত্রার ছাপ থাকলেও তারই সঙ্গে মিশে রয়েছে বৈষ্ণব ভাবধারা ও বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য। এসবই আসলে চৈতন্যদেবের সর্বধর্ম সমন্বয়ের বৃহৎ প্রেমভাবনার ফসল। আসলে তিনি যখন নবদ্বীপে বৈষ্ণব ভক্তি প্রচার করেন তখন কারও জাতবিচার করেন নি। ডঃ রমাকান্ত চক্রবর্তীর কথায় "চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রচারিত বৈষ্ণব ভক্তি ছিল অতিশয় সম্প্রসারিত সাংস্কৃতিক উপযোজন অথবা acculturation।"[৭৯]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমকালেই আর একজন বিশিষ্ট কথাশিল্পী শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। ঐতিহাসিক গল্পলিখনে যিনি সিদ্ধহস্ত। শরদিন্দুর প্রধান কৃতিত্বই হল অতীত যুগের জীবনযাত্রার পুনর্গঠনে ঐতিহাসিক কল্পনার সার্থক প্রয়োগে। এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁর 'চুয়াচন্দন' গল্পটি যেখানে আমরা নিমাই পণ্ডিতের অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাই।

আখ্যায়িকার প্রথমেই লেখক তুলে ধরেছেন ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমাংশের বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক ছবি। সে সময়ে "রাজশক্তি পাঠানের হাতে; ধর্ম ও সমাজের বন্ধন বহুযুগের অবহেলায় গলিত রজ্জু বন্ধনের ন্যায় খসিয়া পড়িতেছে। দেশও যেমন অরাজক, সমাজও তেমনি বহুরাজক। কেহ কাহারও শাসন মানে না। মৃত বৌদ্ধধর্মের শব নির্গলিত তন্ত্রবাদের সহিত শাক্ত ও শৈব

মতবাদ মিশ্রিত হইয়া যে বীভৎস বামাচার উত্থিত হইয়াছে , তাহাই আকণ্ঠ পান করিয়া বাঙালি অন্ধ মত্ততায় অধঃপথের পানে স্খলিত পদে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। সহজিয়া সাধনার নামে যে উচ্ছৃঙ্খল অজাচার চলিয়াছে তাহার কোনো নিষেধ নাই। ··· মাতৃকা সাধনা, পঞ্চমকার উদ্দাম নৃত্যে আসর দখল করিয়া আছে। প্রকৃত মনুষ্যত্বের চর্চা দেশ হইতে যেন উঠিয়া গিয়াছে।"[৮০] সমাজ দেহ যেমন বিধর্মী শাসক ও ব্রাহ্মণ-পাষণ্ডীর অত্যাচারে ভেঙ্গে পড়েছে, সমাজ মনও তেমনি গলিত কুষ্ঠে আক্রান্ত। এই সমাজ মাধাইয়ের মতো ধনী, চরিত্রহীন, মদ্যপায়ী বামাচারী ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে নবদ্বীপে শাস্ত্রচর্চাও অব্যাহত। প্রসঙ্গত স্মার্ত রঘুনন্দন, কানভট্ট, রঘুনাথ ও বাসুদেব সার্বভৌমের কথা উল্লেখ করেছেন গল্পকার।

১৪২৬ শকাব্দের প্রারম্ভে এক কৃষ্ণাচতুর্দশীর পূর্বাহ্নে বাংলার কেন্দ্র নবদ্বীপের ঘাটে কি হচ্ছিল তাই নিয়েই এই আখ্যায়িকার আরম্ভ। নবদ্বীপের গঙ্গার ঘাটে যখন পণ্ডিতেরা তাঁদের পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমানে ব্যগ্র, তখনই অলক্ষিতে গল্পে প্রবেশ করেছেন নিমাই পণ্ডিত। লেখক তাঁর বর্ণনা দিয়েছেন এইভাবে – "একজন অতি গৌরকান্তি যুবা – বয়স বিশ বছরের বেশি নয় – তর্ক বাধাইয়া দিয়া, পাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের বিতণ্ডা শুনিতেছিল ও মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছিল। তাহার ঈষদরুণ আয়ত চক্ষু হইতে যেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যের অভিমান ও কৌতুক একসঙ্গে ক্ষরিয়া পড়িতেছিল।"[৮১] বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত'এর আদিখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের দীপ্ত চেহারার বর্ণনা রয়েছে : "হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্রবদন অনুক্ষণ।/ নিরন্তর দিব্যদৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন।।/ ··· সুবলিত শ্রীমস্তক শ্রীচাঁচর কেশ।/ সিংহগ্রীব গজস্কন্ধ বিলক্ষণ বেশ।।/ ··· শ্রীললাটে উর্দ্ধ সুতিলক মনোহর।/ আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর।।"[৮২]

এই গল্পে একদিকে যেমন নিমাই পণ্ডিতের আত্মবিশ্বাসী, বিদ্যার অহঙ্কারে দৃপ্ত, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনি অসীম সাহসি, নির্ভীক, অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে উদ্ধারকারী, বলিষ্ঠ একটি যুবকের পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিত কানভট্ট গঙ্গার ঘাটে ঢেউয়ে ভেসে গেলে আত্মবিশ্বাসী পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ জলে ঝাঁপ দিয়ে তাকে বাঁচিয়ে তোলে। তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে সহাস্য কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে "শিরোমণি মশায় বলুন তো বেঁচে আছেন না মরে গেছেন? আপনার নব্যন্যায় শাস্ত্র কি বলে?"[৮৩] এই আপাত কৌতুক দীপ্ত প্রশ্নটির গভীরে রয়েছে চাপা উৎকণ্ঠা – কানভট্ট মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার পর সুস্থ বোধ করছেন তো! কানভট্টের কূট উত্তরটিও মনে রাখার মতো, তবে যুবকের প্রতি তাঁর সম্বোধন পাঠককে সচকিত করে – "কে নিপাতনে সিদ্ধ?"[৮৪] পাঠক জানতে পারেন, কূটতর্কে অপারাজেয় এই যুবক পণ্ডিতদের অনায়াসে নিপাতনে সিদ্ধহস্ত, অন্যদিকে যেন এক স্বতন্ত্র নিয়ম তিনি স্বয়ং; ব্যাকরণে যা সূত্র মেনে হয় না, অথচ স্বীকার

করতে হয়, তাকেই নিপাতনে সিদ্ধ বলা হয়। এই সস্নেহ সম্বোধনের মধ্যে আভাসিত হয়েছে সমাজজীবনে স্বতন্ত্র পথের সন্ধানী এই যুবকের পরিচয়।

একই সঙ্গে কৌতুকপ্রিয়, তর্কপ্রিয়, বলদর্পী এই জ্যাঠা ছেলেটির এই বিরাট কীর্তি দেখে তার প্রশংসা না করে পারেননা কানভট্ট – " ··· বিশ্বম্ভর এতদিন জানতাম তুমি নিপাতনেই সিদ্ধ কিন্তু এখন দেখছি প্রাণদানেও তুমি কম পটু নও। আশীর্বাদ করি এমনিভাবে মজ্জমানকে উদ্ধার করেই যেন তোমার জীবন সার্থক হয়।"[৮৫] গল্পকার কানভট্টের আশীর্বাদ সূত্র ধরে সংকেতে যেন জানিয়ে দিলেন বিশ্বম্ভরের ভবিষ্যৎ জীবনপথ রেখা। একই সঙ্গে বিদ্যার অহংকারে দর্পী, আবার নিজের বিপদকে অগ্রাহ্য করে অন্যকে বাঁচাবার কী আকুল প্রচেষ্টা এক অসাধারণ বিপ্রতীপতার মেলবন্ধন লক্ষ করা যায় তার চরিত্রে।

আর এই 'অপরূপ তেজোদীপ্ত পুরুষ মূর্তি' যুবক নিমাই পণ্ডিতের অকুণ্ঠ সহযোগিতাতেই চন্দন বেনে মদ্যপ দুর্বৃত্ত মাধাইয়ের হাত থেকে চুয়াকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। শুধু তাই নয়, এমনকি চুয়া ও চন্দন এই দুই নরনারীর মিলনকে সামাজিক স্বীকৃতি দানের জন্য এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই উভয়ের বিয়ে দিয়ে সদর্পে ঘোষণা করে – "নিমাই পণ্ডিতের নাসা স্ফুরিত হইল, তিনি গর্বিত স্বরে বলিলেন, 'নিমাই পণ্ডিত যে বিয়ের পুরুত, সে বিয়ে অমান্য করে কে?"[৮৬]

এভাবেই বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় চৈতন্যদেবের বিরাট ব্যক্তিত্বের নানা রঙের প্রতিফলন বাংলা ছোটগল্পের শিল্প রূপে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। কখনো দেখা যায় তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাস্ত করেছেন, কখনো দেখা যায় নরনারীর মিলনে পুরুতঠাকুরের ভূমিকা গ্রহণ করছেন, কখনোবা মৃত্যুর মুখ থেকে মানুষকে উদ্ধার করছেন, কখনো বা বিপন্ন মানুষকে মুক্তির পথ দেখান – ফলে তাঁর আশ্চর্য অবর্ণনীয় কীর্তি। আবার একইসঙ্গে তাঁর চরিত্রে রঙ্গরসিকতা, কৌতুক প্রিয়তা, ব্যঙ্গপ্রবণতা, গাম্ভীর্য, তর্কপ্রবণতা অহংকারী প্রতিবাদী সংবেদনশীল ব্যক্তিত্বের পরিচয়ও ধরা পড়ে।

আবার মহাশ্বেতা দেবীর 'বান' গল্পে গৌরাঙ্গ প্রেমের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ধরা পড়ে। নদীতে বান এলে তা যেমন সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি গোরা প্রেমের বানও অজস্র মানুষকে ভক্তির প্লাবনে ভাসিয়ে নিয়ে চলে। এই গোরা প্রেমের বান সমস্ত মানুষের মধ্যে বিভেদ-বৈষম্য ঘুচিয়ে দিয়ে ধনী- দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র সকলকে একাসনে মিলিত করে। কিন্তু বাস্তব অন্য কিছু। হত দরিদ্র সমাজের নীচু তলার অপাংক্তেয় মুচি-মেথর-বাগদী পরিবারের কাছে গোরা প্রেমের বাস্তব সত্য চিত্রটা ভিন্নরকম। রূপসী বাগদীর

মা-র কথায় – " শুধু শুনি গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী নাকি উঁচুকে নিচু আর নিচুকে উঁচু করবে বলে লেচে বেড়াচ্চে। শুনে তো আমি শুধাই, হাঁ গো, তবে কি আমরা ঠাকুরদের মত পালঙে শোব, খইমুড়ি যা মনে হয় তাই খাব? তা যদি না হয় তবে আমি গোরাপ্রেমের বানে ভাসব কেন? ... '' / তুই তো মা গৌরাঙ্গ দেখিসনি?/ দেখতে যাব কেন লো? গৌরাঙ্গ কি আমায় রাজা করবে?"[৮৭] সমাজের এইসব অভুক্ত অনাহারী মানুষগুলি যাদের একবেলাও ভরপেট খাবার জোটে না তাদের কাছে গৌরাঙ্গ প্রেম বিলাসিতামাত্র।

নবদ্বীপের আকাশে বাতাসে ভাসতে থাকে নবীন সন্ন্যাসী গৌরাঙ্গের কথা। দিকে দিকে সমস্ত মানুষ গোরা প্রেমে মাতোয়ারা। গৌরাঙ্গ গৌড় থেকে শান্তিপুরে গিয়ে মাতৃদর্শন করে আবার নীলাচলে চলেছেন। বড় আচার্যের ইচ্ছা যে সেই পথ দিয়ে নিমাই গেলে তার বাড়িতে দুটি দিন রাখবেন। কিন্তু বড় আচার্যের এ হেন ইচ্ছার কারণ জানতে চান তাঁর স্ত্রী : "বড় আচার্য তো সিরস্তদার, জোতদার, ধনীমানী মানুষ দেখলে তবে সন্মান করেন। যুবক সন্ন্যাসীকে এ সন্মান কেন?"[৮৮] তাঁর উত্তরে আচার্য বলেছিলেন : "ও গো, গৌরাঙ্গ এখন নতুন নতুন গো! মানুষ এখন গৌরাঙ্গের নামে সত্বর মজে। যে জন গৌরাঙ্গ ভজে তার এখন সমাজে সন্মান। শান্তিপুরের তাঁতি বেটারা অব্দি গৌরাঙ্গ যখন নগরে গেল, তখন কাঙ্গালীরে কাপড় বিলিয়ে নাম করল। আমি যদি করি আমার ভাল হবে। ··· এতে আমার নামডাক দশ দিকে যাবে।"[৮৯] এও এক বাস্তব চিত্র। সমাজের একশ্রেণির মানুষ গৌরাঙ্গের সান্নিধ্যের মধ্য দিয়ে নিজেদের সন্মান, নামডাক বাড়ানোর চেষ্টা করত।

গৌরাঙ্গের আদ্বিজচণ্ডালে কোলদানেরও এক বিপরীত সত্য চিত্র তুলে ধরেছেন মহাশ্বেতা দেবী এই গল্পে : "তিনি না কি মানুষ ডেকে ডেকে আচণ্ডালে কোল দেয়? ··· কোল দিলে কি? কোল তো উনির সঙ্গে যাবে। উনি গেলে তবে চাঁড়াল বাগদী আবার যেমন ছিল তেমন রইবে। ··· "[৯০] এ থেকে বোঝা যায় চৈতন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে আচণ্ডালে কোল দানের মহৎ উদ্দেশ্য প্রচার করলেও কার্যকালে তা বাস্তবায়িত হয় না। চাঁড়াল বাগদী সমাজের অপাংক্তেয় এই মানুষগুলির জীবন যে তিমির সেই তিমিরেই থেকে যায়।

গৌরাঙ্গ নীলাচলে ফেরার পথে সেই পথ দিয়ে যাবে এবং বড় আচার্যের গৃহে পদরেণু দেবে এই প্রত্যাশায় 'ঢোলমোহর' দিয়ে তিনি সকলকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। " কীর্তন, ঠাকুর সেবা, প্রসাদ বিতরণ আর গৌরাঙ্গ দর্শন হবে। সবাই যাবে। দিবাকর চক্রবর্তীর মত বামুন, চিনিবাসের মত বাগদী, সবাই।"[৯১] এ যে গৌরাঙ্গ প্রেমের বন্যায় বামুন বাগদী একাসনে বসার উপক্রম। বন্যার সময় যেমন বামুনরা সব মানুষকে নিজেদের দালানে ঠাঁই দিয়েছিল, চিঁড়ে-মুড়ি-বাতাসা দিয়ে সকলের প্রাণ বাঁচিয়েছিল গৌরাঙ্গ প্রেমের বন্যাতেও তো ঠিক সেরকমই হবার সম্ভাবনা। আর তাই গোরাপ্রেমের বান দেখে রূপসী

বাগদীর মনে হয় " এ বান-ও যে সেই গঙ্গার বানের মত মনে হচ্ছে? সবাই এক জায়গায় দাঁড়াবে বসবে, একসঙ্গে চিড়ে মুড়ি ভাগ করে খাবে।"[৯২] শুধু চিড়ে মুড়ি নয় ছোট্ট ছেলে চিনিবাসের আশা আর একটু বেশি। দিনের পর দিন অভুক্ত থাকতে হয় যাদের, গেঁড়ি-গুগলি ও কচুর শাক খেয়ে দিন কাটে যাদের সেই রকমই রূপসী বাগদীর এই ছেলেটি চিনিবাস অনেক দিন যে একমুঠো ভাত খেতে পায় নি তার মনের আশা –" চিড়ে মুড়ি না রে আয়ী! ভাত হবে, পরমান্ন, ঘি সম্বরা ডাল আর নারকেল ছাঁচি কুমড়ো বেন্নুন!"[৯৩] আর নিম্নবর্ণের এই বাগদী মানুষেরা ভাবে গৌরাঙ্গ এলে তাদের সব দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যাবে।

'কিন্তু গৌরাঙ্গ এলেন না' – এই হতদরিদ্র ক্ষুধার্ত মানুষগুলির সমস্ত আশা-প্রত্যাশা বুঁদবুঁদের ন্যায় বিলীন হয়ে যায়। এমনকি এক মুঠো খেতে পাওয়ার আশাটুকুও এক লহমায় ধূলিসাৎ হয়ে যায়। গৌরাঙ্গ না আসায় দীর্ঘ অপেক্ষারত ক্ষুধার্ত মানুষগুলির পাতে কোনো প্রসাদ জোটে না, শেষ পর্যন্ত তাদের মুড়ি বাতাসা দিয়ে বিদায় করতে হয়। আর তা দেখে এক মুঠো ভাত পাওয়ার আশায় বসে থাকা চিনিবাসের চোখ ফেটে জল পড়তে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত অবসন্ন ছোট্ট ছেলেটি তার আয়ীকে বলে – "গৌরাঙ্গের বানের চায়ে সে বান ভাল রে আয়ী। তেমন বান আর আসে না? সেই যে বানে চিড়ে মুড়ি চাল দেয় এত? দুস্কু ঘুচে যায়?"[৯৪] এইভাবে একেবারে বাস্তব সমাজের পটভূমিতে চৈতন্যদেবের প্রভাব আদৌ কতটা কার্যকর, নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনে গৌরাঙ্গ প্রেমের জোয়ার কি সত্যি আদৌ তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে পারবে? সমাজের অপাংক্তেয় এইসব মানুষগুলির অবস্থার কি আদৌ কোনো পরিবর্তন ঘটবে? এইসমস্ত প্রশ্নের সম্মুখীন করে দেন পাঠককে।

চৈতন্যদেবের জীবনী অবলম্বনে ২০০৯ সালে দশদশি পত্রিকায় প্রকাশিত হয় দুটি ছোটগল্প। গল্পকার দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'পৌর্ণমাসী' এবং গৌতম ঘোষের লেখা 'সন্ধিক্ষণ'। দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'পৌর্ণমাসী' গল্পে আমরা নিমাই পণ্ডিতের দ্বিতীয় স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর্বেদনার পরিচয় পাই। নিমাই কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করার পর বৃন্দাবন যাত্রার প্রাক্কালে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যের গৃহে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এই সময় মায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে নিত্যানন্দ মারফত শচীদেবীর কাছে সংবাদ পাঠান। নিত্যানন্দ সেই সংবাদ পৌঁছে দিলে বিষ্ণুপ্রিয়াও প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার যাওয়া নিষেধ কারণ যতি জীবনে একবার প্রবেশ করলে স্ত্রীর মুখ দর্শন মহাপাপ। এ হেন মন্তব্য শুনে বিষ্ণুপ্রিয়ার কৌতূহলী উদগ্রীব হৃদয় এক বিপুল সর্বগ্রাসী রিক্ততায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। যে নারীর সযত্ন সাহচর্যে এতদিন প্রিয় পুরুষটি তৃপ্ত হয়ে এসেছেন, আজ সেই নারীর সান্নিধ্য, দর্শন মাত্র পাপ – এই ভয়ঙ্কর সংবাদ বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয়কে ছিঁড়ে খুঁড়ে রক্তাক্ত করে দেয়।

তবে বিষ্ণুপ্রিয়ার ধৈর্যও অসাধারণ। তিনি জানেন তাঁর স্বামী এক বিরাট যুগপুরুষ। লক্ষ লক্ষ মানুষকে উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি সংসার পরিত্যাগ করেছেন। বৃহৎ স্বার্থে যে ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিতে হয়, এ আত্মবিসর্জন যে গরিমাময় – তা বিষ্ণুপ্রিয়া জানেন। তবুও যুবতী রমণীর নারী হৃদয়ের আক্ষেপ মাঝে মাঝেই তাকে উদ্বেল করে তোলে। দেহ মনের চাহিদাকে তিলে তিলে পিষে মারতে মারতে তিনি প্রায় প্রস্তরীভূত। বিষ্ণুপ্রিয়া জানতেন তাঁর স্বামী লক্ষ্মীপ্রিয়ার স্মৃতি ভুলতে পারেননি। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার দিক থেকে তো কোনো শৈথিল্য ছিল না। তিনি সেবায়-যত্নে , ভক্তিতে-ভালবাসায় সর্বস্ব দিয়ে স্বামীকে ভরিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু বৃহৎ জগতের আহ্বান যে একবার শুনেছে সে তো আর কোনো বাঁধনেই ধরা দেয় না। নিমাই শুনেছিলেন এই বৃহৎ জগতের ডাক। তাই তাঁর পক্ষেও আর ঘর-সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকা সম্ভব হয় নি। তাই বৃহৎ জগতের স্বার্থে পতিত উদ্ধারের নিমিত্ত জাতিকে বাঁচাতে, নতুন পথ দেখাতে নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণও অবশ্যম্ভাবী ছিল। নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে গৃহ ত্যাগ করবে এমন সংবাদ যখন নবদ্বীপের দিকে দিকে প্রচারিত হয়ে গেছে এমন সময় বিষ্ণুপ্রিয়া একদিন স্বামীকে নতুন গামছা উপহার দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে নিবেদন জানালেন :

"জথা তথা জায় তুমি সঙ্গে যাইব আমি

না ছাড়িব দ্বিজরাজ।

করিব তুমার সেবা সেই যে আমার শোভা

গৃহ পরিজনে পড়ু বাজ।।"[৯৫]

চৈতন্যচরিতকার জয়ানন্দের এই বর্ণনা অনুযায়ী শ্রীগৌরাঙ্গ সান্ত্বনা দিলেন বিষ্ণুপ্রিয়াকে, দিতে চাইলেন যজ্ঞসূত্র আর উপদেশ দিলেন – প্রত্যহ হরে কৃষ্ণ হরে রাম বত্রিশ অক্ষর মন্ত্র জপ করে একটি তণ্ডুলে রাখবে, দুই প্রহরে যতগুলি চাল হবে সেইগুলি একত্র করে রন্ধন করে কৃষ্ণের ভোগ দিয়ে ভোজন করবে:

"আমার যজ্ঞসূত্র দিব্য ধৌত খুনি বস্ত্র

মন্দিরে আসি নিত্য পরিহ।।

আতব তণ্ডুল মুষ্টি ভূমে থ্যুয়া এক মুষ্টি

একটি তণ্ডুল হাথে করিহ।।

হরে কৃষ্ণ হরে রাম বত্রিশ অক্ষর নাম

সাঙ্গ হইলে সে তণ্ডুলে ছাড়িহ।।

এই মত যত পার প্রমাণ দুই প্রহর

সে তণ্ডুল রন্ধন করিহ।

সে অন্ন ভোজনে থুয়্যা তুলসী মঞ্জরী দিয়া

কৃষ্ণে নিবেদিয়া ধ্যান করিহ।"[৯৬]

সেই সঙ্গে চৈতন্যদেব আরও নির্দেশ দেন –

"সংকীর্তন করাইহ বৈষ্ণবে অন্নজল দিহ

এই সত্য পালিহ আমার।।"[৯৭]

গৌরচন্দ্র আরও বললেন- 'স্ত্রী সঙ সন্ন্যাসে না হএ।' স্বামীর আদেশ মাথা পেতে নিলেন বিষ্ণুপ্রিয়া –

"এ কথা শুনিয়া সতী বিষ্ণুপ্রিয়া মৌনব্রতী

যজ্ঞসূত্র লইল হাথ পাতিয়া।"[৯৮]

যদিও বৃন্দাবন দাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিমাইয়ের সন্ন্যাস প্রসঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকার কথা সেরকম কিছুই উল্লেখ করেন নি, তবে জয়ানন্দের বর্ণনা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে নিমাই তাঁর সন্ন্যাস পরবর্তী জীবনে বিষ্ণুপ্রিয়ারও যথাকর্তব্য স্থির করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের দীর্ঘ সাত বৎসর পরে নিমাই একবার নবদ্বীপে এসেছিলেন। মুরারী গুপ্ত ও লোচন দাসের বিবরণ অনুযায়ী শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবন মথুরা থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে গৌড় মণ্ডলে এসেছিলেন । মুরারির বিবরণে গৌরচন্দ্র মথুরা বৃন্দাবন থেকে নীলাচলের পথে কুলিয়া গ্রামে উপনীত হয়েছিলেন। সেখানে নবদ্বীপ থেকে সমাগত ভক্তবৃন্দের অনুরোধে নবদ্বীপে আগমন করে মাতৃভক্ত শ্রী গৌরাঙ্গ ভূমিতে পতিত হয়ে মায়ের চরণে বন্দনা করেছিলেন এবং শচী দেবী পরিবেশিত চতুর্বিধ রসযুক্ত অন্ন নিত্যানন্দ ও অন্যান্য ভক্তগণ সহ ভোজন করে কীর্তনানন্দে নিমগ্ন হয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি

বিষ্ণুপ্রিয়াকে তাঁর মূর্তি গড়ে পূজা করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। আবার চৈতন্যদেবের চিত্রপট নির্মাণ করে পূজা করার কথাও প্রচলিত আছে।

যাইহোক, এই ঘটনা অবলম্বন করেই হাল আমলের গল্পকার দেবাশিষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পৌর্ণমাসি' গল্পে দেখিয়েছেন মহাপ্রভু সন্ন্যাস নেবার পর নবদ্বীপে মায়ের দর্শনের অভিলাষে এলে শত শত ভক্তবৃন্দ তাঁকে পরিবেষ্টন করে থাকে। মনের সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া অবগুণ্ঠনবতী হয়ে চৈতন্যের সম্মুখে যান এবং তাঁর চরণে আশ্রয় নেন। এইসময় শ্রীচৈতন্যদেব নির্লিপ্ত মনোভাব থেকে স্ত্রীকে তার কর্তব্য স্থির করে দেন। বিষ্ণুপ্রিয়াকে তিনি বৈষ্ণব গোষ্ঠীর দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বলেন এবং তার প্রতিনিধি স্বরূপ নবদ্বীপে বৈষ্ণব ভক্তি প্রচারের কথা বলেন : " চৈতন্যদেব আবারও বললেন, আমার পর বৈষ্ণব গোষ্ঠীগুলির একতাবিধানের ভার তোমাকেই নিতে হবে। দেখ, কত ভক্ত। সারা দেশ জুড়ে এরকম সহস্রাধিক কৃষ্ণভক্ত তাপিত মানুষ আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাকে আবার শীঘ্রই নীলাচলে ফিরে যেতে হবে। তুমি এখানে আমার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ কর এটাই আমার ইচ্ছা। এস কৃষ্ণ নামে দীক্ষা নাও, অন্তর শান্ত হবে।"[৯৯] কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া এতবড় গুরুভার গ্রহণের যোগ্য কিনা - মহাপ্রভুকে সেই প্রশ্ন করলে মহাপ্রভু তার উত্তরে বলেন – " ··· তুমি পৌর্ণমাসী। বৈষ্ণব শাস্ত্রানুসারে যিনি কৃষ্ণলীলা ঘটান , সেই যোগমায়াই পৌর্ণমাসী। ভগবান কৃষ্ণ তাঁর আনন্দ আস্বাদনের জন্য রাধিকার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনই আমারও তুমি। তোমার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব তুমি পালন কর। আমি একাকী তো সম্পূর্ণ নই বিষ্ণুপ্রিয়া।"[১০০]

বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীকে চিনতে পারলেন না। তিনি দেখলেন তাঁর স্বামী অন্যজগতের মানুষ। এই মানুষটি আর তাঁর সেই ছোট্ট সংসারের গণ্ডির মধ্যে চেনা রূপ আর সীমার মানুষটি নন। তাঁর শরীর মন কৃষ্ণপ্রেমে তন্ময়। বিষ্ণুপ্রিয়া জানেন তাঁর স্বামী একাকীই সম্পূর্ণ। তিনি স্বয়ং বৃহৎ জগতের উদ্ধার কর্তা। তবুও মনের সমস্ত মান-অভিমান, দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রনা ভুলে তিনি স্বামীর দেওয়া নির্দেশ পালন করতে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়ে ওঠেন : " বিষ্ণুপ্রিয়া ভাবলেন, মহাপ্রভু যে কাজ তাঁকে দিয়েছেন, সেই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কর্মের মধ্য দিয়ে জীবনকে উপলব্ধির চেষ্টা করবেন তিনি।"[১০১] কারণ তিনি যে পৌর্ণমাসী।

'দশদিশি' পত্রিকার ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় গৌতম ঘোষের লেখা একটি গল্প 'সন্ধিক্ষণ'। স্মার্ত রক্ষণশীল হিন্দু ব্রাহ্মণদের অত্যাচারেই যে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করে নবদ্বীপ ত্যাগ করেছিলেন, সেই পটভূমি অবলম্বনেই এই গল্পটি রচিত। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নিমাইয়ের জাত-পাতের ভেদাভেদ ঘুচিয়ে ব্রাহ্মণ-শূদ্র, উচ্চ-নীচকে একাসনে বসানোর, সমমর্যাদা দানের ঔদার্য্য, মহনীয়তাকে

কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে নি। দীর্ঘদিন ধরে যে রক্ষণশীলতা, যে সংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা নিয়ে তারা সমাজে বর্ণবিভেদ করে এসেছে, সামান্য অপরাধে মানুষকে সমাজচ্যুত, জাতিচ্যুত করে এসেছে, তথাকথিত নীচ-শূদ্রজাতির উপর অমানবিক অত্যাচার করে এসেছে সেই দীর্ঘদিনের লালিত সংস্কারে তীব্র আঘাত এসে পড়ে। নিমাই পণ্ডিতের সর্ব-ধর্ম, সর্ব-বর্ণের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার উদারনীতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের রক্ষণশীল নীতির বিরুদ্ধে একপ্রকার প্রতিবাদ তথা জেহাদ ঘোষণা। সমাজপতিরা জগন্নাথের ছেলের এই ঔদ্ধত্য কোনোভাবেই মেনে নিতে পারে না। তারা যে কোনোপ্রকারে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। তারাই কাজীর কাছে গিয়ে নিমাই ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এমনকি গোপনে দরজা বন্ধ করে নাম-সংকীর্তনের আড়ালে এই বৈষ্ণবগোষ্ঠী আসলে চাঁদ কাজি মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে – এমন নালিশ নিমাইয়ের বিরুদ্ধে করা হয়।

আবার তারা সমাজের দলপতিদের নিয়ে সকলে সংগঠিত হয়ে নিমাইয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামে। আবার, ছাত্র সমাজকে তারা নিমাইয়ের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে তোলার কথা ভাবে। জাতিনাশ ও ধর্ম ভ্রষ্টতার প্রশ্ন তুলে ছাত্র সমাজকে তারা উত্তেজিত করে তোলার চেষ্টা করে। এই ছাত্র সমাজের সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের দলবলের সংঘর্ষ বাঁধানোর পরিকল্পনা করে এবং তাতে সমাজে আইন-শৃঙ্খলার ভঙ্গের অজুহাতে কাজী আর গৌড়ের সুলতানের কাছে নালিশ করে নিমাইকে কারারুদ্ধ করার ষড়যন্ত্র রচনা করে। আর কারারুদ্ধ হলে সহজেই নিমাই ও তাঁর দলের জাতিনাশ করে তাদের সমাজ বিচ্যুত করা যাবে বলে ষড়যন্ত্র রচনা করে।

সর্বোপরি তারা নিমাইয়ের অনুপস্থিতির সুযোগে তার বৃদ্ধ অসহায় মা শচীদেবী ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ভয় দেখিয়ে , শাসিয়ে আসে যাতে তারা নিমাইকে এসব থেকে বিরত করে। আর নবদ্বীপের ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের হাত থেকে শূদ্র চণ্ডাল পতিত প্রভৃতি জগতের বৃহৎ মানুষের মুক্তির জন্যই যে নিমাই সন্ন্যাস নিয়ে দেশত্যাগ করেছে সেকথা শচীমাতা জানেন এবং সেকথা তিনি সমাজপতিদেরও জানিয়ে দেন। তাই শচীমাতা নিমাইয়ের সন্ন্যাস গ্রহণে বাধা দেন নি। তারই নির্দেশে নিমাই বৃন্দাবনে না গিয়ে তার পূর্বপুরুষের দেশ নীলাচলেই যাত্রা করেছিল। স্মার্ত রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদের অত্যাচার, সমাজপতিদের দৌরাত্ম্য, বিধর্মী শাসকের রক্তচক্ষু – এইরকম একটি যুগসন্ধিক্ষণে বিশ্বজগতকে উদ্ধারের নিমিত্ত নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করে। এভাবেই চৈতন্যদেবকে নিয়ে বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে ওঠে। কথাসাহিত্যিকের হাত ধরে বাংলা ছোটগল্পে শ্রীচৈতন্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব অব্যাহত থাকে। আর সেই প্রবহমানতায় সাহিত্যের আকাশে দশকের পর দশক ধরে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ নিমাই পন্ডিত তথা বিশ্বম্ভর তথা চৈতন্যদেবের আত্মপ্রকাশ আমরা লক্ষ করে থাকি।

তথ্যসূত্র

(১) চৌধুরী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ১৯৬২, পৃ- ৩০।

(২) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, পত্র ১৯৯, বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃ- ৩১৯।

(৩) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৯২৭, পৃ- ৬৬১-৬৬২।

(৪) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, পত্র ১৪, বিশ্বভারতী, ১৩৭১, পৃ- ৩৩।

(৫) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৯৭, পৃ-২০৭।

(৬) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, আশ্বিন ১৩৯৮, পৃ- ২৭৫।

(৭) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১৯২৭, পৃ- ৬৬১।

(৮) তদেব, পৃ- ৬৬৪।

(৯) সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা), কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯২, পৃ-৪৬৩।

(১০) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ, গোরা, প্রথম পরিচ্ছেদ, বিশ্বভারতী, ১৩৯৭, পৃ-৫০৯।

(১১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, অখণ্ড সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০৫, বিশ্বভারতী, পোষ্টমাস্টার, পৃ-১৬।

(১২) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, মেঘ ও রৌদ্র, পৃ-২০৬-২০৭।

(১৩) তদেব।

(১৪) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, জয়-পরাজয়, পৃ- ১০৪।

(১৫) তদেব, পৃ-১০৫।

(১৬) তদেব।

(১৭) তদেব, পৃ-১০৭।

(১৮) সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত', আদিলীলা, একাদশ পরিচ্ছেদ, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১১, পৃ- ৫১।

(১৯) তদেব, পৃ-৫৩।

(২০) তদেব।

(২১) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, প্রাগুক্ত, জয়-পরাজয়, পৃ- ১০৬।

(২২) তদেব।

(২৩) চক্রবর্তী রমাকান্ত, শরৎ সাহিত্যে ধর্ম, 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, শরৎ সংখ্যা, ১৪০৮, পৃ- ২৮৫।

(২৪) চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শরৎরচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, স্বামী, শুভম, ২০১১, পৃ-৮২৬।

(২৫) সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা), কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, বিংশ পরিচ্ছেদ, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯২, পৃ- ৫০৭।

(২৬) চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শরৎরচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, স্বামী, প্রাগুক্ত, পৃ- ৮৩০।

(২৭) তদেব, পৃ- ৮৩৪।

(২৮)তদেব, একাদশী বৈরাগী, পৃ- ১০২৬।

(২৯) তদেব, আঁধারে আলো, পৃ- ৯৪৬।

(৩০) তদেব, পথনির্দেশ, পৃ- ৯০১।

(৩১) তদেব, প্রথম খণ্ড, শ্রীকান্ত, পৃ- ৬৫০।

(৩২) তদেব, পৃ- ৬৫২।

(৩৩) তদেব, পৃ- ৬৫৭।

(৩৪) তদেব, পৃ- ৬৭৩।

(৩৫) তদেব।

(৩৬) তদেব, পৃ- ৬৬৩।

(৩৭) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পাদিত, বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), ২০১১, পৃ- ৩০।

(৩৮) চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শরৎরচনাবলী, প্রথম খন্ড, শ্রীকান্ত, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৫৭।

(৩৯) তদেব, পৃ- ৬৫৮।

(৪০) তদেব, পৃ-৬৫৫।

(৪১) মজুমদার উজ্জ্বলকুমার (সম্পা), শরৎচন্দ্র : দেশকাল, চক্রবর্তী জাহ্নবীকুমার, বৈষ্ণবী কমললতা , সোনার তরী , ২০০০ , পৃ- ১২০-১২৪।

(৪২) চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র, শরৎরচনাবলী, প্রথম খন্ড, শ্রীকান্ত, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৫৩।

(৪৩) তদেব।

(৪৪) তদেব, পৃ-৬৫৬।

(৪৫) মিত্র সনৎকুমার (সম্পা.), লোকসংস্কৃতি গবেষণা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৪০৪, শতবর্ষে তারাশঙ্কর: লোকজীবন ও সংস্কৃতি, ১০বর্ষ ৩ সংখ্যা, গিরি সত্যবতী, ‘তারাশঙ্কর: বৈষ্ণবীয় জীবন ও আখড়া, পৃ- ৪০৫।

(৪৬) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৭, পৃ - ৩১৫।

(৪৭) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, পঞ্চম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯, পৃ- ৪১৩।

(৪৮) গোস্বামী ননীগোপাল, চৈতন্যোত্তর যুগের গৌড়ীয় বৈষ্ণব, করুণা প্রকাশনী, ১৯৭১, পৃ-২১১।

(৪৯) মুখোপাধ্যায় শুভঙ্কর (সম্পা.) চৈতন্যচিন্তা, চক্রবর্তী সুধীর, বাউল বৈষ্ণবের মিলিত চৈতন্য, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা লি, ২০০২, পৃ-১২৫।

(৫০) গোস্বামী ননীগোপাল, চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, করুণা প্রকাশনী, ১৯৭১, পৃ-২১১।

(৫১) বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলি, প্রথম খন্ড, রসকলি, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৭, পৃ- ৪০৫।

(৫২) তদেব, পৃ-৪১৩।

(৫৩) তদেব।

(৫৪) গিরি সত্য, বৈষ্ণব পদাবলি, রত্নাবলি, ২০০৬, পৃ-৩০২।

(৫৫) বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৬।

(৫৬) তদেব, পৃ-৪১৬।

(৫৭) মিত্র সনৎকুমার (সম্পা.), লোকসংস্কৃতি গবেষণা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৪০৪, শতবর্ষে তারাশঙ্কর: লোকজীবন ও সংস্কৃতি, ১০বর্ষ ৩ সংখ্যা, গিরি সত্যবতী, 'তারাশঙ্কর: বৈষ্ণবীয় জীবন ও আখড়া, পৃ- ৪১৩।

(৫৮) দত্ত বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্পে প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫, পৃ- ২৪৩।

(৫৯) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ- ৪০৫।

(৬০) তদেব, পৃ- ৪২০।

(৬১) দত্ত বীরেন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ-২৪৫।

(৬২) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, বৈষ্ণবের আখড়া, মালাচন্দন, সাহিত্যপ্রকাশ, ১৩৬৭, পৃ- ১৩৮।

(৬৩) তদেব, পৃ- ১৩৯।

(৬৪) তদেব, পৃ-১৫২-১৫৩।

(৬৫) তদেব, পৃ-১৭৮।

(৬৬) মিত্র সনৎকুমার (সম্পা.), লোকসংস্কৃতি গবেষণা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৪০৪, শতবর্ষে তারাশঙ্কর: লোকজীবন ও সংস্কৃতি, ১০বর্ষ ৩ সংখ্যা, গিরি সত্যবতী, 'তারাশঙ্কর: বৈষ্ণবীয় জীবন ও আখড়া, পৃ- ৪১১।

(৬৭) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, বৈষ্ণবের আখড়া, প্রসাদমালা, সাহিত্যপ্রকাশ, ১৩৬৭, পৃ-২০০।

(৬৮) তদেব, পৃ-২০৭।

(৬৯) তদেব, পৃ- ২২১।

(৭০) তদেব,পৃ- ২২২।

(৭১) তদেব,পৃ- ২২৩।

(৭২) তদেব, পৃ- ২২৪।

(৭৩) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, পঞ্চম খন্ড, রাধারানী, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৫৯,পৃ- ৪১৩

(৭৪) চক্রবর্তী রমাকান্ত, বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ- ১৪০।

(৭৫) তদেব, পৃ- ১৪৪।

(৭৬) বন্দ্যোপাধ্যায় অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খন্ড, মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৯৮৩, পৃ- ১২৫।

(৭৭) বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কররচনাবলী, অষ্টম খন্ড, যাদুকরী, মিত্র ও ঘোষ, ১৩৬০, পৃ- ৩০৫।

(৭৮) তদেব, পৃ- ৩১১।

(৭৯) চক্রবর্তী রমাকান্ত, বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ- ১৪৭।

(৮০) বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু, চুয়াচন্দন, পি সি সরকার এণ্ড কোং লিঃ, প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৪২, পৃ- ১২০।

(৮১) তদেব, পৃ-১২১।

(৮২) সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবন্দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, একাদশ অধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮২, পৃ-৫২।

(৮৩) বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু, চুয়াচন্দন, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৩।

(৮৪) তদেব।

(৮৫) তদেব, পৃ- ১২৫।

(৮৬) তদেব, পৃ- ১৭০।

(৮৭) দেবী মহাশ্বেতা, স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প, বান, পৃ-২১।

(৮৮) তদেব।

(৮৯) তদেব।

(৯০) তদেব, পৃ-২২।

(৯১) তদেব, পৃ-২৪।

(৯২) তদেব।

(৯৩) তদেব।

(৯৪) তদেব, পৃ-২৬।

(৯৫) মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা), জয়ানন্দ বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গল', বৈরাগ্য খন্ড, বাইশ পরিচ্ছেদ, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৬, পৃ-১২০।

(৯৬) তদেব।

(৯৭) তদেব।

(৯৮) তদেব।

(৯৯) মুখোপাধ্যায় অতনুশাসন (সম্পা.), দশদিশি, নভেম্বর ২০০৯, মুখোপাধ্যায় দেবাশিস, পৌর্ণমাসী, কল-০৭, পৃ- ৪৫৪।

(১০০) তদেব, পৃ- ৪৫৪।

(১০১) তদেব।

উপসংহার

আমাদের গবেষণার প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলা কথাসাহিত্যে নববীক্ষণে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রভাব কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার অন্বেষণ। এই উদ্দেশ্যেই আমরা ঊনবিংশ-বিংশ ও একবিংশ শতকে রচিত বিবিধ উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে কথাসাহিত্যের ধারায় বিবিধ প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের উদার সার্বভৌম বিরাট ব্যক্তিত্বের অনমনীয় প্রভাব, চৈতন্যাদর্শের, চৈতন্যসংস্কৃতির, চৈতন্য প্রভাবিত নব্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব যেমন প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। অপরদিকে আধুনিক কথাসাহিত্যিকের শিল্পিত সচেতন মানবিক দৃষ্টিতে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের নবনির্মান ও বিনির্মাণ আধুনিক পাঠককে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গির সম্মুখীন করে তুলেছে। ফলত চৈতন্যদেবকে নিয়ে নতুন করে ভাবনা-চিন্তার অবকাশ তৈরি হয়েছে।

আমরা দেখেছি বাংলা কথাশিল্পীরা যেভাবে চৈতন্যদেবের জীবনের নানা ঘটনাবলীকে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করে চৈতন্যজীবনের পুনর্নির্মাণ করেছেন তাতে ষোড়শ শতকের নবজাগরণের দূত চৈতন্যদেব কিন্তু বিংশ-একবিংশ শতকেও আধুনিক যুগনায়ক রূপে বাংলা কথাসাহিত্যে প্রতিভাত হয়েছেন। ফলে চৈতন্যদেব কেবল ধর্মপ্রচারক নন, সমাজ সংস্কারকরূপে, জাতীয় সংহতির রূপকার রূপে, জননায়ক, গণনায়ক, সমাজনায়ক রূপে তাঁর ব্যক্তিত্বের বিবিধ ভূমিকা যেমন বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পে শিল্পরূপ পেয়েছে তেমনি বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতির চর্চা ও ঐতিহ্যের ধারাও বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এ থেকে এই সত্যই আমাদের কাছে আরও একবার প্রতিপন্ন হয় যে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের প্রভাব যুগ-যুগান্তর ধরে প্রবহমান নবনবায়মান।

চৈতন্য-প্রভাবে বাংলা সাহিত্য হয়ে ওঠে মানবজীবনাভিমুখী বাস্তবতার প্রথম দলিল। নতুন করে নির্ণীত হয় মানবজীবনের মূল্য। নতুন বৈশিষ্ট্যে, নতুন চেতনায় বাংলা সাহিত্য গতিপথ পরিবর্তন করে সম্প্রসারিত হয় নানাদিকে। চৈতন্য জীবনী কাব্যগুলি একদিকে যেমন চৈতন্যদেবের জীবনের প্রামাণ্য দলিল অপরদিকে সমসামায়িক সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসেরও প্রামাণ্য গ্রন্থ; যা কেবল মধ্যযুগের সাহিত্যের পক্ষেই যে এক বিশেষ সম্পদ তাই নয়, ড.শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য পর্যালোচনা করে আমরা দেখিয়েছি এই কাব্যগুলিতে উপন্যাসের লক্ষণও নিহিত রয়েছে। তাই তো পরবর্তী কথাসাহিত্যিকবৃন্দ সেইসব উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেই চৈতন্যদেবকে নিয়ে রচনা করেছেন একাধিক উপন্যাস ও ছোটগল্প।

'চৈতন্যভাগবতে' বৃন্দাবন দাস চৈতন্যচরিত্রে করুণ কোমলতার সঙ্গে একটা রুদ্র কঠিন মূর্তিও অঙ্কণ করেছেন যার পরিচয় আমরা পাই জগাই-মাধাই উদ্ধার এবং কাজী দলনের মতো ঘটনায়। এইখানে চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে যে গণ আন্দোলনের পটভূমি রচিত হয়েছিল, চৈতন্যদেবের সেই প্রতিবাদী গণশক্তির জাগরুক সত্তার পরিচয়ই পরবর্তী উপন্যাসে নায়করূপে চৈতন্যচরিত্র নির্মাণের উপাদান হয়ে উঠেছে যার পরিচয় আমরা পাই কালকূটের 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য', ড. দীপকচন্দ্রের 'সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য' প্রভৃতি উপন্যাসে। আবার নবদ্বীপের গোরার আদলে গড়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের গোরা, শৈবাল মিত্রের গোরা। আবার জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' দেখা যায় সেই সময় গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হওয়ার একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ রাজা হব হেন আছে' এই প্রবাদকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুমানের ভিত্তিতে আভিজিৎ সেন লিখেছেন 'রাজপাট ধর্মপাট' উপন্যাসটি।

উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'অমৃতাভ' কাব্যে শ্রীচৈতন্যদেবকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ রূপে চিত্রিত করেছেন। তিনি চৈতন্যদেবের সমগ্র জীবন কাহিনী বর্ণনা না করে কেবল শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলা গ্রহণ করেছেন এবং চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের মহৎ উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ কেন্দ্রিক প্রতিবাদী সত্তার, জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ গণ আন্দোলনের নায়ক রূপে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের এই প্রভাব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসে গোরার চরিত্র গঠনে, রূপক সাহার 'ক্ষমা কর হে প্রভু' উপন্যাসের নায়ক গোরার চরিত্র নির্মাণে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। এইভাবে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, নতুন নতুন ভাবনা-চিন্তার প্রসার ঘটতে থাকে আধুনিক উপন্যাস ও ছোটগল্পে।

আবার বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও 'মৃণালিনী' উপন্যাসেও চৈতন্যদেবের আদর্শের প্রতিফলন দেখা যায়। আনন্দমঠের সন্তানেরাও বৈষ্ণব; তবে তা চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্ম থেকে ভিন্ন। চৈতন্যদেবের ইষ্টদেবতা যেখানে প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ, সন্তানদের ইষ্টদেবতা অনন্ত শক্তিময় শ্রীবিষ্ণু। বৈষ্ণবের অহিংসাই পরম ধর্ম; সন্তানদলের মতে 'প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন ধরিত্রীর উদ্ধার'। বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' অনুসরণ করলে দেখা যায় দুষ্টকে দমন করে শিষ্টের পালনের জন্য এবং ধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। নবদ্বীপে জগাই মাধাই উদ্ধার ও কাজী দলনের মতো ঘটনায় চৈতন্যচরিত্রে যে বীরত্ব ও সংগ্রামী আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে তারই প্রভাব যেন পরোক্ষে সন্তানদলের মধ্যে লক্ষ করা যায়। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক প্রবন্ধে চৈতন্যদেবের প্রসঙ্গ এনেছেন। বাঙালির দুর্বলতা, গৌরবহীনতার মনোভাবকে নস্যাৎ করতে যেমন তিনি চৈতন্যদেবের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন তেমনি ইউরোপের রেণেঁসাসের সঙ্গে বাংলার রেণেঁসাসের তুলনা করতে গিয়ে তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের নেতৃত্বে বাংলার নবজাগরণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন 'বাঙ্গালার

ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে। কেবল তাই নয় 'চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্যে'র কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। এমনকি 'মৃণালিনী' উপন্যাসে গিরিজায়ার মুখে এবং 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে হরিদাসীর কণ্ঠে যে গানগুলি ব্যবহার করেছেন তা পদাবলীধর্মী গান। এইভাবে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীতে কথাসাহিত্যের সূচনালগ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে চৈতন্যদেবের প্রভাব লক্ষ করে থাকি।

বিংশ শতকেও কথসাহিত্যে চৈতন্যদেবের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বউ ঠাকুরাণীর হাট'(১৮৮৩),'রাজর্ষি'(১৮৮৭),'গোরা' (১৯১০), 'চতুরঙ্গ'(১৯১৫), 'ঘরে বাইরে'(১৯১৬) প্রভৃতি উপন্যাসেও চৈতন্যব্যক্তিত্ব ও তাঁর আদর্শের প্রভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। চৈতন্যদেব বিশ্বপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ দৃষ্টি থেকে মুক্ত হয়ে চৈতন্য যে ভালবাসার ধর্মে জাতিকে উজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তাকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন। মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ সাম্যবাদের কথা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন। তার নমুনা আমরা 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে দেখতে পাই। চৈতন্যদেবের এই মানবপ্রেম ও মানবধর্ম প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী প্রতিফলন আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজর্ষি' উপন্যাসেও দেখতে পাই।; যেখানে অহিংস প্রেমই শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করে। আর, এই অহিংস প্রেমধর্মই বৈষ্ণব ধর্মের তথা চৈতন্য ধর্মের মূল কথা। চৈতন্যদেবের প্রভাব সবচেয়ে বেশি লক্ষ করা যায় রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের গোরা চরিত্র নির্মাণে। কেবল দৈহিক সৌন্দর্যই নয়, গোরার সঙ্গে আমরা গৌরাঙ্গের জীবন ও কর্মধারার সাদৃশ্যও লক্ষ করে থাকি। এই গবেষণা পত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

চৈতন্যদেবের প্রভাবে যে পদাবলী সাহিত্য ভক্তি ও কবিত্বের তুঙ্গ শিখর স্পর্শ করেছিল সেই পদাবলী রবীন্দ্রনাথের হাতে আরও গভীর ও ব্যাপক মাত্রা লাভ করে। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে নিখিলেশের মনের বিচিত্র ভাব পরিস্ফুটনে, আত্মবিশ্লেষণে, বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা বোঝাতে বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর' পদটি মোট চারবার উদ্ধৃত হয়েছে। আবার চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্মের রসচর্চার ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে নবীনের স্ত্রীর আত্মহত্যার মধ্যে; 'উদ্ধার' গল্পে গৌরীর বিষপান করে সহমৃতা হওয়ার মধ্যে এবং 'বোষ্টমী' গল্পে আনন্দী বোষ্টমীর সংসার ত্যাগের ঘটনায়। এই রচনাগুলির মধ্যে দিয়ে লেখক বৈষ্ণব ধর্মে গুরুবাদী সাধনার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন এবং চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর বৈষ্ণব ধর্মের অবক্ষয়ের চিত্রটিই পরিস্ফুট করেছেন। এইভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যে চৈতন্যদেবের আদর্শ এবং বৈষ্ণব পদাবলী ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়।

প্রকৃতপক্ষে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলন এমন এক সংস্কৃতির বাতাবরণ তৈরি করেছিল যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বাংলা কথাসাহিত্যে সুবিস্তৃত। বিশেষত তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতি ও বৈষ্ণব সমাজের সার্থক প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর 'রসকলি', 'রাইকমল', 'মালাচন্দন', 'প্রসাদমালা', 'রাধা', 'কবি', 'স্বর্গমর্ত্য', 'রাধারাণী' প্রভৃতি উপন্যাস ও ছোটগল্পে। এই উপন্যাস ও ছোটগল্পগুলি বিস্তৃত বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে আমরা দেখেছি শ্রীচৈতন্যদেবের বৃহৎ গণ আন্দোলনের পটভূমিতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের বিপরীতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল মানুষকে হরিভক্তি সূত্রে একত্রিত করার যে আদর্শ ব্রাহ্মণ-শূদ্র-চণ্ডালকে সমমর্যাদা দানে ও সাম্যের অধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করেছিল চৈতন্যদেবের সেই উদার মানবধর্মই পরবর্তীতে যেসকল সাধারণ মানুষ মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিল সেই জাত বৈষ্ণব সমাজ ও সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জীবন চিত্রের বাস্তব সত্য চিত্রের প্রতিফলনই ঘটেছে এখানে। সেইসঙ্গে রাঢ় বাংলার পটভূমিতে বৈষ্ণবীয় ভাব পরিমণ্ডল, বাউল বৈষ্ণবের নিয়ম-কানুন, সামাজিক রীতিনীতি, আচার-বিশ্বাস-সংস্কার, আখড়া নির্মাণ, রসকলি, মালাচন্দন, মাধুকরী, সমাধি, শ্রীচৈতন্যদেব, মহাজন পদাবলী, বৈষ্ণব ভিখারী, মোহান্ত, কীর্তনীয়া প্রভৃতি নানা অনুষঙ্গে পরিপূর্ণ এই রচনাগুলি। আমরা আরও দেখেছি কীভাবে বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী এই পল্লীবাংলার মানুষগুলির সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার সঙ্গে অন্বিত হয়ে যায়। আরও দেখা যায় যে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের প্রেক্ষিতে নারীর সাম্য, স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের যে পথ সূচিত হয়েছিল , তারই সুদূরপ্রসারী ফলশ্রুতি রূপে তারাশঙ্করের রচনায় নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা পরিলক্ষিত হয় 'রসকলি', 'রাইকমল', 'রাধা', 'স্বর্গমর্ত্য' প্রভৃতি উপন্যাসে। আর বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাসে তারাশঙ্করের সৃষ্ট রসকলি, রাইকমল, রাধা, বসন, ব্রজবাসিনী, তুলসী স্বাধীন ব্যক্তিত্বময়ী নারী চরিত্র হিসাবে উজ্জ্বল হয়ে থাকে। সর্বোপরি চৈতন্য প্রভাবে সমাজের নিম্ন বর্ণেরাও যে উত্তর চৈতন্যযুগে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিল তাঁর সার্থক দৃষ্টান্ত তারাশঙ্করের 'কবি', 'নিশিপদ্ম' প্রভৃতি উপন্যাস যেখানে সমাজের প্রান্তে বসবাসকারী হীনবৃত্তিধারী মানুষগুলির উন্নততর জীবনে উত্তরণের বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর ত্রয়ী উপন্যাস ('ময়ূরাক্ষী', 'গৃহকপোতী', 'সোমলতা') - এও ধরা পড়েছে চৈতন্যপ্রভাবিত বৈষ্ণবতার নানা ছাপ। শ্রীচৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্ম পরবর্তীতে সমাজজীবনে কীরূপ নেয়, সাধারণ গ্রাম্য মানুষের জীবন সাধনার সঙ্গে, জীবনযাপনের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম কীভাবে অন্বিত হয়ে যায় তারই বাস্তব সত্য চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায় সরোজকুমার রায়চৌধুরীর এই 'ত্রয়ী' উপন্যাসে। এভাবেই আধুনিক কথাসাহিত্যিকের হাত ধরে চৈতন্য-চর্চার ধারা অব্যাহত থাকে এবং চৈতন্যদেবের সুদূরপ্রসারীপ্রভাব কথাসাহিত্যে ফুটে ওঠে।

আর বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সম্পূর্ণরূপে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে বেশ কিছু উপন্যাস যেখানে চৈতন্যজীবনীই উপন্যাসের প্রধান কথাবস্তু। আমরা দেখেছি সেখানে একদিকে যেমন বিশিষ্ট কথাশিল্পীদের কলমে চৈতন্যব্যক্তিত্বের নবনির্মাণ ঘটেছে অপরদিকে নবনিরীক্ষণে চৈতন্যচর্চার ধারাও বাংলা উপন্যাস শিল্পকে সমৃদ্ধ করেছে। সমরেশ বসুর কালকূট ছদ্মনামে লেখা 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য' উপন্যাসে চৈতন্য কেবল ধর্মপ্রচারক বা অবতার নন, তিনি একজন রক্তমাংসের মানুষ। তিনি নেতা - তিনি প্রেমিক - তিনি স্বামী - তিনি সন্তান। চৈতন্যের জীবনের অধ্যায়গুলিকে যেমন একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে তাঁকে করে তোলা যায় ঘরের ছেলে , আবার বর্তমান যুগসংকটের মধ্যে দাঁড়িয়ে তাঁর মত দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর গুরুত্বও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ইতিহাসের আশ্রয় নিয়ে ঔপন্যাসিক দেখান যে জনমনে তাঁর নেতৃত্ব, তাঁর জনপ্রিয়তা তাঁকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে গেছে। কিন্তু তিনি চিরকালের 'জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য' হয়ে বেঁচে থাকেন মানুষের মনে।

এভাবেই ঔপন্যাসিকের হাত ধরে চৈতন্যব্যক্তিত্ব নতুন মাত্রা পায় আর বাংলা কথাসাহিত্যের ধারায় চৈতন্যচর্চার ধারা অব্যাহত থাকে। আর তাই দেখা যায় 'সাগরিক' উপন্যাসে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চৈতন্যদেবের প্রভাবে বাংলার সমাজ ও সাহিত্যে নবজাগরণের প্রভাব, সমাজ সংস্কারক রূপে তাঁর ভূমিকা, বিধর্মী শাসকের হাত থেকে হিন্দুধর্ম রক্ষা, সর্বোপরি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বিভেদ-বৈষম্য দূর করে সাম্য ও ঐক্যবোধ প্রচার প্রভৃতি চৈতন্যজীবনের নানান দিক সাম্প্রতিক কালের প্রেক্ষাপটে তুলে তুলে ধরেছেন।

ঔপন্যাসিক গজেন্দ্রকুমার মিত্র কল্লোল উত্তর পটভূমিতে দাঁড়িয়ে সাহিত্যের আঙিনায় চিরাচরিত প্রথা অবলম্বন করে 'চৈতন্যচরিতামৃত' অনুসরণে চৈতন্যদেবের জীবনকে উপন্যাস শিল্পে রূপ দান করে আধুনিক পাঠককে আর একবার চৈতন্যজীবন চর্চার আস্বাদ ফিরিয়ে দেন তাঁর 'কান্তাপ্রেম' উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে। এখানে আমরা দেখতে পাই ঔপন্যাসিক 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বর্ণিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসতত্ত্বের পঞ্চরসের উপাদানকে ব্যবহার করেছেন এবং চৈতন্যচরিত্রের মধ্য দিয়ে কীভাবে এই রসগুলি উপলবদ্ধির মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় সেই পথই বর্ণনা করেছেন।

তারাশঙ্করের উপন্যাস ও ছোটগল্পে আমরা রাঢ় বাংলার পটভূমিতে বৈষ্ণব আখড়াকে কেন্দ্র করে বোষ্টম-বোষ্টমীর জীবন আবর্তিত হতে দেখেছি আর সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসে সম্পূর্ণ ভিন্ন পটভূমিতে বৃন্দাবনের বৈষ্ণব আশ্রমকে কেন্দ্র করে তথাকথিত শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত একটি পরিবারের সদস্যদের জীবনাবর্তের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। এই উপন্যাসে বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতি, আচার-আচরণ এবং বৈষ্ণবদের আশ্রমকেন্দ্রিক জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে। এইভাবে বিংশ শতাব্দীর

দ্বিতীয়ার্ধে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম পরিবর্তিত রূপ লাভ করে সমাজজীবনে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তার চিত্রই আমরা উপন্যাসে প্রতিফলিত হতে দেখি।

বাঙালি জাতির প্রথম নবজাগরণের অধিনেতা শ্রীচৈতন্য। পাঁচশো বছরের বেশি সময় ধরে যিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাঙালি ব্যক্তিত্ব। তিনি আজও আমাদের সমাজে দৃষ্ট, পৃষ্ট, কীর্তিত ও স্মরণের বিষয়ীভূত। তিনি জনগনমন অধিনায়ক। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হল এই মহান ব্যক্তিত্বের তিরোধান রহস্যাবৃত যা সত্যিই বিস্ময়কর। আর এই বিস্ময়ের বিষয়কেই একটি রোমাঞ্চকর কাহিনীর রূপদান করেছেন ডঃ জয়দেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কাহাঁ গেলে তোমা পাই' উপন্যাসে। আমাদের গবেষণা পত্রের পঞ্চম অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বাংলা চৈতন্যজীবনী সাহিত্য থেকে যেমন তথ্য নিয়েছি তেমনি উড়িয়া সাহিত্য থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছি। সেইসঙ্গে বিভিন্ন ঐতিহাসিক, সাহিত্য সমালোচক ও চৈতন্য জীবনী বিষয়ে গবেষকদের মতামত উদ্ধৃত করে এ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছি যার মাধ্যমে চৈতন্যদেবের অন্তর্ধান রহস্য সম্পর্কে একাধিক সূত্র আমাদের সামনে উঠে এসেছে।

শ্রীচৈতন্যের তিরোধান নিয়ে যতই জল্পনা-কল্পনা চলুক না কেন তাঁকে কেন্দ্র করেই ক্ষয়িষ্ণু বাঙালি জাতি ও বাংলা সংস্কৃতি তার গ্লানি, বৈষম্য, কুসংস্কার থেকে মুক্তি লাভে সক্ষম হয়েছিল। গতানুগতিক বিবর্তনের ধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের গতি সংযুক্ত করেছিলেন তিনি। আবাহন করেছিলেন এক নতুন যুগের। অন্ধকার অতিক্রম করে নতুন অভ্যুদয়ের যোগ্য ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল তাঁর নতুন দিগদর্শনের মাধ্যমে। তাঁকে কেন্দ্র করে বাঙালি ধর্ম-দর্শনে, ভাষা-সাহিত্যে, সঙ্গীত-ভাস্কর্য-চিত্রকলায় এক মহৎ চেতনার বিষ্ফার ঘটিয়েছিল, পাঁচশো বছর পরেও যার ঔজ্জ্বল্য নিষ্প্রভ হয়ে যায় নি।

একবিংশ শতকের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আজও চৈতন্যদেবের প্রভাব অনস্বীকার্য। তাঁকে নিয়ে রচিত হয়ে চলেছে একের পর এক উপন্যাস। বাংলা কথাসাহিত্যিকের হাত ধরে চৈতন্যদেবের প্রভাব ও চৈতন্যচর্চার ধারা নব নব রূপে নবতাৎপর্যে একবিংশ শতকেও বাংলা উপন্যাস শিল্পে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। কোথাওবা নায়করূপে চৈতন্যব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ ঘটেছে, যেমন ডঃ দীপক চন্দ্রের 'সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে' প্রতিবাদী গণ আন্দোলনের নায়করূপে চৈতন্যচরিত্র চিত্রিত হয়েছে।

শৈবাল মিত্রের 'গোরা' উপন্যাসে লেখক তিন যুগের গোরার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রভাবের এক অনবদ্য ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন; মধ্যযুগের নবদ্বীপের গোরা প্রথম জাত-পাত, উচ্চ-নীচ, ধর্ম-বর্ণের বিভেদ-বৈষম্য দূর করে ঘোষণা করেছিলেন 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ'। এই একই আদর্শের প্রতিধ্বনি যেন আমরা শুনতে পাই বিশ শতকে রবীন্দ্র উপন্যাসে গোরার কণ্ঠে যে তিনি শুধু ভারতবর্ষীয়, তার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান কোন সমাজের কোন বিরোধ

নেই। চণ্ডালের ঘরেও তার অপবিত্রতার ভয় নেই। আর, আমরা দেখতে পাই একবিংশ শতকে শৈবাল মিত্রের গোরাও শেষ পর্যন্ত জীবনে বৃহতের সন্ধান পেয়ে স্বেচ্ছাসেবী রূপে কোটি কোটি দুর্গত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে চেয়েছে। আর গোরার মুখে এ কথা শুনে তার কাকা ত্রিদিবনাথ যেন মনশ্চক্ষে দেখেন - পাঁচশো বছরের আগের গোরার সঙ্গে কাল থেকে কালান্তরে হেঁটে চলেছে অনেক অনেক গোরা, গোরার মিছিল। এইভাবে ঔপন্যাসিকের হাতে চৈতন্যব্যক্তিত্বের নবনির্মাণ ঘটতে থাকে এবং আধুনিককালে চৈতন্যচর্চার ধারা অব্যাহত থাকে।

আবার চৈতন্যদেবের পদরেণুধন্য বিশিষ্ট স্থানগুলি নিয়েও উপন্যাস রচিত হয়েছে, যেমন চৈতন্যদেবের গৌড় পরিভ্রমণকে কেন্দ্র করে রচিত অভিজিৎ সেনের 'রাজপাট ধর্মপাট' যেখানে একদিকে গৌড় উড়িষ্যার মুসলিম ও হিন্দু রাজার সংঘাত রাজপাটের নিজস্ব নিয়মে , অন্যদিকে চৈতন্যের নেতৃত্বে ধর্মপাট, এই দুয়ের মেলবন্ধনে এক ক্রান্তিকালের ছবি এঁকেছেন লেখক অভিজিৎ সেন এই উপন্যাসে। চৈতন্যদেবের গৌড়ে আগমন, রূপ সনাতন উদ্ধার, চৈতন্যদেবের সর্বধর্ম সমন্বনয়ের আদর্শ কীভাবে একটা সময়ের অস্থির জীবনাদর্শের মাঝে লক্ষ লক্ষ মানুষকে একত্রিত করল, তাদের উদ্ধারের নিমিত্ত চৈতন্যদেবকে অবতারত্ব গ্রহণ করতে হল, রাজপাটের সঙ্গে কীভাবে ধর্মপাট একাত্ম হয়ে গেল তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে এই উপন্যাসে। আর এভাবে 'রাজপাট ধর্মপাট' উপন্যাসটি যেন হয়ে উঠেছে বর্তমানের প্রেক্ষিতে মধ্যযুগের নবনির্মাণ।

আবার চৈতন্যদেবের পানিহাটি আগমন ও সেই সূত্রে সোদপুরের পানিহাটা জনপদের পাঁচশ বছরের ইতিহাসকে লেখক সাধন চট্টোপাধ্যায় সাহিত্যরূপ দান করেছেন তাঁর 'পানিহাটা' উপন্যাসে। পানিহাটি গ্রামটি গঞ্জত্ব হারিয়ে মফফসল থেকে ধীরে ধীরে শহর হয়ে উঠলেও তা যে আজও শ্রীচৈতন্যদেবের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে; এই প্রসঙ্গে অতীত বনাম বর্তমানের বিভিন্ন দ্বন্দ্বে লেখক সমাজজীবনের বিভিন্ন প্রান্তকে ছুঁয়ে গেছেন। উপন্যাসে এসেছে বৈষ্ণবদের কৃষ্ণ নামের মাহাত্ম্য, মধুর রসের ভজনা, সখিভাবে ভজনা, গৌর নাগরী ভাবে ভজন পূজন, শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে সংকীর্তন, মহোৎসব প্রভৃতি। এইভাবে লেখক 'পানিহাটা' উপন্যাসে চৈতন্য-সংস্কৃতির নবতর ব্যঞ্জনা উপস্থাপন করেছেন।

আবার তাঁর অন্তর্ধান রহস্য নিয়ে রচিত হয়েছে গবেষণাধর্মী উপন্যাস রূপক সাহার 'ক্ষমা কর হে প্রভু' যেখানে লেখক একদিকে চৈতন্যদেবের মৃত্যু রহস্য নিয়ে গবেষণায় মধ্যযুগের চৈতন্যচরিতকাব্যগুলি যেমন অনুসরণ করেছেন, উড়িয়া মালিকা সাহিত্য থেকে উপাদান নিয়েছেন, তেমনি সাম্প্রতিককালে চৈতন্যচর্চার ধারাকেও গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে

অতীতের রূপরেখা রচনা করে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের বিনির্মাণ করেছেন গোরা চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে। চৈতন্যদেব বৃহৎ গণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিভেদ বৈষম্য দূর করে সমাজের নিপীড়িত নিম্নবিত্ত মানুষগুলিকে মর্যাদা দানের চেষ্টা করেছিলেন ঠিকই কিন্তু সেই বর্ণবৈষম্য যে আজও সমাজে অব্যাহত রয়েছে, তা প্রত্যক্ষ করে উপন্যাসের গোরা দলিত সম্প্রদায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনে যোগদান করে।

এইভাবে ঔপন্যাসিকের কলমে বাংলা সাহিত্যে একদিকে যেমন চৈতন্যদেবের সুদূরপ্রসারী প্রভাব অব্যাহত থাকে অপরদিকে চৈতন্যব্যক্তিত্বের নবনির্মাণ ও বিনির্মাণ বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলে। এ প্রসঙ্গে চৈতন্যদেবের সমসাময়িক গৌড়বঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত নন্দিনী চট্টোপাধ্যায়ের 'চেনা পথ অচেনা পথিক' উপন্যাসটির কথা উল্লেখ করতে হয় যেখানে গৌড়ের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলির ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, প্রেম-অপ্রেমের কথামালাই উপন্যাসের উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

এছাড়া আমাদের গবেষণায় উঠে এসেছে আরও বেশ কিছু উপন্যাসের আলোচনা। যেমন অলখ মুখোপাধ্যায়ের 'এক জন্মেই জন্মান্তর'(২০১৪) যেখানে নিমাইয়ের জীবন-দর্শন, অনুভব, উপলব্ধিকে লেখক যেমন নতুনভাবে তুলে ধরেছেন তেমনি ষোড়শ শতাব্দীর পটভূমিতে নবদ্বীপের সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রাচুর্য, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ বিষয়কে শিল্প রূপ দিয়েছেন মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের পটভূমিকে অবলম্বন করে। মহাপ্রভুর আদিলীলা নিয়ে রচিত কিন্নর রায়ের 'শ্রীচৈতন্য কথা' (২০১৮) যেখানে চৈতন্যের জন্মের পূর্ববর্তী শচীর মৃত অষ্টকন্যার জন্ম রহস্য নিয়ে লেখকের কল্পনা আবর্তিত হয়েছে এবং হাল আমলে বসন্ত লস্করের 'মিথের মানুষ শ্রীচৈতন্য' (২০২০) যেখানে গ্রাম বাংলার পটভূমিতে বেড়ে ওঠা একটি নিতান্ত সাধারণ ছেলে নিমাইয়ের প্রেম-ভালবাসা, বিরহ-যন্ত্রণা এবং পরিশেষে জননায়ক হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে একেবারে সহজ-সরল ভাষায় প্রভৃতি উপন্যাসগুলি পর্যালোচনার মাধ্যমে আমরা একবিংশ শতকে কথাসাহিত্যে নববীক্ষণে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর গভীর ও ব্যাপক প্রভাব প্রতিফলিত হয়ে উঠতে দেখি।

শুধু উপন্যাস নয়, বাংলা ছোটগল্পেও আমরা চৈতন্যদেবের প্রভাব লক্ষ করে থাকি। চৈতন্যদেব যে নব্য বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন তার মূল কথাই ছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণের উর্ধ্বে সমস্ত মানুষকে প্রেমভক্তি বিতরণ। চৈতন্যদেবের এই উদার প্রেমধর্মই গ্রাম বাংলার জনজীবনকে বিশেষত নিম্নশ্রেণির মানুষকে আলোড়িত করেছিল। গৌরাঙ্গের বর্ণভেদ বিরোধী মানবিক উদারনীতির আহ্বানে

অনুপ্রানিত, ভক্তির অর্ন্তনিহিত সাম্য ও মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ সংখ্যা গরিষ্ঠ নিম্নবর্ণ ও বর্ণহীন পল্লীবাংলার মানুষের জীবনের সত্য চিত্রই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে বাংলা ছোটগল্পগুলিতে।

বাংলা ছোটগল্পের প্রথম যথার্থ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্পে বৈষ্ণব পদাবলী, বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য এবং বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রাণপুরুষ চৈতন্যদেবের প্রভাব আমরা লক্ষ করে থাকি। বৈষ্ণব ধর্মের সহজ-সরল রূপ যেমন তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন 'বোষ্টমী' গল্পে তেমনি শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত কীর্তন গান এবং বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর 'পোস্টমাস্টার', 'মধ্যবর্তিনী', 'জয়-পরাজয়', 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে। কখনো পরিস্থিতি পরিস্ফুটনে, কখনো বা প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনায়, কখনো নায়ক-নায়িকার চিত্ত উদ্ঘাটনে, তাদের বিরহ-যন্ত্রণা প্রকাশে বৈষ্ণব পদগুলি বাংলা ছোটগল্পে এক অনন্য ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আঁধারে আলো' গল্পে বারাঙ্গনা বিজলীর কণ্ঠের পদাবলী গানটিও উল্লেখযোগ্য। আবার 'পথনির্দেশ' গল্পের শেষাংশে ফুটে উঠেছে রাধার শতবর্ষব্যাপী বিরহের ছবি। আবার চৈতন্যদেবের আদর্শের তথা বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় 'স্বামী' গল্পে ঘনশ্যামের চরিত্রে। শরৎচন্দ্রের 'একাদশী বৈরাগী' গল্পে দেখা যায় সমাজবিচ্যুত বিধবা বোনকে নিয়ে একাদশী শেষপর্যন্ত ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হয়ে আত্মরক্ষা করে। এখানেই শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত নব্য বৈষ্ণবধর্মে পতিতদের উদ্ধারের বৃহৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করে। যুগ যুগ ধরে অবক্ষয়ী মানুষের সর্বনাশ রুখতে চৈতন্যব্যক্তিত্বের প্রভাব ও বৈষ্ণব বীক্ষা যেন এভাবেই সামাজিক বর্মের কাজ করে চলে। আর চৈতন্য হয়ে ওঠেন নবযুগের ভক্তিসিক্ত রূপকার, এক সমাজনায়ক, সমাজসংস্কারক। জাগ্রত চৈতন্যের আলোকে পথ খুঁজে চলে আধুনিক মানুষ, আর যুগে যুগে তাদের পথপ্রদর্শক রূপে চৈতন্যদেবের গভীর ও ব্যাপক প্রভাব সমাজ ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চলে।

চৈতন্যদেবের এই উদার ধর্মনীতি সাম্যবাদী প্রচেষ্টা যে সুদূরপ্রসারী ফল লাভ করেছিল বাংলা ছোটগল্পগুলি তার সার্থক নিদর্শন বহন করে। এই নিদর্শন আরও সার্থকতা লাভ করে রাঢ় বাংলার বিখ্যাত ছোটগল্পকার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে। তাঁর রচনায় গ্রামবাংলার বাউল-বোষ্টম-বৈরাগীদের জীবন ও জীবিকার এবং শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের বাস্তব সত্য চিত্রই প্রতিফলিত হয়ে ওঠে 'রসকলি', 'মালাচন্দন','প্রসাদমালা', 'রাধারাণী', 'পৌষলক্ষ্মী', 'যাদুকরী' প্রভৃতি ছোটগল্পে।

আবার শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চুয়াচন্দন' গল্পে আমরা আত্মবিশ্বাসী, বিদ্যার অহংকারে দৃপ্ত, নির্ভীক, অসীম সাহসী একটি বালকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় যেমন পাই তেমনি তার কৌতুক রসপ্রিয়তার পরিচয়ও পাওয়া যায়। আবার মহাশ্বেতা দেবীর 'বান' গল্পে চৈতন্য প্রেমের বানের বিরূপ

প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। এইভাবে বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যচর্চা নতুন মাত্রা পায় এবং ছোটগল্পে চৈতন্যদেবের প্রভাব অব্যাহত থাকে।

এইভাবে আধুনিক কথাশিল্পীর দার্শনিক দৃষ্টিতে চৈতন্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর প্রভাবের আরও অনেক অজানা দিক, নতুন তথ্য, নতুন নতুন ভাবনা-চিন্তা বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের শিল্পরূপে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। আর এগুলি থেকে আজকের পাঠক যেমন সাহিত্য রস আস্বাদন করে তেমনি তাদের সামনে চৈতন্যদেবকে নিয়ে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবনা-চিন্তার দ্বার উন্মোচিত হয়। বিভিন্ন প্রেক্ষিতে, বিভিন্ন পটভূমিতে কথাসাহিত্যের ধারায় চৈতন্যব্যক্তিত্বের উপস্থিতি সমসাময়িক কালের প্রেক্ষাপটে মধ্যযুগের সীমা অতিক্রম করে তাঁকে আধুনিক যুগনায়ক করে তোলে। তাই তো একবিংশ শতকে বসেও আমরা অনায়াসে চৈতন্যদেবের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারি।

বর্তমান একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে একদিকে সাম্প্রদায়িক হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি অপরদিকে ভয়ঙ্কর মহামারী যেখানে মানুষের জীবনকে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে, যেখানে প্রতিনিয়ত মৃত্যু মিছিল, গণচিতা, ভয়ঙ্কর দুরাবস্থার মধ্যে পড়ে মানুষের প্রাণ ছটফট করছে – এইরকম পরিস্থিতিতে আরও একবার স্মরণ করতে হয় চৈতন্যকে যিনি মানুষের চেতনার জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। কালকূটের কথা অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি - " ফিরে এসো, হে নিমাই, এই জগৎ উদ্ধারিতে ফিরে এসো নবরূপে। পাপ ও অবিচারের ভারে অসহনীয় পৃথিবী আজ তোমার প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।"

বাংলা কথাসাহিত্যে যেভাবে চৈতন্য ব্যক্তিত্বের নবনির্মাণ ও বিনির্মাণ ঘটে চলেছে, যেভাবে তাঁর গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বাংলা উপন্যাস ও ছোটগল্পের শিল্পরূপে প্রতিফলিত হয়ে আধুনিক সমস্যাজর্জর পঙ্কিল সমাজকে আশার আলো দেখিয়ে চলেছে তাতে মনে হয় বর্তমানের সাময়িক অন্ধকার দূরীভূত হয়ে আবার নতুন সূর্যোদয় হবে, আর উদিত সূর্যের ন্যায় চৈতন্যদেবের কৃতিত্ব, তাঁর মহিমার আলোকে যেমন আমরা আলোকিত হব, তেমনি বাংলা কথাসাহিত্যের জগতও আলোকিত হবে এবং নববীক্ষণে চৈতন্যদেবকে নিয়ে গবেষণার পথ আরও আরও প্রসারিত হবে।

গ্রন্থসূচি

আকর গ্রন্থ:

কালকূট, কালকূট রচনাসমগ্র, সপ্তম খণ্ড, জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৯।

কালকূট, কালকূট রচনাসমগ্র, অষ্টম খণ্ড, জ্যোতির্ময় শ্রীচৈতন্য, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা-৯, ২০০৯।

গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৮৭।

ঘোষ শিশির কুমার, শ্রী অমিয় নিমাই চরিত, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা -৯, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৯।

ঘোষ বিশ্বরঞ্জন সম্পাদিত, লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, সাহিত্যলোক, কলকাতা-৬, ২০০০।

চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০৬ ।

চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, ১৩৬১।

চট্টোপাধ্যায় সাধন, পানিহাটা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪।

চট্টোপাধ্যায় নন্দিনী, চেনা পথ অচেনা পথিক, দেজ, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ২০০৯।

চন্দ্র দীপক, সচল জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, দেজ, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০১।

চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর সম্পাদিত, লোচনদাসের ‘শ্রীশ্রী চৈতন্যমঙ্গল’, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-০৬, প্রথম প্রকাশ, ২০১৯।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ , চিঠিপত্র, নবম খন্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৭১।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৯৩।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৯৩।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৯৩।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৯৪।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৯৭।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৯৮।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৯৮।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র উপন্যাস সংগ্রহ, বিশ্বভারতী, কলকাতা- ১৭, ১৩৯৭।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-১৭, ১৩৫৩।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-১৭, ১৯২৭।

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ, অখণ্ড সংস্করণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা-১৭, ১৪০৫।

দাস সজনীকান্ত (সম্পা.), নবীনচন্দ্র রচনাবলি, সপ্তম খন্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-০৬, ১৩৬৬।

বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩, ১৩৫৭।

বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩, ১৩৫৮।

বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলি, পঞ্চম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা- ৭৩, ১৩৫৯।

বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলি, ষষ্ঠ খন্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা- ৭৩, ১৩৫৯।

বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর রচনাবলি, অষ্টম খন্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা- ৭৩, ১৩৬০।

বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্য জীবন, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা- ৭৩, ১৩৬০।

বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, আমার কালের কথা, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩, ১৩৫৮।

বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, বৈষ্ণবের আখড়া, সাহিত্যপ্রকাশ, কলকাতা-০৯, ১৩৬৭।

বন্দ্যোপাধ্যায় শরদিন্দু, চুয়াচন্দন, পি সি সরকার এণ্ড কোং লিঃ, ১৮ শামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৪২।

ভাদুড়ী সতীনাথ, সতীনাথ রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩, মাঘ ১৪২০।

মজুমদার বিমানবিহারী ও মুখোপাধ্যায় সুখময় (সম্পা), জয়ানন্দ বিরচিত ‘চৈতন্যমঙ্গল’, দি এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা- ১৬, প্রথম প্রকাশ ১৯৭১, পুনর্মুদ্রণ ২০০৬।

মিত্র গজেন্দ্রকুমার, কান্তাপ্রেম, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯০।

মিত্র শৈবাল, গোরা, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, সেপটেম্বর ২০১২ ।

মুখোপাধ্যায় অলখ, এক জন্মেই জন্মান্তর, কৃতি পাবলিকেশন, কলকাতা- ৯, প্রথম প্রকাশ ২০১৪।

মুখোপাধ্যায় জয়দেব, কাঁহা গেলে তোমা পাই, প্রাচী পাবলিকেশন, কলকাতা-৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, ২০১৭।

রায় কিন্নর, শ্রীচৈতন্যকথা (আদিপর্ব), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারী ২০১৮।

রায়চৌধুরী সরোজকুমার, ময়ূরাক্ষী, নতুন ফসলের প্রথম পর্ব, বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-০৯, ১৯৬৪।

রায়চৌধুরী সরোজকুমার, গৃহকপোতী, নতুন ফসলের দ্বিতীয় পর্ব, বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-০৯, ১৯৬৪।

রায়চৌধুরী সরোজকুমার, সোমলতা, নতুন ফসলের তৃতীয় পর্ব, বিদ্যোদয় লাইব্রেরি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-০৯, ১৯৬৪।

লস্কর বসন্ত, মিথের মানুষ শ্রীচৈতন্য, প্রথম খণ্ড, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, জানুয়ারী ২০২০।

লস্কর বসন্ত, মিথের মানুষ শ্রীচৈতন্য, দ্বিতীয় খণ্ড, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, জানুয়ারী ২০২১।

সাহা রূপক, ক্ষমা কর হে প্রভু, দীপ প্রকাশন, কলকাতা- ৬৭, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩।

সেন সুকুমার (সম্পা.), বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা -০৪, প্রথম প্রকাশ ১৯৮২, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১১।

সেন সুকুমার ও মুখোপাধ্যায় তারাপদ (সম্পা.), কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১৩৯২।

সেন সুকুমার ও মিত্র খগেন্দ্রনাথ (সম্পা.), বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১।

সেন অভিজিৎ, রাজপাট ধর্মপাট, দেজ, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ২০০৮।

সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার, অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৬।

সহায়ক গ্রন্থ :

গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা- ৭৩, ১৪০৫।

গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, ছোটগল্পের সীমারেখা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রা লি , কলকাতা- ১২, ১৩৭৬।

গিরি সত্যবতী, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ১৯৮৮।

গিরি সত্য, বৈষ্ণব পদাবলি, রত্নাবলি, কলকাতা-০৯, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৬।

গিরি সত্যবতী, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যচর্চা, দিয়া, কলকাতা – ০৯, ২০১৭।

গুপ্ত নির্মল নারায়ণ, ভারতীয় সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য, রত্নাবলি, কলকাতা- ০৯, ১৯৮৬।

গুপ্ত ক্ষেত্র, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা-০৯, ১৯৯৪।

গোস্বামী ননীগোপাল, চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭১।

ঘোষ কানাইলাল, শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাব ভূমি, একুশ শতক, কলকাতা – ৭৩, ২০১৩।

ঘোষ শুভময়, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে চৈতন্য-আন্দোলন ও বঙ্গনারী, পত্রলেখা, কলকাতা -০৯, ২০২০।

ঘোষ সতী, বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলীর ক্রমবিকাশ, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৭।

চক্রবর্তী বরুণ কুমার (সম্পা.), চৈতন্য পরিক্রমা, খিদিরপুর হরিসভা, কলকাতা- ২৩, ১৩৯৩।

চক্রবর্তী রমাকান্ত, বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারী ১৯৯৬।

চক্রবর্তী রমাকান্ত, বাঙালির ধর্ম- সমাজ ও সংস্কৃতি, সুবর্ণরেখা, কলকাতা-০৯, ২০০২।

চক্রবর্তী সুধীর, বাউল ফকির কথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, ২০১০।

চক্রবর্তী সুমিতা, উপন্যাসের বর্ণমালা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, ১৯৯৮।

চট্টোপাধ্যায় দুর্গাপদ, শ্রীচৈতন্য অনন্ত জীবনের সত্যান্বেষণ, সুবর্ণা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০।

চট্টোপাধ্যায় দেবব্রত, বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস, দে'জ, কলকাতা–৭৩, ২০০২।

চৌধুরী নারায়ণ, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র, এ মুখার্জী এণ্ড কোং প্রা. লি., কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭।

চৌধুরী ভীষ্মদেব সম্পাদিত, তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৯৯।

চৌধুরী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, প্রথম পর্যায়, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, ১৯৯৫।

চৌধুরী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, তৃতীয় পর্যায়, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা–৭৩, ১৯৯৫।

চৌধুরী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩, ১৯৬২।

চৌধুরী ভূদেব, রবীন্দ্র উপন্যাস ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, দেজ, কলকাতা- ৭৩, ১৯৮৪।

চৌধুরী মৈত্রেয়, প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যদেব, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-০৬, ১৪০৯।

চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর, শ্রীচৈতন্যদেব ও সমকালীন নবদ্বীপ, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪।

জানা যুধিষ্ঠির (মালীবুড়ো), শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধান রহস্য, ময়না প্রকাশনী, কলকাতা-০৯, ১৯৮৫।

দে অশোক কুমার, বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে, জিজ্ঞাসা, কলকাতা-০৯, ১৯৭৪।

দত্ত বিজিতকুমার, চৈতন্য জীবনকথা, গ্রন্থনিলয়, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯২।

দত্ত বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, ১৯৮৫।

দত্ত বীরেন্দ্র, বাংলা কথাসাহিত্যের একাল, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, ১৯৯৮।

দত্ত ভবতোষ, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, জিজ্ঞাসা, কলকাতা- ০৯, ১৯৭৩।

দত্ত সত্যেন্দ্রনাথ, কুহু ও কেকা, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯২৯।

দাশ শিশিরকুমার, বাংলা ছোটগল্প, দেজ, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৩।

দাশগুপ্ত প্রফুল্লকুমার, উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, সান্যাল এণ্ড কোম্পানি, কলকাতা-১২, ১৩৭৮।

দাশগুপ্ত শশিভূষণ, বাঙলা সাহিত্যের নবযুগ, এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা- ১২, ১৩৭২।

দাশগুপ্ত শশিভূষণ, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে, এ.মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা -১২, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৩।

দাশগুপ্ত শান্তিকুমার ও গুপ্ত নির্মল নারায়ণ, পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৫।

দাস ক্ষুদিরাম, বৈষ্ণব রসপ্রকাশ, এ.কে.সরকার অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা- ১২, ১৯৮২।

দে অশোককুমার, বাংলা উপন্যাসের উৎস সন্ধানে, জিজ্ঞাসা, কলকাতা-৭৩, ১৯৭৪।

দে সত্যব্রত, রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা, জিজ্ঞাসা, কলকাতা-০৯, ১৯৭১।

নস্কর সনৎকুমার, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য পরিপ্রশ্ন ও পুনর্বিবেচনা, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা ০৯, ১৯৭১।

পট্টনায়ক মাধব, চৈতন্যবিলাস, বিষ্ণুপদ পাণ্ডা কৃত বঙ্গানুবাদ (শ্রীচৈতন্যের দিব্য জীবন ও অজ্ঞাত তিরোধান পর্ব), দে'জ, কলকাতা–৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৯৭।

পাণ্ডা বিষ্ণুপদ, শ্রীচৈতন্য প্রদক্ষিণ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৩।

পাল সুকান্ত ও রায় সুব্রত (সম্পা.), নবজাগরণের প্রথম আলো শ্রীচৈতন্য, মিত্রম, কলকাতা -০৯, জুন ২০১৪।

পোদ্দার অরবিন্দ, বঙ্কিম মানস, পুস্তক বিপণি, কলকাতা- ৯, ১৯৫১।

বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা-৭৩, ১৯৮৩।

বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা-৭৩, দশম সংস্করণ, ১৯৯০।

বন্দ্যোপাধ্যায় দেবাশিস, চৈতন্যচর্চার পাঁচশো বছর, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৯, ১৯৮৭।

বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি., কলকাতা-৭৩, পঞ্চম সংস্করণ, ১৯৬৫।

বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা, দ্বিতীয় খণ্ড, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রা. লি., ১৯৯৩।

বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, কলকাতা-১২, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৯।

বন্দ্যোপাধ্যায় সরিৎ, আমার পিতা তারাশঙ্কর, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৭।

বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, উপন্যাসের কালান্তর, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, কার্তিক ১৪১০।

বন্দ্যোপাধ্যায় সুনীলকুমার, উপন্যাস শিল্পী রবীন্দ্রনাথ, রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, ১৯৯৮।

বন্দ্যোপাধ্যায় সুরভি, গবেষণা : প্রকরণ ও পদ্ধতি, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৯০।

বসু তাপস (সম্পা.), শ্রীচৈতন্য একালের ভাবনা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, ২০১৪।

বসু নিতাই, তারাশঙ্করের শিল্পী মানস, দেজ, কলকাতা- ৭৩, ১৯৭৩।

বিশী প্রমথনাথ, বঙ্কিম সরণী, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা- ৭৩, ১৩৮৪।

বিশী প্রমথনাথ, রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা-৭৩, ১৩৬৬।

ভট্টাচার্য অমিত্রসূদন, বঙ্কিম সাহিত্য, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা-০৩, ১৯৭৮।

ভট্টাচার্য্য জগদীশ, চৈতন্য প্রসঙ্গ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা-০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ ১৪২১।

ভট্টাচার্য্য জগদীশ, আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, ভারবী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯।

ভট্টাচার্য প্রদ্যুম্ন (সম্পা), তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা-৩০, ২০০১।

ভট্টাচার্য বিষ্ণুপদ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভক্তিরস ও অলংকার শাস্ত্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ১৪০০।

ভট্টাচার্য হংসনারায়ণ, যুগাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-১২, ১৯৮৪।

মজুমদার বিমানবিহারী, শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা-৬, জানুয়ারী ২০০৬।

মজুমদার বিমানবিহারী, রবীন্দ্র সাহিত্যে পদাবলীর স্থান, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-০৬, ১৩৬৮।

মজুমদার বিমানবিহারী, পাঁচশত বৎসরের পদাবলী, জিজ্ঞাসা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭৩।

মজুমদার রমেশচন্দ্র, বাংলা দেশের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-১৩, ১৯৯৮।

মজুমদার সমরেশ, বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর, রত্নাবলী, কলকাতা-০৯, ১৩৯৩।

মজুমদার সমরেশ, তারাশঙ্করের রাধা দর্শন ও জীবনে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা - ০৯, ১৪১২।

মজুমদার উজ্জ্বলকুমার(সম্পা.), তারাশঙ্কর দেশ-কাল-সাহিত্য, মর্ডান বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ,কলকাতা-৭৩, ১৩৮০ ।

মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, বাংলা কথাসাহিত্য জিজ্ঞাসা, দেজ, কলকাতা- ৭৩, জুন ২০০৪।

মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, দেজ, কলকাতা- ৭৩, ১৯৯৯।

মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, কালের প্রতিমা, দেজ, কলকাতা- ৭৩, ১৯৯৩।

মুখোপাধ্যায় প্রভাতকুমার, রবীন্দ্রজীবনকথা, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬৬ ।

মুখোপাধ্যায় শুভঙ্কর, চৈতন্যচিন্তা, এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, ১৯৯৯।

মুখোপাধ্যায় সুখময়, বাংলার ইতিহাসের দু'শো বছর স্বাধীন সুলতানদের আমল, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা- ০৯ প্রথম প্রকাশ জুলাই, ১৯৬০।

মুখোপাধ্যায় সুখময়, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দ্বিপ্রহর, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স, কলকাতা- ১৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬০।

মুখোপাধ্যায় হরেকৃষ্ণ, বৈষ্ণব পদাবলী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৮০।

রায় গৌরমোহন, তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা, সাহিত্যশ্রী, কলকাতা- ০৯, ১৯৯৪।

রায় দেবেশ, উপন্যাসের নতুন ধরণের খোঁজে, দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, ২০০৬।

রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দেজ পাবলিশার্স, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২।

রায় বিশ্বনাথ, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নতুন পাঠ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা-৭৩, ২০০৭।

রায় রামদাস, শ্রীচৈতন্য উড়িষ্যা ও বৈষ্ণব আন্দোলন, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৭।

রায়চৌধুরী গোপিকানাথ, বাংলা কথাসাহিত্য প্রসঙ্গ, অন্নপূর্ণা পুস্তক মন্দির, কলকাতা- ০৭, ১৯৭৭।

রায়চৌধুরী গোপিকানাথ, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দেজ, কলকাতা- ৭৩, ১৩৮০।

রায়চৌধুরী বাঁশরী, জয়ানন্দ ও লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গলে সমাজচিত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা-৬, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮০।

শরীফ আহমেদ, বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড), বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩।

শ' ড. রামেশ্বর, আধুনিক বাংলা উপন্যাসের পটভূমি ও বিবিধ প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯।

সর রমেনকুমার, চৈতন্য জীবন – প্রসঙ্গ সেকাল ও একাল, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারী ২০১৬।

সান্যাল অরুণ, প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ১৯৯১।

সিকদার অশ্রুকুমার, আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস, অরুণা প্রকাশন, কলকাতা- ০৬, ১৩৯৫।

সিংহরায় গোপীমোহন, রবীন্দ্র সাহিত্যের নরনারী, প্রথম খণ্ড, ভারবী, কলকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ১৯৩২।

সেন দীনেশচন্দ্র, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৩, ১৯৮৫।

সেন দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম খণ্ড, দেজ, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৪।

সেন দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, দেজ, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬।

সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, ১৯৭৮।

সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯।

সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৬।

সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮।

সেন সুকুমার, চৈতন্যাবদান, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-০৯, ১৩৯২।

সেন সুকুমার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা-৬, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬৩।

সেনগুপ্ত সুবোধচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা- ১২, ১৯৭২।

সেনগুপ্ত সুবোধচন্দ্র, শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য, এ মুখার্জী এণ্ড কোং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৩৫৫।

হালদার গোপাল, বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ডঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-০৬, ১৪০০।

সহায়ক গ্রন্থ (ইংরাজী)

Chakraborty, Ramakanta, Vaishnavism in Bengal, 1486-1900, Sanskrit Pustak Bhander, 1985.

De Sushil Kumar, EARLY HISTORY OF THE VAISHNAVA FAITH AND MOVEMENT IN BENGAL, General Printers and Publishers Limited, Calcutta, 1942.

Keneddy, The Chaitanya Movement : A Study of the Vaishnavism of Bengal, Calcutta, 1925.

Mukherjee Pravat, The History of Medieval Vaishnavism in Orissa, Calcutta, 1940.

Pal Bipin Chandra, Bengal Vaishnavism, Modern Book Agency, Calcutta, 1933.

Sen Dinseh Chandra, Chaitanya and His Age, University of Calcutta, 1922.

পত্র-পত্রিকা

গিরি সত্যবতী ও নস্কর সনৎকুমার সম্পাদিত, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য গবেষণা পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ভাদ্র-মাঘ, ১৪০৯ ।

ঘোষ ঋতুপর্ণ সম্পাদিত, রোববার, প্রতিদিন, সাহা রূপক, ক্ষমা কর হে প্রভু, বি.এল.পাবলিকেশন, ২৭শে জুন, ২০১০।

চক্রবর্তী রমাকান্ত, শরৎ সাহিত্যে ধর্ম, 'কোরক' সাহিত্য পত্রিকা, শরৎ সংখ্যা, ১৪০৮।

চৌধুরী যজ্ঞেশ্বর সম্পাদিত, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ পত্রিকা, তৃতীয় সংখ্যা, ২০০৪।

মিত্র সনৎকুমার সম্পাদিত, লোকসংস্কৃতি গবেষণা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৪০৪, শতবর্ষে তারাশঙ্কর: লোকজীবন ও সংস্কৃতি, দশম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৪০৪।

সিন্‌হা রাজ্যেশ্বর সম্পাদিত, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, গিরি সত্যবতী, আধুনিক বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যজীবনের উপাদান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১।

দশদিশি সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত, দশদিশি, বিষয় : শ্রীচৈতন্য, কলিকাতা-০৭, নভেম্বর ২০০৯।

দশদিশি সম্পাদকমণ্ডলী সম্পাদিত, দশদিশি, বিষয় : শ্রীচৈতন্য, (দ্বিতীয় পর্ব), কলিকাতা-০৭, ২০১৪-২০১৫।

দাস রঞ্জনকুমার সম্পাদিত, শনিবারের চিঠি, তারাশঙ্কর সংখ্যা, ১৯৯৮।

শব্দ সাহিত্য পত্রিকা, কালকূট বিশেষ সংখ্যা, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১১।

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা (১-৪ সংখ্যা ১০৩ বর্ষ), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৯৮।

তবু একলব্য, সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, ২৫ বর্ষ, ৪০ সংখ্যা, ২০২০।

বইয়ের দেশ, জানুয়ারী – মার্চ, ২০২১, এবিপি প্রাঃ লিমিটেড।

মুনমুন দাস

গবেষক

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়



চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করে জননীকে বিদায় জানাচ্ছেন। শিল্পী : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।



। সপার্ষদ চৈতন্যদেব।। কুঞ্জঘাটা-মুর্শিদাবাদ। ১৮শ শতক

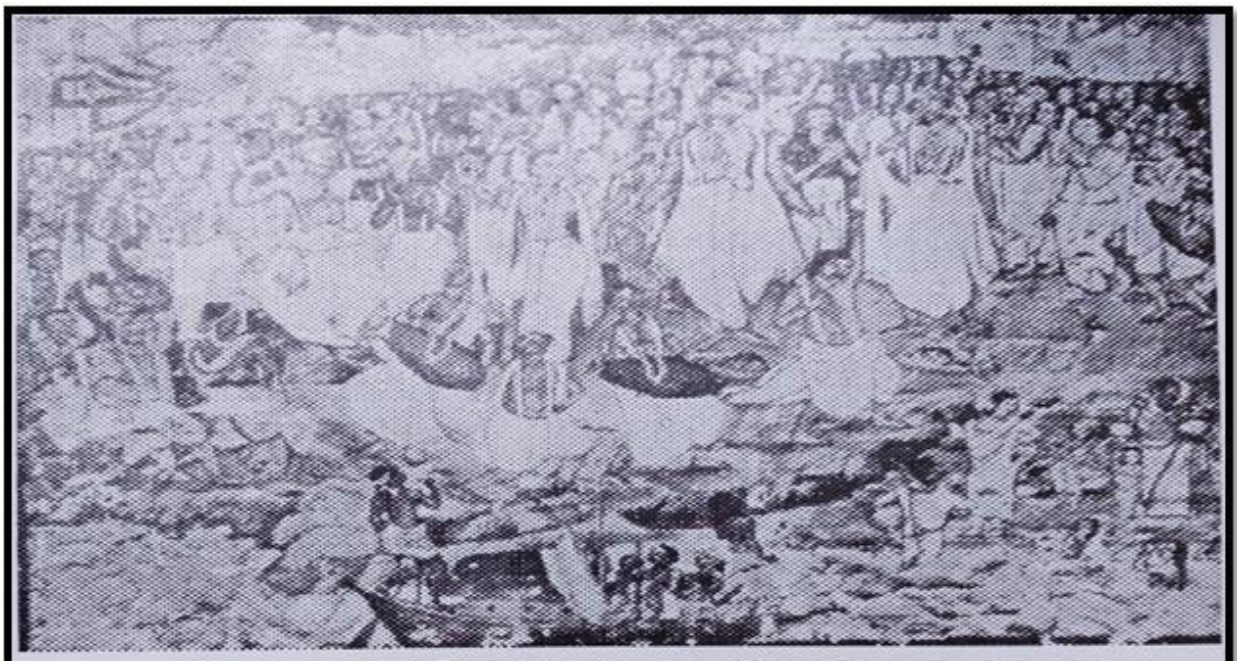

নবদ্বীপে চৈতন্য সংকীর্তন।। আড়িয়াদহ মল্লিকবাড়ি। আঃ ১৭ শতাব্দ।



সংকীর্তিনে ভাবাবিষ্ট চৈতন্যদেব।। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আঃ ১৯২২



পুরীর পথে নৃত্যরত চৈতন্য।। দীপেন বসু। সমকালীন

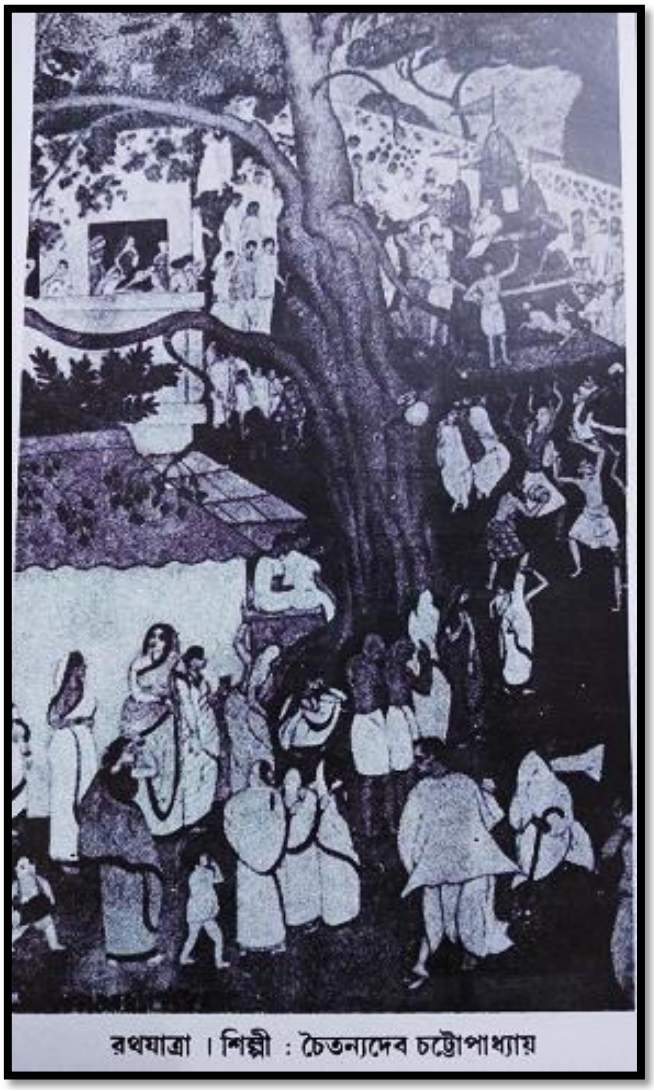

রথযাত্রা । শিল্পী : চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়



সংকীর্তন।। যামিনী রায়। আঃ ১৯৪৮



ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্য।। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমকালীন

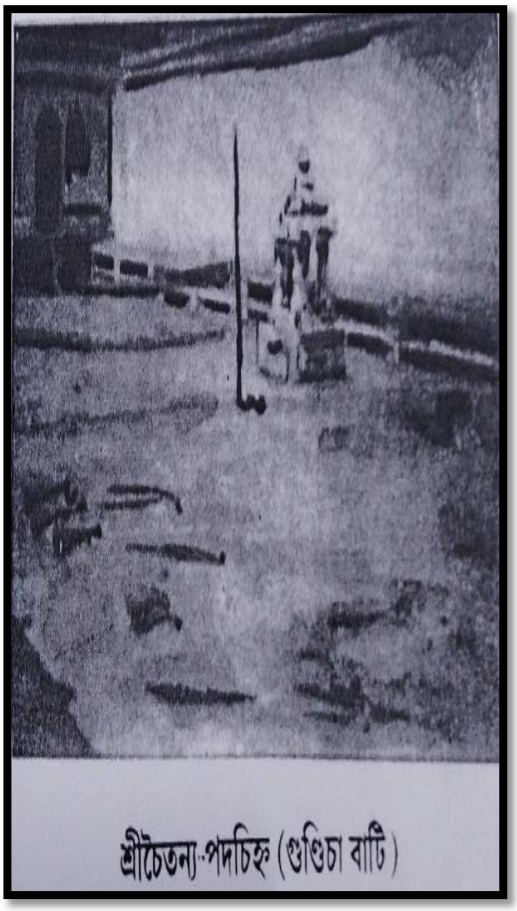

শ্রীচৈতন্য-পদচিহ্ন (গুণ্ডিচা বাটি)



শ্রীচৈতন্য-পদচিহ্ন (জগন্নাথ মন্দির পুরী)